সালাজারের জেলে উনিশ মাস

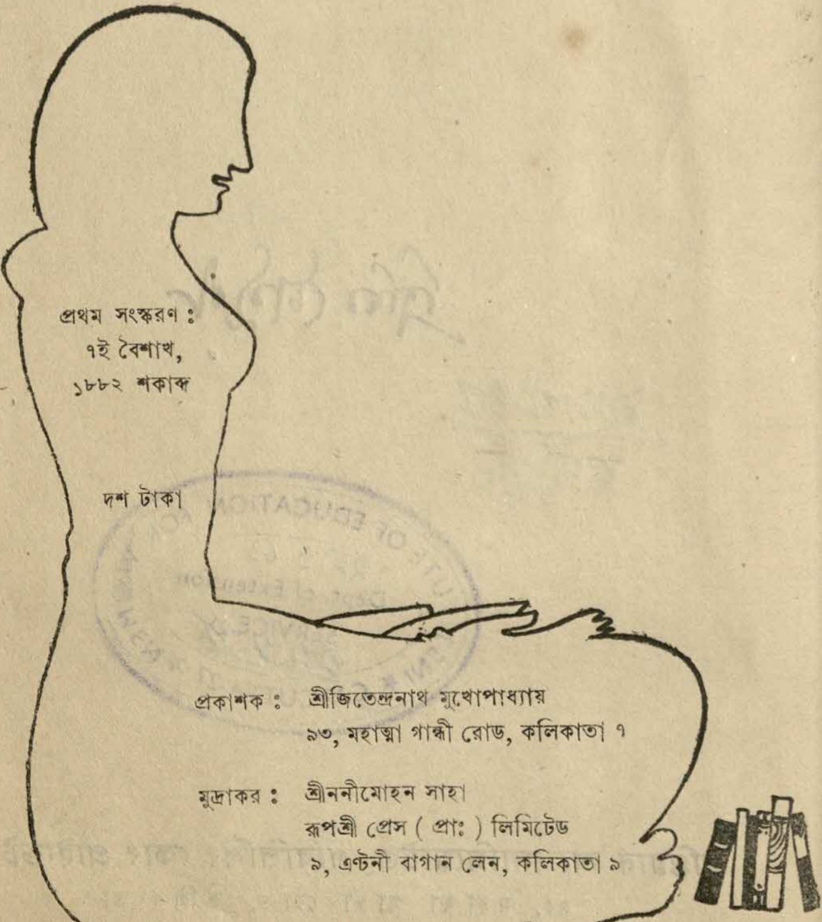
ত্রিদিব চৌধুরী

সালাজারের
জেলে
উনিশ
মাস

সালাজারের জেলে উনিশ মাস

ত্রিদিব চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ,
১৮৮২ শকাব্দ

দশ টাকা

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

গোয়াকে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের সেইসব অমর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

—লেখক



গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের অমর শহীদ :

শ্রীবালরায় মাপারী	আস্নোরা, গোয়া	১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫; মাপ্সো পুলিস হাজতে পুলিস নির্যাতনে নিহত।
শ্রীরাজারাম কুন্দেইকর	কুন্দেই, গোয়া	২৮শে জুলাই, ১৯৫৫; সরকারী নির্যাতন সহ্য না করিতে পারিয়া আত্মহত্যা করেন।
শ্রীকৃষ্ণশম্ভু শেঠ	পোম্বুর্পা, গোয়া	১৪ই আগস্ট, ১৯৫৫; আজাদ গোমন্তক দলের আত্মগোপনকারী কর্মীদের সম্পর্কে পুলিসকে কোনো খবর দিতে অস্বীকার করায় পুলিস ইঁহাকে একটি গাছের সংগে বাঁধিয়া নৃশংসভাবে প্রহার করিয়া পরে গুলি করিয়া হত্যা করে।
শ্রীসখারাম যশোবন্ত শিরোদকর	একোশী, গোয়া	আজাদ গোমন্তক দলের আত্ম-গোপনকারী কর্মী, একটি নদী সাঁতরাইয়া পার হওয়ার সময় পুলিস ইঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।
শ্রীপ্রভাকর ভেরেনকর	সাভোই ভেরে, গোয়া	৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৫; পুলিসের গুলিতে আহত হইয়া হাসপাতালে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।
শ্রীবালগোপাল দেশাই	নেতার্দা, গোয়া	৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬; ইন্-স্পেক্টর কাসিমির মন্তেইরো ও পর্তুগীজ সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে স্টেনগানের গুলিতে নিহত হন।
শ্রীবাপু বিষ্ণু গাভান্স	নেতার্দা, গোয়া	৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬; বালগোপাল দেশাইয়ের সহকর্মী; তাঁহার সঙ্গে মন্তেইরো বাহিনীর গুলিতে নিহত হন।
শ্রীকৃষ্ণ প্রভু	পঞ্জিম, গোয়া	৯ই জুন, ১৯৫৬; পঞ্জিমের পুলিস হাজতে নির্যাতনের ফলে নিহত হন।

শ্রীডিমোথিও গন্‌সালভেজ	পাঞ্জিম, গোয়া	২৬শে জ্লাই, ১৯৫৬; ইঁহার গ্লী-বন্দ্কের ব্যবসা ছিল। গোয়ার জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইতেছেন সন্দেহে পর্তুগীজ মিলিটারী প্লিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন এড়ানোর জন্য আত্ম-হত্যা করেন।
শ্রীকেশবভট্ট তেঙ্গ্সে	পৈঞ্জিনিম্, গোয়া	১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬; পার্তাগাল মঠের ঘটনা ও গোয়েন্দা কনস্টেবল জেরোনিমো বারেডোকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তারের পর প্লিস নির্যাতনে নিহত হন।
শ্রীপরশ্রামাচার্য	পার্তাগাল মঠ, গোয়া	১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬; পার্তাগাল মঠাধীশ, জেরোনিমো বারেডোর হত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তারের পর প্লিস নির্যাতনে নিহত হন।
শ্রীর্হিদাস মাপারী	আস্নোরা, গোয়া	২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬; জেলের ভিতর নির্যাতনের ফলে ইঁহার মৃত্যু হয়।
শ্রীবালকৃষ্ণ ভোঁস্লে	পোম্ব্র্পা, গোয়া	৫ই ডিসেম্বর, প্লিসের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে গ্লির আঘাতে নিহত হন।
শ্রীস্রেশ অনন্ত কেরকর	কেরিং, গোয়া	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭; জাতীয়তাবাদী কর্মী; ইনস্পেক্টর কাসিমির মন্তেইরোর গ্লিতে নিহত হন।
শ্রীকার্সালিও পেরেইরা	বান্দোরা, গোয়া	১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭; জাতীয়তাবাদী কর্মী; কাসিমির মন্তেইরোর গ্লিতে নিহত হন।

শ্রীবিনায়ক ধর্মা কাঁসার	লাদ্‌ফে', গোয়া	১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭; জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদী কর্মী শিরগাঁও খনিতে ডিনামাইট বিস্ফোরণের সংগে লিপ্ত ছিলেন। পুলিসের সংগে সশস্ত্র সংগ্রামে নিহত হন।
শ্রীআমীরচাঁদ গুপ্ত	উত্তরপ্রদেশ	২৫শে জুন, ১৯৫৫; সীমান্ত সত্যাগ্রহী; পুলিস নির্যাতনে কিরানপাত্রী' গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। পুলিস তাঁহাকে মারিয়া পাহাড়ের উপর হইতে ধাক্কাইয়া ফেলিয়া দেয়।
শ্রীনিত্যানন্দ সাহা	নদীয়া, পশ্চিম বাংলা	৩রা জুলাই, ১৯৫৫; সীমান্ত সত্যাগ্রহী; পুলিসের গুলিতে পাত্রাদেবীতে নিহত হন।
শ্রীবাবুরাও থোরাট	জাল্‌না, জালগাঁও, মহারাষ্ট্র	৩রা জুলাই, ১৯৫৫; নিত্যানন্দের সহ-সত্যাগ্রহী; পুলিসের গুলিতে নিহত হন।
শ্রীহনুমন্তাইয়া তেনগুটে	গাদাগ, মহীশুর	১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের সীমান্ত সত্যাগ্রহী; গোয়াতে পার্সে সীমান্তে মিলিটারীর গুলিতে নিহত হন।
শ্রীআনন্দনায়া গজেন্দ্রগড়	গাদাগ, মহীশুর	
শ্রীপান্নালাল যাদব	কোটা, রাজস্থান	১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের সীমান্ত সত্যাগ্রহী; গোয়াতে পালাইয়ে সীমান্তে নিহত।
শ্রী সি, এইচ্‌, জগমোহন রাও	— —	১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের সীমান্ত সত্যাগ্রহী; কাস্‌ল রক্‌ সীমান্তে নিহত হন।
শ্রী এস, এইচ্‌, সুব্বারাও গারু	বিজয়বাড়া, অন্ধ্র	
শ্রীব্রিজমোহন শর্মা	বৃন্দাবন, উত্তরপ্রদেশ	
শ্রী জে, শ্যাম ঘারমারে	বিয়োরা, মধ্যপ্রদেশ	
শ্রীকল্যাণ শর্মা	বিয়োরা, মধ্যপ্রদেশ	
শ্রীশেষনাথ ওয়াড়েকর	রেওডান্ডা, মহারাষ্ট্র	১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের সীমান্ত সত্যাগ্রহী; কাস্‌ল রক্‌ সীমান্তে নিহত হন।

(পর্তুগীজরা ইঁহাদের মৃতদেহ ভারতে আনিতে দেয় নাই। গোয়ার ভিতরে পেট্রোল ঢালিয়া পোড়াইয়া ফেলে)।

শ্রীহিরভে গুরুজী	পানভেল, মহারাষ্ট্র	১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের সীমান্ত সত্যাগ্রহী; টেরেখোল সীমান্তে নিহত।
শ্রীকর্নেইল সিং	লুধিয়ানা, পাঞ্জাব	১৫ই আগস্ট, ১৯৫৫; বান্দা সীমান্তে নিহত হন।
শ্রীরাজভাউ মহাকাল	উজ্জয়িনী, মধ্যপ্রদেশ	
শ্রীমধুকর চৌধুরী	উমরখেড়, মহারাষ্ট্র	
শ্রীরামগিরি সাধু	কাশী, উত্তরপ্রদেশ	১৫ই আগস্ট, ১৯৫৫; দমন সীমান্তে নিহত হন।
শ্রীব্যাস অমৃত নাথুরাম	সুরত, গুজরাত	১৫ই আগস্ট, ১৯৫৫; দমন সীমান্তে নিহত হন।
শ্রী এস, এম, রামরাও	বিজয়বাড়া, অন্ধ্র	১৫ই আগস্ট, ১৯৫৫; কাসল্ রক্ সীমান্তে নিহত হন।
শ্রীবাপুলাল হোটেলওয়ালা	মহারাষ্ট্র	
শ্রীনাথুজী কাম্বলে	মহারাষ্ট্র	

(এই শেষ নয়জনের দেহ কয়েকজন ভারতীয় সত্যাগ্রহী ও বিদেশী সাংবাদিকদের চেষ্টায় ভারতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছিল)।

	ভূমিকা	...	ক
॥ ১ ॥	সালাজারের অতিথি	...	১
॥ ২ ॥	গোয়ায় গেলাম কি ভাবে?	...	১০
॥ ৩ ॥	উদ্যোগ পর্ব ঃ 'চলো! গোয়া চলো!'	...	২৪
॥ ৪ ॥	অনমুড় কাস্টমস্ ক্যাম্পে	...	৩২
॥ ৫ ॥	গেরিলা সত্যাগ্রহ ঃ 'চলা! পুঢ়ে চলা!'	...	৩৯
॥ ৬ ॥	'সহ্যাচে' উগু কড়ে, স্বাগতাস সজ্জ খড়ে'	...	৪৮
॥ ৭ ॥	অরণ্যে রাত্রিবাস	...	৫৭
॥ ৮ ॥	গোমন্তকের লোকালয়ে	...	৬৬
॥ ৯ ॥	গোয়ার মানুষ	...	৭১
॥ ১০ ॥	গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহ্য ঃ অতীতের কয়েকটি পৃষ্ঠা	...	৭৭
॥ ১১ ॥	গ্রেপ্তার ঃ সালাজারের পিটুনী পুলিসের হাতে	...	৮১
॥ ১২ ॥	বিরোন্দে'-র পুলিস চৌকীতে	...	৯০
॥ ১৩ ॥	বিরোন্দে' হইতে ওয়ালপই	...	৯৭
॥ ১৪ ॥	মন্তেইরো সংবাদ	...	১০২
॥ ১৫ ॥	আরো মন্তেইরো সংবাদ	...	১০৯
॥ ১৬ ॥	ডাক্তারের বদলে চা	...	১১৫
॥ ১৭ ॥	মাপ্সা হাজতে	...	১১৬
॥ ১৮ ॥	পাঞ্জিমে	...	১২৮
॥ ১৯ ॥	কুয়ার্তেল জেরাল দা পোলিসিয়া	...	১৩৩
॥ ২০ ॥	কুয়ার্তেলের হাজত জীবন ঃ অন্নমন্ত্রী	...	১৩৭
॥ ২১ ॥	এক নম্বর হাজতের কাহিনী	...	১৪৪
॥ ২২ ॥	সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস	...	১৫০
॥ ২৩ ॥	গোয়ার মুক্তি আন্দোলন ও রাম দেশাই-দের কথা	...	১৫৭
॥ ২৪ ॥	পর্তুগীজ থানা-পুলিসের নানান কথা ঃ গোয়ার বীর মহিলা রাজবন্দীরা		১৬২

॥ ২৫ ॥ কন্সাল জেনারেল সঙ্গে সাক্ষাৎ ... ১৬৯
॥ ২৬ ॥ কুয়ার্তেল হাজত হইতে মানিকোমের পাগলা গারদে ... ১৭৬
॥ ২৭ ॥ কেরুস ও ফের্নান্দের কাহিনী ... ১৮২
॥ ২৮ ॥ আল্‌তিন্যোর দৈনন্দিন ... ১৮৮
॥ ২৯ ॥ পর্তুগীজ সৈন্য ও পর্তুগীজ সাধারণ মানুষ ... ১৯৫
॥ ৩০ ॥ পনরই আগস্ট ... ২০৪
॥ ৩১ ॥ পনরই আগস্টের রক্তস্নান ... ২১২
॥ ৩২ ॥ পাদ্রী কারিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ... ২১৯
॥ ৩৩ ॥ কাজীর বিচার ঃ উপক্রমণিকা ... ২২৩
॥ ৩৪ ॥ জজ কুয়াদ্রুসের জেরা ... ২২৯
॥ ৩৫ ॥ মেয়াদ বারো বছর ... ২৩৫
॥ ৩৬ ॥ আল্‌তিন্যো জেলের মেয়াদী কয়েদী ... ২৩৯
॥ ৩৭ ॥ আল্‌তিন্যোতে বাকী দুই মাস ... ২৪৬
॥ ৩৮ ॥ 'নাতাল' উৎসব ... ২৫১
॥ ৩৯ ॥ আগুয়াদা দুর্গে ... ২৫৯
॥ ৪০ ॥ প্রমোশন! ... ২৬৪
॥ ৪১ ॥ তেনেন্ত আফোঁসা দা কস্তা দা বেইরার রাজত্বে ... ২৬৮
॥ ৪২ ॥ আগুয়াদার সমুদ্র ... ২৭২
॥ ৪৩ ॥ আগুয়াদার জীবনযাত্রা ... ২৮১
॥ ৪৪ ॥ পর্তুগালের সাধারণ মানুষ ঃ আগুয়াদার অভিজ্ঞতা ... ২৯০
॥ ৪৫ ॥ গোয়া মুক্তি সংগ্রাম ঃ সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদের পর্যায় ... ৩০৩
॥ ৪৬ ॥ জেল মুক্তি! ... ৩১৬
॥ ৪৭ ॥ উপসংহার ... ৩২৭
॥ ৪৮ ॥ পরিশিষ্ট ... ৩৩৫

ভূমিকা

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস হইতে ১৯৫৬ সালের শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের আধুনিকতম পর্যায়ের বছর তিনেকের ইতিহাস এই কারা-কাহিনীর পটভূমি। ঘটনাচক্রে এই তিন বছরের ভিতর একটা সময়ে আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামে কিছুটা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালের ৯ই—১০ই জুলাই আমি সত্যাগ্রহী হিসাবে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়ার ভিতরে গিয়া পর্তুগীজ পুলিসের হাতে বন্দী হই। বে-আইনী ভাবে গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ এলাকায় প্রবেশ করার অভিযোগে এবং সেখানে গিয়া পর্তুগীজ ভারতের প্রজাদেরকে পর্তুগাল সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে অন্যান্য ভারতীয় সত্যাগ্রহী বন্দীদের মতো আমারও দশ বছর ও দুই বছর (জরিমানার বদলে), মোট বারো বছর সাজা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে পনরো-ষোলো মাসের বেশী সাজা খাটিতে হয় নাই। বিচারে সাজা হওয়ার আগে, অর্থাৎ গ্রেপ্তারের পরে পুলিস হেফাজতে বিচারাধীন অবস্থার কথা ধরিলে, গোয়াতে আমাকে আরও তিন-চার মাসের মতো থাকিতে হয়। এইভাবে গোয়াতে বন্দী অবস্থায় বিভিন্ন হাজতে বা জেলে আমার সবশুদ্ধ কাটে উনিশ মাসের কিছু বেশী। গোয়াতে ঢোকার উনিশ মাস তেইশ দিন বাদে, ১৯৫৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী, গোয়ার বন্দী অন্যান্য ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে একত্র মুক্তিলাভ করিয়া আমি পর্তুগীজ ভারত হইতে আবার স্বাধীন ভারতে ফিরিয়া আসি। বলিয়া দিতে হইবে না, গোয়াতে আমার সেই উনিশ মাসের বন্দী-জীবনের কাহিনী নিয়াই এই বই।

গোয়াতে যতদিন ছিলাম তাহার প্রায় সবটাই পর্তুগীজ সরকারের আটক বন্দী হিসাবে পুলিস হাজতে বা জেলে কাটিয়াছে। পুলিস পাহারা ছাড়া জেলের বাহিরে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়া গোয়া দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। সীমান্ত পার হইয়া গোয়াতে পর্তুগীজ এলাকায় ঢোকার পর প্রথম দিন (অর্থাৎ ৯ই জুলাই) গোটা দিনটাই আমাদের পাহাড়ে পাহাড়ে ও বনে-জঙ্গলে ঘুরিতে হয়। পরের দিন আমরা গোয়ার লোকালয়ে যে দিকে আসিয়া পৌঁছাই—গোয়ার পূর্বাঞ্চলে সাতারি জেলা (গোয়ার একটি জেলার এলাকা আমাদের একটি থানার এলাকার চেয়েও ছোট)—তাহাকেও নিতান্ত গ্রাম্য অঞ্চল ছাড়া কিছু বলা চলে না। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে দিন আমাদের মুক্তি দেওয়া হয় ,সে দিনও আমাদের জেল হইতে গোয়ার ভিতরে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। গোয়ার ভিতরে যাহাতে আমরা থাকিতে বা ঘোরাফেরা না করিতে পারি সেজন্য আমাদের সশস্ত্র পুলিস পাহারায় মোটর-বাসে বসাইয়া একেবারে সীমান্ত পার করিয়া দিয়া তবে ছাড়া হয়। এই সময়ে আমাদের জেল-মুক্তির যে আদেশ দেওয়া হয় সেটা আসলে আমাদের জেলের সাজা মকুব করিয়া গোয়া হইতে বহিষ্কারের আদেশ। তাহা সত্ত্বেও গোয়ার চেহারা যে একেবারেই দেখি নাই তাহা নয়, কিছু কিছু দেখিয়াছি। বন্দী হিসাবে পুলিস পাহারায় এক জেল হইতে আরেক জেলে আসিতে যাইতে, পুলিস হেড কোয়ার্টারের হাজত বা জেল হাজত হইতে কোর্টে কিংবা জেল হাজত হইতে পুলিস হেড কোয়ার্টার্সে পুলিসের জেরার জন্য আসিতে যাইতে অথবা জেল হইতে এক আধবার

চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা-যাওয়ার পথে গোয়ার গ্রাম, শহর-বাজার, পথ-ঘাট বা লোকজন এসব দেখার যথেষ্ট সুযোগ হয়। মুক্তির দিন আমাদের, কেন জানি না, অর্ধেক গোয়ার প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ ঘুরাইয়া দক্ষিণ সীমান্তে ভারতীয় এলাকা মাজাড়ী-কারওয়ার অঞ্চলের কাছাকাছি আনিয়া ছাড়া হয়। আমরা সে সময় মান্ডভী নদীর উত্তর-পূর্ব পারে ছিলাম। ফেরীতে করিয়া বন্দিভর্তি ৩-৪টি মোটর-বাস, সশস্ত্র পুলিস বোঝাই ৭-৮টি লরী, অফিসারদের ল্যান্ড-রোভার জীপ এসব নদী পার করার হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য হয়ত আমাদের সেদিন কিছুটা আঁকাবাঁকা ঘোরাপথে আনা হইয়া থাকিবে, এমন হইতে পারে। কিন্তু কারণ যাহাই হোক, সেদিন আমাদের ওয়াল্‌পই, মাপ্‌সা, মাড়গাঁও, কানাকোন প্রভৃতি জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ করিয়া ঘোরার এবং এই সব জায়গার চেহারা মোটামুটি এক ঝলক দেখিয়া নেওয়ার সুযোগ হইয়াছিল। দেড় বছর আগে গ্রেপ্তারের দিন ওয়াল্‌পই এবং মাপ্‌সার চেহারা খানিকটা চোখে পড়িয়াছিল। তবে আমাদের যেদিন মুক্তি দেওয়া হয় সেদিন পুলিসের ব্যবহারও অত্যন্ত সৌজন্য ও ভদ্রতাপূর্ণ ছিল। সুতরাং সেদিন শহর দেখার অসুবিধা হয় নাই। এছাড়া গোয়ার ভিতরে আমার যা' কিছু অভিজ্ঞতা, সেটা জেলের ভিতরকার অভিজ্ঞতা; বাহিরের অভিজ্ঞতা নয়।

কিন্তু জেলের ভিতরে থাকিলেও পর্তুগীজ শাসনে, বিশেষ করিয়া সালাজারের একনায়কত্বের আমলে, গোয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে বেশী অসুবিধা হয় নাই। গোয়াবাসীদের জীবনযাত্রা, তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা এবং গোয়ার ভিতরকার বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেলের ভিতরেও জানার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাহার একটা কারণ, বন্দী-জীবনের প্রথম ছয় মাস আমাকে পুলিস হাজতে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে একই সেলে রাখা হয়। ভারতীয় সত্যাগ্রহী নেতাদের মধ্যে এক জনসঙ্ঘ নেতা জগন্নাথরাও যোশী ও অল্প কিছু দিনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির রাজারাম পাতিল ভিন্ন এ সুযোগ অন্যদের হয় নাই। শ্রীযুক্ত নানা সাহেব গোরে, শিরুভাউ লিমায়ে বা ঈশ্বরভাই দেশাইকে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের নিকট হইতে যতটা সম্ভব দূরে সরাইয়া আলাদা আলাদা সেলে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অবশ্য গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে আমাদের এই কয়জনকে একত্র রাখার একটা অন্যতম কারণ ছিল, আমাদের যতটা পারা যায় জব্দ করা। গ্রেপ্তারের সময় পর্তুগীজ পুলিস আমাকে অন্যান্য ভারতীয় বন্দীদের মতো ঠেঙ্গাইতে পারে নাই; কর্তৃপক্ষের নিষেধ ছিল। (সে সব কাহিনী বইয়ের ভিতরে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।) তাহার জন্য পুলিসের মনে কিছুটা ক্ষোভ ছিল। আমাদের গোয়াবাসী বন্দীদের সঙ্গে রাখিয়া তাহারা আমাদের উপর তাহাদের মনের সেই ঝালটা কিছু পরিমাণে মিটাইয়া নিতে চাহিয়াছিল। গোয়াবাসী বন্দীদের সাধারণত একটি সেলের ভিতর গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা হইত। ফলে এই সব সেলে জীবনযাত্রার বাস্তব পরিবেশ নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ও কদর্য ধরনের হইত। খাওয়া-দাওয়াও নিতান্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট ধরনের ছিল। পুলিসের গালাগালি ও অন্যান্য ছোটখাট অসুবিধার কথা না বলাই ভালো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এইভাবে গোয়ার দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের সঙ্গে দিনের পর দিন একত্র থাকার ও মেলামেশা করার সুযোগ পাওয়ার ফলে গোয়া সম্পর্কে জানার এবং গোয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মনে মনে একটা পরিষ্কার ধারণা করার পক্ষে খুবই সুবিধা হইয়া গিয়াছিল।

এইসব বন্দীদের মধ্যে গোয়ার সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন। পর্তুগীজ পুলিসের গ্রেপ্তারের বেড়াজালে সে সময়ে কেহই বাদ পড়ে নাই। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই আমি আলাপ-আলোচনা করিয়া গোয়ার অবস্থা যতটা পারি বোঝার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ করিয়া দুটি বিষয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার খুবই সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। গোয়া যাওয়ার আগে গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা ও গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের পিছনে কি ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন ছিল, কি ভাবে আন্দোলন চলিতেছিল এসব বিষয়ে আমার বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। হাজতে আসিয়া গোয়ার ভিতরে এই সময় যেসব কর্মী মুক্তি-আন্দোলনের পরিচালনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস সম্পর্কে, চলতি আন্দোলনের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সংগঠন সম্পর্কে এবং আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি কথা আমার এই সময় জানার সুযোগ হয় যাহা তাঁহাদের সঙ্গে দেখা না হইলে আমি কোনো দিন জানিতে পারিতাম না। তা ছাড়া এই সব হাজতে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকার ফলে আর একটি সুবিধা এই হইয়া গিয়াছিল যে আমার গোয়াবাসী সহবন্দীদের মধ্যে অনেকেই পর্তুগীজ ভাষার উপর ভালো দখল রাখিতেন, ইংরাজী তো জানিতেনই। গোয়ার ভিতরে শিক্ষিত লোকেরা ইংরাজী এবং পর্তুগীজ দুই ভাষাই শেখেন। রাজনৈতিক বন্দীদেরও অনেকে দুই ভাষাতেই কথাবার্তা বলিতে বা লিখিতে পড়িতে পারিতেন। তাঁহাদের সাহায্যে আমাদের, চোরাই ভাবে জেলের ভিতর আনা গোয়াতে প্রকাশিত পর্তুগীজ খবরের কাগজ পড়া সম্ভব হইত। সরকারী খবর ছাড়া এই সব কাগজে বাহিরের বেশী কোনো খবর না থাকিলেও, এই সব কাগজে প্রকাশিত পর্তুগীজ সরকারী ইস্তাহার হইতে, কিংবা মিলিটারী ট্রাইবুনালের সামনে রাজনৈতিক বন্দীদের বিচার ও সাজার টুকরা টুকরা খবর হইতে, গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কি ধরনের আন্দোলন চলিতেছিল সে সবন্ধে আমরা কিছু কিছু আন্দাজ করিতে পারিতাম। তাছাড়া আমাদের এই সব সহবন্দীদের সাহায্যে পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে এবং কখনো-সখনো মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াও আন্দোলন সম্পর্কে বহু খবর পাইতাম, বিশেষ করিয়া গোয়ার মুক্তি-আন্দোলন ও ভারত-গোয়া সমস্যা সম্পর্কে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের মনোভাব কখন কি পথে মোড় নিতেছিল তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিতাম।

একথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ হইলেও, পাঠকেরা এই কারা-কাহিনীতে ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন যে, পুলিসের কথা বাদ দিলে গোয়ার ভিতরে জেলে থাকার সময় আমরা পর্তুগীজ সৈনিকদের বা সামরিক বিভাগের লোকেদের কাছে যথেষ্টই ভালো ব্যবহার পাইয়াছি এবং নানা ধরনের সাহায্য পাইয়াছি। গোয়াতে জেলে ঢুকিয়া বন্দী-জীবনের প্রথম দিকে এইভাবে গোয়াবাসী রাজবন্দীদের সঙ্গে একত্র থাকার সুযোগ না হইলে পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে পুলিসের নজর এড়াইয়া গোপনে মেলামেশা বা তাহাদের ভাষায় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। পর্তুগীজ ভাষাদক্ষ গোয়াবাসী সহবন্দীদের দোভাষী হিসাবে খাড়া করিয়া ক্রমে ক্রমে আমি নিজেও এই সব সৈনিকদের সঙ্গে কিছু কিছু আলাপ করার সুযোগ পাই। আন্দোলন সংক্রান্ত খবরাখবর ছাড়াও তাহাদের সঙ্গে এই সব আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া পর্তুগালের সাধারণ

লোকেদের জীবনযাত্রা ও সুখ-দুঃখের কথা, গোয়া সম্পর্কে তাহারা নিজেরা কি চিন্তা করে, নিজেদের দেশের গভর্নমেণ্ট ও দেশের অবস্থা সম্পর্কেই বা তাহাদের মনোভাব কি—এসব বিষয়ে কিছু কিছু ধারণা করার পক্ষে আমার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়া যায়।

গোয়ায় মুক্তি-আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর পর্তুগীজ আফ্রিকা অর্থাৎ আংগোলা ও মোজাম্বিক হইতে যেসব নিগ্রো সৈনিককে গোয়াতে আনা হয় তাহাদের সঙ্গেও আমরা এইভাবে পরিচিত হই। নিগ্রো সৈনিকরা সাধারণত গোয়ার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে কিছুটা বেশী সহানুভূতিসম্পন্ন হইত এটা আমরা দেখিয়াছি। গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের ছোঁয়াচ পাছে তাহাদের মনেও লাগে এবং তাহাদের মারফৎ আফ্রিকাতেও এ রোগ ছড়াইয়া না পড়ে, সেজন্য পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ পারিলে তাহাদের আমাদের কাছাকাছি আসিতে দিতে চাহিতেন না। নিগ্রো সৈনিকরাও আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে নানা কারণে কিছুটা ভয় পাইত। ভয়টা অবশ্য আমাদের সম্পর্কে নয়। পাছে পুলিস জানিতে পারিলে তাহাদের শাস্তি পাইতে হয়, ভয় বা সংকোচ সেজন্য। নিগ্রোরা জানে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের কাছে তাহাদের কোনো অধিকার বা মর্যাদা নাই। মানুষ বলিয়া তাহাদের কেহ গণ্য করে না। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অপরাধে তাহাদের উপর মারধোর, জেলের সাজা সব কিছু হইবে। পর্তুগীজ সৈনিকদের বেলায় এই সব অপরাধের সাজা যা হয়, তাহাদের বেলায় অনেক বেশীগুণ হইবে। সেই জন্য স্বভাবতই তাহারা কিছুটা ভয়ে ভয়ে থাকিত। পর্তুগীজ গোরা সৈন্যরা যে একেবারেই ভয় করিত না তাহা নয়; কিন্তু নিগ্রোদের মত নয়। ১৯৫৬ সালে আগুয়াদা দুর্গে বদলী হইয়া আসার পর আমরা সেখানকার সৈন্যদের সঙ্গে আগের তুলনায় অনেকটা খোলাখুলিভাবেই মেলামেশার সুযোগ পাই, যদিও সেটা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়া নয়। এক কথায় গোয়াতে জেলে বসিয়া এই সব সূত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহাই এই বইয়ের প্রধান উপজীব্য।

গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে যুক্ত হইয়া পড়ি অনেকটা ঘটনাচক্রে, অনেকটা অপ্রত্যাশিত ও অপরিকল্পিত ভাবে। ১৯৫৫ সালে মে মাস হইতে গোয়ার ভিতরে গিয়া পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ও গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য যখন ভারত হইতে গোয়াতে সত্যাগ্রহী অভিযাত্রী দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়, তাহার কিছু পরে সেইরূপ একটি সত্যাগ্রহী দলের অধিনায়কত্ব নিয়া গোয়ার ভিতরে গিয়া গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া, এই মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব বা সাংগঠনিক পর্বে আমার নিজের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। গোয়ার ভিতরে বা বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা এই সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন, কিংবা মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে গোয়ার ভিতরে পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া আত্মগোপন করিয়া সংগঠনের দায়িত্ব নিয়া যাঁহারা কাজ করিয়াছেন, অসমসাহসিক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া চলাফেরা করিয়াছেন, পর্তুগীজ পুলিসের গুলীতে বা কারাগারে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগ লোকেরই নাম কেহ জানে না। তাঁহাদের অধিকাংশই হয় গোয়ার অধিবাসী অখ্যাত, অজ্ঞাত দেশপ্রেমিক তরুণের দল কিংবা গোয়ার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত একই রকমের অখ্যাত ও অপরিচিত দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসৈনিকের দল, যাঁহারা ভারতের মাটি হইতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ কলঙ্ক-রেখা মুছিয়া ফেলার সংগ্রামে স্বাধীন ভারতের আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষার ডাকে পাগলের মত গোয়া সীমান্তে ছুটিয়া

আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই আর কোনো দিন নিজেদের ঘরে ফিরিয়া যাইবেন না। তাঁহাদের নামও বেশী কেহ জানে না। ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহী অভিযাত্রী দল পাঠানোর ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেস ভিন্ন এদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল এক সময় খুব তোড়জোড় করিয়া উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের তরফ হইতেও এ ব্যাপারে সহানুভূতির অভাব ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ সালের মে হইতে আগস্ট পর্যন্ত মাস চারেকের বেশী গোয়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির সে উৎসাহ বা উদ্যম স্থায়ী হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও, সকল প্রকার দুরূহ বাধা-বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম যে প্রায় তিন বছরকাল ধরিয়া চলিতে পারিয়াছিল, সালাজারের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের সামনে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই বা মাথা নোয়ায় নাই তাহার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এই সমস্ত অখ্যাত, অজ্ঞাত, নামগোত্রহীন সাধারণ কর্মী ও তরুণ স্বেচ্ছা-সৈনিকদের; প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা ও দলপতিদের নয়। গোয়াবাসীদের ভিতর হইতে শিক্ষিত ও রাজনীতি-চেতনাসম্পন্ন যাঁহারা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারাও এদেশের রাজনীতিতে যে মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভের অধিকারী তাহা পান নাই এবং গোয়ার মুক্তি-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের নিকট হইতে যে পরিমাণ সাহায্যের দাবী করিতে পারিতেন তাহা কোনো সময়ে পান নাই। গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম, শহীদদের রক্তদান, শত শত গোয়াবাসী ও ভারতীয় স্বেচ্ছা-সৈনিকদের দুঃখ ও নির্যাতন বরণ—সবই আজ কয়েক বছরের ব্যবধানে কিছুটা নেপথ্যে দূরে সরিয়া গিয়াছে। গোয়া-সমস্যার আজো সমাধান হয় নাই শুধু তাই নয়। গোয়ার কথা আজ যতটা না মনে করিয়া পারা যায়, আমরা যেন ততটা নিশ্চিন্ত বোধ করি।

গোয়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসার কয়েক মাস বাদে সুপরিচিত বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশে' যখন গোয়াতে আমার বন্দী-জীবনের এই স্মৃতিকথা ধারাবাহিক-ভাবে লিখিতে আরম্ভ করি তখন আশা ছিল যে এই উপলক্ষে অসমাধিত গোয়া-সমস্যার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি কিছুটা আকর্ষণ করার সুযোগ পাইব। সঙ্গে সঙ্গে এ ইচ্ছাও ছিল যে গোয়ার মুক্তি-যোদ্ধারা কিভাবে শুধুমাত্র নিজেদের বলিষ্ঠ দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের প্রেরণায় দিনের পর দিন, সালাজারের ফ্যাসিস্ট দমননীতির হিংস্রতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, গোয়া হইতে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদ করার জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন; বাহিরের কোনো প্রতিকূলতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই বা তাহাতে নিরুৎসাহিত হন নাই; অবলীলাক্রমে চরম আত্ম-বলিদানের পথে আগাইয়া গিয়াছেন সে ইতিহাসও এই প্রসঙ্গে যতটা পারি দেশবাসীর কাছে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব। আমার সে চেষ্টা কতটা সার্থক হইয়াছে জানি না। তবে ভরসা আছে তাড়াহুড়ার ভিতর কিছুটা বিশিলষ্ট ও অগোছালো ভাবে লেখা হইলেও গোয়াতে আমার এই কারা-কাহিনী হইতে পাঠকেরা গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম সম্পর্কেও একটা ধারণা করিতে পারিবেন।

গোয়া হইতে ছাড়া পাওয়ার অল্প কিছুদিন বাদেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমাকে মাসখানেকের মত সময় হাসপাতালে আটক থাকিতে হয়। রোগশয্যার সেই অবকাশে আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী দুইজন বন্ধুর আগ্রহে এই লেখার কাজে হাত দেওয়ার অনুকূল যোগাযোগ ঘটিয়া যায়। তাঁহাদের একজন আমার অগ্রজ-প্রতিম প্রবীণ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী ও অপরজন সুহৃদ্বর 'দেশ' কাগজের সর্বজন-

সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ। এই দুজনের অদম্য উৎসাহ ও নিরবচ্ছিন্ন তাগিদ না থাকিলে, এ কাজ আমি কোনো দিন আরম্ভ করিতে পারিলেও কিছুতেই যে শেষ করিতে পারিতাম না, তাহা অপরে না হোক আমি নিজে ভালো করিয়াই জানি। কিন্তু রোগশয্যা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার সংগে সংগে আমাকে আবার চল্তি রাজনীতির রুটিনে অপরিহার্যভাবে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। সেজন্য যেভাবে সমস্ত কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া গুছাইয়া লেখা উচিত ছিল, কিংবা যেভাবে লিখিতে পারিলে গোয়াতে আমার বন্দী-জীবনের এই কাহিনীর মাধ্যমে সেখানকার মুক্তি-সংগ্রামের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠকদের কাছে তুলিয়া ধরা যাইত তাহা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় বসিয়া অন্যান্য কাজের অবসরে প্রতি সপ্তাহে 'দেশে' প্রকাশের জন্য লেখার সাপ্তাহিক কিস্তিগুলি তৈয়ারী করিয়া দিতে হইয়াছে। অনেক সময় যে সপ্তাহের লেখা সেই সপ্তাহেই কোনোমতে লিখিয়া শেষ করিয়া দিতে হইয়াছে। তাহার ফলে কোনো কোনো জায়গায় পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটিয়াছে। তাছাড়া, গোয়াতে জেলে থাকার সময় দিনপঞ্জী জাতীয় কোনো কিছু লিখিয়া রাখা হয় নাই। সেখানে আমরা বহুদিন পর্যন্ত হাজতে কাগজ, কালি-কলম বা লেখাপড়া করার কোনো সাজ-সরঞ্জাম রাখার অনুমতি পাই নাই। পরে যখন সে অনুমতি পাওয়া গেল তখন কোনোদিন যে আবার বাহিরে গিয়া গোয়ার কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা লেখার অবকাশ পাওয়া যাইবে, বা এত তাড়াতাড়ি তাহা পাওয়া যাইবে, সেকথা কল্পনা করিতে পারি নাই। সুতরাং কোনো দিনপঞ্জী রাখার কথা মনে ওঠে নাই। এখানে যা কিছু লিখিয়াছি 'দেশে' প্রকাশের জন্য প্রতি সপ্তাহের লেখা লিখিতে বসিয়া যখন যে রকম মনে পড়িয়াছে লিখিয়া গিয়াছি। কাজে কাজেই গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের কোনো আনুপূর্বিক ধারাবাহিক ইতিহাস এই লেখার ভিতরে সুসম্বন্ধ আকারে পাওয়া যাইবে না। তবে গোয়াতে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া বন্দী-জীবনের স্মৃতিকথার ফাঁকে ফাঁকে গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের কিছু কিছু বর্ণনাও এই কাহিনীতে দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিগত তিন-চার শ' বছর ধরিয়া পর্তুগাল ও গোয়ার ভিতরে রাজনৈতিক সম্পর্কের বিবর্তন কিভাবে হইয়াছে সে সম্পর্কে বা গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কোনো ভালো ইতিহাস এদেশে আজো লেখা হয় নাই। এ সম্পর্কে পর্তুগীজ ভাষায় যে সব ঐতিহাসিক বিবরণ বা দলিলপত্র আছে তাহার সবই হয় সরকারী-পর্তুগীজ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কিংবা ক্যাথলিক জেসুইট পাদ্রীদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত। পঁয়ত্রিশ কোটি চল্লিশ কোটি মানুষের বাস যেখানে সেই বিশাল ভারতবর্ষের এক কোণায় ছোট্ট গোয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়া কে মাথা ঘামাইবে? গোয়ার লোকসংখ্যা খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ছয় লাখের বেশী নয়। কাজে কাজেই ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য কিভাবে পর্তুগীজ রাজশক্তির সংগে লড়িয়াছে, সেদিকে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাসও সেইজন্য আজ অবধি লেখা হয় নাই। পর্তুগীজদের চেয়ে অনেক গুণে প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা ভারতের রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এতদিন আমাদের সমস্ত দৃষ্টি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে যুদ্ধোত্তর যুগে নিতান্ত সাম্প্রতিক কালে ভিন্ন—অর্থাৎ ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হইয়া আমাদের স্বাধীনতা

প্রতিষ্ঠার আগে—আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয় নাই বা হইতে পারে নাই একথা বলিলে ভুল হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও গোয়াতে পর্তুগীজ শাসন যত প্রাচীন বা পুরাতন, গোয়াবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও তাহার চেয়ে কিছু কম পুরাতন নয় তাহা ভুলিলে চলিবে না। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকের্ক বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানদের নিকট হইতে গোয়া জয় করার কয়েক বছরের ভিতরেই গোয়াবাসীরা পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত গোয়াতে বারবার এই ধরনের বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। তাছাড়া পর্তুগীজ পার্লিয়ামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরেও গোয়াবাসীরা তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও কম সংগ্রাম করে নাই। কিন্তু সে ইতিহাসের বেশীর ভাগই ভারতের জনসাধারণের কাছে অজানা থাকিয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধোত্তর যুগে গত চৌদ্দ-পনরো বছরের ভিতর গোয়াবাসীরা পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যে আন্দোলন চালাইয়াছে, সে ইতিহাসেরও বেশীর ভাগ আমাদের জানা নাই। গোয়ার মুক্তির প্রশ্ন নিয়া সীমান্তের এদিকে ভারতবর্ষে মধ্যে মধ্যে যে সব আন্দোলন হইয়াছে মাত্র তাহার খবরই আমরা কিছু কিছু জানি। কিন্তু গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের নিজেদের উদ্যোগে বা চেষ্টায় কয় বছর ধরিয়া যে সংগ্রাম পরিচালিত তাহার ইতিহাস এদেশে এখনো সেভাবে প্রচারিত হয় নাই।

ইহার একটি কারণ সম্পর্কে আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। সারা ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দমন ও দিউ এই তিনটি পর্তুগীজ উপনিবেশকে একসঙ্গে ধরিলেও তাহাদের মোট আয়তন এতই ক্ষুদ্র, জনসংখ্যা এত কম যে, তাহাদের কোনোটি সম্পর্কে কিংবা গোয়া সম্পর্কে আমাদের জাতীয় ভাবাবেগ বেশীদূর অগ্রসর হয় না। এদেশে আরো হাজারো রকমের আভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বহু অসমাধিত প্রশ্ন আছে। গোয়া-সমস্যার বাস্তব গুরুত্ব বা তীব্রতা তাহাদের তুলনায় আমাদের কাছে কোনো সময় বেশী বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য গোয়া নিয়া সাময়িকভাবে মাঝে মাঝে কিছু মাতামাতি বা হৈ-চৈ হইলেও গোয়ার কথা ভুলিয়া যাইতে আমাদের বেশী সময় লাগে না। আমাদের মনে একটা সহজ ধারণা আছে যে, সারা-ভারত-জোড়া সাম্রাজ্যের দখল ছাড়িয়া দিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যখন চলিয়া গিয়াছে, ফরাসীরা যখন চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহের ছিটমহলগুলি স্বাধীন ভারতের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে তখন পর্তুগীজরাও, আজ হোক বা কাল হোক, একদিন না একদিন গোয়া, দমন ও দিউ হইতে বিদায় নিতে বাধ্য হইবে। তাহার জন্য আমাদের গায়ে পড়িয়া কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জত বা বেশী কোনো চেষ্টা না করিলেও চলিবে; ইতিহাসের কার্য-কারণে গোয়া-সমস্যা একদিন না একদিন আপনা-আপনি সমাধান হইয়া যাইবে। অন্তত এই ধরনের যুক্তি দিয়া আমরা সাধারণত মনে মনে নিজেদের প্রবোধ দিতে চাই। কিন্তু সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমরা যে আজ পর্যন্ত গোয়া সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধানের দিকে কার্যকরীভাবে অগ্রসর হইতে পারি নাই, সেই অপ্রীতিকর সত্যটার দিক হইতেও আমরা যতটা পারি চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই।

ভারত গভর্নমেণ্টের গোয়া-সম্পর্কিত নীতির কোনো সমালোচনা করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়, বা এই বইয়ে সে চেষ্টা আমি কোথাও করি নাই। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে

গোয়ার সমস্যা ছাড়াও কাশ্মীর সমস্যা, ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা বা সিংহলের ভারতীয় অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার-রক্ষার সমস্যা, ফরাসী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে কথা বলিয়া একটা স্থায়ী সন্ধিচুক্তি করিয়া পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহের উপরে আইনত (*de jure*) দখল নেওয়ার সমস্যা—প্রভৃতি বড় ও ছোটো নানা রকমের সমস্যাই আমাদের সামনে আছে এবং তাহাদের বেশীর ভাগেরই কোনো সন্তোষজনক সমাধান এপর্যন্ত হয় নাই। সম্প্রতি দালাই লামা ও তিব্বত-সমস্যা এবং চীনের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ও লাদাখ্ এলাকার দখল নিয়া যে বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে তাহা আসিয়া আমাদের অন্য সব সমস্যার গুরুত্বকে চাপা দিয়াছে; কিংবা আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে সেগুলিকে আপাতত দূরে সরাইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য গোয়া-সমস্যাও এই সব কারণে আজ আমাদের সামনে আর তত বড় হইয়া নাই। কিন্তু কয়েক বছর আগে যখন এ প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে ছিল, তখনও ইহার বাস্তব পরিবেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ভালোভাবে আকর্ষিত হয় নাই। আমাদের ধারণা ছিল ইংরাজ ও ফরাসীরা এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর, আমাদের অভ্যস্ত রীতিতে আমরা যদি কিছুটা হৈ-চৈ, চেঁচামেচি করি, গোয়ার ভিতরে যে একটা কিছু আন্দোলন আছে তাহা কোনো মতে সকলকে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে পর্তুগীজদের মুরুব্বি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের উপর চাপ দিয়া তাহাদের মারফৎ গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ সরকারের সঙ্গে একটা সন্তোষজনক আপোষ-রফায় আসা যাইবে। কিন্তু কার্যত সেটা হয় নাই। তাহা কেন হয় নাই, ভারত হইতে পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের পর কিংবা ফরাসীরা চন্দননগর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি জায়গাগুলির দখল ভারতের হাতে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হওয়ার পর গোয়াতে বিদেশী পর্তুগীজ শাসন আজো টিঁকিয়া আছে, পর্তুগালের মত একটি ক্ষুদ্র ও নিতান্ত দুর্বল ঔপনিবেশিক শক্তি কোন জোরে ভারত সরকারের সমস্ত যুক্তিতর্ককে অগ্রাহ্য করিয়া গোয়াকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিতেছে সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইতে হইলে আমাদের গোয়া-সমস্যার আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের দিকে আর একটু ভালোভাবে তাকাইয়া দেখিতে হইবে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু লোকের ধারণা আছে ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারতের অন্তর্গত হইলেও পর্তুগীজরা প্রায় সাড়ে চার শ' বছর ধরিয়া সেখানে থাকার ফলে গোয়া ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে একরকম আধা-পর্তুগীজ ক্যাথলিক দেশ বনিয়া গিয়াছে। পর্তুগীজদের সঙ্গে গোয়ার অধিবাসীদের চলাফেরা ও আচারে-ব্যবহারে বোধহয় বেশী পার্থক্য নাই। কাজে কাজেই রাজনৈতিক দিক দিয়াও গোয়ার অধিবাসীদের পক্ষে পর্তুগাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মানসিক আকর্ষণ অনেক কম। গোয়াবাসীরা নিজেদেরকে পর্তুগীজদের বেশী কাছাকাছি বলিয়া মনে করে; ভারতের চেয়ে পর্তুগালের সঙ্গেই তাহারা বেশী একাত্মতা বোধ করে। বলা বাহুল্য, পর্তুগীজ সরকারের তরফে গোয়ার উপর হইতে নিজেদের দখল না ছাড়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এইটাই। গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ প্রোপাগাণ্ডার সবচেয়ে বড় অবলম্বনও এই যুক্তি। এই বইয়ের ভিতর গোয়া ও পর্তুগীজ ভারতের অধিবাসীদের ধর্মমত ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রসঙ্গত যে সকল তথ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকেরা এই ধরনের যুক্তির কিছু কিছু উত্তর পাইবেন। এখানে এ প্রসঙ্গে প্রবেশ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি শুধু এই কারণে যে ইহা শুধুমাত্র পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের প্রোপাগাণ্ডার

কথা নয়। অন্যান্যদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিশ্ব-বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-দর্শন-শাস্ত্রী অধ্যাপক টয়ন্‌বীর মত লোককেও যখন এই ধরনের মত প্রকাশ করিতে দেখা যায়, তখন এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। টয়ন্‌বী তাঁহার প্রসিদ্ধ 'A Study Of History' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখিতেছেনঃ—

"In A. D. 1952 it seemed probable that of the three West European Powers between whose empires the whole of Continental India had been partitioned five years back, Portugal would be the last to lose her surviving Continental Indian possessions inspite of the fact that in this age Portugal was very much weaker than either Great Britain or France........ The contemporary population of Portuguese India was hardly distinguishable in race from the inhabitants of the rest of the sub-continent, since the Portuguese blood that had been infused into the Goanese in the course of four and a half centuries was no more than a tincture. This tincture, however was significant, not in virtue of its physical strength, but because it was an outward symbol of an inward spiritual union which the Portuguese conquerors of Goa had consummated with a conquered native Indian population that had embraced the conquerors' religion. In A. D. 1952 it remained to be seen whether the community of religion that was a voluntary bond between Goa and Portugal might not prove morally stronger than the community of race and geographical contiguity that would tend to attract the tiny territory of Goa towards the mighty mass of an encompassing India."

(A Study Of History : Vol. VIII, p. 566 *note*)

সংক্ষেপত অধ্যাপক টয়নবী মনে করেন, আমাদের এ যুগে শক্তির দিক দিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের চেয়ে পর্তুগাল যদিও অনেক দুর্বল তবু ভারতভূখণ্ডে তাহার যে সমস্ত উপনিবেশ আছে, ভারতে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হওয়ার অনেক পরে, সম্ভবত সকলের শেষে, সেগুলি পর্তুগালের হাতছাড়া হইবে। গোয়াবাসীরা জাতিগতভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে যে অভিন্ন সে বিষয়ে টয়ন্‌বীর কোনো সন্দেহ নাই। গোয়াবাসীদের ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহার সঙ্গে পর্তুগীজ রক্তের সংমিশ্রণ নিতান্ত ক্ষীণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অধ্যাপক টয়ন্‌বীর ধারণা, পর্তুগাল গোয়ার অধিবাসীদের ধর্মের আত্মিক বন্ধনে একেবারে আপন করিয়া কাছে টানিয়া নিয়াছে। ১৯৫২ সালে তাঁহার গ্রন্থ শেষ করার সময় তাই তাঁহার একথাই মনে হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ক্যাথলিক ধর্মের এই আধ্যাত্মিক বন্ধন হয়ত শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে গোয়ার অধিবাসীদের ভৌগোলিক সম্পর্ক বা জাতিগত রক্ত-সম্পর্কের চেয়ে বাস্তবে বেশী শক্তিশালী হইয়া দেখা দিবে। সেই ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বন্ধনই বৃটিশ-শাসন-মুক্ত বিশাল ভারতের সর্বগ্রাসী আকর্ষণের হাত হইতে গোয়াকে পর্তুগালের জন্য রক্ষা করিবে।

অধ্যাপক টয়ন্‌বী ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট হইতে এ ধরনের উক্তি শুনিলে আমরা সে উক্তিকে খৃষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার নামে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ওকালতী বলিয়া মনে করিতে পারিতাম। কিন্তু অন্যপক্ষে ইহাও বাস্তব সত্য যে, শুধু ১৯৫২ সালে কেন, আজ ১৯৬০ সালেও গোয়া পর্তুগালের শাসন-মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই। সে হিসাবে টয়ন্‌বীর ভবিষ্যদ্বাণী আপাতভাবে সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি শুধুমাত্র গোয়াবাসীদের মনে খৃষ্টীয় রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের ফল; গোয়াতে পর্তুগীজ সংস্কৃতির ও সভ্যতার অনস্বীকার্য প্রভাবের দরুন? না ইহার পিছনে সমসাময়িক পৃথিবীর আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তি-বিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থূলতর বাস্তব ব্যাখ্যা আছে?

পর্তুগালের সঙ্গে গোয়ার আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করার সময় অধ্যাপক টয়ন্‌বীর ব্রাজিলের কথা কেন মনে পড়ে নাই তাহাও একটু আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। ব্রাজিলের সঙ্গে পর্তুগালের সম্পর্ক খৃষ্টীয় ১৫০০ সাল হইতে। পর্তুগীজরাই ইউরোপ হইতে গিয়া ব্রাজিলে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ব্রাজিল দেশ গড়িয়া তোলে। বিগত শতাব্দীর ১৮২২ সাল পর্যন্ত ব্রাজিল পর্তুগালের অধীন ছিল। ব্রাজিল যখন নিজের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের কথা ঘোষণা করে, তখন উভয় দেশ একই রাজবংশের শাসনে ছিল। গোয়াবাসীদের তুলনায় ব্রাজিলের অধিবাসীদের সঙ্গে পর্তুগালের রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের সম্পর্ক, ভাষা ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক আজও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ, অনেক বেশী কাছাকাছির সম্পর্ক। কিন্তু তা হওয়া সত্ত্বেও ব্রাজিল কেন রাষ্ট্রিক দিক দিয়া পর্তুগালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিতে পারিল না, বা সংযুক্ত থাকিতে চাহিল না, তাহার তাৎপর্য কি করিয়া অধ্যাপক টয়ন্‌বীর মতো লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল—তাহা বাস্তবিকই বড় আশ্চর্যের বিষয়।

তাছাড়া অধ্যাপক টয়ন্‌বীর কথা মানিয়া নেওয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে তাঁহার একথা মানিয়া নিতে গেলে পর্তুগাল ও গোয়ার রাজনৈতিক সম্পর্কের বাস্তব ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া যাইতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস্কো লুইস্ গোমেজ হইতে শুরু করিয়া আমাদের এ যুগে ত্রিস্তাঁও ব্রাগাঞ্জা কুন্যা পর্যন্ত গোয়ার ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীদের চিন্তাধারার ঐতিহ্য একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়; ভুলিয়া যাইতে হয় যে লুইস্ গোমেজ ও ব্রাগাঞ্জা কুন্যা—আধুনিক কালের গোয়াবাসীদের ভিতর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-প্রতীক এই দুইজনই গোয়ার সুপ্রাচীন রোমান ক্যাথলিক বংশোদ্ভূত ছিলেন। ভুলিয়া যাইতে হয়, গোয়াতে আধুনিক যুগের উপক্রমণিকায় পর্তুগালের শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম যে বিদ্রোহ হয়—Pinto's Rebellion বা Priests' Rebellion—তাহার নেতা ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দুইজন গোয়াবাসী ক্যাথলিক ধর্মযাজক, পঞ্জিমের ফাদার ফান্সিস্কো কুতো এবং দিভারের ফাদার আন্তোনিও গন্‌সাল্‌ভেস।

বইয়ের ভিতর এ সমস্ত ইতিহাস কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। পর্তুগীজ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ষাটজনের উপর হিন্দু; রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের সংখ্যা শতকরা ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ জনের বেশী নয়। গোয়াতে ধনী হিন্দু-ব্যবসায়ী ও জমিদারের অভাব নাই; তাঁহারা প্রায় সকলেই পর্তুগীজ রাজভক্ত। আবার বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে ভারতপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর অভাব নাই। আমরা যখন গোয়ার ভিতরে জেলে ছিলাম ক্রিশ্চিয়ান রাজনৈতিক বন্দী বা আন্দোলনের কর্মী বা নেতার

সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কিছু কম দেখি নাই। ভারতে গোয়ার বাহিরে অন্যান্য অঞ্চলে—কেরল ও অন্যান্য রাজ্যে—রোমান ক্যাথলিকদের মোট সংখ্যা গোয়ার মোট ক্যাথলিক জনসংখ্যার চেয়ে অন্তত পঁচিশ গুণ বেশী। কিন্তু তাহারা সেজন্য পর্তুগাল বা ইউরোপের অন্য কোনো রোমান ক্যাথলিক দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রিক বন্ধনে যুক্ত হইতে চায় না। গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনের চার শ' সাড়ে চার শ' বছরের ইতিহাসের ভিতর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে গোয়াবাসীরা যে অন্তত চল্লিশ বার সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়াছে সে খবর অবশ্য আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও রাখেন না; সুতরাং টয়ন্‌বীকে তাহা না জানার জন্য বেশী দোষ দিয়া লাভ নাই। কিন্তু ইতিহাসবেত্তা টয়ন্‌বী গোয়ার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করার আগে গোয়ার ইতিহাস সম্পর্কে আরও কিছুটা ভালোভাবে খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করিবেন সে প্রত্যাশা করা বোধহয় অন্যায় নয়।

গোয়াতে গোয়াবাসীদের শেষ সশস্ত্র বিদ্রোহ হয় ১৯১৩ সালে সাতারি ও সাঁক্‌লির রানেদের মধ্যে। রানেরা অবশ্য হিন্দু এবং ক্যাথলিক শাসকদের তরফ হইতে হিন্দুদের উপর কিছুটা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক অত্যাচার তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব সঞ্চার করার অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু গোয়ার ক্যাথলিকরা সকলেই বা তাঁহাদের অধিকাংশ পর্তুগালের প্রতি অনুরক্ত এরূপ মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। কিছুদিন আগে গোয়ার পর্তুগীজ আর্কবিশপ জোসে দা-কস্তা ন্যুনেজ দম্ভভরে ঘোষণা করেন : "গোয়ার ক্যাথলিক আর্কবিশপ হিসাবে ক্রিশ্চিয়ান চার্চের নিয়মিত কাজের মতোই আমি পর্তুগালের প্রতি ভক্তি ও দেশপ্রেম (অর্থাৎ পর্তুগাল-প্রেম) শুধু প্রচার করিতে পারি তাই নয়; আমি নিশ্চয়ই তাহা প্রচার করিব এবং আমাকে সেই সঙ্গে গোয়াকে বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত করার আন্দোলনের সীমাহীন মুর্খতারও নিন্দা করিতে হইবে। কারণ তাহাই আমার ধর্মীয় কর্তব্য।" পর্তুগাল হইতে ডাঃ সালাজারও একই সঙ্গে একই সুরে ঘোষণা করেন : "পর্তুগীজ গোয়াকে রক্ষা করার অর্থ ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের মূল কেন্দ্র বা ঘাঁটিকে বাঁচাইয়া রাখা।" আর্কবিশপ ন্যুনেজ ও ডাঃ সালাজারের এই উক্তির প্রতিবাদ করার জন্য সে সময় সম্মুখে আগাইয়া আসেন দুইজন গোয়াবাসী ক্যাথলিক নেতা, অধ্যাপক সুয়ারিস এবং অধ্যাপক কুরেইয়া আফোঁসা। ইঁহাদের দু'জনেই ভারতের ক্যাথলিক সমাজে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। দু'জনকেই স্বয়ং পোপ 'খৃষ্টধর্মের বীর যোদ্ধা' বা 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। সুতরাং গোয়াবাসী ক্যাথলিক মাত্রেই পর্তুগাল ভক্ত, এবং তাহারা কোনোদিন পর্তুগালের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের অংশীদার হইতে চায় না, কিংবা রাষ্ট্রগতভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হইতে চায় না, ক্যাথলিক ধর্মের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের প্রভাবে চিরকাল পর্তুগালের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে চায়—এরকম মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। তাছাড়া অদৃষ্টের বা ইতিহাসের পরিহাস এমনি যে, খাস পর্তুগালেও আজ ক্রমে ক্রমে ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সালাজারের এক-নায়কতন্ত্রের বিরোধ বাধিয়া উঠিতেছে!

গোয়াতে পর্তুগীজ শাসন আজো কেন ও কিভাবে টিঁকিয়া আছে তাহা বুঝিতে হইলে আধ্যাত্মিক মার্গ হইতে আমাদের বাস্তব স্থূল জগতে নামিয়া আসিতে হইবে। প্রথম চিন্তা করিতে হইবে, গোয়াকে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন হইতে মুক্ত করার জন্য ভারতবর্ষে আমাদের চেষ্টা কি পরিমাণে বাস্তব ও কার্যকরী পন্থা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তেমনি এ যুগের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পর্তুগালের স্থান কোথায় এবং পর্তুগালের

ভিতরে তাহার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ রাজনীতিরই বা স্বরূপ কি সেদিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। সেদিক দিয়া বিচার করিলে আমরা সহজেই বুঝিব যে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে গোয়া-সমস্যা কোনোমতে ভারতের বুক হইতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের শেষ নিদর্শনটুকু মুছিয়া ফেলার সমস্যা নয়। গোয়ার ক্ষেত্রে পুরাতন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে ডাঃ সালাজারের অতি-রক্ষণশীল ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের যোগাযোগ ঘটিয়াছে। অন্যদিকে, এ যুগের পৃথিবীতে পর্তুগালের নিজের শক্তি যত নগণ্যই হোক, আজ ঘটনাচক্রে যুদ্ধোত্তর যুগের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিবেশে পর্তুগালের ক্ষুদে ফ্যাসিস্ট শাসকদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের শক্তির লড়াইয়ের কূটনীতির স্বার্থও অনেকখানি জড়িত হইয়া গিয়াছে। আমরা এই দ্বিতীয় কারণকে যে গুরুত্ব দিই বা না দিই, পর্তুগালের শাসকেরা এ সম্পর্কে সচেতন থাকিতে বা তাহার সুবিধা নিতে ত্রুটি করেন নাই।

ভারতে বৃটিশ আমলে জাতীয় স্বাধিনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী নিয়া আন্দোলন করার বা জনমত সংগঠন করার যতটুকু সুযোগ ছিল গোয়াতে সালাজারের আমলে তাহার লেশমাত্র নাই তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ডাঃ সালাজার এখনকার ইউরোপের সবচেয়ে বনেদী ও সবচেয়ে রক্ষণশীল ফ্যাসিস্ট এক-নায়কতন্ত্রের কর্ণধার। ১৯২৭-২৮ সালে পর্তুগালের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোইম্‌ব্রা ইউনিভার্সিটিতে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ডাঃ আন্তোনিও দে অলিভেইরা সালাজার পর্তুগীজ সাধারণতন্ত্রের তদানীন্তন সামরিক শাসকদের আমন্ত্রণে আর্থিক বিপর্যয় হইতে পর্তুগালকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে অর্থসচিব ও পরে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। প্রেসিডেণ্ট কারমোনার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পর্তুগালের অভিজাত ও রক্ষণশীল সামরিক অফিসার-গোষ্ঠী, ধনিক ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সমর্থনে তিনি ক্রমে ক্রমে কয়েক বছরের ভিতর পর্তুগালে তাঁহার সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১৯৩২ সাল.হইতে তিনি একটানাভাবে পর্তুগালে অপ্রতিহত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার ক্ষমতার প্রধান বাহন 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' দলও এই সময় তাঁহার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। মুসোলিনীর অনুকরণে পর্তুগালের সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন, কৃষক সংগঠন সব কিছু ভাঙিয়া দিয়া তিনি 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র পরিচালনায় তাঁহার 'ইস্তাদু নুভো' (Estado Novo বা New State) গড়িয়া তোলেন। মুসোলিনীর মতই তিনি পর্তুগালে 'কর্পোরেটিভ' রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলিতে থাকেন—যে ব্যবস্থার মোদ্দা কথা একটিমাত্র শাসক দলের নেতৃত্বে ধনিক ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক, ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পী সকলে সঙ্ঘবদ্ধ নিজ নিজ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সমবেত হইয়া কাজ চালাইবে; নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীগত স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া যাইবে। এই সব 'সংঘ' বা সমবেত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'কর্পোরেশন'। ধনিক বা ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে ইহার ভিতর দিয়া যে কোনোমতে ক্ষুণ্ণ করা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রেণী-সংগ্রাম এড়াইয়া দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করার ইহাই নাকি প্রকৃতষ্টতম উপায়। এইভাবে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করা ও তাহাকে সকল রকমে সম্মুখে আগাইয়া নিবার চেষ্টা করাই ইহার আদর্শ। সেই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করার ও দেশের রাজনীতিতে জাতিকে নেতৃত্ব দিবার একমাত্র

অধিকারী সালাজারের 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' বা ন্যাশনাল ইউনিয়ন দল। সুতরাং সেই দল ভিন্ন পর্তুগালে অন্য দলের কোনো অস্তিত্ব আইনত থাকিতে দেওয়া বা স্বীকার করা হয় না। মোটামুটিভাবে এই হইল সালাজারের আমলের পর্তুগীজ রাষ্ট্রব্যবস্থার বহিরঙ্গ পরিচয়।

এখানে এ সম্পর্কে বেশী বিস্তৃত অলোচনায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। পোলাণ্ডে পিল্‌সুড্‌স্কী, ইতালীতে মুসোলিনী, জার্মানীতে হিটলার, স্পেইনে ফ্রাঙ্কো বা পর্তুগালে সালাজার—সকলেই একই পথের পথিক; একই ধরনের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের প্রতিভূ বা প্রতিনিধি। ইতিহাসের গতির নিয়মের পরিহাস এমনি যে পিল্‌সুড্‌স্কী, মুসোলিনী, হিটলার সকলেই একে একে ইতিহাসের মঞ্চ হইতে বিদায় নিয়াছেন। কিন্তু স্পেইনের ফ্রাঙ্কো, যিনি হিটলার-মুসোলিনীর অনুগ্রহে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়া ক্ষমতা দখল করেন, আজো টিঁকিয়া আছেন। পর্তুগাল এতই ছোট ও দরিদ্র দেশ, এবং ইউরোপের রাষ্ট্রশক্তিগুলির ভিতর এত নগণ্য ও দুর্বল বলিয়া পর্তুগাল বা পর্তুগীজ সাম্রাজ্য নিয়া আধুনিক কালে কেহ মাথা ঘামায় নাই। ইতিহাসের নেপথ্যে, পালা করিয়া কখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সাজিয়া, কখনো হিটলার-মুসোলিনীর অনুগ্রহপ্রার্থী হিসাবে, ইদানীং আমেরিকার দুয়ারে ধর্না দিয়া মার্কিন সমর্থন ও মুরুব্বিয়ানার জোরে সালাজার পর্তুগালে তাঁহার 'ইস্তাদু নুভো' ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যকে টিঁকাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন; শুধু ক্যাথলিক আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর করিয়া নয়! অন্যান্য ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে যেমন হয়, রাষ্ট্রব্যবস্থার জাঁকজমকপূর্ণ সাজানো বহিরঙ্গ আবরণের পিছনে থাকে নগ্ন পুলিসী শাসনব্যবস্থা। শাসকদল ও গোয়েন্দা পুলিস পরস্পরের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া যায়। সালাজারের 'ইস্তাদু নুভো' তাহার ব্যতিক্রম নয়। জার্মানীতে হিটলারের গেস্টাপো ছিল, স্টর্ম ট্রুপ্‌স বা ঝটিকা বাহিনী ছিল। সালাজারেরও 'পিদে' বাহিনী (PIDE—Policia International da Defesa de Estado) আছে; সিকিউরিটি পুলিস (Policia Seguranza) আছে। বিগত যুদ্ধের সময় সালাজার হিটলারের পুলিস-কর্তা হিম্‌লারের পরামর্শ মত তাঁহার নিজের 'পিদে' বাহিনীকে জার্মানীর 'গেস্টাপো' সংগঠনের কায়দায় নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজান। হিম্‌লার আজ বাঁচিয়া নাই; কিন্তু সালাজারের 'পিদে' আছে। পর্তুগালের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করিয়া গোয়ার অধিবাসীরা মনে মনে একথা ভাবিয়া খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করিতে পারেন যে সালাজারের আমলে খাস পর্তুগালেও পর্তুগীজ নাগরিকেরাও তাহাদের চেয়ে কোনো অংশে বেশী রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন না। পর্তুগালেও গোয়ার মতই পুলিসকে দিয়া প্রথমে সেন্সার করাইয়া অনুমোদন না নিলে কোনো বই হোক, খবরের কাগজ হোক, সাধারণ বিজ্ঞাপন হোক, কোনো কিছুই ছাপাইয়া বাহির করা যায় না। গোয়াতে জেলে থাকিতে পর্তুগীজ ভাষা শেখার জন্য পর্তুগালে ছাপানো ও প্রকাশিত স্কুলপাঠ্য বই কিনিয়া আনাইয়াছি। গোয়াতে ছাপানো যে কোনো কাগজ বা বইয়ের মতই পর্তুগালে ছাপা প্রত্যেকটি বইয়ের ভিতরে প্রেস ও প্রকাশকের পরিচয়পত্রের সঙ্গে ট্রেড মার্কের মত আর একটি কথাও ছাপা থাকে—'Visado pela censura'; অর্থাৎ 'সেন্সর কর্তৃক পরীক্ষিত'। এ না হইলে কোনো বই বা ছাপানো কোনো কিছু পর্তুগালে প্রকাশ করা যায় না। কিছুদিন আগে পর্তুগালের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক আকুইলিনো রিবেইরো পর্তুগালের উত্তরাঞ্চলের সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা

নিয়া একটি বাস্তবধর্মী উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়; শাস্তি হইলে জরিমানা বাদে আট বছর পর্যন্ত জেল! রিবেইরোর বয়স ৭৯ বছর! সোভিয়েট ইউনিয়নে বোরিস পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' নিষিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সব বুদ্ধিজীবীরা পেশাদারী হা-হুতাশ করেন তাঁহারা বোধহয় পশ্চিমের 'নাটো'-মিত্র ডাঃ সালাজারের রাজত্বের এসব খবর রাখেন না! লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রুই লুইস গোমেজ এবং অন্য চারজনের বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পুলিসের কাছ হইতে সেন্সর না করাইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রবন্ধ পাঠানোর অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়; তাঁহাদের অপরাধ তাঁহাদের সেই প্রবন্ধে তাঁহারা পর্তুগালে যাহাতে পার্লামেণ্টে গণতান্ত্রিক প্রথায় প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রথা প্রবর্তিত হয়, জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গোয়ার ব্যাপার লইয়া ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে পারা যায় সে সম্পর্কে সালাজারের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি ছাপা হয় নাই। কিন্তু সালাজারের পর্তুগালে এসব আপত্তিজনক প্রবন্ধ পুলিসকে দিয়া সেন্সর না করাইয়া ছাপানোই শুধু অপরাধ নয়। প্রবন্ধ যদি ছাপা নাও হয়, ছাপানোর জন্য পাঠানো বা লেখাও অপরাধ! অধ্যাপক গোমেজ এবং তাঁর সহকর্মীদের কয়েক বৎসর করিয়া জেল হয়। বৃটিশ শ্রমিকনেতা মিঃ এ্যানুরিন বেভানকে পর্তুগালে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর অভিযোগে বিখ্যাত প্রবন্ধকার ও লেখক আন্তোনিও সের্জিও, ঐতিহাসিক জেইসে কুর্তেজাঁও এবং লিস্বনের দুইজন অধ্যাপক মারিও আজেভাদু গোমেস ও ভিয়েইরা আলমেইদা এই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইঁহাদের সকলেই পর্তুগালের সম্মানিত ও প্রবীণ বুদ্ধিজীবী। সকলেরই বয়স ৭০ এর উপর। বেভান যে ইহার পর পর্তুগালে ঢুকিতে পারেন নাই, তাহা না বলিয়া দিলেও চলিবে।

সালাজার আমলের পর্তুগালের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আর বেশী কথা বলার দরকার করিবে না। যা' বলা হইয়াছে তাহা হইতে বাকীটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। কিন্তু পর্তুগাল আজ ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি বা 'নাটো' জোটের অন্তর্ভুক্ত মিত্ররাষ্ট্র এবং সেই হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে শক্তির লড়াইয়ে কিংবা কমিউনিজমের বিপদের মুখে তথাকথিত 'স্বাধীন' জগতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক! এ দেশে অনেকেই জানেন না যে 'রেডিও ফ্রী ইউরোপ' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমী 'গণতান্ত্রিক' দেশগুলির তরফে পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট-শাসিত দেশগুলির জনসাধারণের কাছে রেডিও ও বেতার মারফৎ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করার মহৎ কাজে নিযুক্ত আছে তাহার হেড কোয়ার্টার সালাজারের লিস্বনেই। লিস্বন এবং লিস্বনের উপকণ্ঠে সেতুবাল, সিন্তারা প্রভৃতি শহর ইউরোপের বিগত যুগের যত রাজ্যচ্যুত রাজা ও রাজবংশধরদের আড্ডা। হাঙ্গারীর ভূতপূর্ব রাজ-অভিভাবক অ্যাডমিরাল হর্থির পার্শ্বচরেরা এখন লিস্বনে আসিয়া জমায়েত হইয়াছেন। হাঙ্গারীতে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে যখন সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ ও কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিক-বিক্ষোভ ও গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয় তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সালাজারের লিস্বন হইতে তাহার সমর্থনে খুব উঁচু পর্দার আওয়াজ শোনা যাইতে থাকে। সে আওয়াজের

পিছনে প্রেরণা বা প্ররোচনা কাহার ছিল তাহা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। আমরা সে সময় গোয়াতে জেলে বসিয়া বহির্জগতের বেশী কোনো খবর পাইতাম না বটে, কিন্তু সেখানে থাকিতে গোয়াতে প্রকাশিত আধা-সরকারী পর্তুগীজ কাগজগুলির মারফৎ সে আওয়াজ আমাদের কাছে অবধি পৌঁছিয়াছিল। গোয়াতে সালাজারের জেলে বসিয়া সে সময় আমরাও শুনিয়া বিশেষ 'পুলকিত' বোধ না করিয়া পারি নাই যে সালাজারেরই লিস্‌বনে হাঙ্গারীর 'স্বাধীনতা' এবং 'গণতান্ত্রিক অধিকার' প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে!

যুদ্ধোত্তর ইউরোপে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের ক্ষমতার লড়াইয়ের পরিবেশে সুযোগ বুঝিয়া সালাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের মিত্র ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষক বা 'ক্রুসেডার' হিসাবে দেখা দিতে বিলম্ব করেন নাই। কিন্তু পর্তুগালের ভিতরে তাঁহার রাজনীতির স্বরূপ কি সে সম্পর্কে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নাই। সালাজারের নিজের দেশে 'গণতান্ত্রিক' আদর্শের প্রতিষ্ঠা কি রকমের এখানে তাহার আর কোনো বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না—খালি হেন্‌রিক গালভাঁওয়ের কাহিনী বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। ক্যাপ্টেন হেন্‌রিক গালভাঁও ক' বছর আগেও সালাজারের ন্যাশনাল ইউনিয়ন দলের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য এবং পর্তুগালের পার্লিয়ামেণ্ট ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীরও সদস্য ছিলেন। তাহার কিছুদিন আগে তিনি আফ্রিকায় পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির অন্যতম পরিদর্শক বা ইন্‌স্পেক্টর হিসাবে কাজ করিতেন। সে সময় তিনি পর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকায় নিগ্রোদের উপর কিভাবে অমানুষিক নির্যাতন ও শোষণ চলে এবং ঔপনিবেশিক রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে চরম দুর্নীতির প্রকোপ কতদূর এসব বিষয়ে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট লিস্‌বন গভর্নমেণ্টের কাছে পেশ করেন। কয়েক বছরের ভিতর সেই রিপোর্টে কোনো কাজ না হওয়াতে তিনি অবশেষে অধৈর্য হইয়া পর্তুগীজ পার্লিয়ামেণ্টের এক অধিবেশনে সে সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আর যায় কোথায়! দলের বিনানুমতিতে পার্লিয়ামেণ্টে একথা উত্থাপন করার অপরাধে তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে দল হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। সালাজারের 'ইস্তাদু নোভো'-তে নিয়ম এই যে 'ইউনিয়ন নাসিওনালের' সভ্য না হইলে কেহ আইনত জাতীয় পরিষদ বা পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যপদে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং আইনত তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যপদও খারিজ হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত 'পিদে'-র নির্দেশে তাঁহাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া জেলে পাঠানো হয়। ১৯৫৩ সালে তাঁহাকে ক' বছর জেলে রাখার পর প্রথমে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়। কিন্তু সে সাজা খাটা শেষ হইলেও তাঁহাকে জেলের বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় নাই। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহাকে ফের নূতন অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া ১৬ বছরের সাজা দেওয়া হয় (গত বৎসর খবর আসে কিছুদিন আগে তিনি জেল হাসপাতাল হইতে পলাইয়া আসিয়া আর্জেণ্টিনার দূতাবাসে আশ্রয় নিয়াছেন)।

গালভাঁওয়ের এই ঘটনা কোনো ব্যতিক্রম নয়; সালাজারের পর্তুগালে ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই রকম আরো শত শত ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। সালাজার ক্ষমতায় আসার পরে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন—"We are anti-parliamentary, anti-democratic, anti-liberal" ("আমরা পার্লিয়ামেণ্টারী ব্যবস্থার বিরোধী, গণতন্ত্রের বিরোধী, সর্বপ্রকার উদারনীতির বিরোধী")। আজো তাঁহার সেই মূলনীতির কোনো

পরিবর্তন হয় নাই। ইউনিয়ন নাসিওনাল দল বা সালাজারের বিরুদ্ধবাদীদের পর্তুগালের রাজনীতিতে কোনো স্থান নাই। তাহাদের স্থান হয় জেলের ভিতর, কিংবা নির্বাসনে দেশের বাহিরে। পর্তুগালে প্রতি সাত বছর অন্তর গণভোটে পর্তুগীজ সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হইত। এতদিন পর্যন্ত একমাত্র এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন নাসিওনাল দলের বাহিরের লোকদের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড়াইতে দেওয়ার নিয়ম ছিল, যদিও তাঁহারা কোনো দলের ছাপ নিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। তাঁহাদের দাঁড়াইতে হয় ব্যক্তিগতভাবে। ১৯৫৮ সালে পর্তুগালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছর ছিল। এই নির্বাচনে ইউনিয়ন নাসিওনালের প্রার্থী ছিলেন এ্যাডমিরাল আমেরিকো তোমাস এবং তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন জেনারেল দেলগাদু। দেলগাদু এক সময়ে সালাজারেরই সমর্থক ছিলেন এবং পর্তুগালের অসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে সালাজারের সঙ্গে দেলগাদুর মতভেদ দেখা দেয়। দেলগাদু সালাজার বিরোধী হইলেও বামপন্থী নন; আদর্শ ও মতবাদের দিক দিয়া তাঁহাকে দক্ষিণপন্থী ডেমোক্রাট বলাই সঙ্গত। তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিনা বাধায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া নির্বাচনের প্রচার পর্যন্ত করিতে দেওয়া হয় নাই। একবার ইউনিয়ন নাসিওনালের লোকেরা তাঁহাকে জোর করিয়া কয়েকদিনের জন্য গুম করিয়া রাখে। পদে পদে তাঁহার উপর বিধি-নিষেধ জারী করা হয়। কিন্তু দেশের লোককে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হইলে তিনি সালাজারকে ক্ষমতাচ্যুত করিবেন এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিবেন। এই দুই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে তিনি পর্তুগালে সালাজার বিরোধী দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী সকলের সমর্থন পান এবং সালাজারপন্থীদের সকল রকম বিরোধিতা সত্ত্বেও ভোট গ্রহণের পর সরকারী গণনাতেও দেখা যায়, তিনি মোট ভোটের এক চতুর্থাংশ ভোট পাইয়াছেন। কিন্তু এখানেই দেলগাদু কাহিনীর শেষ নয়। নির্বাচনের পর কয়েকবার জেনারেল দেলগাদুর প্রাণনাশের চেষ্টা হয় এবং অবশেষে গত বছর তাঁহাকে নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া লিস্‌বনের ব্রাজিলীয় দূতাবাসে আশ্রয় নিতে হয়। ইদানীং তিনি পর্তুগাল ছাড়িয়া ব্রাজিলের পথে গ্রেট বৃটেন ও ইউরোপে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সালাজারও তাঁহার দিক হইতে ভবিষ্যতে সাত বছর পরে নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আসিলে আবার যাহাতে কোনো নূতন দেলগাদু দেখা দিয়া তাঁহাকে বিব্রত না করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। গণভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার পুরাতন প্রথা প্রচলিত থাকিলে যে কোনো একজন প্রার্থীকে সম্মুখে খাড়া করিয়া সালাজার-বিরোধী শক্তিগুলি রাজনৈতিক দিক দিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। সালাজার এবার সে পথ আইনত বন্ধ করিয়াছেন। পর্তুগীজ রাষ্ট্র সংবিধানের পরিবর্তন করিয়া তিনি নূতন আইন পাশ করাইয়া নিয়াছেন—এখন হইতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য আর গণভোটের প্রয়োজন হইবে না। তাহার বদলে ভোট দিবেন জাতীয় পরিষদ বা পর্তুগীজ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যেরা। অর্থাৎ এক কথায় সালাজারের ইউনিয়ন নাসিওনালের মনোনীত প্রার্থী ছাড়া আর কেহ নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইতে চাহিবেন না। কারণ উপরেই বলিয়াছি, সালাজার বহু আগেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে ইউনিয়ন নাসিওনালের সদস্য না হইলে বা তাহার দ্বারা মনোনীত না হইলে পর্তুগালে কেহ জাতীয় পরিষদের সদস্য হইতে

পারে না। বুদ্ধির দোষে দেলগাদুর নির্বাচনী ইস্তাহারে গোয়ার দুই একজন স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পিছনে লাগিতে গোয়া পুলিসের বা 'পিদে'র বেশী দেরী হয় নাই।

সালাজারের আমলে পর্তুগালের অনেক রকম উন্নতি হইয়াছে, পর্তুগালের বাহিরে উৎসাহী সালাজার-সমর্থকদের মুখে সালাজারী ব্যবস্থার সম্পর্কে এ ধরনের প্রশংসা প্রায়ই শোনা যায়। পর্তুগালের সাধারণ লোকেদের আর্থিক অবস্থা দিয়া এই উন্নতি বিচার করিতে গেলে পর্তুগালের অন্য চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে। পর্তুগালের শতকরা ৬০-৭০ জন এখনও চাষবাস কিংবা মাছ ধরার উপর নির্ভর করে। সালাজার আমলের ২৮-২৯ বছরে তাহাদের দারিদ্র্য কিছুই কমে নাই। গ্রামাঞ্চলে কর্ক এবং অলিভ বাগিচার মেয়ে মজুরদের দৈনিক আয় আট হইতে বারো এস্ক্যুদো (পর্তুগীজ টাকার নাম) আর পুরুষ মজুরদের বারো হইতে চৌদ্দ এস্ক্যুদোর মতো (আমাদের টাকার হিসাবে ১৷৹ থেকে ২৲ টাকা এবং ২৲ টাকা থেকে ২৷৹ মতো, যেটা পর্তুগালের বাজার দরের তুলনায় নিতান্তই কম।) তাও যদি কাজ থাকে। অনেক সময়ে সপ্তাহে তিন দিনের বেশী কাজ জোটানো মুশকিল হয়। যুদ্ধের সময় পর্তুগাল নিরপেক্ষ থাকায় উভয়পক্ষের কাছে মাল বেচিয়া পর্তুগীজ ধনিকদের লাভ কম হয় নাই। কিন্তু সে টাকার কোনো ভাগ সাধারণ চাষী-মজুর বা নিম্নমধ্যবিত্তদের পকেটে আসে নাই। পর্তুগালে সাধারণভাবে একটা কথা প্রচলিত আছে যে দেশের সমস্ত ধন-সম্পদ ৫০টি পর্তুগীজ পরিবারের হাতে আসিয়া জমা হইয়াছে! সরকারী হিসাবেই দেখিতেছি পর্তুগালে প্রতি বছরে যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার হাজার-করা ৫৮ জন; পর্তুগালের মতই ছোট দেশ হল্যান্ড বা বেলজিয়মে এই হার হাজারে ৫ জনের বেশী নয়। জাতীয় রাজস্বের শতকরা ৩২ ভাগ দেশরক্ষা খাতে সৈন্যদলের উপর খরচা করা হয়। পুলিসের এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর খরচা আরো ২৫-৩০ ভাগ। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের উপর খরচ শতকরা ৬ ভাগেরও কম; শিক্ষা খাতে শতকরা দশ ভাগের কম। পর্তুগালের ইতিহাসকার নোওয়েল লিখিতেছেন, "যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতেই দরিদ্র জনসাধারণ ও শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত হইয়া পড়িতে থাকে। জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়িতে থাকে, আয় তাহার চেয়ে বেশী দ্রুত কমিতে থাকে। ধর্মঘট বে-আইনী হওয়া সত্ত্বেও লিস্‌বন, ওপোর্তো প্রভৃতি শহরে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট দেখা দেয়। শ্রমিকদের মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন এ সবের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে থাকে।" নোওয়েল বলিতেছেন, "পুলিস শক্ত হাতে এসব বিক্ষোভ দমাইতে চেষ্টা করে বটে। কিন্তু বিক্ষোভকারী এবং আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করিয়া পর্তুগীজ উপনিবেশে নির্বাসনে পাঠাইয়াও অবস্থার কোনো উন্নতিসাধন করা যায় নাই। ১৯৪৮ সালে আসিয়া মনে হইতেছিল সালাজারের নূতন রাষ্ট্র ('ইস্তাদু নুভো') ও তাঁহার এক-নায়কতন্ত্রের অবসান আসন্নপ্রায়" ('A History Of Portugal' ২৩৯ পৃঃ)।

কিন্তু ১৯৪৮ সাল হইতে পৃথিবীর ও বিশেষ করিয়া ইউরোপের আন্তর্জাতিক শক্তি-বিন্যাসে অদল-বদল হইতে থাকে। একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট-শাসিত রাষ্ট্রগুলির জোট আর অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ। ইউরোপ তখন 'মার্শাল এইড্' (জেনারেল মার্শালের প্রস্তাব অনুযায়ী

প্রদত্ত মার্কিন আর্থিক সাহায্য) হইতে 'নাটো'র পথে পা বাড়াইয়াছে। 'নাটো' চুক্তি এবং মার্কিন সাহায্য সালাজারের ঘুণেধরা এক-নায়কত্বকে নূতন করিয়া ঠেকো দিয়া খাড়া রাখিল। কেননা ইউরোপে 'গণতন্ত্র' বাঁচানোর সংগ্রামে সালাজারের পর্তুগালেরও সাহায্য পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের কাছে অবহেলার জিনিস নয়। ১৯১৬ সালে লেনিন আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গত মন্তব্য করিয়াছিলেন যে নামে স্বাধীন হইলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়া পর্তুগাল কার্যত গ্রেট বৃটেনের একটি উপনিবেশের মত; কারণ তাহার রেলপথ, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা সব বৃটিশ মূলধনের সাহায্যে চলে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর আজ গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে পর্তুগালের ঠিক সেই সম্পর্ক আর নাই। গ্রেট বৃটেনের সে স্থান এ যুগে অধিকার করিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার বা অনুগ্রহনীতির client state 'মোয়াক্কেল' রাষ্ট্র বলিতে পশ্চিম ইউরোপে পর্তুগালের স্থান সবার আগে। পর্তুগীজ শাসকশ্রেণী জানে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ভিন্ন তাহাদের পক্ষে এ যুগে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য বা পর্তুগালের ঘুণে-ধরা সমাজ-ব্যবস্থাকে টিঁকাইয়া রাখা কঠিন। অন্যপক্ষে পর্তুগালকে তাঁবে রাখিতে পারিলে যুক্তরাষ্ট্রেরও লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। পর্তুগালকে পূর্ব আটলাণ্টিক ও মধ্য আটলাণ্টিকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে সহজেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। মধ্য আটলাণ্টিকে আজোরস্ দ্বীপপুঞ্জ ১৯৪৩ সাল হইতে মার্কিন বিমান বাহিনীর অন্যতম ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকায় অর্থাৎ আংগোলা এবং মোজাম্বিকে পেট্রোলিয়াম ও ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পর্তুগালের হাতে এই সব খনিজ সম্পদকে কাজে লাগানোর মত টাকা নাই; আমেরিকার দৃষ্টি সে দিকে আছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া পর্তুগালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের বাহিরে বা বিপক্ষে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই; অন্ততপক্ষে যতদিন সালাজার ও দক্ষিণপন্থীদের এক-নায়কত্ব সেখানে বর্তমান আছে। কাজে কাজেই পর্তুগালের শাসকদের সাম্রাজ্যরক্ষার নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের সায় দিয়া চলিতে কোনো অসুবিধা নাই। গোয়ার প্রশ্নেও দেখা গিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মুখপাত্রেরা তাই যতটা পারেন পর্তুগালের পক্ষ টানিয়া কথা বলিতে পারেন ও বলেন। ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডালেসের পক্ষে সেই কারণেই পর্তুগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাউলো কুন্যার সঙ্গে যুক্ত বিবৃতি দিয়া গোয়াকে পর্তুগালের অন্তর্গত 'প্রদেশ' বলিয়া বর্ণনা করিতে এবং ভারত জোর করিয়া যাহাতে গোয়া দখল করার চেষ্টা না করে সেজন্য ভারতের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে দ্বিধা হয় নাই। তাহার পর পাঁচ বৎসরকাল অতীত হইয়াছে। কিন্তু পর্তুগাল বা গোয়া সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হইয়াছে তাহা মনে করার মত কোনো কারণ নাই।

ভারত-গোয়া প্রশ্নের সঙ্গে আজ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও শক্তির দ্বন্দ্ব অপরিহার্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ভারত তাহার নিজের দিক দিয়া গোয়া সমস্যার সমাধানকে কত জরুরী কতটা গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া মনে করে ও গোয়াবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে কতদূর অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিবে তাহার উপরে এ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান নির্ভর করিতেছে।

এ প্রসঙ্গে এখানে সাইপ্রাস ও গ্রীসের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধোত্তর

যুগে বৃটেনের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসের মুক্তি-সংগ্রাম গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে প্রায় একসঙ্গেই আরম্ভ হইয়াছিল। সাইপ্রাসের মোট জনসংখ্যা গোয়া বা পর্তুগীজ ভারতের জনসংখ্যার চেয়ে খুব বেশী নয়, ছয়-সাত লাখের মত। সাইপ্রাস গ্রীস হইতে সমুদ্রপথে সাড়ে ছয় শ' সাত শ' মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গ্রীস সাইপ্রাসের অধিবাসী গ্রীকদের মুক্তি-সংগ্রামে সর্বরকম সাহায্য করার জন্য আগাইয়া আসিতে দ্বিধা করে নাই। ভূমধ্যসাগরে মধ্যপ্রাচ্যের প্রবেশ পথে গ্রেট বৃটেনের প্রধানতম সামরিক ও নৌ-যুদ্ধের ঘাঁটি ছিল। বৃটেনের সঙ্গে গ্রীসের মিত্রতাও কম ছিল না। বৃটেন ও গ্রীস একই উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তিতে জোটবদ্ধ শক্তি। বলা বাহুল্য বৃটেনের সঙ্গে ক্ষুদ্র গ্রীসের শক্তির কোনোই তুলনা হয় না। গ্রীস বৃটেনের বিরুদ্ধে সাইপ্রাস নিয়া সরাসরি যুদ্ধে নামে নাই। কিন্তু বৃটেনের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসের মুক্তি-যুদ্ধে নির্লিপ্ত হইয়াও থাকে নাই; সাইপ্রাসের মুক্তির সংগ্রাম সাইপ্রাসের অধিবাসীদের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া শুষ্ক সহানুভূতি দেখাইয়া নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকে নাই। সমগ্র গ্রীক জাতির আত্মমর্যাদার সঙ্গে জড়িত জাতীয়-সংগ্রাম হিসাবেই তাহাকে দেখিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতরে ও বাহিরে নিজের সকল প্রকার প্রভাব খাটাইয়া, কূটনীতির সাহায্য নিয়া ও অন্যান্য সকল ভাবে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সাইপ্রাসের দিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সাইপ্রাস মুক্তি-সংগ্রামের নেতা ফাদার মাকারিওস ও কর্নেল গ্রিভাসকে কোনো প্রকারে সাহায্য ও সমর্থন করিতে গ্রীক গভর্নমেণ্ট কোনো সময়ে কার্পণ্য করে নাই। আজ দেখিতেছি সাইপ্রাস মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সিংহ-দরজায় উপনীত হইয়াছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ফাদার মাকারিওসকে স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা দিয়া তাঁহার সঙ্গে আপোষ-আলোচনার কথা বলিতেছেন।

গ্রীস সাইপ্রাসের ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছে ভারত তাহা করিতে পারিত কিনা, বা সেরূপ করিলেই গোয়া সমস্যার কার্যকরী কোনো সমাধান হইত কিনা সে প্রশ্ন এখানে তুলিতেছি না। কিন্তু সাইপ্রাস-সমস্যাকে নিজের জাতীয় সমস্যা বলিয়া মনে করিয়া গ্রীস তাহার আশু সমাধানকে যে গুরুত্ব দিয়াছে আমরা তাহা দিয়াছি কিনা, সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই আমরা নিজেদেরকে করিতে পারি।

ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া একটিই মাত্র আশার রেশ দেখা যায়—সেটা ভারত সরকারের উপকূলে নয় পূর্ব আটলাণ্টিকের উপকূলে পর্তুগালের ভিতরে। পর্তুগালে সালাজারের অচলায়তনে সুনিশ্চিতভাবে ফাটলের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। অত্যন্ত সহনশীল দরিদ্র, অর্ধ-শিক্ষিত পর্তুগীজ শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কর্ক-বাগিচা এবং অলিভ-বাগিচার মজুর এবং সমুদ্র উপকূলবাসী মৎস্যজীবীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। মধ্যবিত্ত. নিম্ন মধ্যবিত্তদের ভিতর, শিক্ষিত সাধারণের ভিতর নূতন গণতান্ত্রিক জাগরণের সাড়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ১৯৫৮ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের মধ্য দিয়া তাহার কিছুটা পূর্বাভাস দেখা গিয়াছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে আসিয়া দেখিতেছি পর্তুগালের উত্তর অঞ্চলের উপকূলবর্তী প্রদেশে মাতোজিনুস্, পোভুয়া দো ভার্জিঁ, আফুয়ার্দা, মুর্তোসা, ভিতা দো কঁদে প্রভৃতি মৎস্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে মৎস্যজীবীদের ৭০ দিনের ধর্মঘট চলিতেছে। গরীব জেলে পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া একসঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল করিয়া নিজেদের দাবী জানানোর জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া আসিতেছে। সালাজার আর 'পিদে'-র ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিরস্ত করিতে পারিতেছেন না। ওপোর্তোর ডক

শ্রমিক, নিম্নমধ্যবিত্ত অফিস কর্মচারীরা, লিস্‌বনে, সান্তারে' শহরে, ব্রাগায়, ভিয়ানা দে কাস্তেলো-তে লোহা কারখানা আর এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা; ওপোর্তো, মিন্যো, কোভিল্যান্ড প্রভৃতি কেন্দ্রে কাপড়ের কলের শ্রমিকরা; আল্‌জুস্ত্রেল ও সান্তা দোমিংগুসে খনি শ্রমিকরা একে একে ধর্মঘটের পথে পা বাড়াইতেছে। কাস্তেল ব্রাঙ্কোতে ছাত্র, শ্রমিক, সাধারণ নাগরিক ও সৈনিক দল একসঙ্গে মিলিতভাবে রাজনৈতিক বিক্ষোভ জানাইতে আগাইয়া আসিতেছে। সালাজারের নিজের কোইম্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে, লিস্‌বন, আভিজ্‌, ওপোর্তোর কলেজে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিতেছে। বেজা প্রদেশে গোয়াতে পাঠানোর জন্য জোর করিয়া কন্‌স্ক্রিপ্‌ট করিয়া আনা সৈন্যদলের পরিবারবর্গ তাহাদের দেশের বাহিরে পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আসিতেছে। ধীরে ধীরে দেখিতেছি ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের মনেও সংশয়, প্রশ্ন ও প্রতিবাদের সূচনা। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ভিতর দিয়া জনসাধারণের ভিতর তীব্র অসন্তোষের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা দেয় তাহার অব্যবহিত পরেই ওপোর্তোর বিশপ মঁসিগ্‌নোর আন্তেনিও ফেরেইরা গোমেস সালাজারের নিকট ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি লিখিয়া জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি ও সাম্প্রতিক গণ-বিক্ষোভের জন্য গভর্নমেণ্টকে তীব্রভাবে দোষারোপ করেন। ইহার পরে ক্রমে লিস্‌বনের প্যাট্রিয়ার্ক এবং সমগ্র পর্তুগালের বিশপরা মিলিয়া এক যুক্ত বিবৃতি মারফৎ সালাজার গনর্ভমেণ্টের নীতির সঙ্গে চার্চের মতভেদের ইঙ্গিত দেন। ব্রাগা এবং বেইরা প্রদেশের ছয়জন ধর্মযাজক বিরোধী দলের রাজনীতিকদের সঙ্গে একসঙ্গে ইস্তাহার জারী করিয়া সালাজারকে ক্ষমতা হইতে অপসারণের দাবী জানান। সালাজার এবং 'পিদে'-র দমননীতি ক্রমে ক্রমে ধর্মযাজকদের উপরেও নামিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওপোর্তোর বিশপ মনসিগ্‌নোর ফেরেইরা গোমেসের এখনকার কোনো খবর কেহ জানে না। জানি না তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে! সংক্ষেপে এই হইল সালাজারের পর্তুগালের বাস্তব অবস্থার স্বরূপ।

এই সব ঘটনার ইঙ্গিত কোন দিকে তাহা বোঝা কঠিন নয়। সেইজন্য সময় সময় একথা মনে হইয়াছে—কে জানে, গোয়ার মুক্তির প্রশ্ন পর্তুগালের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে কিনা? আগামী কালের ইতিহাস সে জিজ্ঞাসার জবাব দিবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছে আজ যে প্রশ্ন কোনোমতেই এড়াইয়া যাওয়ার উপায় নাই তাহা এই—গোয়াকে ভারতের অচ্ছেদ্য অংশ মনে করিয়া পর্তুগীজ শাসন হইতে গোয়ার মুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি তাহাকেই আমরা যথেষ্ট বলিয়া মনে করি কিনা? সাধারণ গোয়াবাসী এবং গোয়া-মুক্তিকামী ভারতীয় স্বেচ্ছাসৈনিকের দল স্বাধীন ভারতের মুখের দিকে তাকাইয়া গোয়ার মুক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কম মূল্য দেয় নাই। একথা ভোলার উপায় নাই, গোয়ার ভিতরে এবং গোয়ার সীমান্তে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ জন তরুণ যুবক পর্তুগীজ সৈন্যদলের বুলেটে কিংবা পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণ দিয়াছে। আজো প্রায় পঁয়ত্রিশ জন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা গোয়ার ভিতরে জেলে আছেন তাঁহাদের এবং তাঁহাদের মত আরো শত শত মুক্তি-সৈনিকের দুঃখবরণ ও আত্মদানকে আমরা ব্যর্থ হইতে দিব কিনা, গোয়ার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের আরো কিছু করণীয় আছে বলিয়া আমরা মনে করি কিনা—ইতিহাস তাহার দিক হইতে আমাদের কাছে সে প্রশ্ন করিতে ছাড়িবে না। গোয়াতে আমার

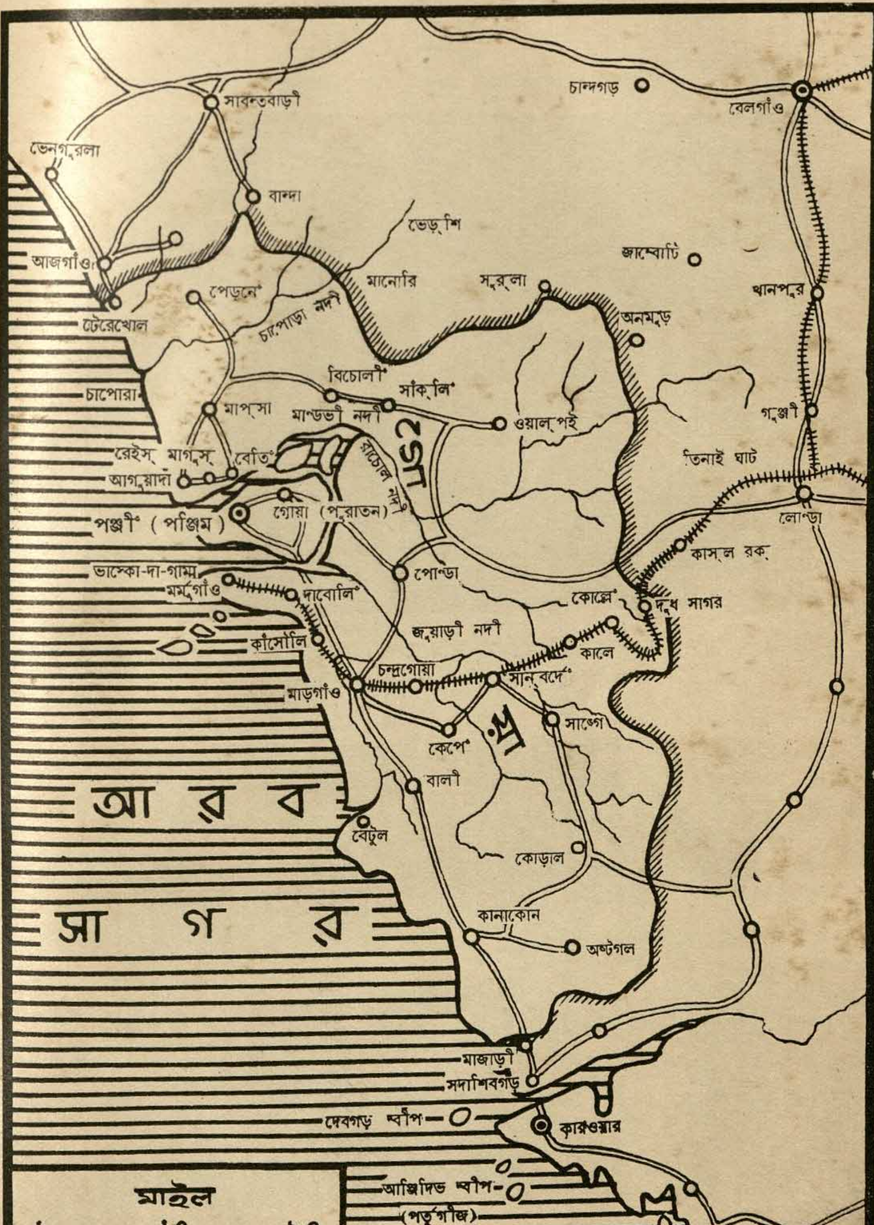
কারাবাসের এই সামান্য কাহিনী গোয়ার মুক্তির সঙ্গে জড়িত সেইসব মূলগত প্রশ্নের দিকে হয়ত কাহারো কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে সেই আশা রাখি। বইয়ের আকারে এই কাহিনী প্রকাশের স্বপক্ষে যদি কোনো যুক্তি থাকে, ইহার যদি কোনো সার্থকতা থাকে, তাহা এইখানে।

পরিশেষে আর একটি কথাই বলার আছে। 'দেশে' ধারাবাহিকভাবে আমার এই কারা-কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার পরেও বেশ কিছু সময় কাটিয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যাঁহার একান্ত আগ্রহে ও উৎসাহে 'সালাজারের জেলে উনিশ মাস' স্বতন্ত্র বই হিসাবে প্রকাশিত হইতে পারিল, তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারিতেছি না। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড'-এর অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদি ক্রমাগত তাগিদ দিয়া 'দেশে' প্রকাশিত লেখার আবশ্যকীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজ আমাকে দিয়া শেষ না করাইয়া নিতেন, তাহা হইলে এ বই ছাপিয়া বাহির হইত না। এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ খালি প্রকাশকের উৎসাহ নয়। গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও একাত্মবোধের নিদর্শনও বটে—সে বিষয়ে লেখকের মনে কোনো সংশয় নাই। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড'-এর অন্যতম তরুণ কর্মী ও আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছেও এই বই প্রকাশের ব্যাপারে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমার পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি হইতে তিনি যেভাবে বইটিকে উদ্ধার করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ছাপার উপযুক্ত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকেও বিশেষ ধন্যবাদ না জানাইয়া পারিতেছি না।

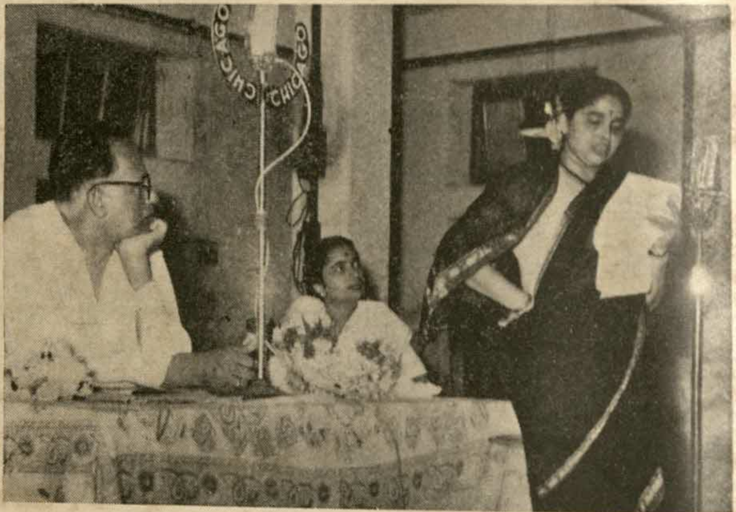
আমার এই বই ছাপিয়া বাহির হইলে যিনি সবচেয়ে বেশী খুশী হইতেন, আমার গোয়াযাত্রার সাথী ও অনুজপ্রতিম তরুণ সহকর্মী কমরেড নিতাই গুপ্ত, আর আমাদের মধ্যে নাই। আজ 'সালাজারের জেলে উনিশ মাস' বইয়ের আকারে প্রকাশের দিনে তাঁহার কথা তাই সবশেষে কিন্তু সবচেয়ে বেশী করিয়া স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০
॥ নিউ দিল্লী ॥

ত্রিদিব চৌধুরী



চান্দগড়
বেলগাঁও
সাবন্তবাড়ী
ভেনগুরলা
বান্দা
ভেড়্‌শি
জাম্বোটি
আজগাঁও
মানোরি
সুর্‌লা
থানপুর
পেড়্‌নে
টেরেখোল
চাপোড়া নদী
অনমড়
বিচোলী
সাঁক্‌লি
চাপোরা
মাপ্‌সা
মান্ডভী নদী
ওয়াল্‌পই
গুঞ্জী
রেইস্‌ মাগুস্‌
বেতি
তিনাই ঘাট
আগুয়াদা
পঞ্জী (পঞ্জিম)
গোয়া (পুরাতন)
লোন্ডা
কাস্‌ল রক্‌
ভাস্কো-দা-গামা
পোন্ডা
মর্মুগাঁও
দাবোলি
কোল্লে
দুধ সাগর
জুয়াড়ী নদী
কাঁসোলি
কালে
চন্দ্রগোয়া
সান্‌বর্দে
মাড়গাঁও
সাঙ্গে
কেপে
বালী
আ র ব
বেটুল
কোড়াল
সা গ র
কানাকোন
অষ্টগল
মাজাড়ী
সদাশিবগড়
দেবগড় দ্বীপ
কারওয়ার
আঞ্জিদিভ দ্বীপ
(পর্তুগীজ)
মাইল
১ ১০ ২০



গোয়া কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সুধাবাঈ যোশী গোয়াতে প্রবেশ করিবার পূর্বে বোম্বাই-এ সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করিতেছেন।



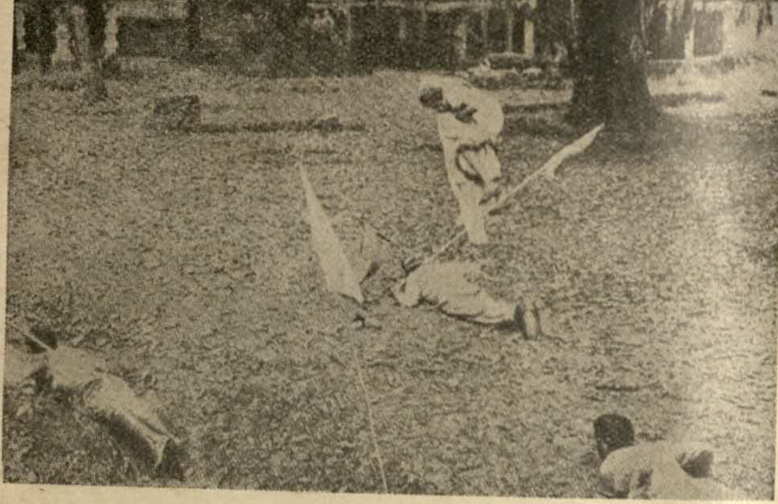
১৫ই আগস্ট, ১৯৫৫; টেরেখোল নদী পার হইয়া ভারতীয় সত্যাগ্রহী দল গোয়ায় প্রবেশ করিতেছে। সীমান্তের অপর-পারে—সম্মুখদিকে পর্তুগীজ এলাকা।



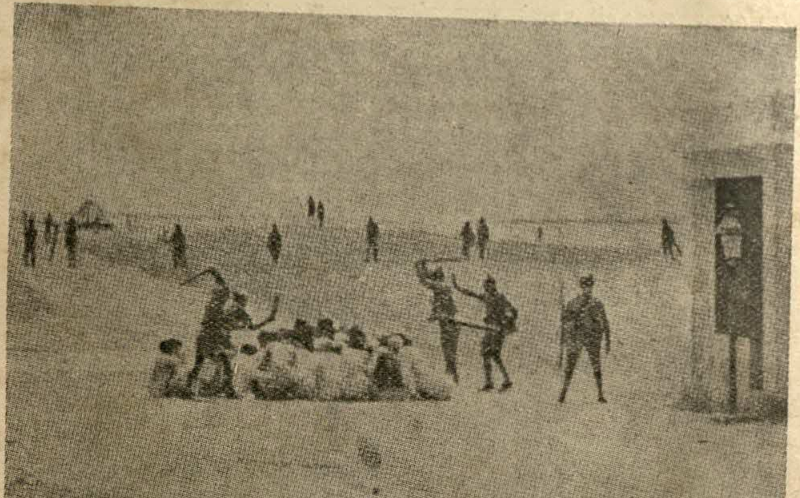
১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত হইতে বান্দার পথে সত্যাগ্রহী দলের গোয়ায় প্রবেশ। ছবির পিছন দিকে যে টিলাটি দেখা যাইতেছে তাহা ভারত সীমান্তে। সত্যাগ্রহী দলের সম্মুখভাগ গোয়া সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র।



১৫ই আগস্ট, ১৯৫৫; বান্দা সীমান্তে গুলীচালনার পর মার্কিন সাংবাদিক মিঃ আর্থার বনের একজন নিহত সত্যাগ্রহীর দেহ বহন করিয়া ভারতীয় এলাকায় নিয়া আসিতেছেন।



ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজ সৈন্যদের গুলিচালনা। ছবিতে দেখা যাইতেছে যে জনৈক সত্যাগ্রহী গুলিচালনার ফলে নিহত একজন মহিলা সত্যাগ্রহীর মৃতদেহ কাঁধে করিয়া ভারতীয় এলাকায় লইয়া আসিতেছেন। দুজন পর্তুগীজ সৈন্যকে বাড়ীর বারান্দা হইতে গুলি চালাইতে দেখা যাইতেছে।



ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজ সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যদের নির্যাতনের একটি দৃশ্য। ছবিতে ১৫ই আগস্ট দিউ'তে প্রবেশকারী ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজ সশস্ত্র পুলিসদের লাঠি ও রবার-ট্রাঞ্চিয়ন দ্বারা নির্মমভাবে পিটাইতে দেখা যাইতেছে। সঙ্গীনধারী সৈন্যরা সত্যাগ্রহীদের চারিপাশে পাহারা দিতেছে।



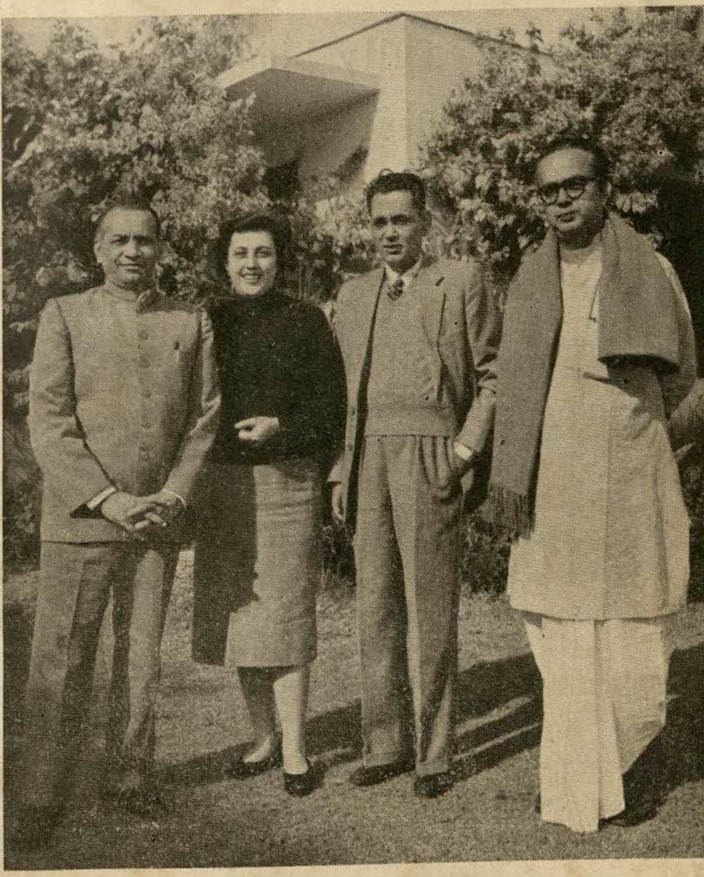
গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহীদের উপর গুলীচালনা। ছবিতে সম্মুখের দিকের বাড়ীর ডানদিকের বারান্দায় গুলীচালনায় রত পর্তুগীজ সৈন্যদের দেখা যাইতেছে।



গোয়ার রাজধানী পঞ্জিম শহরে পুলিস হেড কোয়ার্টারের সামনে পর্তুগীজ ও নিগ্রো সৈন্যদল। লেখক (শ্রীত্রিদিব চৌধুরী)-কে গ্রেপ্তারের পর এক মাস এই বাড়ীরই ভিতর দিকে হাজতে রাখা হয়।



নির্বাসিত দেশপ্রেমিকদের সংবর্ধনা। পর্তুগালে দশ বৎসর নির্বাসন ও কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ডাঃ রামা হেগড়ে ও তাঁহার ধর্মপত্নী শ্রীমতী আমেলিয়া মারিয়া হেগড়ে এবং অধ্যাপক পুরুষোত্তম কাকোড়কর লণ্ডনের পথে প্রত্যাবর্তন করিলে বোম্বাইয়ে তাঁহাদের সংবর্ধনা। শ্রীমতী হেগড়ের একটু পিছনে গান্ধীটুপী পরিহিত শ্রীপিটার আলভারিসকে দেখা যাইতেছে। শ্রীআলভারিস গোয়া ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। অধ্যাপক কাকোড়করের পাশে মাথায় সাদা চুল ও চশমা-চোখে ডাঃ টি. ব্রাগাঞ্জা কুন্যাকে দেখা যাইতেছে। ডাঃ কুন্যা লিস্‌বন হইতে পর্তুগীজদের ফাঁকি দিয়া এদেশে পালাইয়া আসেন। ডাঃ হেগড়ে, অধ্যাপক কাকোড়কর ও ডাঃ কুন্যা নবপর্যায়ের গোয়া-মুক্তি-আন্দোলনের স্রষ্টা। তাঁহারা তিনজনই ১৯৪৬ সালে গোয়া হইতে পর্তুগালে নির্বাসিত হন।



(বাম হইতে দক্ষিণে): শ্রীনারায়ণ গণেশ গোরে, শ্রীমতী এদিলা গাইটোণ্ডে, ডাঃ পুণ্ডালিক গাইটোণ্ডে ও লেখক।



Hamburger Bar & Restaurant

The Leader of Restaurants in Goa

Rua **Cunha Rivara, Pangim**

Fully Licensed

Best Cuisine

Furnished Rooms

Picknicks and Parties Catered For

WHILE IN GOA DO NOT FAIL

TO PAY US A VISIT

Your Satisfaction is our Motto

Prop. *FRIEDRICH VETTERS*

(GERMAN)

TIP CENTRAL GOA — Visado pela Censura

পর্তুগালের মতো গোয়াতেও ছাপানো যে কোনো পত্র-পত্রিকা, বই বা বিজ্ঞাপনের জন্য সাধারণ কোনো পোস্টার-হ্যান্ডবিল পর্যন্ত প্রথমে সেন্সার না করাইয়া ছাপানো যায় না। মুদ্রিতভাবে যাহা কিছু প্রকাশিত হইবে তাহাতে প্রেস ও প্রকাশকের পরিচয়ের সঙ্গে ট্রেড মার্কের মতো আর একটি কথাও ছাপা থাকে—'Visado pela censura'; অর্থাৎ সেন্সার কর্তৃক পরীক্ষিত। ছবিতে সেইরূপ একটি সেন্সার হওয়া সাধারণ পোস্টারের নমুনা দেখা যাইতেছে।

"মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।"

—রবীন্দ্রনাথ

সালাজারের অতিথি

১৯৫৫ সালের ১০ই জ্বলাই হইতে ১৯৫৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উনিশ মাস কাল আমাকে পর্তুগালের ডিক্টেটর ডাঃ অলিভেইরা সালাজারের অতিথি হিসাবে গোয়াতে থাকিতে হইয়াছিল। গোয়াতে যাওয়ার পর আমরা ছিলাম অবশ্য পুলিসের হাজতখানায় এবং জেলে। সুতরাং 'সালাজারের অতিথি' না বলিয়া 'পর্তুগীজ সরকারের অতিথি' বলিলেই আইনগতভাবে কথাটা শুদ্ধ হইত। তবে সকলেই হয়ত জানেন, আজ প্রায় পঁচিশ বছর ধরিয়া পর্তুগীজ সরকার বলিতে আসলে ডাঃ সালাজারকে বোঝায়। পর্তুগীজ সরকার মানেই ডাঃ সালাজার। খাস পর্তুগালে হোক্, আর পর্তুগাল ও ইউরোপ হইতে সাত সমুদ্র পারে এশিয়া-আফ্রিকায় ছড়ানো পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে হোক্, সালাজারের মুখের কথাই আইন। গোয়া কিংবা পর্তুগালের 'ভারত রাজ্য' 'Estado da India'—গোয়া, দমন, দিউ—তার ব্যতিক্রম নয়। হোক্ না কেন সেই 'ভারত রাজ্য' খুব ছোট, পকেট-সাইজের কয়েকটি ছিট্-মহল মাত্র। সালাজার তাঁহার জমিদারীর কোথাও খালি নায়েব-গোমস্তাদের উপর ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। সুতরাং আমার উনিশ মাস গোয়া-বাসের 'হোস্ট্' হিসাবে ডাঃ সালাজারের নাম করিলে বোধহয় এমন কিছু ভুল বা অত্যুক্তি করা হইবে না।

বলাই বাহুল্য, ডাঃ সালাজার লিস্বন হইতে তাঁহার সাধের 'Golden Goa'—'সোনার দেশ' গোয়ায় বেড়াইয়া যাওয়ার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান নাই। আমরাই বরং উপযাচক হইয়া নিজেরা নিজেদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া নিয়াছিলাম। অর্থাৎ সোজা কথায়, স্বাধীন ভারতের বুকে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন আজও যেই ভাবে জোর করিয়া টিঁকিয়া থাকার চেষ্টা করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমরা 'সত্যাগ্রহী' হিসাবে গোয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাহার জন্য পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অনুমোদন নেওয়ার কষ্ট স্বীকার করি নাই। সুতরাং গোয়াতে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা যে গোয়ার "গ্রেট্ ইস্টর্ণ"—"হোটেল মাণ্ডভী"তে হয় নাই, তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। ব্যবস্থা হইয়াছিল মাপ্‌সা আর পঞ্জিমের পুলিস হাজতে, পঞ্জিমের উপকণ্ঠে মানিকোম্ পল্লীর পাহাড়ের টিলার উপরে একটি পাগ্‌লা গারদের সেলে এবং পরে, ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন হইলে পর, পঞ্জিম হইতে বারো মাইল দূরে, মাণ্ডভী নদী যেখানে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছাকাছি পর্তুগীজ ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "আগুয়াদা" দুর্গের সামরিক বন্দীশালায়। রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সত্যাগ্রহীদের ভাগ্যে ইহার চেয়ে ভালো আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কোথাও জোটে না। বিশেষ করিয়া পর্তুগীজ রাজত্বে তো তাহার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

অতএব গোয়াতে আমাদের সম্বর্ধনা বা আদর-আপ্যায়নের এই ধরনের কিছুটা বেমক্কা ব্যবস্থার জন্য ডাঃ সালাজার, কিংবা তাঁহার বন্ধু এবং পর্তুগীজ ভারতের তখনকার বড়লাট, জেনারেল পাউলো বেনার্দ গেদীস্‌কে অনর্থক দোষারোপ করিলে অন্যায় হইবে। ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই অর্থাৎ আমাদের মত সত্যাগ্রহীদের। আমরা নিজেরা সবকিছু জানিয়া শুনিয়া, সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করিয়াই গোয়া যাই। একে বিনা

পাসপোর্টে, বিনা হুকুমনামায়। তাহার উপরে সত্যাগ্রহী হিসাবে, গোয়া এবং পর্তুগীজ ভারত হইতে পর্তুগীজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য গোয়াবাসীদের উস্কানি দিবার উদ্দেশ্যে! খাস পর্তুগালেই যখন সালাজারের বিরুদ্ধবাদী সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের ২৭।২৮ বছর ধরিয়া জেলে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, তখন গোয়ায় আমাদেরকে পর্তুগীজ সরকার খালি ভারতীয় বলিয়া, কিংবা নিরামিষ 'অহিংস' সত্যাগ্রহী মনে করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, এরকম প্রত্যাশা করার কোনই অবকাশ ছিল না। আমরা বাহির হইতে আসিয়া পর্তুগীজ এলাকায় ঢুকিয়া তাহাদের আইন ভাঙ্গিব, তাহাদের প্রজা খেপাইব, আর তাহারা আমাদের হাতে-নাতে ধরিয়াও কোন কিছু না বলিয়া, ঘরে বসাইয়া জামাই-আদরে অভ্যর্থনা করিবে—সালাজার রাজত্বে, তাহা গোয়াতেই হোক্, আর আফ্রিকায় আঙ্গোলা-মোজাম্বিকে হোক্, কিংবা খাস পর্তুগালের ভিতরে হোক্—সে কথা ভাবা নিছক দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

একথা নিশ্চয় এখানে বলার কোন দরকার করিবে না যে ১৯৫৪—৫৫ সালে ভারত হইতে যে সমস্ত সত্যাগ্রহী বে-আইনীভাবে ভারত-গোয়া সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়াতে পর্তুগীজ এলাকায় প্রবেশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই এই ধরনের আশা নিয়া সেখানে যান নাই। গোয়ার ভিতরে ঢোকার পর পর্তুগীজ এলাকায় গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পর্তুগীজ মিলিটারী এবং গোয়েন্দা পুলিসের হাতে আমাদের ভাগ্যে যে নিয়ম-মাফিক ধুম-ধড়াক্কা অভ্যর্থনা জুটিয়াছিল, সেটাই বরং প্রত্যাশিত ছিল। তার পর, উনিশ মাস ধরিয়া আমাদের উপর যত রকমারি কায়দায় অত্যাচার চলিয়াছে এবং পুলিস হাজতে বা বিভিন্ন জেলের আঁধার কুঠুরীতে আমাদের যেভাবে আটক রাখা হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। বরং মাত্র উনিশ মাসেই যে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি মিলিয়াছে সেটাই পরম আশ্চর্যের বিষয়।

পর্তুগীজ আইন অনুযায়ী মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারে আমার দশ বছর এবং তার সঙ্গে ফাউ হিসাবে আরো দু' বছর (মোট বারো বছর) সাজা হয়। শ্রীযুক্ত নানাসাহেব গোরে, শ্রীধর পুরুষোত্তম লিমায়ে, মধু লিমায়ে, জগন্নাথ রাও, অনন্ত যোশী, রাজারাম পাতিল, ঈশ্বরভাই দেশাই এবং আমি—অর্থাৎ যে সাতজন সত্যাগ্রহী নেতাকে পর্তুগীজরা 'পালের গোদা' হিসাবে বাছাই করিয়া ধরিয়া রাখে, সকলেরই এই শাস্তি হয়। অন্যান্য ভারতীয় সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক যাঁহারা আটক ছিলেন তাঁহাদের সাধারণত মোট ৯—১০ বছর করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে একজনের খালি ১৩ বছর, এবং গুরুজী রানাড়ে নামে একজন ভারতীয় নাগরিকের হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে ২৬ বছর সাজা হয়।

আমাদের যে দুই বছর ফাউ সাজা বা অতিরিক্ত সাজা দেওয়া হয় তাহার অর্থ এই যে, দশ বছর পুরা মেয়াদ খাটার পর, ইচ্ছা করিলে, দৈনিক একশত এস্কুদো (পর্তুগীজ টাকার নাম; পর্তুগীজ ভারতের টাকার নাম 'রুপিয়া') কিংবা পর্তুগীজ ভারতের ১৭ রুপিয়া ২ তাংগা (১ রুপিয়া = ভারতীয় ১৲ টাকা, ১ তাংগা = ৴০ আনা; পর্তুগীজ ভারতের রুপিয়া, আধ রুপিয়া, তাংগা এইসবের চেহারা আমাদের টাকা, আধুলি ও ঢেউ খেলানো আনির মতই) খেসারত ধরিয়া দিলে এই ফাউ সাজা মাপ পাওয়া সম্ভব ছিল। অর্থাৎ মোট সাড়ে বারো হাজার টাকা জরিমানা দিলে দশ বছরেই আমরা খালাস পাইতে পারিতাম। পর্তুগীজ আইনে আমাদের দেশের মতো—"অতো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে অতো বছর সশ্রম কারাদণ্ড" এই ফর্মুলায় ফাউ সাজার আদেশ না দিয়া, তাহার বদলে—"অতো বছর অতিরিক্ত মেয়াদ, তবে দৈনিক এত এস্কুদো বা এত রুপিয়া হিসাবে নগদ

খেসারত জমা দিলে এই অতিরিক্ত সাজা মাফ্ করা হইবে"—এইভাবে ফাউ সাজার আদেশ আদালতের রায়ে লেখা হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত গিয়া ব্যাপারটা দাঁড়ায় একই। যাই হোক্, কপালগুণেই বলা যাক্, কিংবা ঘটনাচক্রে বলা যাক্, দশ বারো বছর মেয়াদ আমাদের খাটিতে হয় নাই; আঠারো-উনিশ মাসের উপর দিয়াই গিয়াছে। তাহার মধ্যে মেয়াদী সাজা পনেরো মাস মাত্র। কারণ মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের কাজীর বিচার শেষ হইতে হইতেই প্রথম চার-পাঁচ মাস কাটিয়া যায়। মোটের উপর, অল্পের উপর দিয়াই দুর্ভোগ কাটিয়া গিয়াছে। গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীরা আজও যে অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদেরকে যে পরিমাণ সুদীর্ঘ কারাবাসের সাজা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের কতটুকু আর দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে? আর যে সমস্ত ভারতীয় সত্যাগ্রহী তরুণ যুবক পর্তুগীজ সৈন্যের গুলীতে প্রাণ বলিদান দিয়াছেন, পর্তুগীজ পুলিস হাজতের ভিতরে গোয়ার যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে—তাঁহাদের তুলনায়?

ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পর্তুগীজ এলাকায় ঢোকার সময় পর্তুগীজরা সত্যাগ্রহীদের গুলী করিয়া মারিতেও পারিত; পরে তাহারা মারিয়াছেও। আইনত তাহাদের সে ক্ষমতা ছিল ও আছে। ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্তুগীজ সীমান্তরক্ষী সৈনিকেরা ২২জন ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে এইভাবেই গুলী করিয়া মারে। বীর শহীদ আমীরচাঁদ গুপ্তকে তাহারা মারের চোটে বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার পর পাহাড়ের উপর হইতে তাঁহাকে ধাক্কাইয়া ফেলিয়া দেয়। ইহার বিরুদ্ধে আমাদের গভর্নমেণ্ট 'জোরালো' প্রতিবাদ জানানো ছাড়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। আমাদের সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে চীৎকার করিয়াছে; বিক্ষুব্ধ জনমত দেশের ভিতরেই যাহা কিছু বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ, গোয়া ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া বা জাতিগতভাবে ভারতবর্ষের অচ্ছেদ্য অংশ হইলেও, রাজনৈতিক দিক দিয়া আইনত ও বাস্তবত—de jure and de facto—পর্তুগীজ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন। পর্তুগীজদের সার্বভৌম এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় ভারত সরকারের কোনই এক্তিয়ার বা ক্ষমতা নাই। আমাদের সরকারের হুকুমনামা সেখানে অচল। ভারতের কোন প্রজা যদি পর্তুগীজ সরকারের উপযুক্ত অনুমতিপত্র না নিয়া এবং ভারত সরকারের পাসপোর্ট ছাড়া, বে-আইনীভাবে গোয়ার পর্তুগীজ এলাকায় (কিংবা অন্য যে কোন বিদেশী রাজ্যে) প্রবেশ করে এবং সেখানে গিয়া পর্তুগীজ সরকারের (বা সেই বিদেশী রাজ্যের) আইন ভাঙ্গে, তাহা হইলে তাহাকে সেই রাজ্যের আইন অনুযায়ী সাজা পাইতে হইবে। ইহাই সাধারণভাবে স্বীকৃত ও সর্বত্র প্রচলিত আন্তর্জাতিক রীতি।

গোয়া-সত্যাগ্রহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ঔপনিবেশিক মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইহাই প্রথম আন্তর্জাতিক সত্যাগ্রহ। সাইপ্রাসের মুক্তি আন্দোলন এবং গ্রীক রাষ্ট্রের সঙ্গে সাইপ্রাসের অন্তর্ভুক্তির দাবীর ('এনোসিস্ আন্দোলন' নামে যাহা পরিচিত) ব্যাপারে গ্রীক গভর্নমেণ্টের ও গ্রীক জনসাধারণের সহানুভূতি সর্বজনবিদিত। সাইপ্রাসের মুক্তি-যুদ্ধে বহু গ্রীক স্বেচ্ছাসৈনিক নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া সশস্ত্র সংগ্রাম করিতে গিয়াছে। কিন্তু অহিংস সত্যাগ্রহের নীতি অবলম্বন করিয়া গ্রীকদের মধ্য হইতে কেহ বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন চালানোর জন্য সাইপ্রাসে যায় নাই। আল্‌জিরিয়ার মুক্তি-সংগ্রামে তেমনি প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলি হইতে

ফরাসীদের বিরুদ্ধে আরবেরা অনেকে রাইফেল কাঁধে লড়াই করিতে গিয়াছে। বিভিন্ন আরব গভর্নমেণ্ট, প্রত্যক্ষ ও সরকারীভাবে না হইলেও, নানাভাবে আলজিরিয়ার মুক্তি-যোদ্ধাদের সাহায্য করিতে, এমন কি অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতেও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই সেখানে খালি হাতে অহিংস সত্যাগ্রহ করিতে যায় নাই। এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্তের কথাই অনেকের মনে পড়িবে। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সে দেশের অধিবাসীরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে, কিংবা বিদ্রোহ করিলে, তাহাদের সেই সংগ্রামে অন্যান্য দেশ হইতে সাহায্য করা, বা অন্যান্য দেশ হইতে স্বেচ্ছাসৈনিকের দল সংগঠন করিয়া সে দেশের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে যাওয়া গোয়ার ক্ষেত্রেই প্রথম নয়। কিন্তু অহিংস গণসত্যাগ্রহের পন্থায় এই ধরনের সংগ্রাম এই প্রথম। সাইপ্রাস ও গ্রীসের অনুরূপ ক্ষেত্রে, এবং গোয়ার ক্ষেত্রেও, অহিংস গণসত্যাগ্রহের পন্থাই সবচেয়ে কার্যকরী ও সার্থক পন্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা, অথবা অহিংস সত্যাগ্রহের পন্থা অবলম্বন করার উপযুক্ত পরিবেশ সেইসব ক্ষেত্রে আদৌ ছিল বা আছে কিনা, ১৯৫৫ সালে গোয়াতেও তাহা ছিল কিনা, তাহা নিয়া মতভেদের বহু অবকাশ থাকিতে পারে। কিন্তু গোয়ার ক্ষেত্রেই প্রথম এক দেশ হইতে অপর প্রতিবেশী দেশ বা রাষ্ট্রের এলাকায় গিয়া তাহার বিরুদ্ধে অহিংস গণসত্যাগ্রহের নীতির বাস্তব প্রয়োগ বা পরীক্ষা চলিয়াছে। গোয়া সত্যাগ্রহ সেইদিক দিয়া কি পরিমাণ সার্থক হইয়াছে ইতিহাস ও উত্তরকাল হয়ত তাহার বিচার করিয়া দেখিবে। কিন্তু এইদিক দিয়া গোয়া সত্যাগ্রহ ও গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম যে খানিকটা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, আন্তঃ-রাষ্ট্রিক বিরোধের ক্ষেত্রে অহিংস গণ-সত্যাগ্রহের বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ইহাই সর্বপ্রথম; যদিও, সেটা গভর্নমেণ্টের স্তরে নয়, সম্পূর্ণভাবে বে-সরকারী স্তরে।

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পর্তুগীজ সরকারের প্রকাশ্য অভিযোগ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে একথা সকলেই জানেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট, কিংবা ভারতে শাসনক্ষমতা যাঁহাদের হাতে সেই কংগ্রেস দল দলগতভাবে, আমাদের এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে অনুমোদন করেন নাই বা সরকারীভাবে ইহাকে সমর্থন বা কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে কংগ্রেসের বা ভারত গভর্নমেণ্টের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, একথা ধরিয়া নিলেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা সকলেই জানেন যে, ১৯৫৪ সালে গোয়াবাসী সত্যাগ্রহীদের ভারত হইতে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গোয়ায় প্রবেশ করিতে বাধা না দেওয়া, এবং ১৯৫৫ সালে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের বেলাতেও সেই বাধার বা নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ না করা ছাড়া এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ভারত গভর্নমেণ্টের কোন প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের বে-আইনীভাবে গোয়া প্রবেশে যে সময় তাঁহারা কোন বাধা দিতেছিলেন না—১৯৫৫ সালের জানুয়ারী হইতে আগস্ট পর্যন্ত—তখনও তাহাদের গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্তকে ভারত গভর্নমেণ্ট বা কংগ্রেস মোটেই অনুমোদন করেন নাই বরং তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনাই করিয়াছেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, এই ধরনের সত্যাগ্রহ করা যে উচিত নয় সে কথা বারবার ঘোষণা করিয়াছেন। গোয়া সীমান্তে ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্তুগীজরা সত্যাগ্রহীদের উপর যখন নির্বিচারে গুলী চালায় ও ২২জন সত্যাগ্রহী পর্তুগীজদের হাতে নিহত হন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্ট গোয়া-ভারত সীমান্ত একেবারে বন্ধ করিয়া দেন এবং সত্যাগ্রহীদের সম্পর্কে সরকারের বিনা অনুমতিতে ভারত-গোয়া সীমান্ত অতিক্রম করা

বিষয়ে তাঁহাদের পূর্বেকার নিষেধাজ্ঞা নূতন করিয়া বলবৎ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পণ্ডিত নেহরুও এই সময় দ্বিধাহীনভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, এই ধরনের গণ-সত্যাগ্রহ আন্তঃ-রাষ্ট্রিক বিরোধ মীমাংসার সুষ্ঠু বা কার্যকরী উপায় নয়। ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশক্রমে ও অনুরোধে গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্যোক্তারাও তখন হইতে এই আন্দোলন এ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ যখন চলিতেছিল, সেই সময় সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে পর্তুগীজ সরকার কি ধরনের ব্যবহার করিবেন সে সম্পর্কে ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বেও কোনরূপ ভুল বোঝার অবকাশ ছিল না।

মনে রাখিতে হইবে, অহিংস গণ-সত্যাগ্রহ (অনশন সত্যাগ্রহ বা হাঙ্গার স্ট্রাইকের মত) একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব, অর্থাৎ ভারতীয় ট্রেড মার্কা দেওয়া স্বদেশী জিনিস। 'বর্বর' পর্তুগীজরা এখনও পর্যন্ত তাহার মর্যাদা বোঝে নাই বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোটাও সম্পূর্ণ নিরর্থক। পুরানো জমিদার মেজাজের সালাজার সাহেব, কিংবা তাঁহার মন্ত্রিসভা, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সূচ্যগ্রও বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন বলিয়া দোষারোপ করা বৃথা। আর এই বিষয়ে বেচারী সালাজারকে একা দোষ দিলে চলিবে কেন? বাধ্য না হইলে সহজে কে কোথায় নিজের জমিদারী ছাড়িয়া দিতে চায়? উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ফরাসীরা ইন্দোচীনে দেয় নাই, আল্‌জিরিয়ায় দিতেছে না। ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনের যুদ্ধে দিয়েন-বিয়েন-ফ্যু'র দুর্বিপাকের সঙ্গে জেনেভা সম্মেলন এবং ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রাঁসের উদারনীতির যোগাযোগ না ঘটিলে ভারতবর্ষের মাটিতে চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহের ছিট্ মহলগুলি ছাড়িতেও যে তাহারা রাজী হইত না সেইকথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পণ্ডিচেরী প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশের হস্তান্তর-চুক্তি এখনও ফরাসী পার্লিয়ামেণ্টে অনুমোদিত হয় নাই। ইংরেজরাও তেমনি সাইপ্রাসে বা কেনিয়ায় অথবা গায়নায় দখল ছাড়িতে রাজী নয়। ভারতে, বর্মায়, সিংহলে বা ঘানায় যেখানে ইংরেজরা অধিকৃত রাজ্যের দখল ছাড়িয়াছে, বা ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছে—সহজে করে নাই। আজও সিঙ্গাপুরে বা মালয়ে বা নাইগেরিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তাহারা এম্‌নি এম্‌নি রাজী হইতেছে না। বাধ্যবাধকতা এসব ক্ষেত্রে কিছু ছিল কিনা বা কতখানি ছিল, আজই বা কোথায় কি পরিমাণে আছে, সেসব কথা ঐতিহাসিকেরা বিচার করিবেন। কিন্তু খালি অহিংসার মহিমায় বিগলিত হইয়া গিয়া ইংরেজ জাত তাহাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে—তাহা ভারতের ক্ষেত্রে হোক্ আর অন্যত্র হোক্—মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

তবে ইংরেজ বা ফরাসীদের বেলায় যাহাই হোক্ না কেন, মনে রাখিতে হইবে, পর্তুগীজরা ইংরেজ নয়। বাস্তব ইতিহাস-বোধ, সমাজ-চেতনা, দেশকালবোধ এবং রাষ্ট্রিক ঐতিহ্য সবই পর্তুগীজদের ক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন রকমের। সালাজারের আমলে পর্তুগীজ শাসকদের রাষ্ট্রচিন্তা সচেতনভাবে অতীতমুখী। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব পর্তুগালের বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রিক চিন্তাধারার প্রধান উপজীব্য। গোয়ায় থাকিতে ফাদার কারিনো* একবার আমায় বলিয়াছিলেন :

---

* রেভারেণ্ড ফাদার জোসে লুইস্ কারিনো, গোয়ার "ডম্ বস্কো" শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের রেক্টর, গোয়া জেলে আমরা থাকার সময় আমাদের বেসরকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

"গোয়া ছাড়ার ব্যাপারে ডাঃ সালাজার যদি কোনক্রমে রাজী হইয়াও যান (যদিও তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই) গোয়া ছাড়া তাঁহার পক্ষে তাহা হইলেও সম্ভব হইত না। পর্তুগীজদের জাতীয় চেতনা আজও পর্তুগালের অতীত ইতিহাসের মধ্যে ডুবিয়া আছে। পুরাতন পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্যের অতীত গৌরব তাহারা ভোলে নাই। সেই অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে। তাহাদের সেই অতীতজীব্য চেতনা পর্তুগীজ শাসকদের সহজে গোয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নিতে দিবে না। গোয়া তাহাদের অতীতের অচ্ছেদ্য অংশ।"

"It would be impossible for Dr. Salazar to openly agree to give up Goa even if he somehow comes round to that view—although there is no earthly chance of his coming round to that view. The Portuguese people are steeped deep in their past history; they live upon their past. That clinging consciousness of their past would not allow them to recognise the independence of Goa, for Goa is an inseparable part of that past of theirs."

১৯৫৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আমরা যখন মানিকোমের পাগলা গারদ আল্‌ডিন্যো জেলে আছি, সেই সময় একদিন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে কথায় কথায় উল্লিখিত মন্তব্যটি করেন। যতদূর মনে পড়ে মধু লিমায়ে এবং সুরাতের প্রজা-সোস্যালিস্ট নেতা ঈশ্বরভাই বোধহয় সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তখন পাগলা গারদে কেরুস ও ফের্নান্দ নামে দুটি পর্তুগীজ গোরা কনস্টেবলের চার্জে আছি। কেরুস এবং ফের্নান্দ দুজনেই লিসবনের শহুরে লোক হইলেও দাড়িগোঁফ-ওয়ালা সৌম্য চেহারার পাদ্রী কারিনোকে অতিশয় ভক্তি করিত। পুলিস কমাডাণ্ট নিজে আসিয়া একদিন কারিনোকে তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেটাও একটা কারণ হইতে পারে। বেচারারা ইংরেজী বুঝিত না তাই কথাবার্তার সময় সামনে হাজির থাকিত না। অন্য কোন দোভাষী বা গোয়েন্দা পুলিসও সে সময় ফাদার কারিনোর

এককালে তিনি লিলুয়া ও কৃষ্ণনগরের "ডন্ বস্কো" মিশনে থাকিয়া গিয়াছেন। বিগত যুদ্ধের কিছু আগে হইতে তিনি ভারতবর্ষে আছেন। জাতিতে স্প্যানিশ্, কিন্তু অতি তরুণ বয়স হইতে ইতালীর রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, সেইণ্ট ডন বস্কোর অনুবর্তীদের দ্বারা পরিচালিত সালেশিয়ান শিক্ষা-মিশন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া ডন্ বস্কোর মতই শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছেন। যুদ্ধের সময় একে ইতালীয়ান প্রতিষ্ঠানের লোক এবং তাহার উপরে স্পেনের অধিবাসী বলিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে নজরবন্দী হিসাবে আটক করেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিক হন। পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইলে পর, গোয়ার ভারতীয় কন্‌সাল-জেনারেল তাঁহাকে, পর্তুগীজ সরকারের অনুমোদনক্রমে, গোয়ায় ভারতীয় বন্দীদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য নিযুক্ত করিয়া আসেন। এই কাহিনীতে ফাদার কারিনোকে আরও কয়েকবার আমরা দেখিতে পাইব। গোয়ার বিভিন্ন বন্দী-নিবাসে যে সকল রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন তাঁহারা সকলেই এই স্বার্থলেশহীন পরহিতব্রতী ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর নিকট উপকৃত। তাঁহার কাছে আমাদের ঋণ আমরা সহজে শোধ করিতে পারিব না—লেখক।

সঙ্গে আসিত না (পরে আসিতে আরম্ভ করে)। ফাদার কারিনো আইনত ভারতীয় নাগরিক; আমাদের দেশের লোক। তখনও আমরা খবরের কাগজ বা বাড়ির চিঠিপত্র পাই না। ফাদার কারিনো আসিলে তাই মনের আনন্দে আমরা দেশের খবরাখবর, রাজনীতি, সাহিত্য সব কিছু আলোচনা করিয়া নিতাম। আর ফাদার কারিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষে আমাদের অনেক সময় অন্যান্য ভারতীয় সহ-বন্দীদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া যাইত। পর্তুগীজদের জাতীয় চেতনা সম্পর্কে ফাদার কারিনোর কথাগুলি আমার সেদিন খুবই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং আমার ডায়েরীতে কথা কয়টি টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।

অবশ্য খালি এই কথাগুলি দিয়া পর্তুগীজদের জাতীয় চেতনা সম্পর্কে একটা ধারনা করিয়া নিলে বা ইহাকেই সমগ্র পর্তুগীজ জাতির বা জনসাধারণের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখিলে ভুল করা হইবে। হয়ত পর্তুগীজ জাতির প্রতি কিছুটা অবিচার করাও হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, সালাজারের আমলে পর্তুগীজ শাসক সম্প্রদায়ের এবং অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশেরই চিন্তাধারা এইভাবে অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সমসাময়িক ক্রান্তিকালের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছে। পর্তুগীজ শাসক শ্রেণীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করার জায়গা এটা নয়। কিন্তু গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের হাতে ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা কিংবা গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামে বন্দী রাজনৈতিক কর্মীরা এ পর্যন্ত যে ধরনের ব্যবহার পাইয়াছে, তাহার পিছনে কোন্ মানসিকতা কাজ করিতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে ফাদার কারিনোর মন্তব্যগুলি কিছুটা সাহায্য করিবে। গোয়াতে সত্যাগ্রহীদের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহা আধুনিক টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের পুলিসী অত্যাচার বা জার্মানী-ইতালীর ফ্যাসিস্ট নৃশংসতার সঙ্গে তুলনীয় নয়। ভারতীয় ও গোয়াবাসী সত্যাগ্রহী বা অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পর্তুগীজদের অত্যাচারের পিছনে যে মানসিকতা কাজ করিতেছে তাহা অনেকটা ইউরোপের ফিউদাল যুগের ancien regime-এর মানসিকতা, সামন্তশাহী মানসিকতা, পুরাতন দিনের দোর্দণ্ড-প্রতাপ জমিদারদের মানসিকতা। পুলিসের কথা ছাড়িয়া দিলে, বা সালাজারের রাজনৈতিক বিরোধীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয় তাহার কথা বাদ দিলে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে পর্তুগীজরা জাতি হিসাবে অত্যন্ত ভদ্র, সৌজন্যবোধসম্পন্ন ও বিদেশীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান বা অন্যান্য উত্তর-ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো বর্ণবিদ্বেষ বা নিজেদের সম্পর্কে উচ্চতর ধারনা পোষণ করার বদস্বভাব তাহাদের আদৌ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যাগ্রহী বন্দীদের উপর অত্যাচার করিতেও পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বাধে নাই। ১৯৫৪—৫৫ সালে গোয়ার ভিতরে কোথাও কোন সত্যাগ্রহ বা রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের লেশমাত্র খবর পাইলে স্বয়ং পর্তুগীজ পুলিস কমাণ্ডাণ্ট, অ্যাড্জুট্যাণ্ট কমাণ্ডাণ্ট পর্যন্ত সাধারণ কনস্টেবলদের সঙ্গে লাঠি বন্দুক ঘাড়ে করিয়া দৌড়িয়া যাইতেন। অর্থাৎ কোন জমিদারের জমিদারীতে প্রজা বিদ্রোহী হইলে, আগেকার দিনে যেমন বুকে বাঁশদলা দিয়া, মুখে রক্ত উঠাইয়া, সেই বিদ্রোহী প্রজাকে শায়েস্তা করা হইত, গোয়ার ভিতর ও বাহির হইতে হঠাৎ ব্যাপক আকারে গণ-সত্যাগ্রহের উৎপাত আরম্ভ হইতে দেখিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া কতকটা সেই ধরনের হয়। সালাজারী শাসনের সামন্তশাহী মানসিকতার সঙ্গে গোয়ার শাসন ব্যবস্থার পুরাতন ঔপনিবেশিক চরিত্রের কথা মনে রাখিতে হইবে। আধুনিক রাজনীতির লেশমাত্র বালাই যেখানে ছিল না সেখানে হঠাৎ সত্যাগ্রহের আকারে ব্যাপক রাজদ্রোহের আত্মপ্রকাশ দেখিয়া,

গভর্নর পুলিস কমাণ্ডাণ্ট, সেনাপতি যাঁহারা এতদিন নিশ্চিন্ত মনে আম আর নারিকেলের বাগান ঘেরা ভিলায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পরম আরামে একটু দিবানিদ্রা দিয়া উঠিয়া (পর্তুগীজ ভাষায় এই নিয়মিত দিনানিদ্রাকে বলে 'সিয়েস্তা') বিকালে ক্লাবে নাচে গানে ফুর্তিতে খানা-পিনায় দিন কাটাইতেন, স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। 'পিটাইয়া বেটাদের ঠাণ্ডা করিয়া দাও' এই হাঁক দিয়া সেনাপতি, পুলিস, কোটাল, বড়লাট, ছোট লাট, কনস্টেবল, চৌকিদার সকলে একমত হইয়া বেপরোয়া পিটুনী নীতির নির্বিচার প্রয়োগ শুরু করিয়া দিলেন। ভারতবর্ষেও বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে ১৯০৫—৭ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এইসবের সময় ইংরেজ শাসকদের প্রতিক্রিয়াও প্রথমটা এই ধরনেরই হইয়াছিল। কাজেই গোয়ার পর্তুগীজ শাসকদের সত্যাগ্রহ-দমন পালার পুলিসী নির্যাতন বা অত্যাচারের দিকটা যত বেশী নিন্দার্হ ও বিকট ধরনের হোক না কেন—তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। নিজেদের জমিদারীতে প্রজা বিদ্রোহী হইলে তাহাকে যেমন পিটাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে; তেমনি জমিদারীর বাহির হইতে অন্য জমিদারের প্রজা যদি কেউ তোমার বিদ্রোহী প্রজাকে উস্কানী দিতে আসে তাহা হইলে তাহাদেরকেও এমনভাবে ঠেঙ্গানি দিয়া খেদাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে আবার কোনদিন ফিরিয়া আসার দুর্বুদ্ধি তাহাদের কিছুতেই না হয়। সংক্ষেপে ইহাই হইল সালাজার তথা পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসকদের রাষ্ট্রদর্শন। এ যুগের ঝুনা সাম্রাজ্যশাসক ইংরেজ কৌটিল্যদের মতো সাম, দান, দণ্ড ও ভেদের অর্থশাস্ত্র পর্তুগীজরা এখনো আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে, বেধড়ক এবং বেপরোয়া পিটুনী নীতি চালানো ছাড়া অন্য কোনরূপ 'ভব্য' নীতির কথা তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই।

পর্তুগীজদের এই পিটুনী নীতির কথা সকলেরই জানা ছিল। সেই কথা জানিয়াই সত্যাগ্রহীরা গোয়াতে সত্যাগ্রহ করিতে যায়। তাহা ছাড়া আমি যখন সেখানে যাই তখন এই বিষয়ে কোন ভুল ধারণা মনে পোষণ করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। আমি যে সত্যাগ্রহী অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব নিয়া গোয়ায় যাই সেটি গোয়া সত্যাগ্রহ অভিযানের বোধহয় সপ্তম কি অষ্টম দল। আমার আগে নানা সাহেব গোরে, সেনাপতি বাপত, শ্রীধর পুরুষোত্তম লিমায়ে, আত্মারাম পাতিল, রাজারাম পাতিল, বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডে (এম-পি), জগন্নাথ রাও যোশী প্রভৃতির নেতৃত্বে যেসব সত্যাগ্রহী দল গোয়ায় যান তাঁহাদের উপর পর্তুগীজদের ভয়াবহ নৃশংস অত্যাচারের কথা তখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শহীদ আমীরচাঁদ গুপ্তের মৃত্যুর খবরও সারা দেশে তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বেলগাঁও হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ডোডামার্গ অঞ্চলে পাহাড়ের তলা হইতে—যেখানে পর্তুগীজরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া দেয়—ভারতীয় পুলিস ও গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্বেচ্ছা-সেবকেরা তাঁহাকে জীপে তুলিয়া আনে। ডাক্তারদের শত চেষ্টাতেও তাঁহাকে বাঁচানো সম্ভব হয় নাই। বেশীর ভাগ সত্যাগ্রহী ভলাণ্টিয়ারদিগকে পর্তুগীজরা হাজতে এইরকম নৃশংসভাবে মারধোর করিয়া তারপর ট্রাকে করিয়া গোয়া সীমান্তের পারে ফেলিয়া দিয়া যাইত। সেই সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী তখন আর কাহারও অজানা নয়। সমস্ত দেশময় তখন পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও তীব্র উত্তেজনা আগুনের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমি গোয়ায় গেলে অভ্যর্থনাটা কি ধরনের হইবে তাহার একটা আন্দাজ করিয়া নেওয়া শক্ত ছিল না। অবশ্য তাহারা আচম্‌কা একেবারে আমাদের উপর গুলী চালাইয়া দিবে বা মারিয়া ফেলিবে, এমনটা ধরিয়া নেই নাই। কিন্তু মারধর যে বেশ কিছুটা খাইতে

হইবে সে বিষয়ে মনে কোন সংশয় ছিল না (যদিও আমাকে পরে সত্য সত্যই মার খাইতে হয় নাই; কেন তাহা পরে বলিব। তবে গোয়াতে আমিই বোধহয় একমাত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহী বন্দী যাহার উপর দৈহিক প্রহার—beating বা পিটুনী যাহাকে বলে—করা হয় নাই)।

আমার গোয়া প্রবেশের অল্প কিছুদিন পূর্বে পার্লিয়ামেণ্টে আমাদের বন্ধু, হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ও গোয়ালিয়রের অধ্যাপক বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডে, এম-পি একটি অভিযাত্রী দলের নেতৃত্বভার নিয়া গোয়ায় গিয়াছিলেন। হাজতে পুরিয়া কিছুটা মারধোর করিয়া পর্তুগীজ পুলিস অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বর্ডার পার করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়। আমাকেও হয়ত পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য বলিয়া ঐভাবে অল্প কিছুটা ধোলাই করিয়া ছাড়িয়া দিবে—বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ যে আমার বেলাতেও সেই ধরনের ভরসা পাইতে চাহিতেছিলেন না তাহা নয়। কিন্তু সেটা ডিগ্রীর তফাৎ মাত্র। নতুবা আমার দলের সরকারী অভ্যর্থনাও যে পরিচিত পর্তুগীজ কায়দায় জবরদস্ত জমিদারী ঢংয়ের হইবে এবং গায়ে-গতরে বেশ কিছুটা পিটুনী খাইয়া আসিতে হইবে, এটা মোটামুটি অবধারিত বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলাম।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া গোয়াতে সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়ার 'প্রস্‌পেক্টটা' যে খুব সুখের বা প্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা নয়। দেশ স্বাধীন হইয়া গেলেও লাঠিচার্জ, জেলখানা, পুলিস সবই যথারীতি বহাল আছে। স্বদেশী আমলেও যে কখনো-সখনো তাহার প্রয়োগ হয় না তাহা নয়। তবে দেশসেবার পুরস্কার হিসাবে আমাকে অনেকদিন মারধোর খাইতে হয় নাই। পুলিসের হাতে মারধোর খাওয়ার কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম বলিলেও চলে। ইতিমধ্যে বয়সও কিছুটা হইয়াছে। লোক-সভা-সদস্য হিসাবে পার্লিয়ামেণ্ট ভবনে এয়ার কণ্ডিশনড্ হলে গদী-গালিচা আঁটা আরামের কিছুটা আস্বাদও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পিঠে কি মাথায় হঠাৎ পর্তুগীজ পুলিসের লাঠি (কিংবা যদি ধর, বন্দুকের কুঁদাই হয়!) কিংবা রবার Truncheon-এর বাড়ি আচমকা আসিয়া পড়ে বা পর্তুগীজ পুলিসদের মধ্যে কেহ যদি বুটশুদ্ধ লাথিই চালাইয়া দেয়, কিংবা পেটে সঙ্গীনের খোঁচা দেয়—সেটা কেমন লাগিবে ঠিক আন্দাজ হইতেছিল না।

অথচ যেটা আমি তখন নিজে ভাবি নাই (আশ্চর্যের বিষয়, আর কেহই ভাবে নাই) যে আমি মার খাইব না, কিন্তু দশ-বারো বছরের লম্বা মেয়াদ দিয়া পর্তুগীজরা আমাকে আটকাইয়া রাখিবে; বিশেষ কারণে বা অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে না হইলে হয়ত ১৯৬৭ সালের আগে সহসা ছাড়া পাইব না; দশ-বারো বছর দেশে ফিরিতে পারিব না—সেই সম্ভাবনাটা তখনও অজানা ও অনিশ্চিত ছিল। পুলিসের হাতে মার খাওয়াটাই অবধারিত ও সুনিশ্চিত বোধ হইতেছিল।

গোয়া অভিযানের উপক্রমণিকায় মনে মনে যেটুকু অস্বস্তি ছিল সেটা এই প্রহারের কথা ভাবিয়া। গ্রেপ্তার বা কিছুকাল জেলবাসের কথা মনে করিয়া ততটা চিন্তিত হই নাই। যে কোন সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য আন্দোলনে এ সব প্রায় অবধারিত থাকে; হিসাবের মধ্যে ধরাও থাকে। কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে বলা হয় 'রং সাইড অব দী ফরটিস' (অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশের পর) সেইখানে পা দিয়া আবার নূতন করিয়া ঠেঙানি খাইতে হইবে—সেটা তত সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইতেছিল না।

১৯৫৫ সালের ১৮ই মে হইতে ভারতীয় সত্যাগ্রহী দলের অভিযান আরম্ভ হয়।* প্রথম অভিযাত্রী দলের নেতা নানাসাহেব বা সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সেনাপতি বাপতও পর্তুগীজদের মারধোরের হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। আমিও নিশ্চয় পাইব না। সেটা মোটামুটি অবধারিত ধরিয়া নিয়া ইংরেজ আমলের পুরানো ঠেঙানির দৈহিক স্মৃতি মনে ফিরাইয়া আনিয়া, নিজের 'প্রৌঢ়ায়মান' দেহ ও মনকে প্রবোধ দিতে দিতে ("তত বেশী লাগিবে না, দু'এক ঘা ডাণ্ডার বাড়ি পিঠে পড়ার পর পিঠ আপনি শক্ত হইয়া যাইবে"—নিজেকে এই ধরনের স্তোক ও সাহস যোগাইতে যোগাইতে) অবশেষে একদিন গোয়ার পথে পা বাড়াইতে হইল।

গোয়ায় গেলাম কিভাবে?

গোয়ার পথে পা বাড়াইলাম বটে, কিন্তু আমাদের গোয়া অভিযানের মূলকাহিনী এইখানেই আরম্ভ করিতে পারিতেছি না।

উনিশ মাসকাল গোয়ায় আটক থাকার পর ১৯৫৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে ছাড়া পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসি। বারো বছরের মেয়াদী সাজা শেষ পর্যন্ত না খাটিয়া আমরা কেন ও কিভাবে মুক্তি পাইলাম, হঠাৎ সালাজার সরকারের মনে আমাদের প্রতি কৃপা বা করুণার উদ্রেক কেন হইল, সেই কথা যথাসময়ে আলোচনা করা যাইবে। অদৃষ্টে বিশ্বাসীরা বলিবেন—নিতান্ত কপালগুণে ও পিতৃপুণ্যে, ঘরের ছেলে আবার ভালোয় ভালোয় অক্ষত শরীরে ঘরে ফিরিতে পারিয়াছি। আমাদের মুক্তি পাওয়ার 'দৃষ্ট' কার্য-কারণ সম্পর্কে যাহা জানি গোয়া হইতে বাহিরে আসার পরে সাংবাদিকদের কাছে কিছু কিছু বলিয়াছি।† কিন্তু কাহিনীর সূত্রপাত যে সময় অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে যখন আমি গোয়ায় যাই, আমার অন্যান্য সব কাজ ফেলিয়া

---

* ইহার পূর্বে ভারত গভর্নমেণ্ট ভারতীয় নাগরিকদের সত্যাগ্রহ করার জন্য গোয়া সীমান্ত লঙ্ঘন করার অনুমতি দেন নাই। তাহারা যাইতে চাহিলে সীমান্তে তাহাদের আটক করা হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু সত্যাগ্রহী যে ভারত গভর্নমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকেই গোয়ায় প্রবেশ করে নাই তাহা নয়। ১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রায় ৩০জনের একটি সত্যাগ্রহী দল গোপনে গোয়ায় প্রবেশ করে এবং গোয়াতে তাহাদের সকলের ৯—১০ বছর করিয়া সাজা হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সাল হইতেই ভারত গভর্নমেণ্ট ভারত হইতে গোয়াবাসী সত্যাগ্রহীদের (যাঁহারা গোয়ার অধিবাসী, কিন্তু যাঁহারা কার্য উপলক্ষ্যে ভারতে থাকেন) সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়াতে গিয়া পর্তুগীজ শাসকদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা দিতেছিলেন না। ভারত হইতে গোয়াবাসী সত্যাগ্রহীদের প্রথম দল শ্রীযুক্ত এণ্টনী ডি'সুজার নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট গোয়ার উত্তর সীমান্ত হইতে টেরেখোল নদী পার হইয়া গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করে।

† আমাদের মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন আগে, ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে, পণ্ডিত নেহরু প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের আমন্ত্রণক্রমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যান। এদেশে অনেকের মনে

গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহ করার সিদ্ধান্ত হঠাৎ তখন নিলাম কেন, সে প্রশ্ন আজও অনেকের মনে থাকিয়া গিয়াছে। সেই বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া যাওয়া দরকার মনে করিতেছি।

অবশ্য প্রত্যেকবার জেল হইতে ফেরার পর যেমন হয়, এবারও ছাড়া পাওয়ার পরে হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে জেল যাওয়ার এবং বিশেষ করিয়া অকারণে গোয়ার মত পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় গিয়া শখ করিয়া জেলে ঢোকার জন্য কিছুটা কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। 'অনেক তো জেলখাটা জীবনে হইল—এইবার আবার সমস্ত কিছু বিপদ-আপদ ও অনিশ্চয়তার কথা জানিয়া শুনিয়াও গোঁয়ার গোবিন্দ পর্তুগীজদের এলাকায় গিয়া সত্যাগ্রহ না করিতে গেলেই কি চলিতেছিল না? যদি বেটারা শেষ পর্যন্ত না-ই ছাড়িত? আন্দোলন করিতে হয়, বে-আইনী সভা-সমিতি করিয়া, কিংবা গরম বক্তৃতা করিয়া জেল যাওয়ার শখ হয় দেশের ভিতরে থাকিয়াও তো সে সব করা যাইত? জিদ্ করিয়া বিদেশে বেঘোরে মরিতে যাওয়ার কি দরকার ছিল?'... ইত্যাদি।

এই ধরনের সকল প্রশ্নের জবাব সব সময়ে দেওয়া যায় না; দেওয়ার প্রয়োজনও করে না। কিন্তু আমি একথাও জানি আমার বহু সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এবং সম্মানভাজন নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই গোয়াতে পর্তুগীজদের হাতে আমার দৈহিক বিপদ-আপদের কথা ভাবিয়া বা জেলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী হইয়া থাকার আশঙ্কায় ততটা নয় যতটা গোয়া যাওয়ার পরবর্তী কালের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করিয়া, আমার গোয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত পুরাপুরি সমর্থন করিতে পারেন নাই। আমার নিজের দিক দিয়া আমার গোয়া যাওয়ার সিদ্ধান্তের সমর্থনে বেশ তেজের সঙ্গে, বীরোচিত ও জোরালো

ধারণা আছে সেই সময় পণ্ডিত নেহরু আইসেনহাওয়ারের মারফৎ পর্তুগীজ সরকারের উপর আমাদের মুক্তির জন্য চাপ দেওয়ার ফলেই আমরা মুক্তি পাই। পণ্ডিত নেহরুর সংগে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের গোয়ার বিষয়ে বা আমাদের মুক্তি প্রসংগে কোন আলোচনা হইয়াছিল কিনা তাহা আমি জানি না। তবে এইটুকু জানি যে আমাদের মুক্তি দেওয়ার পিছনে পর্তুগীজ সরকারের নিজেদেরও কিছুটা গরজ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে (প্রধানত বোম্বাই শহর ও নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে) প্রায় দেড় হইতে দুই লাখের মত গোয়াবাসী চাকুরী-বাকুরী এবং অন্যান্য কার্য-সূত্রে বসবাস করেন। গোয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার ও পর্তুগালের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া উঠিলে এইদেশ হইতে গোয়াতে মণি অর্ডার যোগে হোক, ব্যাঙ্কের মারফৎ কিংবা লোকের মারফতে হাতে হাতে টাকা পাঠানো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। গোয়ার ভিতরে সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কের শাখা অফিস এবং ভারতে পর্তুগালের 'বাঙ্কো নাসিওনাল্ উল্ত্রা মারিনো'র (ন্যাশনাল ওভারসীজ্ ব্যাঙ্ক) অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গোয়াতে গোয়াবাসীদের জীবিকার সুযোগ-সুবিধা নানা কারণে খুবই সীমাবদ্ধ। কাজকর্মের সন্ধানে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বেশীর ভাগ চাকুরীজীবী গোয়াবাসীকে ভারতে আসিতেই হয়। গোয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, বাজার সব কিছু ভারতে প্রবাসী গোয়াবাসীদের পাঠানো টাকার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার পরিবারকে একান্তভাবে এই আয়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়—অর্থাৎ গোয়ার সাড়ে পাঁচ লাখ বা ছয় লাখ লোকের প্রায় এক চতুর্থাংশের জীবিকা ইহার উপরে নির্ভরশীল। কাজে কাজেই ভারত গভর্নমেণ্ট যখন

ধরনের একটা জবাব দিতে পারিলে আমি নিশ্চয়ই খুশী হইতে পারিতাম। কিন্তু সে রকম কোনো জবাব আমার আজও নাই, বা তখনও ছিল না।

আমার গোয়া যাওয়ার সংকল্প কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল নয়। ১৯৫৫ সালের মে মাসের গোড়ায় পুণা হইতে যখন আমার গোয়া যাওয়ার সংকল্পের কথা সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়, তাহার পূর্বে আমার বন্ধু-বান্ধব বা রাজনৈতিক সহকর্মীদের কাহারও সঙ্গে এই বিষয়ে কোন পরামর্শ বা আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ আমার হয় নাই। এমন কি গোয়া যাইব বলিয়া ঘোষণা করার ঘণ্টা দুই আগে পর্যন্ত আমি নিজেও কল্পনা করি নাই যে, আমাকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। নীতিগত-ভাবে দেশবাসী আর সকলের মতই আমিও গোয়া-মুক্তির সংগ্রাম ও গোয়ার ভারতভুক্তি দাবী যে সমর্থন করিতাম বা করি—সে কথা বোধহয় এখানে না বলিলেও চলিবে। কিন্তু তাহা হইলেও আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এই সময় পর্যন্ত গোয়া-মুক্তি আন্দোলনের কোন সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। এই সময় গোয়ার প্রশ্ন নিয়া সারা দেশময় জনসাধারণের মনে বেশ কিছুটা আলোড়ন ও উত্তেজনা থাকিলেও আন্দোলন তখনও পর্যন্ত, প্রধানত পশ্চিম ভারতে গোয়ার কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের বোম্বাই, পুণা, বেলগাঁও এই সব জায়গাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখনও বাংলাদেশে ইহার ঢেউ তত প্রবলভাবে আসিয়া লাগে নাই। সেইজন্যই গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার প্রশ্ন বা উপলক্ষও দেখা দেয় নাই। উপলক্ষ দেখা দিল, কিছুটা আচমকা ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে, এই সময় রাজনৈতিক কার্যসূত্রে আমার পুণা যাওয়ার ফলে।

১৯৫৫ সালের মে মাসের একেবারে গোড়ার দিকে, আমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু,

---

ভারত হইতে এইভাবে গোয়ায় টাকা পাঠানো বন্ধ করিয়া দিলেন, গোয়ার অধিবাসী জনসাধারণের ভিতর একটি বিরাট অংশ খুবই অসুবিধায় পড়িয়া যায়। পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টও এই ব্যাপারে খুব অসুবিধায় পড়েন। কারণ, এতগুলি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করিতে হইলে তাঁহারা যে খরচার দায়ে পড়িবেন, সেটা বড় কম নয়। অবশেষে মীমাংসার জন্য ব্যাপারটি পর্তুগীজ ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমে ধর্মগুরু পোপের কাছে পর্যন্ত যায়। আমরা যতদূর জানি, এই বিষয়ে একটা আপোষ-মীমাংসার অনুকূল রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরী করার জন্য ধর্মগুরু পোপ ও ক্যাথলিক চার্চের ইঙ্গিতে গোয়াতে আটক ভারতীয় বন্দীদের সকলকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব লিস্‌বনে পর্তুগীজ সরকারের সম্মুখে আসে এবং তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন। আমরা মুক্তিলাভ করিয়া গোয়া হইতে ভারতে আসার কয়েক মাসের ভিতরে ভারত হইতে গোয়াতে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে কড়াকড়ি শিথিল করিয়া দেওয়া হয়। গোয়া ও ভারতের মধ্যে লোকজন যাতায়াতের যেসব বিধি-নিষেধ এই পর্যন্ত বলবৎ ছিল তাহাও গত বৎসর তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। এখন ভারত হইতে কোন গোয়াবাসী যদি গোয়ায় যাইতে চান বা গোয়া হইতে ভারতে আসিতে চান, তাহার জন্য কোন অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় না। পর্তুগীজ সরকারের দিক হইতেও এইসব বিষয়ে আজকাল সেরূপ কড়াকড়ি করা হয় না; আর সেরূপ করার বিশেষ কোন গরজও তাঁহাদের নাই। বরং এই বিষয়ে বেশী বিধি-নিষেধ না থাকে, সেটাই তাঁহারা চান। পর্তুগীজ সরকার কর্তৃক গোয়াতে আটক ভারতীয় সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদান এই বিষয়ে ভারত ও পর্তুগীজ সরকারের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রথম ধাপ।

মহারাষ্ট্রের অন্যতম বামপন্থী নেতা শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ খাডিলকরের (খাডিলকর বর্তমানে বোম্বাই-আহমদনগর হইতে নির্বাচিত লোকসভা সদস্য) জরুরী আমন্ত্রণক্রমে তাঁহাদের দলের—অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের "পেজাণ্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির" ("ক্ষেতকারী কামগার পক্ষ") বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য নূতন দিল্লী হইতে পুণায় যাই। পুণায় গিয়া আরও কিছু রাজনৈতিক কাজ ও আলাপ-আলোচনার কাজ জুটিয়া যায়। খাডিলকর, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির মহারাষ্ট্রের নেতা নানাসাহেব গোরে প্রমুখেরা তখন পুণার সর্বদলীয় "গোয়া বিমোচন সহায়ক সমিতি"র প্রধান কর্মকর্তাদের মধ্যে। ইহার আগে অবশ্য খাডিলকরের ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া বা চলতি রাজনীতির সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় গোয়া আন্দোলনের কথা সময় সময় যে আসিয়া পড়ে নাই তাহা নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই; তাহার বেশী আর কিছু নয়।

আমার পুণায় রওনা হইবার অল্প কয়েক দিন আগে নূতন দিল্লীতে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে "All Parties' Parliamentary Committee on Goa" বা "সর্ব-দলীয় পার্লিয়ামেণ্টারী গোয়া কমিটি" নামে একটি কমিটি গড়িয়া ওঠে। তদানীন্তন লোকসভা সদস্য ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ এই কমিটির সম্পাদক হিসাবে পরে সম্মুখে আসিলেও, আসলে ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা, বন্ধুবর অশোক মেহতা। পুণার "গোয়া বিমোচন সমিতি"র কর্মকর্তাদের মধ্যে কেহ কেহ পার্লিয়ামেণ্টের ভিতরে গোয়ার প্রশ্ন নিয়া আন্দোলন করার জন্য এবং এই ব্যাপারে, প্রয়োজন হইলে, গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিবার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে আলাপ-

---

কিন্তু ইহার ফলে গোয়া সম্পর্কে উভয় গভর্নমেণ্টের ভিতর কোনওরূপ রাজনৈতিক আপোষ-মীমাংসার পথ উন্মুক্ত হয় নাই, কিংবা গোয়াতে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পান নাই। গোয়ার ভিতরে চারশতেরও বেশী রাজনৈতিক বন্দী আজও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য লম্বা মেয়াদের সাজা খাটিতেছেন। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেই সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় যাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন হিংসাত্মক কার্য-কলাপের অভিযোগ নাই। ভারতীয় সত্যাগ্রহী বন্দীদের ভিতরে অধিকাংশ—মোট ৩৫জন—এই সময় আমাদের সঙ্গে একসাথে মুক্তি পান। ইহা ছাড়া আরও ৬-৭জন ভারতীয় সত্যাগ্রহী বন্দী এখনও গোয়ায় আছেন যাঁহাদের পর্তুগীজ সরকার ভারতীয় নাগরিক বলিয়া স্বীকার করেন না; গোয়াবাসী পর্তুগীজ প্রজা বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। সত্যাগ্রহী মহিলা নেত্রী শ্রীমতী সুধাবাঈ যোশীকেও এই একই কারণে, আমাদের মুক্তির পরে দুই বছরেরও বেশী সময় গোয়াতে আটকাইয়া রাখা হয়। তাহার কারণ শ্রীমতী সুধাবাঈয়ের স্বামী শ্রীযুক্ত মহাদেও শাস্ত্রী যোশী ভারতীয় নাগরিক হইলেও, সুধাবাঈয়ের পিতামাতা গোয়ার অধিবাসী পর্তুগীজ প্রজা। পর্তুগীজ সরকার দাবী করেন যে, তাঁহাদের আইনমতে পর্তুগীজ এলাকায় সুধাবাঈ পর্তুগীজ প্রজা বলিয়াই গণ্য হইবেন। যাহাই হোক, ইজিপ্টের গভর্নমেণ্টের মধ্যস্থতায় দুই বৎসরব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫৯ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে পর্তুগীজ সরকার শেষ পর্যন্ত সুধাবাঈকে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার নামে কোন হিংসাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিযোগ ছিল না। হিংসাত্মক সশস্ত্র অপরাধের অভিযোগে প্রায় ৮-৯জন রাজনৈতিক বন্দী গোয়াতে বিভিন্ন জেলে মেয়াদ খাটিতেছেন।

আলোচনা চালানোর জন্য, এক কথায় গোয়ার সমস্যা সম্পর্কে পার্লিয়ামেণ্টের ভিতরে তদ্বির-তদারক যাহা কিছু দরকার, তাহা করার জন্য একটি Goa Lobby—অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টের লবীতে ও পার্লিয়ামেণ্টের ভিতরে গোয়ার প্রশ্নে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য যেসব সদস্য তৎপর থাকিবেন—গড়িয়া তোলার কথা অশোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। নূতন দিল্লীতে বিভিন্ন বামপন্থী দলভুক্ত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যগণ এবং পরে অনেক কংগ্রেস সদস্যও এই কমিটিতে যোগ দেন।

এই কমিটি গঠনের উদ্যোগ-পর্বে অশোক একদিন আমাকে জানান যে, আমার নাম কমিটিতে রাখা হইয়াছে—আমি তাহাতে অমত করি নাই। শ্রীযুক্তা কৃপালনী এই কমিটির সভানেত্রী বা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন; ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ সাধারণ সম্পাদক। পার্লিয়ামেণ্টের কংগ্রেস সদস্যদের অনেকেই এই কমিটিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও সরকারীভাবে কংগ্রেস হইতে অনুমতি না পাওয়ার জন্য তাঁহারা প্রথমটায় ইহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই। কয়েক দিন পরে অবশ্য কংগ্রেস সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে কমিটিতে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হয়। তখন হায়দরাবাদের কংগ্রেস নেতা স্বামী রামানন্দ তীর্থ, মহীশূরের শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, মহীশূরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী, বোম্বাইর ডাঃ ভি বি গান্ধী, ভূতপূর্ব শ্রম-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভি. ভি. গিরি (বর্তমানে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল) প্রমুখ কংগ্রেস দলের অনেক বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে কমিটিতে যোগদান করেন। বামপন্থীদের মধ্যে কম্যুনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালন, অশোক মেহতা, গুরুপদ স্বামী, হীরেন মুখার্জি, শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ, শোলাপুরের অধ্যক্ষ খার্ডেকর; স্বতন্ত্রদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক এণ্টনী, ডাঃ কৃষ্ণস্বামী মুদালিয়র প্রভৃতি গোড়া হইতেই ইহার ভিতরে ছিলেন। আমার নিজের দিক দিয়া কমিটিতে আমার থাকার ব্যাপারটাকে তেমন কিছু গুরুত্ব তখনও দিই নাই। গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে এই কমিটির কোনই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। আমি কমিটি পাকাপাকিভাবে গঠিত হওয়ার আগেই, কমিটিতে থাকার ব্যাপারে সম্মতি দিয়া আমার নিজের কাজে পুণায় চলিয়া যাই।

পুণায় তখন গোয়া বিমোচন সমিতির অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে ভারত হইতে গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামে সক্রিয় ও কার্যকরীভাবে কি সাহায্য করা যায়—বিশেষ করিয়া গোয়ার ভিতরকার আন্দোলনকে সীমান্তের এদিক হইতে সাহায্য পাঠাইয়া কিভাবে আরও তীব্র করিয়া তোলা যায়—সেই কথা আলোচিত হইতেছিল; এবং সেই প্রসঙ্গেই ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহ করার জন্য ভারতীয় সত্যাগ্রহী দল পাঠানো যায় কিনা এবং পাঠানো যুক্তিযুক্ত কিনা সেই কথাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে "বিমোচন সমিতি"র নেতাদের সম্মুখে ছিল।

গোয়ার ভিতরে গিয়া সেখানকার মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য ভারত হইতে সত্যাগ্রহী দল পাঠানোর প্রস্তাব ১৯৫৪ সালে যখন প্রথম ওঠে, ভারত গভর্নমেণ্ট তখন কোন ভারতীয় নাগরিককে বে-আইনীভাবে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়ায় সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দেন নাই। ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম যে সত্যাগ্রহী দল এদেশ হইতে গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করে তাহারা সকলেই গোয়াবাসী বা বোম্বাই প্রবাসী গোয়ানীজ। পণ্ডিত নেহরুর তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট অভিমত ছিল, গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম প্রধানত গোয়াবাসীদের সংগ্রাম। সুতরাং ভারত প্রবাসী গোয়াবাসীরা যদি সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া সত্যাগ্রহ করার জন্য গোয়ার ভিতরে যায়, ভারত সরকার তাহাদের

বাধা দিবেন না। কিন্তু কোন ভারতীয় নাগরিককে তাঁহারা এইভাবে গোয়ায় যাওয়ার অনুমতি দিবেন না। যাইতে চাহিলে পুলিস ও সীমান্তরক্ষীরা তাহাকে বাধা দিবে ইহাই তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল।

অবশ্য গোয়ার ভিতরে যে সমস্ত ভারতীয়েরা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ গোয়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে বা অন্যভাবে গোয়াবাসীদের রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত হন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, পর্তুগীজ পুলিস তাঁহাদের মারধোর করিয়া কিংবা অল্প কিছু দিনের জন্য জেলের ভিতরে কয়েদ করিয়া রাখিত; পরে ভারত হইতে কিছুটা হৈ-চৈ হইলেই গোয়া হইতে তাঁহাদের বাহির করিয়া দিত।

১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী বোম্বাই হইতে একদল দুঃসাহসী তরুণ ভারতীয় সত্যাগ্রহী, ভারতীয় পুলিস ও সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া 'স্বাধীনতা দিবসে' গোয়ায় পতাকা সত্যাগ্রহ করার জন্য গোপনে গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করে। পুণাতে তখনও "সর্ব-দলীয় গোয়া বিমোচন সহায়ক সমিতি" গড়িয়া ওঠে নাই। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের বেলগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় অফিস হইতে তখন সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হইতেছিল। যতদূর জানি, গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই সত্যাগ্রহী দলকে পাঠানো হয় নাই। গোয়ায় ঢোকার পর ইহারা সকলেই পর্তুগীজ মিলিটারী ও সীমান্ত-রক্ষীদের হাতে গ্রেপ্তার হয় এবং হাজতে পোরার আগে পরে যথারীতি মারধোর করিয়া সকলকেই মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়। এই সত্যাগ্রহীদের প্রত্যেকের—কাহারও নয় বছর,, কাহারও দশ বছর করিয়া সাজা হয়।

দুঃখের বিষয়, গোয়ার ভিতরে ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের অফিস হইতে মামুলি খোঁজ-খবর নেওয়া ছাড়া এই সত্যাগ্রহীদের বন্দিশালায় ইহাদের কোনরূপ সাহায্য করার জন্য বা ইহাদের বন্দি-জীবনকে একটুখানি সুসহ করার জন্য কেহই মাথা ঘামায় নাই। যাঁহারা ইহাদের পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাও আর ইহাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই সত্যাগ্রহীদের সকলেই বয়সে তরুণ এবং নাম-করা কোন রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা ইহাদের পরিচালনা করিয়া আনেন নাই, কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের ছেলেরা এই দলে ছিল—তাহার মধ্যে একটি তেলেগু ক্রিশ্চিয়ান ও একটি মালয়ালী ক্রিশ্চিয়ান ছেলেও কি করিয়া যেন এই দলে জুটিয়া যায়। একটি বাঙ্গালী ছেলে, শ্রীমান শক্তিপদ নন্দীও এই দলের সঙ্গে আসিয়াছিল। মিলিটারী ট্রাইব্যু-নালের বিচারে ইহাদের সাজা হওয়ার প্রায় এক বছর পরে, আমরা যখন আগুয়াদা দুর্গের বন্দি-নিবাসে আসি ইহাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় (অবশ্য দূর হইতে; কারণ আগুয়াদা দুর্গের মিলিটারী আইন অনুযায়ী এক সেল বা কুঠুরী হইতে অন্য সেলের লোকদের সঙ্গে কথা বলা বা মেলামেশা করার কোন হুকুম ছিল না)। কিন্তু এই অখ্যাত ও নাম-না-জানা তরুণ স্বেচ্ছা-সৈনিকের দল গোয়ায় বিদেশীদের জেলে, সম্পূর্ণ বিদেশী পরিবেশে, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় থাকিয়াও যে কোন সময় মাথা নোয়ায় নাই, অকুতোভয়, সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে দেশের ও জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সমানে লড়াই করিয়া গিয়াছে—সেকথা এখানে উল্লেখ না করিয়া গেলে মোটেই সঙ্গত হইবে না। ইহাদেরই মতন নিতান্ত সাধারণ ভারতীয় ও গোয়াবাসী ছেলেদের সুস্থ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের নিদর্শনে এবং জাতীয় আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে নিঃশেষে আত্ম-

বলিদান দেওয়ার ক্ষমতার পরিচয়ের ভিতর দিয়া গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে।

১৯৫৫ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, এই একটি সত্যাগ্রহী দলের কথা বাদ দিলে (উপরেই বলা হইয়াছে, ইহারা ভারত সরকারের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া গোয়ায় প্রবেশ করে), অন্য কোন ভারতীয় সত্যাগ্রহী দল ভারত হইতে গোয়ায় যায় নাই। ভারত গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন তাহা মোটামুটি রকম বলবৎ ছিল। ফলে ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় সত্যাগ্রহী দল পাঠাইয়া গোয়ার ভিতরে ব্যাপক আকারে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার কোন প্রচেষ্টা সে সময় পর্যন্ত হয় নাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের মধ্যে কোনই আন্দোলন ছিল না। ১৯৪৫—৪৬ সাল হইতে গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন দেখা দেয় এবং কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। পুলিসের অত্যাচারও ক্রমে ক্রমে সকল সীমা ছাড়াইয়া যাইতে আরম্ভ করে।*

১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে গোয়া-মুক্তি-সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় বা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গোয়ার সুবিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা ও প্রসিদ্ধ সার্জন ডাঃ পুণ্ডলিক গাইটোণ্ডে গ্রেপ্তার হন। এই সময় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পুরাতন ঔপনিবেশিক আইনের (Lei Coloniale বা Colonial Act, 1933) নামমাত্র অদলবদল করিয়া পর্তুগীজ ভারতকে খাস পর্তুগালেরই আচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে "পতুগালের সমুদ্রপারের প্রদেশ" (Provincia Ultramar) বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার জন্য পর্তুগীজ সরকার ও ডাঃ সালাজারকে ধন্যবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে গোয়ার রাজধানী পাঞ্জিমে† একটি সরকারী ভোজসভার আয়োজন হয়। সেখানে ডাঃ গাইটোণ্ডেও আমন্ত্রিতদের

---

* দুঃখের বিষয় গোয়ার ভিতরকার রাজনৈতিক আন্দোলনের বা গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের সংগে এদেশে আমরা তত বেশী পরিচিত নই। সে সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা এই স্মৃতিকাহিনীতে প্রসংগত আসিয়া পড়িবে। তবু এখানে উল্লেখ করিয়া যাওয়া দরকার মনে করিতেছি যে যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯৪৫—৪৬ সালে গোয়াতে যে মুক্তি-আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহা গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নবতম অধ্যায় সংযোজন করিয়াছে মাত্র। গোয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৭৮৭ সালে। তখন হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত শতাব্দী কালেরও বেশী সময় ধরিয়া গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে প্রতি দশ বৎসরে একবার করিয়া সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হইয়াছে। গোয়াতে শেষ সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয় ১৯১৩ সলে। ইহা 'রাণেদের বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। গোয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজপুতবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা 'রাণে' বা 'রাণা' নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া দমননীতির যে তাণ্ডব ও বিভীষিকা চলে তাহার ফলে বহুদিন গোয়াতে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন প্রকাশ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। ১৯২৭—২৮ সালে সালাজার ক্ষমতায় আসার পর সে সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে।

† Panjim, কোংকনী ভাষায় 'পঞ্জী'। ইহার অপর নাম Nova Goa বা নূতন গোয়া। আলবুকার্কের স্থাপিত Old Goa বা Velha Goa পাঞ্জিম হইতে ৭।৮ মাইল দূরে। পুরনো গোয়া শহর এখন জনশূন্য বলিলেও চলে।

মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার অপরাধ, যখন ভোজসভায় প্রধান বক্তা ডাঃ সালাজারের উদ্দেশ্যে 'টোস্‌ট' প্রপোজ্‌ করিয়া সরকারী ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব তোলেন, তিনি উঠিয়া খালি বলেন, 'protesto' ('আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি')। আর যায় কোথায়? এই প্রতিবাদ জানানোর অপরাধে তাঁহাকে সেইখানেই গ্রেপ্তার করিয়া কয় দিনের ভিতর জাহাজে করিয়া বিচারের জন্য সোজা লিসবনে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ডাঃ গাইটোণ্ডের এই গ্রেপ্তার ও লিসবন নির্বাসন সমগ্র গোয়ার লোকেদের মনে একটা চাপা উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইহার ফলে খুব প্রকাশ্যভাবে না হইলেও গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য জাতীয় সংগঠন গড়িয়া তোলার কাজে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মনে একটা নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন বা সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন গণ-সংগঠন গড়িয়া তোলার সুযোগ-সুবিধা গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনে কোনোদিনই ছিল না। গোয়ার ভিতরে এই সময় জাতীয় সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছিল প্রধানত গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও পরিচালনায়। কিন্তু সংগঠনের বা প্রচারের যা কিছু কাজ, তাহা চলিতেছিল 'underground' গুপ্ত সমিতির কায়দায়। কারণ তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, ইহার সঙ্গে গোয়েন্দা পুলিসের তৎপরতা, খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, পুলিসের মারধোর বা গ্রামে গ্রামে পুলিসের হামলা—এসবের হিড়িকও ক্রমশ বাড়িতে থাকে। চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া জনসাধারণের ভিতর রাজদ্রোহমূলক চিন্তা বা সংগঠন বিনাবাধায় ছড়াইয়া যাইতে দিবে, সালাজারের পুলিস তেমন নয়। কিন্তু তাহা হইলেও ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগস্টের টেরেখোল সত্যাগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত পর্তুগীজ পুলিস একেবারে পুরাপুরি স্বমূর্তি ধারণ করে নাই। দাদ্‌রা ও নগর হাভেলীর বিদ্রোহের পর (১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে, ২১শে—২২শে জুলাই নাগাদ) এবং বিশেষ করিয়া টেরেখোলের পর, আতঙ্কগ্রস্ত পর্তুগীজ পুলিস ও সামরিক কর্তৃপক্ষ সালাজার ডিক্টেটরশিপের নগ্ন বিভীষিকার মূর্তি লইয়া গোয়ার মাটি হইতে জাতীয় আন্দোলনকে উৎখাত করার শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

টেরেখোল দুর্গের সত্যাগ্রহী দল গোয়ার ভিতর হইতে আসে নাই, আসিয়াছিল ভারত হইতে। কিন্তু এই সত্যাগ্রহী দলে গোয়াবাসী ছাড়া ভারতীয় কেহ ছিল না। গোয়ার ভিতর হইতেও যাঁহারা আসেন তাঁহারাও গোয়া হইতে গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিয়া এই দলে যোগ দেন। গোয়ার জনপ্রিয় তরুণ নেতা এণ্টনী ডি'সুজা—বোম্বাই এবং গোয়াতে গোয়ার রাজনৈতিক কর্মীদের ভিতর 'টোনী' নামে পরিচিত—এই দলের নেতৃত্ব করেন। সত্যাগ্রহীরা সীমান্তবর্তী টেরেখোল নদী পার হইয়া টেরেখোল দুর্গে প্রবেশ করার বহু আগেই, দূর হইতে পাহাড়ের নীচে ভারতের জাতীয় পতাকা কাঁধে করিয়া সত্যাগ্রহী দলকে আসিতে দেখিয়া পর্তুগীজ শান্ত্রী দল তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া একটি স্টীমলঞ্চে করিয়া নদী পার হইয়া পালাইয়া যায়। সত্যাগ্রহীরা যে নিরস্ত্র আসিয়াছে; বিনা অস্ত্রশস্ত্রেই পর্তুগীজদের রাজ্য জয় করিতে লোক পাঠাইয়াছে, সে কথা তাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। পরের দিন, সত্যাগ্রহীরা সত্য সত্যই খালি হাতেই আসিয়াছে, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসে নাই—গোয়েন্দারা সে খবর দিলে পর, গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের সেই সময়কার সর্বময় কর্তা ইন্সপেক্টর কাসিমির মন্তেইরোর নেতৃত্বে, যে স্টীমলঞ্চে করিয়া টেরেখোলের শান্ত্রীরা পালাইয়াছিল, সেই লঞ্চ বোঝাই করিয়া

সৈন্যদল আসিয়া ফের টেরেখোল দুর্গ দখল করে এবং সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করিয়া পঞ্জিমে লইয়া যায়।* ইহার আগে দাদ্রা এবং নগর হাভেলীতেও এই রকম হয়। সেখানেও আজাদ গোমন্তক দলের ভলাণ্টিয়ারদের আসিতে দেখিয়া পুলিস ও সৈন্যদল, পুলিসের বড়কর্তা এবং খোদ পর্তুগীজ এডমিনিস্ট্রেটর সাহেব সস্ত্রীক (সস্ত্রীক বলিলে একটু ভুল হইবে। এই ভদ্রলোক হাঙ্গামা কিছু একটা বাধিতে পারে, আগের দিন তাহা আন্দাজ করিয়া স্ত্রীকে নগর হাভেলীর রাজধানী সেল্‌ভাসা সহরে ফেলিয়া রাখিয়া সেখান হইতে জঙ্গলপথে পালাইয়া যান। তবে স্ত্রীকে নিজের এক পার্শী বন্ধুর জিম্মায় রাখিয়া পরের দিন তাঁহাকে বোম্বাই পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন) টেরেখোলের মতই "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতির অনুসরণে বোম্বাই চলিয়া যান। ভারত গভর্নমেণ্ট সেখান হইতে তাঁহাদের দুজনকে গোয়ায় পাঠাইয়া দেন।

যাই হোক, টেরেখোল সত্যাগ্রহের পরে, গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভীষণ আতঙ্ক-গ্রস্ত হইয়া সারা গোয়াময় রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোকেদের গ্রেপ্তার করিতে এবং বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করিতে আরম্ভ করিয়া দেন।

এই ঘটনার পরেই পর্তুগাল হইতে দলে দলে গোয়া সৈন্য, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা হইতে নিগ্রো সৈন্য, গোয়ায় আনিয়া গোয়াকে একটি সশস্ত্র ও সাঁজোয়া মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত করার চেষ্টা শুরু হইয়া যায়। পঞ্জিমের উপকণ্ঠে বোম্বালিম নামে একটি জায়গায় বড় করিয়া এরোড্রোম তৈয়ার করার তোড়জোড় শুরু হয়। অপর দিকে গোয়ার ভিতরে শুরু হইয়া যায় গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা ইন্সপেক্টর মন্তেইরো এবং লিসবন হইতে আগত সালাজারের স্পেশ্যাল পুলিস Pide-র (Policia International da Defesa do Estado সংক্ষেপে P.I.D.E. বা 'পিদে') ইন্সপেক্টর অলিভেইরা-র অবাধ পিটুনীর রাজত্ব বা সোজা Club rule, ডাণ্ডার রাজত্ব। গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের পক্ষে বোঝা বা ধারণা করা মুশকিল হইবে, গোয়ার ভিতরে ইহার ফলে কি অবস্থা দাঁড়ায়। বিশেষ করিয়া, বৃটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির খুব খারাপ দিনেও ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার যেটুকু আইনগত স্বীকৃতি ছিল, তাহার সিকিভাগের একভাগও যে গোয়ায় কোনোদিন ছিল না, বা সালাজারের রাজত্বে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কোথাও যে তাহা থাকিতে দেওয়া হয় না—যাঁহারা ইহা কল্পনা করিতে পারেন না, তাঁহারা পর্তুগীজ দমননীতির তাণ্ডব রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

টেরেখোল ঘটনার পর হইতে শুরু করিয়া ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, গোয়ার ভিতরকার পুলিসের অত্যাচার আমার জানামতে, ১৯৩২ সালের পর বাংলা দেশের এণ্ডারসনী রাজত্বের বিভীষিকাকে, বা যুদ্ধের সময়ে ১৯৪২ সালের আগস্ট

---

* পরে মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারে টোনী ডিসুজা'র ২৮ বছর সাজা এবং অন্যান্যদের কাহারও ১৮, কাহারও ১৬ কি ১৪ বছর এইভাবে সাজা দেওয়া হয়। এই দলে ১৪ বছরের নীচে কাহাকেও সাজা দেওয়া হয় নাই। পর্তুগীজ আইনে ২৮ বছরের বেশী মেয়াদ কাহাকেও দেওয়ার নিয়ম নাই। এখানে ইহাও উল্লেখ করা দরকার, পর্তুগালে প্রাণদণ্ড-প্রথা নাই। যত অপরাধই কেহ করুক না কেন তাহার জন্য ফাঁসী দেওয়ার গুলী করিয়া মারার নিয়ম নাই। কিন্তু পুলিস যদি বিনা সাজায় হাজতে কোন রাজনৈতিক বন্দীকে পিটাইয়া মারে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

আন্দোলনের পরিবেশে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে দমননীতির তাণ্ডব চলিয়াছিল, তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তবু ইংরেজ শাসকদের দমননীতির সমর্থনে হয়ত এটুকু বলা যায় যে, বাংলা দেশে ১৯৩২—৩৪ সালে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবেশে, সন্ত্রাসবাদী বা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, ডাকাতি, টাকা লুঠ, হত্যাকাণ্ড, এইসবও চলিতেছিল। যুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন তো ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের আকার লইয়া দেখা দেয়। ভারতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে তখন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু গোয়াতে ১৯৫৫ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন যতটুকু চলিতেছিল, তাহা কোন সময়েই নিরুপদ্রব অহিংস সত্যাগ্রহের সীমারেখা ছাড়াইয়া কোন হিংস্র রূপ লয় নাই। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধবিগ্রহের কোন কথাই তখন ছিল না। গোয়ায় একচ্ছত্র পুলিসী রাজত্বের দাপটে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সংগঠন সব সময় প্রকাশ্য ভাবে চলিতে পারে নাই সত্য। কিন্তু ১৯৫৫ সালের জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ যতটুকু হইয়াছে, তাহা নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল করা, কোথাও-বা দাবী জানানোর জন্য প্রকাশ্য সভা করার চেষ্টা, গোপন প্রচারপত্র বিলি করা, কোথাও কোনো সরকারী দপ্তরের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা— এই সব ধরনের কাজের ভিতর দিয়া ছাড়া অন্যভাবে দেখা দেয় নাই। পর্তুগীজ পুলিসের দমননীতির হিংস্র প্রচণ্ডতা ক্রমে গোয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনকে পাল্টা সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ খুঁজিতে বাধ্য করে।

গোয়ার ভিতরকার সর্বশেষ প্রকাশ্য সত্যাগ্রহের প্রচেষ্টা হয় ১৯৫৫ সালের ৬ই এপ্রিল। সেদিন মাপ্‌সা শহরে (Mapuca—গোয়ার মধ্যে মাড়গাঁও ও পাঞ্জিমের পর সবচেয়ে বড় শহর) শ্রীযুক্তা সুধাবাঈ যোশীর সভানেতৃত্বে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন করার চেষ্টা হয়। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কলিকাতায় পুলিসের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া এসপ্লানেড ট্রামওয়ে জংশনের পুরাতন যাত্রী-শেডের কাছে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন করার চেষ্টা কিভাবে হয়, সেই দৃশ্য যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা মাপ্‌সার সেইদিনকার ঘটনার কথা মনে মনে কিছুটা কল্পনা করিতে পারিবেন। তবে মাপ্‌সা কলিকাতা নয়। ছোট্ট একটুখানি শহর ও গ্রামের সংযোগস্থল; সাত-আট হাজারের বেশি লোক সেখানে থাকে না। বাংলা দেশে যে কোনো মহকুমা কেন্দ্রের অর্ধেক সাইজের জায়গা। পুলিসের থানাই সেখানে সবচেয়ে বড় ইমারত; সবচেয়ে বেশি জায়গা লইয়া ঘেরা জায়গায় থানার বাড়ি। কিছু দোকান-পাট, বাজার; দু-একটি সরকারী অফিস, আদালত, হোটেল, চা-কফির দোকান, একটি হাসপাতাল, বড় বড় কয়েকটি গির্জার বাড়ি বা ক্যাথিড্রাল আর অল্প কয়েকটি নাতিপরিসর পিচের রাস্তা—এই লইয়া মাপ্‌সা শহর। সেই শহরে, কল্পনা করুন, পুলিসের ট্রাক, ল্যাণ্ডরোভার ও জীপের সমারোহ, কল্পনা করুন ৬০০—৭০০ সশস্ত্র পুলিস ও মিলিটারী সৈন্য রিভলবার, বন্দুক, স্টেনগান, রাইফেল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। মিটিংয়ের জায়গা মিলিটারীতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তবে অবস্থাটা খানিক আন্দাজ করা যাইবে।

বলা বাহুল্য, সুধা বাঈ ও স্বেচ্ছাসেবকেরা সভায় হাজির হওয়ায় নির্বিচারে তাঁহাদের উপর রবার trucheon-এর বাড়ি পড়িতে থাকে। সঙ্গীন উঁচানো রাইফেল এবং স্টেনগান হাতে করিয়া পুলিস ও মিলিটারী দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের ঘেরাও করিয়া

ফেলে। সুধাবাঈ তাঁহার লিখিত সভানেত্রীর ভাষণ কয়েক লাইনের বেশি আর পড়িতে পারিলেন না, পড়িতে দেওয়া হইল না। একজন তাঁহার হাত হইতে 'লিখিত' অভিভাষণের কাগজ কাড়িয়া নিল। পুলিস ও মিলিটারীর সমারোহ অনেক দূরে জনসাধারণ দাঁড়াইয়া কিছুটা ভয়ে ও আতঙ্কে, আর কিছুটা কৌতূহলে তাকাইয়া দেখিতেছে কি হয়। সভার জায়গায় মিলিটারী, সশস্ত্র পুলিস, সাদা কাপড়-পরা গোয়েন্দার দল ভিড় করিয়া আছে। এই হইল গোয়ার ভিতরকার প্রত্যেকটি সত্যাগ্রহের ঘটনার সাধারণ অভিজ্ঞতা। ৬ই এপ্রিল মাপ্সা ছাড়া মাড়গাঁও, কানাকোন্, পঞ্জিম প্রভৃতি আরও কয়েকটি জায়গায় সত্যাগ্রহীদের মিছিল, পতাকা সত্যাগ্রহ ও এই ধরনের 'ডিমনস্ট্রেশন' বা রাজনৈতিক 'প্রদর্শন' সংগঠন করার চেষ্টা হয়। কোথাও মাপ্সার চেয়ে ভিন্নরূপ অভিজ্ঞতার কথা শুনি নাই। কিন্তু এই এক দিনকার সত্যাগ্রহ উপলক্ষে আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী সত্যাগ্রহী হিসাবে প্রায় শতাধিক এবং তাহাদের সাহায্যকারী ও সমর্থক হিসাবে আরও তিন-চারশ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস হাজতে আনা হয়।

একথা সহজেই বোঝা যায়, এই রকম অবস্থার মধ্যে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জোর গোয়ার ভিতরে কেন ক্রমশ কমিয়া আসিতে থাকে। টেরেখোল সত্যাগ্রহের পরেই সারা গোয়ায় যে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়া যায়, তাহার ফলে গোয়ার ভিতরে যাঁহারা আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্ব করিতে পারিতেন, এরূপ বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোক সকলেই ধরা পড়িয়া যান। গোয়ার জাতীয় আন্দোলনের নেতা ও দায়িত্বশীল কর্মীদের মধ্যে তখন প্রায় শতাধিক লোকের নয়-দশ বছর হইতে পনর-ষোল বছর করিয়া মেয়াদ হইয়া গিয়াছে। পর্তুগীজ আর্কবিশপ সম্মুখে আসিয়া গোয়ানীজ ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের শাসাইতেছেন, যাহাতে কেহ কার্ডিনাল গ্রাসিয়াসের* প্রভাবে হঠাৎ ভারতীয় জাতীয় মনোভাব সম্পন্ন হইয়া না ওঠে (গোয়াতে গোয়ানীজ ধর্মযাজকদের সঙ্গে সাদা চামড়ার পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের বিরোধ বহু দিনের। ১৮৮৭ সালের ধর্মযাজকদের রাষ্ট্রদ্রোহ Priest's revolution বা Pinto's revolution-এর সময় হইতে গোয়ার গোয়ানীজ পুরোহিত ধর্মযাজকদের মধ্যে পর্তুগীজ-বিরোধী জাতীয় ঐতিহ্যের একটি ধারা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে)। এইভাবে চারিদিক হইতে যেখানে আন্দোলনকে চাপিয়া মারার চেষ্টা হইতেছিল, সেখানে খালি কর্মীদের মনের ভিতর হইতে রসদ সংগ্রহ করিয়া অহিংস সত্যাগ্রহের নিরস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন যে বেশীদিন চলিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।

আমি মে মাসে পুণায় গিয়া পৌঁছানোর অনেক আগে হইতে, গোয়া বিমোচন সমিতি ও গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের যে সব নেতা সেখানে ছিলেন তাঁহাদের ভিতর এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল। ভারতবর্ষ হইতে গোয়ার ভিতরে আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালু

---

* কার্ডিনাল গ্রাসিয়াস রোমান ক্যাথলিক জগতে প্রথম ভারতীয় কার্ডিনাল। এই কার্ডিনালেরাই রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের নির্বাচকমণ্ডলী। কোন পোপের মৃত্যু হইলে কার্ডিনালেরা তাঁহার জায়গায় নিজেদের ভিতর হইতে কাহাকেও নূতন করিয়া পোপ হিসাবে নির্বাচিত করেন। কার্ডিনাল গ্রাসিয়াস ভারতীয় হইলেও গোয়াবাসী পরিবারে তাঁহার জন্ম। গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কথা সকলেই জানে। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রভাবকে সুনজরে দেখেন না।

রাখার জন্য কিছু করা যায় কি না, ভারতবর্ষ হইতে গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহী দল পাঠাইতে আরম্ভ করিলে গোয়ার ভিতরকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করা যাইবে কি না, ভারত সরকার ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের সীমান্ত লঙ্ঘন করিতে অনুমতি দিবেন কিনা, না দিলে কি করা যাইবে—এই সমস্ত প্রশ্ন আন্দোলনের পরিচালকদের সম্মুখে বড় হইয়া দাঁড়ায়। দেশের জনসাধারণের ভিতরে এবং গোয়া "বিমোচন সহায়ক সমিতির" মাধ্যমে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এইদেশে গোয়া-মুক্তি-সংগ্রামে সাহায্যের জন্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছিলেন ("গোয়া বিমোচন সহায়ক সমিতির" মধ্যে কংগ্রেস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন; কংগ্রেসেরও অনেকে ইহার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত ছিলেন। বিমোচন সমিতির সভাপতি ছিলেন কেশবরাও জেধে, পুণা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা) তাঁহাদের মনে তো বটেই, ভারত গভর্নমেণ্টের আপাত নিষ্ক্রিয় গোয়ানীতির বিরুদ্ধে সারা দেশময় একটা চাপা অসন্তোষ ও সমালোচনার ভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে থাকে। আন্দোলনের পরিচালকেরা দাবী করিতে থাকেন—ভারত গভর্নমেণ্ট যদি পর্তুগীজ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে পারেন, তাহা হইলে গোয়া সীমান্ত অতিক্রম করা সম্পর্কে তাঁহারা যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া রাখিয়াছেন অন্তত সেটা প্রত্যাহার করিয়া নিন ও সীমান্ত খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন; তাহা হইলে দেশবাসী জনসাধারণ পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে গোয়াবাসীদের সাহায্যের জন্য নিজেদের উদ্যোগে এবং নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিছু করিতে পারে কি না সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিবে।

অবশ্য এই ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে ভাবপ্রবণতার অংশ কতটুকু ছিল এবং বাস্তব ও ব্যবহারিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার অংশই বা কতটুকু ছিল তাহা বলা শক্ত। ভাবপ্রবণতার অংশ যে কিছুটা বেশি ছিল তাহার প্রধান কারণ, এই সময় মাপ্সার ৬ই এপ্রিলের সত্যাগ্রহের কথা, এবং সুধাবাঈ যোশী ও তাঁহার সঙ্গে যে সব স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা ছিলেন তাহাদের উপর পুলিস এবং মিলিটারীর লোকেরা যে মারধোর ও অত্যাচার করে তাহার কথা, এই সময় এই দেশে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। নিছক গায়ের জোরে অত্যাচার করিয়া পর্তুগীজ সরকার ভারতের মাটিতে গোয়ার মত জায়গায় সেখানকার জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবীকে দাবাইয়া দিবে, আর স্বাধীন ভারতবর্ষের ৩৮ কোটি লোক অসহায়ভাবে চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখিবে, কোন কিছুই করিতে পারিবে না, এই বেদনাবোধ ক্রমশ সাধারণ লোকের মনে তীব্র হইয়া ওঠে। ইহার ফলে দেশের জনসাধারণ এবং গোয়া-মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের মনে সক্রিয়ভাবে গোয়াবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য একটা অস্থিরতা দেখা দেয়।

গোয়ার প্রশ্নে বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রবাসী জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল সবচেয়ে বেশি, তাহার কারণ, গোয়া মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকূলের একটি অংশ। ভৌগোলিক দিক দিয়া যেমন, ভাষায়, আচার-ব্যবহারে, বেশভূষায়, খাওয়া-দাওয়ার দৈনন্দিন অভ্যাসে, সংস্কৃতিতেও তেমনি গোয়া মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রত্যন্ত দেশ। সাড়ে চারশ বছর ধরিয়া গোয়া পর্তুগীজদের অধীনে থাকিলেও মহারাষ্ট্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গোয়ার সম্পর্ক নানান দিক দিয়াই ঘনিষ্ঠ। গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতি একাত্মতাবোধ তাহাদের যদি বেশি থাকে তাহা দোষের কথা নয়। গোয়াতে

রাজনৈতিক বন্দী ও সত্যাগ্রহীদের উপর যে অত্যাচার হইতেছিল তাহা তাহাদের মনকে অন্যের চেয়ে বেশি করিয়া উদ্বেলিত করে। সাধারণভাবে সমগ্র দেশেও পর্তুগীজদের বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে এবং এক এক করিয়া সকল রাজনৈতিক দলের মারাঠি কর্মীদের মনে ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহ করার বা অন্যভাবে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়িবার একটা সংকল্প দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে।

এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ তৎপর হন অন্য সকলের আগে। বোম্বাই-এ গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান নেতা ও সংগঠক পিটার আলভারিস্ বহুদিন হইতে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ও পরে প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন (বিগত নির্বাচনে বোম্বাইয়ে তিনি শ্রীযুক্ত ভি. কে. কৃষ্ণমেননের বিরুদ্ধে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন)। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কিছু সংগঠক, বিশেষ করিয়া মহিলা কর্মী ও সংগঠক শ্রীমতী সিন্ধু দেশপাণ্ডে, পর্তুগীজ পুলিসের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়া গোয়ার ভিতরে গিয়া বহুদিন গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংগঠনের কাজ পরিচালনা করেন। "গোয়া বিমোচন সহায়ক সমিতি"র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ গণেশ গোরে। 'নানাসাহেব' নামে, গোরে গোয়ার ভিতরে ও বাহিরে বিশেষ সুপরিচিত। তিনি নিজেও কোংকন অঞ্চলের লোক; বোম্বাইয়ের রত্নাগিরি জেলায় তাঁর বাড়ি। এই সব কারণে তাঁহারা গোড়া হইতেই গোয়া-মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ভারত গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া গোয়ায় সত্যাগ্রহী দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য গোরে নিজেই যে সেই প্রথম সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব লইয়া গোয়ায় প্রবেশ করিবেন তাহা আর কিছুদিন বাদে ঘোষিত হয়।

আমি পুণায় পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে খবর পাই খাডিলকরের "পেজাণ্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি"ও ঐ একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে—তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আত্মারাম পাতিল সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব করিবেন। এইভাবে একের পর এক কম্যুনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ—অর্থাৎ বিমোচন সমিতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দল গোয়ায় সত্যাগ্রহী দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর এইসব সিদ্ধান্তের দরুন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার নিজের দিক দিয়া গোয়ায় যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। উপরে এও বলিয়াছি যে, খাডিলকরের দলের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষেই আমি এ সময় পুণায় যাই। সেই সম্মেলন শেষ হইয়া যাওয়ার পরে ২রা মে সকলে বসিয়া খডিলকরের পুণার বাড়িতে বসার ঘরে আড্ডা দিতেছিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়িতে আমরা নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়া চলিয়া যাইব। এমন সময় কথায় কথায় এদেশ হইতে গোয়ায় সত্যাগ্রহী দল পাঠানোর প্রসঙ্গ কে যেন তুলিয়া দিলেন।

বামপন্থীদের এই ধরনের আলোচনা সভায় যেমন হয়, কিছু কংগ্রেসের সমালোচনা, কিছু পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নেহরু গভর্নমেণ্টের জোরালো নীতি অবলম্বন করা সম্পর্কে কল্পিত অনিচ্ছার সমালোচনা, এবং সেই সমালোচনার ততোধিক কল্পনাশ্রয়ী ব্যাখ্যা—এইসবে যখন আমরা মশগুল, তখন বোধ হয় খাডিলকর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তো পার্লিয়ামেণ্টের 'সর্বদলীয় গোয়া কমিটি'র ভিতরে আছ; তোমাদের কমিটি এই বিষয়ে

কি চিন্তা করিতেছে?" আমার যে কোন কারণেই হোক, এই পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির কার্যকারিতার উপর তত আস্থা ছিল না। আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—"কমিটি আর কি করিবে? কমিটি তো আর সত্যাগ্রহ করিতে যাইবে না।" একজন বলিলেন—"কেন যাইবে না? যদি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের দিকে আকর্ষণ করিতে হয়, তাহা হইলে জনকয়েক পার্লিয়ামেণ্ট সদস্যের গোয়াতে সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়া উচিত।" অপর একজন বলিলেন, "আমরা ত্রিদিববাবুকে পাঠাইলে পারি।" আমি উত্তর দিলাম, "মন্দ কি?" হঠাৎ এই সময় কিছুটা গম্ভীর হইয়া একজন প্রশ্ন করিলেন—

"If anybody from Bengal comes, it will give the movement a tremendous fillip. Will you be really prepared to go?"

"যদি বাঙলাদেশ হইতে কেউ যায়, আন্দোলনের উদ্দীপনা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু আপনি সত্যসত্যই শেষ পর্যন্ত যাইতে রাজী থাকিবেন কি?"

এই কথার উত্তর দেওয়ার আগে হয়তো আমার একবার কিছুক্ষণের জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে উচিত কাজটা কেন জানি না করা হয় নাই। এক মুহূর্তও না ভাবিয়া মুখ হইতে উত্তর বাহির হইয়া আসিল—"যদি প্রয়োজন হয় আমি রাজী আছি।"

আশা করি আমার এই উত্তরকে 'মহান্ কর্তব্যের আহ্বানে বিনা দ্বিধায় বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত' হিসাবে কেহ গ্রহণ করিবেন না। কারণ গোয়া মুক্তি-সংগ্রামকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করিলেও, গোয়ায় গিয়া পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করাটা, আমার নিজের হিসাবে, আমার আশু রাজনৈতিক কর্তব্যের মধ্যে ধরা ছিল না। আমার উপরে ন্যস্ত অন্যান্য বহু কাজই তখন হাতে ছিল। লোকসভায় নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি হিসাবে লোকসভার মেম্বারের কাজ, দলীয় ও বে-দলীয় রাজনীতির খুচরা ও জাবেদা বহু রকমের কাজ, নিজের লেখাপড়ার কিছু বকেয়া কাজ ইত্যাদি। সে সব শিকায় তুলিয়া রাখিয়া, বা অন্যকে বুঝাইয়া দিয়া, গোয়া অভিযানে যাওয়ার কোন অভিপ্রায় বা চিন্তা আমার মনে ইহার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি দিলাম। কেন দিলাম বলা শক্ত।

ইহার পরবর্তী ঘটনাগুলিকে আমার না ভাবিয়া চিন্তিয়া গোয়ায় সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির মতোই হুজুগে ঘটনা ছাড়া কিছু বলা যায় না। গোয়া সত্যাগ্রহে যাইতে যখন আমি রাজী আছি, তখন আর কি? ঘোষণা হোক্, প্রচার হোক্। আমার 'বীরত্বপূর্ণ' রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডার কাজেই বা ত্রুটি থাকিয়া যায় কেন? সুতরাং কখন কোথা দিয়া কি হইল, বলা কঠিন। আড্ডায় "ফ্রী প্রেসের" সীতারাম কোল্পে ছিলেন, তিনি প্রেস কন্ফারেন্সের ব্যবস্থা করিলেন। আমি চট করিয়া ছোট মতন একটু বিবৃতিও লিখিয়া ফেলিলাম। একজন সেটি টাইপ করিয়া দিলেন। দুই ঘণ্টার ভিতরে পুণার সকল খবরের কাগজের ও নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধিদের ডাকিয়া বলিয়া দেওয়া হইল—সালাজারের ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমি গোয়ায় সত্যাগ্রহ করিতে চলিলাম।

এই আমার গোয়া যাওয়ার কেন-ও-কি বৃত্তান্ত।

আজ গোয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি সেইদিনকার কথা বার বার মনে পড়ে। আমার গোয়া অভিযানের সিদ্ধান্ত সেইদিন যেইভাবে পূর্বাপর না ভাবিয়া আমি গ্রহণ

করি এবং গোয়ায় যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিই, আমাকে যাঁহারা চেনেন ও জানেন, তাঁহারা হয়ত ইহাতে কিছুটা আশ্চর্য হইবেন। ব্যক্তিগত জীবনে হোক্, আর আমার রাজনৈতিক জীবনে হোক্, আমি এইভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লইতে আদৌ অভ্যস্ত নই, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তো নয়ই। 'অদৃষ্টে'ও আমার পক্ষে বিশ্বাস স্থাপন করা শক্ত। তাই খালি 'অদৃষ্ট'ক্রমে গোয়ায় গিয়াছিলাম, আর 'অদৃষ্ট'ক্রমে আবার নিরাপদে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি—এই কথাটাও মনে করিতে পারিতেছি না।

কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে একটি কথা দেশবাসীকে বলিতে পারি—আমার জীবনে বোধ হয় সেইদিনকার সেই পূর্বাপর হিসাব ও হিতাহিত বিবেচনাবর্জিত হঠাৎ-নেওয়া সিদ্ধান্ত, আমার জীবনের পথে মূল্যবান ও মহৎ যেইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ আসিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্যতম।

গোয়ায় ভারতের সাধারণ মানুষ ও নিতান্ত সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ ছেলেদের ও মেয়েদের ভিতর, মা বোনেদের ভিতর, বলিষ্ঠ দেশপ্রেম ও দৃপ্ত জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধের যে অদ্ভুত বিকাশ গোয়াতে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতন আশা ও নূতন বিশ্বাস অর্জন করিয়া ফিরিতে পারিয়াছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের ছেলেমেয়েদের অনমনীয় বীর্যের এক মহিমান্বিত প্রকাশ দেখিয়া গোয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আজও আগুয়াদা আর রাইস্ মাগুস্ (Reis Magos) দুর্গের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, পঞ্জিম, মাড়গাঁও, মাপ্সার পুলিস লক্-আপের অন্ধকার কুঠরীগুলিতে. ভারতবর্ষের মনুষ্যত্বের শাশ্বত আত্মার অপরাজেয় ঐতিহ্যে বিশ্বাস রাখিয়া, সেই বীর্য সালাজারের সামন্তশাহী সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া চলিয়াছে। আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু লড়াই বন্ধ হয় নাই।

গোয়ায় না গেলে মনুষ্যত্বের, বীর্যের ও দেশপ্রেমের এই মহান্ অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত হইতাম।

॥ ৩ ॥

উদ্যোগ পর্ব : 'চলো! গোয়া চলো!'

মে মাসের গোড়াতেই আমার গোয়া যাওয়ার সংকল্প যথোচিত সমারোহ সহকারে ঘোষিত হইয়া গেল বটে; কাগজে কাগজে—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের কাগজগুলিতে—বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়া বাহির হইয়াও গেল। কিন্তু যাওয়ার দিনক্ষণ কিছুই তখনও স্থির হয় নাই। এক খাডিলকর ছাড়া, বোম্বাই বা পুণায় গোয়া-আন্দোলনের পরিচালকদের কারও সঙ্গে এই বিষয়ে কোন যুক্তি-পরামর্শ বা আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ তখন আমার হয় নাই।

২রা মে প্রেস কন্‌ফারেন্সে গোয়া যাওয়ার কথা ঘোষণা করিয়া আমি সেইদিনই পুণা হইতে দিল্লী রওনা হইয়া যাই। পার্লিয়ামেণ্টের বাজেট অধিবেশন শেষ হইতে

আরও কয়েকটি দিন তখনও বাকী ছিল। খালি সেই কয়দিন নয়াদিল্লীতে থাকিয়া, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় রাজধানী হইতে তল্পি-তল্পা গুটাইয়া লইয়া বাংলা দেশে ফেরার একটা জোর তাগিদ মনের ভিতর অনুভব করিতেছিলাম। আমার গোয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার নিজের দলের লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের কাহাকেও কিছু জানানো হয় নাই। পুণার প্রেস কন্‌ফারেন্সে আমার গোয়া যাওয়ার সংকল্প ঘোষণার সংবাদ তাঁহারাও অন্যান্য সকলের মত খবরের কাগজেই প্রথম দেখিবেন ও স্বভাবতই বেশ কিছুটা বিস্মিত হইবেন। আমার নিজের দিক দিয়া তাই সবার আগে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া নেওয়ার জরুরী প্রয়োজন ছিল। কারণ গোয়ার পথে রওনা হওয়ার আগে, আমার হাতে যে সমস্ত কাজের দায়িত্ব ছিল তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সেইগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না করিয়া আমার পক্ষে গোয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না, তাহা আমি সুনিশ্চিত-ভাবে জানিতাম।

কিন্তু দিল্লী যাওয়ার প্রয়োজনও তাহার চেয়ে কিছু কম ছিল না। আমার জিনিসপত্র, পার্লিয়ামেণ্টের কাগজপত্র ও দিল্লীবাসের আনুষঙ্গিক লটবহর—সবই নয়া-দিল্লীর বাসায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। আমি পুণায় রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পরে শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে আমাদের সর্বদলীয় পার্লিয়ামেণ্টারী গোয়া-কমিটির সদস্যেরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। গোয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতজীর সঙ্গে তাঁহাদের কি আলোচনা হইল, গভর্নমেণ্ট গোয়া প্রশ্নের সমাধানের জন্য কোন নূতন ধরনের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কিনা, ভারত হইতে গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের জন্য ভারতীয় সত্যাগ্রহী অভিযাত্রী-দল পাঠানোর প্রস্তাবকে গভর্নমেণ্ট কি নজরে দেখিতেছেন—তাহা জানিবার জন্যও মনে মনে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। এতদিন আমার গোয়া-সমস্যা সম্পর্কে মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু গোয়ায় সত্যাগ্রহ করিতে যাইব বলিয়া ঘোষণা করার পর হইতে কতকটা নিজের গরজেও আমি এই সময় হইতে গোয়া প্রশ্নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সব রকম খোঁজখবর লওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতে থাকি। অবশ্য গোয়ায় গিয়া সত্যাগ্রহ করার সংকল্পের কথা বাদ দিলেও তাহার আগেই পার্লিয়ামেণ্টারী গোয়া কমিটির সদস্যপদ গ্রহণে সম্মতি দিয়া, আমি গোয়ার সমস্যা সম্পর্কে সজাগ ও সক্রিয় হওয়ার একটা নৈতিক দায়িত্ব যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তার উপরে গোয়া যাওয়ার প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং গোয়া-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই খোঁজখবর লওয়ার একটা আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই এই সময় আমার মনে দেখা দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যখন গোয়া কমিটির সদস্যেরা দেখা করেন, তখন ভারত হইতে গোয়ায় ভারতীয় সত্যাগ্রহী দল পাঠানোর কথা খবরের কাগজে খোলাখুলিভাবেই আলোচিত হইতেছিল। গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইহার আগেই গোয়াতে গিয়া সত্যাগ্রহ করার প্রস্তাব দেশের সম্মুখে রাখেন। ইহার কিছুদিন আগে ভারত সরকার ভারতীয় নাগরিকদের বিনা পাসপোর্টে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়াতে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ভারতে গোয়াবাসী যাঁহারা আছেন বা থাকেন, তাঁহারা পর্তুগীজ সরকারের বিরুদ্ধে গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহ করিতে চাহিলে তাঁহাদের যাওয়ার পথে কোন বাধা দেওয়া হইবে না সে কথা ভারত

সরকার পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় নাগরিকদের গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহ করার অনুমতি দিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন। কিন্তু গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসী সত্যাগ্রহী ও মুক্তি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পর্তুগীজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার ও দমননীতির সংবাদ এদেশে প্রচারিত হওয়ার ফলে জনসাধারণের ভিতর ক্রমে তীব্র বিক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। ভারত গভর্নমেণ্ট হয় ভারতীয় নাগরিকদেরও সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিন কিংবা, অন্ততপক্ষে ভারতীয়দের ভারত-গোয়া সীমান্ত লঙ্ঘন সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্বেকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া নিন—এই ধরনের দাবী লইয়া তখন চারিদিকে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। কাজে কাজেই এ সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট কি মনোভাব অবলম্বন করিবেন—কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পণ্ডিতজীর আলাপ-আলোচনায় সে প্রশ্নও অবশ্যম্ভাবীরূপে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু আমার বা অপর কাহারও গোয়া যাওয়ার সংকল্পের প্রকাশ্য ঘোষণা তখনও পর্যন্ত খবরের কাগজ মারফত সেইভাবে প্রচারিত হয় নাই। গোরে বা আত্মারাম পাতিলের গোয়া-অভিযানের প্রস্তাব তাঁহাদের নিজ নিজ পার্টির মধ্যে আলোচিত হইলেও, খুব নির্দিষ্ট আকারে হয় নাই। পুণায় আমার প্রেস কনফারেন্সের ঘোষণায় সংবাদ, পণ্ডিতজীর সঙ্গে গোয়া কমিটির সদস্যদের আলাপ-আলোচনার একদিন বা দু'দিন পরে খবরের কাগজে বাহির হয়। দেশপাণ্ডে তাঁহার সংকল্পের কথা খবরের কাগজের মারফত প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন অনেক পরে। সুতরাং পণ্ডিতজীর সঙ্গে কমিটির আলোচনার সময় গোরের, আমার, কিংবা দেশপাণ্ডের গোয়া যাওয়ার কথা ওঠে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতীয়দের গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহ করার প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মনোভাব কি এবং আমার গোয়া যাওয়ার সংকল্প ঘোষিত হওয়ার পর তাহা সর্বদলীয় গোয়া কমিটির সদস্যদের মনে, ও পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য একটা তীব্র কৌতূহল মনে মনে অনুভব করিতেছিলাম।

ঝোঁকের মাথায় আচম্‌কা গোয়া যাওয়ার কথা বলিয়া ফেলিয়া, এই সব সাত-পাঁচ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, লম্বা বাজেট সেশনের একেবারে শেষদিকে আমি পুণা হইতে নয়াদিল্লীতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন পার্লিয়ামেণ্টের প্রায় ভাঙ্গা হাট বলিলেও চলে। পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন পুরা শেষ হওয়ার আগেই অনেকে জরুরী কাজে নিজের নিজের এলাকায় চলিয়া গিয়াছেন। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে অসহ্য গরম পড়ে। ফেব্রুয়ারী হইতে একটানা পার্লিয়ামেণ্টে হাজিরা দেওয়ার পর সকলেরই সেই গরমের প্রকোপ এড়ানোর একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। তবু যাঁহারা থাকিয়া যান, বিশেষ জরুরী বা উত্তেজনাময় কোনো ব্যাপার না ঘটিলে, দৈনন্দিন অধিবেশনে খুব মন লাগাইতে চান না। বেশির ভাগ লোকেরই চিন্তা তখন থাকে দৈনিক ভাতা বা ট্রাভেলিং এলাওএন্সের জমানো বিল আদায় করার দিকে। না হয়, বাড়ি ফেরার পথে রেলগাড়িতে বার্থ রিজার্ভ করা বা গৃহিণীদের তাগিদে দিল্লী থাকার শেষ কয়দিনে কনট্ প্লেসে কিংবা চাঁদনী চকের বাজারে বাজার করার শখ ও ঝামেলা মিটাইয়া নেওয়ার দিকে। সেই অবস্থায় কে আর আমার গোয়া যাওয়ার সংকল্প লইয়া মাথা ঘামাইবে? তবু খবরটা সদ্য সদ্য কাগজে ফলাও করিয়া বাহির হইয়াছে। সুতরাং পুণা হইতে নয়াদিল্লী ফিরিয়া এ সম্পর্কে একটা মৃদু গুঞ্জন যে পার্লিয়ামেণ্টের কোনো কোনো মহলে মহলে একেবারে শুনিলাম

না তাহা নয়। পার্লিয়ামেণ্টারী গোয়া-কমিটির অনেক সদস্যের মনেই যেন একটা প্রশ্নের ভাব দেখিলাম বলিয়া মনে হইল। দু' একজন আমার সিদ্ধান্ত কতদূর সমীচীন বা সঙ্গত হইয়াছে সে সম্পর্কে বেশ খোলাখুলিভাবেই সংশয় প্রকাশ করিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টের সরকারী গোয়া-নীতির সরহদ্দ টপকাইয়া, ভারত পার্লিয়ামেণ্টের কোনো সদস্যের পক্ষে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদের এলাকায় গিয়া প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়েও অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। একটি বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাস্তবে কতদূর কার্যকরী হইবে বা হইতে পারে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ তো ছিলই। তা ছাড়া, পার্লিয়ামেণ্ট কতকটা—পলিটিক্সের খেলায় 'ওল্ড্ হ্যাণ্ড' বলিতে যাঁদের বোঝায়, সেই সব ঝানু রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের আড্ডাখানা বা ক্লাবের মতো। সেখানে আমার গোয়ায় সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়ার ঘোষণাকে একটি 'পলিটিকাল স্টাণ্ট' হিসাবে দেখিয়া তার 'যথাযোগ্য' মূল্য কষার বা তাহা লইয়া কিছুটা চাপা বিদ্রূপ করার লোকেরও অভাব হইল না।

মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, পার্লিয়ামেণ্টের বন্ধু-বান্ধবদের ভিতরে বেশির ভাগ লোকই বিভিন্ন কারণে আমাকে গোয়া যাওয়ার সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। গোয়া কমিটির সদস্যদের অনেকেই তখন দিল্লী ছাড়িয়া নিজের নিজের কাজে এদিক ওদিক চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কমিটির উৎসাহী সম্পাদক ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ স্থায়িভাবে দিল্লীতেই থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে গোয়া-আন্দোলন সম্পর্কে কমিটির নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানিতে পারিলাম। আর যে বিষয় জানা সম্পর্কে আমার বেশি কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল—প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গোয়া সমস্যা সম্পর্কে কমিটির সদস্যদের কি আলোচনা হইয়াছে—তাহার বিশদ বিবরণও তাঁহার নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কমিটির সদস্যদের এই সময় যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার সব কথা এখনও প্রকাশ করার সময় আসে নাই। তবে সাধারণভাবে দু'একটি কথা এখানে বলা যাইতে পারে। যেমন, কমিটির সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার একটি ধারনার কথা কমিটির সদস্যদের কাছে খুবই জোরের সহিত ব্যক্ত করেন—কমিটির সদস্যদের তিনি এ বিষয়ে কিছুটা আশ্বাস দেন যে, পর্তুগীজ সরকারের মনোভাব গোয়া সম্পর্কে অনমনীয় হইলেও আন্তঃ-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে গোয়ার বিষয়ে ভারতের সমর্থন বেশ জোরালো এবং তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া কমিটির সদস্যদের এ ধারনা হয় যে, স্বয়ং ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ্ (অর্থাৎ তদানীন্তন পোপ, ধর্মগুরু পিউস্ Pius; গত বৎসর ইঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে) এবং ভ্যাটিকান্ রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের মনোভাব গোয়ার ব্যাপারে ভারতের প্রতি এবং গোয়াবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা গোয়ার ভারতভুক্তির দাবীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। কয়েক মাস পরে—১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে—পণ্ডিতজী সোভিয়েট সফর শেষ করিয়া লণ্ডনের পথে রোমে যান এবং পোপের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় গোয়া-প্রসঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের দু'জনের ভিতরে যে আলোচনা হয় তখন পোপ তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে এই কথা জানান যে, গোয়ার প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন; রোমান ক্যাথলিক চার্চের কোন ধর্মগত স্বার্থ ইহার সঙ্গে—অর্থাৎ গোয়া পর্তুগালের অধীনে থাকিবে, না ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে সে প্রশ্নের সঙ্গে, জড়িত নাই। পোপের এই উক্তি, পর্তুগীজ সরকারের তরফ হইতে গোয়া সম্পর্কে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দোহাই দিয়া যে ধরনের প্রচার করা হয়, কিছুটা তাহার বিপক্ষে যায় সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের ব্যক্তিগত মতামত প্রকৃত পক্ষে কি ছিল তাহা বোঝা শক্ত। আর সে মতামত যাহাই হোক না কেন, ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে সময় সময় তাঁহাদের সরকারী পত্র-পত্রিকা মারফৎ গোয়া সম্পর্কে বা গোয়াতে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে যে ধরনের মতামত সচরাচর ব্যক্ত করা হয়, তাহা ভারতের মোটেই অনুকূল নয়। আর তা ছাড়া, বর্তমান পৃথিবীর আন্তঃ-রাষ্ট্রিক অবস্থায় এই ধরনের ব্যাপারে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মাধিকারের সমর্থন মূল্যবান হইলেও (যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, গোয়ার প্রশ্নে পোপের সমর্থন আমাদের দিকে আছে, বা থাকিবে) বাস্তব মূল্য কতখানি সে বিষয়েও সংশয়ের অবকাশ আছে।

পণ্ডিতজী কমিটির সদস্যদের দ্বিতীয় যে কথাটি জানান, তাহা ভারত হইতে গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সত্যাগ্রহী অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের নীতি ও মনোভাব কি হইবে সে বিষয়ে। তিনি খুব খোলাখুলিভাবে কমিটির সদস্যদের কাছে এই কথা বলেন যে, ভারত হইতে যদি গোয়ায় এই ধরনের সত্যাগ্রহী অভিযান চালানো হয়, এবং সেই সত্যাগ্রহী অভিযানের প্রতিরোধ করিতে গিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যদি সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালান, তাহা হইলে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ ঘোষণা ভিন্ন তাহার প্রতীকারের দ্বিতীয় কোন উপায় থাকিবে না। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় কোনোমতেই গোয়ার ব্যাপারে এইভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ ভারত গভর্নমেণ্টের 'শান্তি'র নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া গোয়া প্রশ্নের সমাধানের জন্য যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ কোনমতেই অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং এই ধরনের সত্যাগ্রহ চালানোর পরিকল্পনা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা যেন সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া সে পথ গ্রহণ করেন। ভারত গভর্নমেণ্ট এই ধরনের সত্যাগ্রহ দ্বারা গোয়া সমস্যার সমাধানে কোনরূপ সাহায্য হইবে বলিয়া মনে করেন না। কাজে কাজেই এই জাতীয় সত্যাগ্রহ পরিকল্পনাকে তাঁহারা কোনোমতেই সমর্থন করিতে পারিবেন না।

বলাবাহুল্য, গোয়া সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্ট আজ পর্যন্ত পূর্বাপর যে ধরনের নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সঙ্গে পণ্ডিতজীর এই কথার কোনো অমিল নাই। বরঞ্চ পুরাপুরি সঙ্গতি আছে। গোয়া সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে জোরালো ধরনের কিছু একটা ব্যবস্থা লওয়া হোক্—কমিটির সদস্যেরা সেই অনুরোধ জানাইতেই পণ্ডিতজীর কাছে গিয়াছিলেন। গোয়ার ব্যাপার লইয়া পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক্, বা হায়দরাবাদের মত সশস্ত্র "পুলিসী ব্যবস্থা" ("Police Action") জাতীয় কিছু করা হোক্, এ ধরনের কোন দাবী কমিটির সদস্যদের ছিল না। প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ অভিযানের পরিকল্পনার সঙ্গে তো পার্লিয়া-মেণ্টারী গোয়া কমিটির কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট যদি যুদ্ধ বা কোনো সশস্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করার দিকে না যাইতে পারেন বা না যাইতে চান, আর সত্যাগ্রহী অভিযানও যদি তাঁহাদের পছন্দসই না হয়, তাহা হইলে গোয়া সমস্যার সমাধানের আর কি পথ আছে—প্রধানমন্ত্রীর কাছে সে প্রশ্ন সেইদিন কেহ তোলেন নাই। মোটামুটি-ভাবে কমিটির সদস্যেরা প্রধানমন্ত্রীর মুখ হইতে গভর্নমেণ্টের বক্তব্য শুনিয়াই চলিয়া আসেন। ভারতভুক্তির পর গোয়া ও পর্তুগীজ ভারতের অন্যান্য ছিট-মহলগুলির অধিবাসীদের কি কি ধরনের বিশেষ অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে; গোয়াতে

মাদক-দ্রব্য বর্জন বা মদ্যপান পরিহারের নীতি চলিবে কিনা—এইসব লইয়া কিছু জল্পনা-কল্পনা ও হাসিঠাট্টা হয়। কিন্তু তাহার বেশি আর কিছু হয় নাই।

ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ ও কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিকট হইতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কমিটির আলোচনার রকমটা শুনিয়া যে খুব আশ্বস্ত হইলাম, বা ভরসা পাইলাম, তাহা নয়। তবে মোটামুটি এইটুকু বুঝিয়া নিলাম যে গোয়ার ভিতরে হোক্ আর বাহিরে হোক্, গোয়া মুক্তি-আন্দোলনকে প্রধানত দেশবাসীর আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। জনসাধারণের ভিতর হইতে রসদ ও সৈনিক দুই-ই যোগাড় করিতে হইবে। ভারত সরকার গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামকে বা গোয়াবাসীদের স্বাধীনতার দাবীকে পরিপূর্ণ-ভাবে নৈতিক সমর্থন জানাইলেও, তাঁহাদের পররাষ্ট্র-নীতির নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকিয়া ব্যবহারিকভাবে তাঁহারা সেই দাবীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে খুব বেশিদূর আগাইয়া আসিতে পারিবেন না তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। আমরা সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত গভর্নমেণ্টের আশু হস্তক্ষেপে গোয়া সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে—এইরকম মনে করার কোনো কারণ ছিল না।

যাই হোক্, আমার দিক দিয়া তখন পাশার দান ফেলা হইয়া গিয়াছে। যেইভাবেই হোক্, গোয়া মুক্তি-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব তখন আমার উপর আসিয়া গিয়াছে। দেশের জনসাধারণের কাছে এই সংগ্রামে যোগ দিব বলিয়া আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং দেরি না করিয়া যত তাড়াতাড়ি হয় গোয়ার দিকে রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হওয়ার তাগিদটাই মনের ও মাথার ভিতর তখন বেশি কাজ করিতেছিল। দিল্লীতে আমার দেরি করারও তখন আর কোন দরকার ছিল না। পুণায় খাডিলকরের উপর ভার দিয়া আসিয়াছিলাম, গোয়া বিমোচন সমিতি ও গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া, কবে কি নাগাদ আমাকে গোয়া যাইতে হইবে স্থির করিয়া, তিনি আমাকে সময় মত জানাইয়া দিবেন। দিল্লীর বকেয়া কাজ শেষ করিয়া, পার্লিয়ামেণ্টের হাট ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তাই আমি কলিকাতা রওনা হইয়া গেলাম।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই গোয়া বিমোচন সমিতি প্রথম ১৮ই মে হইতে শুরু করিয়া তারপর প্রতি সপ্তাহে, গোয়ায় অন্তত একটি করিয়া সত্যাগ্রহী অভিযাত্রী দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন। বিমোচন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিই নিজ নিজ দলের সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। সরকারীভাবে কংগ্রেস অবশ্য কোনো সময় বিমোচন সমিতির ভিতরে ছিল না। কিন্তু পুণার অনেক কংগ্রেস নেতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের অকুণ্ঠ নৈতিক সমর্থন যে এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল তাহা সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়।

কমিটিতে ইহাও ঠিক হয় যে, বিমোচন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল, কমপক্ষে পঞ্চাশ হইতে একশ জনের, একটি করিয়া সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছা-সৈনিক-বাহিনী সংগঠনের দায়িত্ব লইবেন। প্রত্যেক দল নিজেদের দলের নেতৃস্থানীয়দের ভিতর হইতে সেই সব স্বেচ্ছা-সৈনিক-বাহিনীকে পরিচালনা করিয়া গোয়ার ভিতরে লইয়া যাওয়ার জন্য অধিনায়ক নির্বাচন করিয়া দিবেন। স্বেচ্ছাসেবক অভিযাত্রী দল প্রথমে পুণায় সমবেত হইবেন; তার পর নির্দিষ্ট অধিনায়কদের পরিচালনায় তাঁহারা গোয়ার পথে যাত্রা করিবেন।

পুণা হইতে প্রত্যেক অভিযাত্রী দলকে বেলগাঁও পর্যন্ত পাঠানোর ব্যবস্থা করার ভার থাকিবে পুণার বিমোচন সমিতির উপর। বেলগাঁও হইতে গোয়া সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহাদের পেঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস। এই সময়েই বিমোচন সমিতির তরফ হইতে প্রথম অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক হিসাবে নানাসাহেব গোরে এবং সেনাপতি বাপটের নাম ঘোষিত হয়।

দেশে তখন গোয়া আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া বেশ প্রবল উত্তেজনা ও আলোড়নের আবহাওয়া জমিয়া উঠিতেছিল। গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী ও সুধাবাঈ প্রমুখ মহিলা নেত্রীদের উপর পর্তুগীজদের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইয়া দেশময় এই সময় তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গোয়ার ভিতরে গিয়া পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ভারতীয় স্বেচ্ছাসৈনিক অভিযাত্রী দল পাঠানোর দাবী বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল হইতে উঠিতে থাকে। সেই পরিবেশের ভিতর মহারাষ্ট্র দেশের প্রবীণ বিপ্লবী যোদ্ধা ও বহু সংগ্রামের অধিনায়ক, সেনাপতি বাপট ও তাঁহার সঙ্গে নানাসাহেবের নাম প্রথম অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক হিসাবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুধু সমস্ত পশ্চিম ভারতে কেন, সমগ্র দেশময় ব্যাপক গণ-সংগ্রামের উদ্দীপনা দেখা দেয়। নানাসাহেব গোরে (গোরে মুক্তির পর এখন পুণা হইতে লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন) শুধু প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা বলিয়া নয়, পুণা শহরে ও সমগ্র মহারাষ্ট্রে তিনি সাহিত্যিক ও লেখক হিসাবে, শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ-সংস্কারক হিসাবে এবং বিশেষ করিয়া পুণার যুবক দলের নেতা হিসাবে, বিশেষ পরিচিত ও জনপ্রিয়। প্রথম অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক হিসাবে এই দুইজনের নাম ঘোষণার সঙ্গে গোয়ার ভিতরে গিয়া সত্যাগ্রহী অভিযান আরম্ভ করার দিনক্ষণ ও নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষিত হওয়ার ফলে গোয়া সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা শুধু আর নিছক জল্পনা-কল্পনা বা রাজনৈতিক বিচার-বিতর্কের বিষয় হইয়া থাকিল না। 'Marching order' হিসাবে, সংগ্রামের পথে পা বাড়ানোর আহ্বান হিসাবে ধ্বনিত হইয়া গেল—"চলো, গোয়া চলো!"

আমি অবশ্য জানিতাম আমার ডাক কিছুদিন পরে আসিবে। কারণ, আমি পুণা ছাড়ার সময় খাডিলকরকে বলিয়া আসিয়াছিলাম গোয়া যাইতে হইলে, আমার সমস্ত কাজ সারিয়া তৈরী হইয়া নেওয়ার জন্য আমাকে যেন জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। সম্ভব হইলে তাহার আগে যেন আমার যাওয়ার দিন ধার্য না করা হয়। শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়ার তারিখ ঠিক হয় ৯ই জুলাই। অর্থাৎ দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিয়া পেঁছানোর পরে পুরা দুই মাসের মত সময় আমি পাইয়াছিলাম। আমার এই দুই মাসের বেশির ভাগ কাজের সঙ্গে গোয়া-মুক্তি আন্দোলনের যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, তাহা না বলিলেও চলিবে। অবশ্য পরোক্ষ যোগাযোগ এইটুকু ছিল যে, এই দুই মাস সময়ের ভিতর যতটা পারা যায় হাল্কা হইয়া যাহাতে গোয়া রওনা হইতে পারি সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি আমার সমস্ত বকেয়া কাজ মিটাইয়া লইতেছিলাম। হাতে যে সব দায়িত্ব আগে হইতে জমা হইয়া ছিল, সেগুলি অন্যদের বুঝাইয়া দিয়া যতদূর পারা যায় নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু আমার মত ভবঘুরে লোকের কপালের দোষে বকেয়া কাজ চুকাইতে চুকাইতেও আবার নূতন কাজ ঘাড়ে চাপিয়া যায়। এই দুই মাসে তাই কখনো নিজের জেলা মুর্শিদাবাদ ও মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে আমার নির্বাচন ক্ষেত্রের লোকেদের কাছে গোয়ার কথা বলিয়া বিদায় নিতে গিয়াছি। কাজের

টানে টানে অপরিহার্যভাবে কলিকাতায় থাকিতে ও কলিকাতা হইতে এদিক ওদিক যাইতে হইয়াছে বেশ বারকয়েক। পার্লিয়ামেণ্টারী গোয়া কমিটির উদ্যোগে এই সময় বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজে গোয়ার ব্যাপারে জনমত সংগঠনের জন্য কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন হয়। সেই উপলক্ষে কয়েকবার বোম্বাই-কলিকাতা দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। মে'র শেষে জুনের গোড়ায় কানপুরে কাপড়ের কলের মজুরদের সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে গলাবাজী করিতে গিয়াছি। কানপুর হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই নিজস্ব দলীয় রাজনৈতিক কাজে মাদ্রাজ হইয়া ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন-মালাবারের পথে আমাকে রওনা হইতে হয়। দেখিতে দেখিতে দুই মাস কোথা দিয়া কাটিয়া গেল ঠাহর হইল না।

ইতিমধ্যে মে মাসে গোরে, পি-এস-পি'র শিরুভাউ লিমায়ে, 'ক্ষেতকারী' দলের আত্মারাম পাতিল, কমিউনিস্ট পার্টির রাজারাম পাতিল একের পর এক গোয়ায় গিয়া আটক পড়িয়া গিয়াছেন। জুন মাসে হিন্দুসভার দেশপাণ্ডে, চালিশ গাঁওয়ের ভাণ্ডারী, মোদক গুরুজী, জনসঙ্ঘের জগন্নাথরাও জোশী—ইঁহারাও রওনা হইয়া গেলেন। ইঁহাদের সঙ্গে যে সমস্ত সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছা-সৈনিক অভিযাত্রী দল গোয়ার ভিতরে যায় তাহারা একের পর এক অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিয়া মার খাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। দেশপাণ্ডেকে পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য বলিয়া পর্তুগীজরা রেয়াৎ করে নাই। হাজতে ভরিয়া কাফ্রী সৈনিকদের দিয়া ভাল করিয়া পিটাইয়া তবে ছাড়িয়াছে।

আমি ত্রিবেন্দ্রাম-কুইলন-আলেপ্পী-এর্নাকুলাম্'এর পথে ঘুরিতে ঘুরিতে কখনও রেডিও মারফত, কখনও খবরের কাগজে অবসরমত এই সব খবর কিছু কিছু শুনিতেছি বা দেখিয়া লইতেছি। ২৬শে/২৭শে জুন সংবাদ আসিল জগন্নাথ রাওয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রী দলের স্বেচ্ছা-সৈনিক আমীরচাঁদ গুপ্তকে পর্তুগীজ পুলিস মারিয়া ফেলিয়াছে। যে অমিত শক্তিধর সাহসী যোদ্ধা খালি হাতে লড়িলেও অনায়াসে তিন চারজনের মোহড়া লইতে পারিতেন, নীরবে মুখ বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া মার খাইয়াছেন। পর্তুগীজ সিকিউরিটি পুলিস আর মিলিটারী গুণ্ডার দল তাঁহাকে বন্দুকের কুঁদা দিয়া মারিতে মারিতে বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ২৯শে জুন বেলগাঁও হাসপাতালে তিনি মারা গেলেন। দিনের পর দিন প্রতেকটি খবর দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া বিক্ষোভ ও উত্তেজনার মাত্রা ক্রমশ বাড়াইয়া দিতেছে—রোজই গোয়া সত্যাগ্রহের কোন না কোন খবর কাগজে থাকিবেই। আমার ত্রিবাঙ্কুরের কাজ তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় কুইলন হইতে আলেপ্পীর পথে যাইতে মাঝপথে আমার দলীয় সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীকণ্ঠন নায়ারের বাড়িতে পৌঁছিয়া খাডিলকরের প্রত্যাশিত সমন পাইলাম—"দেরি না করিয়া ৭ই জুলাই পুণায় পৌঁছাও; ৮ই অথবা ৯ই জুলাই তোমাকে গোয়া প্রবেশ করিতে হইবে।"

("Report Poona seventh July latest stop you are to enter Goa eighth or ninth.")

আমারও "Marching order" হাতে আসিয়া গেল—'চলো, গোয়া চলো'!

॥ ৪ ॥

অন্মুড় কাস্টম্স ক্যাম্পে

১৯৫৫ সালের ৯ই জুলাই আমি সত্যাগ্রহী হিসাবে গোয়ায় প্রবেশ করি—খাডিলকরের টেলিগ্রাম কেরলে আমার হাতে পেঁছানোর ঠিক দুই সপ্তাহ পরে। আমার এই দুই সপ্তাহের ভ্রমণ-পঞ্জী গোয়া-সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে এখানে এইকথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, গোয়া-মুক্তি আন্দোলন ও পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঢেউ ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো সেই সময় কেরলেও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেরলে মালয়ালী ক্রিশ্চিয়ান ও রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা যথেষ্ট এবং তাহাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহ্য বা অন্য যে কোন ধরনের প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের ঐতিহ্য, সেখানকার অন্য কোন সম্প্রদায়ের চেয়ে কম নয়। তাই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যখন ক্যাথলিক ধর্মের দোহাই দিয়া তাঁহাদের গোয়া আঁকড়াইয়া থাকার নীতি সমর্থন করিতে থাকেন, তখন কেরলের ক্যাথলিকদের মধ্যে সেই কুযুক্তির বিরুদ্ধে একটা ভাল রকম জবাব দিবার আগ্রহ খুব বেশি করিয়া দেখা যায়। কেরলে যে-কোন জায়গায় গেলেই সভা-সমিতি করিয়া হোক্, আর খবরের কাগজের মারফতে হোক্, গোয়া সম্পর্কে আমাকে কিছু-না-কিছু বলিতেই হইত। আমি যে গোয়া যাইতেছি, সেই কথা তখন কেরলেও বেশ প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মিটিং-এ আসিয়া লোকে গোয়া সম্পর্কে জানিতে চাহিত, প্রশ্ন করিত; গোয়ার সত্যাগ্রহ অভিযানে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লিখাইতে চাহিত। এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমি কেরলের বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করি যে, আমার সঙ্গে কেরল হইতেও জন পঁচিশেকের মত স্বেচ্ছা-সৈনিক গোয়ায় সত্যাগ্রহ অভিযানে যাইবে।

খাডিলকরের টেলিগ্রাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা পাকাপাকিভাবে স্থির হয় যে, কেরলের যুবনেতা কে. কে. কুমারপিল্লাই-এর নেতৃত্বে কেরল হইতে এই স্বেচ্ছা-সৈনিক দল সরাসরি পুণায় গিয়া আমার সঙ্গে যোগ দিবে। ইহার পর কেরলে আর অপেক্ষা না করিয়া আমি আলেপ্পী, এর্নাকুলম্ ও কোঢ়িকোডের (কালিকট) পথে মাদ্রাজ এবং মাদ্রাজ হইতে সোজা কলিকাতার দিকে রওনা হইয়া যাই। কারণ, আগে হইতেই ইহা স্থির ছিল যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন গোয়া যাত্রার পূর্বে বাংলা দেশে ফিরিয়া সেইখান হইতে গোয়া রওনা হইব এবং বাংলা দেশ হইতেও গোয়া অভিযাত্রী একদল স্বেচ্ছা-সৈনিক আমার সঙ্গে যোগ দিবে।

বলা বাহুল্য, বাংলা দেশ হইতে আমার গোয়া রওনা হওয়ার ব্যাপারটা কিছুটা আনুষ্ঠানিক আর কিছুটা প্রচার-ধর্মী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া ঠিক করা হয়। বাংলা দেশও যে গোয়া-মুক্তি সংগ্রামে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সারা ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া এক সঙ্গে লড়িতেছে, গোয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে (রেলপথে ও বাসে করিয়া গোয়ার দূরত্ব কলিকাতা হইতে প্রায় আঠার শ মাইলের মত)

বলিয়া বাংলা দেশ নিরুদ্বিগ্ন বা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই, জাতীয় আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে হোক্, আর য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে অভিযান হোক্, সাহসের সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ার মত বাঙ্গালী তরুণ দলের অভাব আজও হয় নাই—এই ধরনের প্রচারের ভিতর দিয়া কিছু সমারোহ সহকারে আমার বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করিলে কলিকাতার গোয়া-আন্দোলনকে আর একটু জমাইয়া তোলার এবং আর একটু সামনে আগাইয়া লইবার সাহায্য হইবে, বন্ধুরা হয়ত সেইকথা ভাবিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ দলীয় প্রচার বা পার্টি-প্রোপাগান্ডার কথা নাই বা বলিলাম। এখানে উহ্য থাকিলেও এ প্রসঙ্গে সেটা সকলে স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারেন; বাংলা দেশের রাজনীতির কোন্ ক্ষেত্রেই বা এই বস্তু বাদ থাকে?

পাছে লোকের কোন ভুল ধারণা হয়, সেইজন্য এ প্রসঙ্গে এইকথাও বলিয়া যাওয়া দরকার যে, আমি বা আমার সঙ্গে বাংলা দেশ হইতে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক গোয়ায় প্রবেশ করে, বাংলা দেশের গোয়া অভিযাত্রীদের মধ্যে সেই কয়জন সর্বপ্রথম ছিলাম না। শক্তিপদ নন্দীর কথা আগে বলিয়া আসিয়াছি। মে মাসে বিমোচন সমিতির পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ হইবার পর গোরের সঙ্গে প্রথম যে স্বেচ্ছা-সৈনিক দল গোয়ায় যান তাঁহাদের ভিতর শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তী নামে একজন বাঙ্গালী যুবক ছিলেন। তহার সম্পর্কে আমি খুব বেশি জানি না। পরে জেলে গোরের সঙ্গে দেখা হইলে পর ইঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি। উত্তর ভারতে কোথাও তিনি রেলে চাকরী করিতেন; সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে পর চাকুরীর মায়া ছাড়িয়া দিয়া সত্যাগ্রহে যোগ দিতে চলিয়া আসেন। কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া আনে নাই। গোয়ায় প্রথম সত্যাগ্রহী দলের উপর গুলী চলে—শ্রী চক্রবর্তীর মাথায় সেই গুলী লাগে এবং জীবন বিপন্ন হয়। কিছুদিন হাসপাতালে রাখার পর পর্তুগীজরা অবশ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কোথায় গোয়া, কোথায় বাংলা দেশ আর উত্তর ভারত! দেশের জাতীয় স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই শেষ সংগ্রামে এইরকম নাম-না-জানা তরুণ সৈনিকের দল কেন, কিসের প্রেরণায় খালি খবরের কাগজে বা রেডিওতে সংগ্রামের আহ্বান শুনিয়া দেশের দূরতম প্রান্ত হইতেও পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়াছে? কে তাহার সন্ধান করে? কে তাহার উপযুক্ত সম্মান দিবে? কে এই সুস্থ জাতীয়তাবোধ ও আদর্শবাদকে সংহত করিয়া আজিকার দিনে আমাদের নূতন সমাজ রচনার কাজে, জাতিগঠনের কাজে, নিয়োগ করার কথা ভাবিবে?

ইহার পরে আরও দুইটি বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকের দল, প্রথমটি হিন্দু মহাসভার শ্রীদেশপাণ্ডের অধিনায়কতায় এবং দ্বিতীয়টি এশিয়া মুক্তি কমিটির উদ্যোগে, গোয়ায় গিয়াছিল। ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহে বাংলা দেশের প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে বহু ছাত্র ও যুবকের দল গোয়া প্রবেশের চেষ্টা করেন—কিন্তু প্রথম পথ দেখায়, সন্তোষ চক্রবর্তীদের মত নাম-না-জানা সাধারণ সৈনিকের দল।

আমার সঙ্গে যে অভিযাত্রী দল গোয়ায় যায় এই হিসাবে তাহা বাংলা দেশের তৃতীয় দল। আমি ৩রা জুলাই সন্ধ্যার মেইলে বোম্বাইয়ের পথে গোয়া রওনা হইয়া যাই। বর্ষার দিন বলিয়া ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের হলঘরে বিদায় সম্বর্ধনা সভার আয়োজন হয়। সেখানে যথারীতি বক্তৃতা, মালা পরানো, তিলক পরানো, মালা এবং ফুলের তোড়ার চাপে দম বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা, প্রেস ফটোগ্রাফারদের চোখ-ধাঁধানো ফ্ল্যাশ্-লাইটের জ্বলা-

নেভা কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। তারপরে মিছিল করিয়া, স্লোগান দিতে দিতে, হৈ হুল্লোড় করিয়া হাওড়ায় গিয়া ট্রেন ধরা কিছুই বাদ পড়ে নাই। এইসব কথা এখানে বলিবার বা মনে করার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে সেইদিনকার কথা না মনে করিয়া পারিতেছি না। সেইদিনকার সম্বর্ধনা সভায় অসুস্থ শরীর লইয়াও পরম শ্রদ্ধেয় মৃণালকান্তি বসু মহাশয় সভাপতিত্ব করিতে আসেন। শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উপলক্ষে তো বটেই এবং তা ছাড়া আমার অ্যামেচার সাংবাদিক জীবনেও তাঁহার সঙ্গে নানাভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ আমার হইয়াছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া সময় মতন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। যখন দেখা করিতে গেলাম তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়; চেতনা হারাইয়া তাঁহার দেহ কোনমতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। ভুলিতে পারিতেছি না আমার গোয়া যাওয়া সম্পর্কে তাঁহার মনে বিশেষ উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও এই প্রবীণ জননেতার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ মাথায় লইয়া সেইদিন আমি বাংলা হইতে গোয়ার পথে রওনা হইয়া যাই।

গোয়ার পথে বোম্বাই পুণা বা বেলগাঁও-এ কোথাও কিছু কম, কোথাও কিছু বেশি কলিকাতার বিদায়-সম্বর্ধনা-পালারই পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। অর্থাৎ সেই একই ধরনের মালা-মিটিং-মিছিলের সমারোহ, হুল্লোড়, প্রেস কনফারেন্স, প্রেস-ফোটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ-লাইট। কলিকাতার মতই এইসবের ভিতর দিয়া গোয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ৫ই জুলাই বোম্বাই, ৬ই পুণা, ৮ই পুণা হইতে বেলগাঁও...ভারতে অথচ স্বাধীন ভারতের এলাকার বাহিরে...সালাজারের কঠোর ডিক্টেটরশিপের জ্যাক্ বুটের নীচে চাপা সাড়ে চার শ বছরের পর্তুগীজ উপনিবেশ ছোট্ট গোয়া...যেখানে স্বাধীনতার কথা মনে মনে ভাবা কিংবা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাও আইনত দণ্ডনীয়...দেশপ্রেমিক গোয়ানীজ্‌দের স্থান যেখানে মিলিটারী কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আর না হয় বনে-জঙ্গলে পুলিসের ফেরারী আসামীর গোপন আশ্রয়ে সেই গোয়া! গোরে, শিবুভাই, রাজারাম, জগন্নাথ রাও আমার আগে যাঁহারা গিয়াছেন, এক এক করিয়া আটক পড়িয়াছেন। দলে দলে সত্যাগ্রহীরা মার খাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। আবার দলে দলে নূতন অভিযানের সঙ্গে মিশিয়া গোয়া ঢোকার চেষ্টা করিতেছে। বেলগাঁও হাসপাতাল আহত ভলাণ্টিয়ার দলে ভর্তি হইয়া আছে...আমীরচাঁদ পর্তুগীজ পুলিসের মার খাইয়া মারা গেলেন। গোয়ায় গিয়া কপালে আর কিছু না জুটুক, গায়ে-মাথায়-পিঠে পুলিসের লাঠির বাড়ি সুনিশ্চিতভাবে জুটিবে (গোয়াতে পর্তুগীজ পুলিসের রবারের তৈরী ট্রাঞ্চিয়ন ডাণ্ডার কথা তখনও জানা ছিল না)। সেইদিকেই এখন পা বাড়াইতেছি।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ,' 'গোয়া-ভারত অলগ্ নহী! কভী নহি! কভী নহি!' 'ভারত মাতাকি জয়!' 'ডাউন উইথ সালাজার!' 'ডাউন উইথ ইম্পিরিয়ালিজম!' 'ডাউন! ডাউন!'—ভলাণ্টিয়ারদের এইসব স্লোগানের চীৎকার গোয়া-সীমান্তের আকাশ-বাতাস তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া পুণা-বেলগাঁও লাইনে বিদায় অভিনন্দন নিতে নিতে, প্রত্যভিনন্দন, প্রতিনমস্কার জানাইতে জানাইতে, ক্রমশ সেই গোয়া-সীমান্তের দিকে চলিয়াছি। কি হইবে কে জানে? দেশপাণ্ডেকে উহারা ছাড়িয়া দিয়াছে, আমাকেও বোধহয় আটক রাখিবে না, তবে মার খাওয়াটা আর এড়ানো গেল না!...তবু যাইতেই যখন হইবে, আগাইয়া চলো! পুঁড়ে চলা! পুঁড়ে চলা!

বাংলা ভাষার আওয়াজ কখন কানে যাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে খেয়াল নাই। বর্ষায় ভিজিয়া মহারাষ্ট্রের কালো মাটির রুক্ষ দেশ কিছুটা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে। জটা মাথা সহ্যাদ্রি পর্বতমালা (পশ্চিমঘাট) হঠাৎ আচমকা সবুজ হইয়া পড়িয়াছিল। পুণা—সাতারা রোড...কোরেগাঁও...করাড্...! প্রথম জুলাইয়ের ঘন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ এক আধবার বিকালের রৌদ্র পড়িয়া নূতন লাঙ্গল-চষা কালো মাটি সবুজ পাহাড় আর নীল মেঘের সঙ্গে মিলিয়া অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে; ট্রেনের কামরা হইতে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল। ট্রেন নিজের নিয়মে দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে...মিরাজ...বেলগাঁও...অন্মুড়...গোয়া...তারপর?

তার পরের কথা এখনি বলিতেছি। কিন্তু আগের দু' একটি কথা এখানে বলিয়া গেলে পরের ঘটনা বুঝিতে সুবিধা হইবে। বোম্বাই হইতে ছয় তারিখ সন্ধ্যার সময় পুণায় আসিয়া পেঁছিলাম বটে। কিন্তু বোম্বাই হইতে একটু সর্দিজ্বর গায়ে লাগিয়া যায়। জ্বর লইয়াই পুণায় পেঁছাই, প্রথমে গ্রাহ্য করি নাই, কিন্তু পরের দিন সকাল-বেলায় দেখা গেল, জ্বর উঠ্তির দিকে। পুণায় ডাঃ চপলাবাঈ খাণ্ডিলকর—অর্থাৎ আমার বন্ধু খাডিলকরের পত্নী—নামকরা চিকিৎসক। তাঁহাদের বাড়িতেই আমি আসিয়া উঠি। সকালে চায়ের টেবিলে আমার চেহারা দেখিয়া তিনি যথারীতি থর্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ বাহির করিলেন, দেখা গেল, ১০২° জ্বর উঠিয়াছে। চপলাবাঈ পুণার সিভিল সার্জনকে ডাকাইলেন আমাকে এই জ্বর লইয়া বর্ষা মাথায় করিয়া গোয়া যাইতে দেওয়া চলে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে। ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আমার সঙ্গে যাঁহারা যাইবেন সেই সমস্ত স্বেচ্ছা-সৈনিক অভিযাত্রীর দল আমার দু' একদিন আগেই পুণায় জমা হইয়াছেন। কুমার পিল্লাই-এর নেতৃত্বে কেরলের ভলাণ্টিয়ার দল; বহরমপুরের নিতাই গুপ্তের নেতৃত্বে বাংলার দল; ভগৎ তুলসীরামের নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশের দল; নাসিকের ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জায়গার কয়েক দল—সবসুদ্ধ ৫২ জন পুণার 'কেশরী-ভবনে' আসিয়া আমার নেতৃত্বে গোয়া যাওয়ার জন্য তৈয়ারী হইয়া রহিয়াছেন। আট তারিখে রওনা হইব বলিয়া খবরের কাগজে, রেডিওতে ঘোষণা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে পথে পথে সমারোহময় বিদায় সম্বর্ধনা লইতে লইতে গলায় মালা দোলাইয়া পুণায় আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছি। সেই অবস্থায় খালি সর্দিজ্বরের অজুহাতে পুণা হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে কিংবা সকলের অসুবিধা ঘটাইয়া গোয়া যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইবে ইহা চিন্তা করিয়া মনের ভিতর বেশ কিছুটা সংকোচ অনুভব করিতেছিলাম।

বন্ধুবান্ধবরা সকলেই জানেন, আমি খুব 'ডেয়ার-ডেভিল'-গোছের একরোখা লোক নই। কিন্তু চপলাবাঈ ও সিভিল সার্জন সাহেবের মতিগতি আমার ভাল মনে হইল না। যাই হোক্, সেইদিনকার মত ব্যবস্থা হইল কিছু বড়ি-মিক্সচার এইসব। ডাক্তারেরা সেইদিন পুরা বিশ্রাম করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পুণার বিদায় সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিতে গেলাম, কতকটা চপলাবাঈয়ের অজানিতে। বন্ধুবর অশোক মেহতা বিশেষ করিয়া সেইদিন আমার বিদায় সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিবার জন্যই বোম্বাই হইতে পুণায় আসিয়া পেঁছান। তিনি আসিয়াছেন, অথচ আমি মিটিংয়ে যাইব না—তাহাও আমার কাছে খুব বিসদৃশ মনে হইল। খাডিলকরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শেষ পর্যন্ত শিবাজী পার্কে সভামণ্ডপে গেলাম এবং ঝোঁকের মাথায় হিন্দীতে (!) আধ ঘণ্টা বক্তৃতাও করিয়া ফেলিলাম। শরীরের পক্ষে এইটা খুব ভাল হয় নাই, কারণ মিটিংয়ের

পর বাসায় ফিরিয়া দেখা গেল, শরীরের তাপ ১০২° হইতে বেশ কয়েক ডিগ্রী বাড়িয়া গিয়াছে। চিন্তা হইল পরের দিন দুপুরবেলায় বেলগাঁও রওনা হওয়ার সময় যদি জ্বর না কমে তবে কি হইবে?

চপলাবাঈ কোনও সময়ই আমার গোয়া যাওয়ার পরিকল্পনা সুনজরে দেখেন নাই। তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন যাহাতে আমার গোয়া যাওয়া বন্ধ করা যায়। পরের দিন সৌভাগ্যক্রমে সকালবেলায় জ্বর ৯৯°— ১০০° কোঠায় নামিয়া যায়, সেই সুযোগে আপস-রফা হইল যে, ট্রেনে উঠিবার আগে আমাকে তাঁহারা কিছু পেনিসিলিন্ ইন্‌জেক্‌শন দিয়া দিবেন আর সেই রাত্রে বেলগাঁও পেঁাছিলে—তাঁহারা সেখানে ডাঃ য়াল্‌গি-কে ট্রাঙ্ক টেলিফোন করিয়া দিবেন—ডাঃ য়াল্‌গি আমার শরীরে আরও কিছু পেনিসিলিন, ঢুকাইয়া দিবেন এবং বেশি তাপ থাকিলে আমাকে যাইতে দিবেন না; বেলগাঁও হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দিবেন। আমাকে চপলাবাঈয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল, ডাঃ য়াল্‌গি যদি আমায় হাসপাতালে ভর্তি করিতে চান আমি আপত্তি করিতে পারিব না।

জ্বরের ইতিহাস এত দিতেছি কেন? আমার জ্বর হওয়ার ফলে গোয়া ঢোকার পর নিতাই গুপ্তের হাত ভাঙে। আমার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া সে জাতীয় পতাকা বহন করিতেছিল। আমাদের দলের স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর তাহার উপরেই পর্তুগীজ পুলিসের আক্রমণ প্রথম আসিয়া পড়ে। আমার দলের সঙ্গে বাঙলা দেশ হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে শ্রীমান অজিতপ্রসাদ দলভ্রষ্ট হইয়া হারাইয়া ক'দিন বাদে একা একা গোয়ার ভিতর গিয়া প্রবেশ করে এবং ভারতীয় মিলিটারী গুপ্তচর সন্দেহে পর্তুগীজ পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া তাহাকে সবার চেয়ে বেশি নাজেহাল হইতে হয়। আমার জ্বর না হইলে সে চট করিয়া চোখের আড়াল হইত না; বেশির ভাগ সময়ে সে আমার পাশাপাশি চলিতে চলিতে কখন পিছাইয়া পড়ে খেয়াল হয় নাই। আরও অনেক কিছু ঘটনা এই জ্বরের সঙ্গে জড়িত। কাহিনী একটু অগ্রসর হইলে সেইসব কথা ক্রমে সামনে আসিবে।

পুণা হইতে রওনা হওয়ার সময় শ্রীযুক্ত আত্মারাম পাতিল বিমোচন সমিতির পক্ষ হইতে আমাদের সঙ্গে। তিনি নিজে সপ্তাহ তিনেক আগে গোয়া পুলিস হাজত হইতে সদ্য ছাড়া পাইয়াছেন। বেলগাঁওয়ে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত পিটার আলভারিস্‌কে আমি অবশ্য বহুদিন হইতেই জানিতাম। প্রথমে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, পরে সোস্যালিস্ট এবং প্রজা-সোস্যালিস্ট হিসাবে তাঁহার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। কিন্তু তিনি তখন আমার গোয়া প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে গোয়া সীমান্তের কাছে অন্‌মুড় নামে একটি জায়গায় গিয়াছেন। বেলগাঁও হইতে অন্‌মুড় ৮৪ মাইল দক্ষিণে। পিটার সেইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কাজে কাজেই বিমোচন সমিতি শ্রী পাতিলকে আমাদের সঙ্গে যাইতে বলেন। বেলগাঁওয়ে পেঁাছিয়া যাহাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়, সেইজন্য শ্রী পাতিলের আমাদের সঙ্গে আসার খুবই দরকার ছিল। শুধু বেলগাঁও নয় অন্‌মুড়ের কাস্টমস্ পোস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ গোয়া-সীমান্ত অতিক্রমের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

৮ই জুলাই রাত্রি প্রায় ১১৷৷টা/১২টার সময় আমাদের ট্রেন বেলগাঁওয়ে আসিয়া থামিল। দুপুর রাত্রি হইলেও অভ্যর্থনা ও বিদায় সম্বর্ধনার পালা বেলগাঁওয়েও যথারীতি

অনুষ্ঠিত হইল। ডাঃ য়াল্‌গি চপলাবঈয়ের ট্রাঙ্ক কল্‌ পাইয়া স্টেশনেই পেনিসিলিন ইনজেক্‌শনের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া হাজির ছিলেন। গায়ে তখন আমার জ্বর নাই বলিলেও হয়। যাই হোক, টেম্পারেচার লইয়া স্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসাইয়াই তিনি আমার শরীরে আবার পেনিসিলিন ফুঁড়িয়া দিলেন। য়াল্‌গি আকারে ছোটখাটো মানুষটি। কিন্তু ডাক্তারী ব্যাপারে খুবই কড়া। মনে মনে আমি তখনো কিছুটা নার্ভাস হইয়া আছি—য়াল্‌গিকে চপলাবাঈ ফোনে টিপিয়া না দিয়া থাকেন! ভয়ে ভয়েই তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন দেখিতেছেন? আমি তো বেশ সুস্থ-স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছি; গায়ে জ্বরও নাই। আশা করি, আমায় হাসপাতালে আটক করিবেন না?" ডাঃ য়াল্‌গি উত্তর দিলেন—"আই হোপ নট।" তারপর ডাক্তার গম্ভীর হইয়া এই ধরনের জ্বর লইয়া বৃষ্টিতে ভিজিলে কি কি দুর্গতি হইতে পারে, তাহার ফিরিস্তি দিয়া খুব লম্বা ধরনের একটি বক্তৃতা দিলেন। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কিয়াল কাটার্‌, প্লুরিটিক্‌ ইন্‌ফ্লামেশন ইত্যাদি রোগের নাম শুনিয়া সমস্ত উৎসাহ আমার প্রায় চুপসাইয়া আসিয়াছে; একটু অন্যমনস্ক হইয়া যদি নাই যাওয়া হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে, সেইকথা ভাবিতেছি। অন্য লোকে কি ভাবিবে, অসুখের কথাটাকে নেহাৎ খেলো ধরনের অজুহাত মনে করিবে কি না এইসব প্রশ্ন মনে উঠিতেছে, এমন সময় কানে গেল ডাঃ য়াল্‌গি বলিতেছেন—"but if you really feel as you say, then I see no reason why you will not be able to stand the strain." ("আপনার শরীর যে রকম বোধ করিতেছেন বলিয়া আপনি বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলে গোয়া যাওয়ার ধকল আপনি সহ্য করিতে পারিবেন না এইরূপ ভাবার কোন কারণ দেখিতেছি না")। আমি চেয়ার হইতে চট্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, নিজের অজান্তে বাঙলায় মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে"

য়াল্‌গি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হোয়াট? হোয়াট ডু ইউ সে?"

আমি বলিলাম—"না, আমি আপনার কথাই বলিতেছি। কেন গোয়ায় যাওয়ার ধকল আমি লইতে পারিব না, তাহা বুঝিতেছি না। শরীর আমার বেশ ভাল আছে।"

ঈশ্বরবিশ্বাসী বন্ধুরা আমার এই মিথ্যাচরণে আশা করি ক্ষুব্ধ হইবেন না। তাঁহারা সঙ্গতভাবেই এইকথা আমায় বলিতে পারেন, "হায় মূর্খ! গোয়ায় গিয়া জেলবাস যদি কৃষ্ণ কপালে লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন চপলাবাঈ, কোন য়াল্‌গির সুপরামর্শই যে তোমায় আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না—তাহা কি জানিতে না?"

সত্যই সেইদিন তাহা জানিতাম না।

ভলাণ্টিয়ারদের সকলকে তখন গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটি ট্রাকে করিয়া থালাকওয়াড়ীতে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় অফিসে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ডাঃ য়াল্‌গি আমাকে তাঁহার গাড়িতে করিয়া সেইখানে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রেই আমাদের বেলগাঁও হইতে মোটর-লরীতে করিয়া অন্‌মূড় পেঁছাইতে হইবে। ভোর সাড়ে চারটা হইতে পাঁচটার মধ্যে, রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই আমরা সীমান্ত লঙ্ঘন করিব—সেই ব্যবস্থা আছে—সোজা পথে না গিয়া গোপনে পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া গোয়ার ভিতরে লোকালয়ের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে। আমাদের আসল সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে সীমান্ত লঙ্ঘনের ভিতর দিয়া নয়, গোয়ার লোকালয়ে গিয়া, গোয়ার

মুক্তিকামী জনসাধারণের পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। পর্তুগীজ পুলিসকে অগ্রাহ্য করিয়া গোয়ার স্বাধীনতার কথা সেইখানে গিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রথম সীমান্ত অতিক্রম করিতে দেরি করিলে চলিবে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, পর্তুগীজ সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া সীমান্ত পার হইয়া ভিতরে ঢুকিতে হইবে।

থালাক্ওয়াড়ীর অফিসে স্বেচ্ছাসেবকদের নাম-ঠিকানা লেখানো হইতেছিল। যদি কোন বিপদ-আপদ বা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে কোথায় খবর দিতে হইবে, গোয়া হইতে যদি পর্তুগীজরা তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে বাড়ি ফিরিবার সময় কে কোথায় যাইবে—সেইসব ব্যাপারে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের অফিসে রেকর্ড রাখারা ব্যবস্থা ছিল। পর্তুগীজেরা সাধারণ ভলাণ্টিয়ারদের ধরিয়া রাখিবে না, এত লোক আটক করিয়া রাখার মত জায়গা তাহাদের নই। সুতরাং বেশিরভাগ লোককেই তাহারা মারধোর করিয়া তাড়াইয়া দিবে, সেইটা সকলে ধরিয়া লইয়া গোয়া কংগ্রেসের অফিসে নিজেদের বিছানাপত্র কাপড়-চোপড় এমন কি টাকা-পয়সা পর্যন্ত জমা দিয়া যাইতেছিল। বাড়তি জিনিসের বোঝা বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়াও অসুবিধা। তাছাড়া পর্তুগীজরা গোয়ার এলাকা পার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার সময় যা কিছু স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে থাকে সব কাড়িয়া লইয়া উলঙ্গপ্রায় করিয়া ছাড়িয়া দেয় বলিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের জিনিসপত্র থালাক্ওয়াড়ীতে রাখিয়া যাওয়া স্থির হয়।

এইসব কাজ শেষ হইলে পর প্রায় ১টার সময় আমরা সকলে প্রকাণ্ড বড় একটা লরী ভ্যানে চড়িয়া অন্মুড়ের পথে রওনা হইলাম। অত রাত্রে অন্মুড়ের পথের দৃশ্য দেখা সম্ভব হয় নাই। আব্ছা আলো-আঁধারে এইটুকু বুঝিতেছিলাম যে, পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া কাটা পথে লালমাটির ও পাথরের দেশের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। বেলগাঁও হইতে ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের মত পথ পিচ্ বাঁধানো পরিষ্কার রাস্তাই ছিল। তাহার পর বাকী চল্লিশ মাইল পাথরের খোয়া বাঁধানো পাকা রাস্তা।

ড্রাইভারের পাশে সামনের সীটে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে চলিয়াছি। গাড়ির ঝাঁকিতে কখনো কখনো তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেছে, তবু আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছি। গাড়ি চলিতেছেই—হঠাৎ একবার আচম্কা ঝাঁকি দিয়া গাড়ি থামিয়া গেল। আত্মারাম পাতিল পাশে বসিয়াছিলেন—ডাকিয়া বলিলেন, "এইবার নামিতে হইবে আমরা অন্মুড় পৌঁছিয়াছি। ভোর তখন প্রায় সাড়ে চারটা। আকাশে পাত্লা মেঘ থাকিলেও ফিকা আলোয় চারিদিক অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। পূর্বদিক অনেকটা ফরসা হইয়া আসিয়াছে। বাহিরে নামিয়া দেখি কাস্টমস্ পোস্টের বাঙলো হইতে পিটার আলভারিস বাহির হইয়া আসিতেছেন। স্বেচ্ছাসেবকেরাও ঝপাঝপ্ লরী হইতে লাফ দিয়া দিয়া নামিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতেছে। গোয়া কংগ্রেসের কিছু তরুণ কর্মী সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া লওয়ার জন্য বাঙলোর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পিটার জানাইলেন, আর সময় নাই, এখনি বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। পাঁচটায় রওনা হইতেই হইবে। আর আধ ঘণ্টা! আর সময় নাই! আমাদের সম্মুখে গোয়া সীমান্ত!

॥ ৫ ॥

গেরিলা সত্যাগ্রহ : 'চলা! পুঢ়ে চলা!'

অন্‌মুড় জায়গাটা (ইংরাজীতে Anmode লেখা হয়) পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বা সহ্যাদ্রির একেবারে গায়ে লাগা। আমরা যখন অন্‌মুড়ে আসিয়া পেঁছাইলাম তাহার অল্প কিছুক্ষণ আগে বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া আকাশের মেঘ অনেকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। মেঘ-মেদুর আকাশের ভোর; সেই ভোরের ঝাপসা আলোয় একবার চারিদিকটা দেখিয়া নিলাম।

পাহাড়ী দেশের ঘন ঝাঁকড়া জঙ্গল আর তার ছোট-বড় গাছের পাতা হইতে তখনো টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির জল চোয়াইয়া পড়িতেছে। মোটর লরীর সীট হইতে হঠাৎ বাহিরে নামিয়া আসিয়া ভোরের ঠাণ্ডা জোলো হাওয়ায় একটু শীত শীত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও শরীর, মন দুই-ই বেশ হাল্কা ও সতেজ বলিয়া বোধ হইতেছিল। এখনি আমাদের সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ হইয়া যাইবে, আর সময় নাই। আধ ঘণ্টার ভিতর তাড়াতাড়ি তৈরি হইয়া রওনা হইতে হইবে—এইসব কথা মনে করিয়া হয়ত মনে মনে কিছুটা উত্তেজনাও ছিল। সেই উত্তেজনার দরুণ হোক্, আর পেনিসিলিনের গুণেই হোক্, জ্বরের সমস্ত গ্লানি তখন যেন ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। শরীর আবার আগের মত সতেজ, সচল হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ মনে হইতে লাগিল।

লরী হইতে নামিয়া কাস্টম্‌স বাঙলোর সামনে যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেটা সহ্যাদ্রি পাহাড়ের গোড়া। বর্ষার সবুজ জঙ্গলে ঘেরা গাঢ় রংয়ের লালমাটির দেশ। এক হিসাবে বেলগাঁও হইতে লালমাটির দেশ প্রায় আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। গতকাল রাত্রিতে ভালো করিয়া দেখি নাই, মহারাষ্ট্রের কালোমাটি এখানে কোঙ্কনী পাহাড়ের রক্ত-গৈরিক রঙে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের কোলের কাছে বালিয়া জমি ক্রমশ উঁচু হইয়া উপরের দিকে চড়াইয়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। তাহার ভিতর দিয়া গোয়ার দিকে যাওয়ার বাঁধানো রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। এখানকার রাস্তা কালো পাথরের খোয়া আর লাল ল্যাটেরাইট পাথরের নুড়ি বা ঘুটিং দিয়া বাঁধানো পাকা রাস্তা হইলেও বৃষ্টির দিনে লালমাটির জল আর কাদায় মাখামাখি হইয়া পুরাপুরি লাল হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার অন্য রং দেখা যায় না। অন্‌মুড়ের কাস্টম্‌স বাঙলোর সম্মুখ দিয়া এই রাস্তাই আরও কিছুদূর গিয়া গোয়ার পর্তুগীজ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার আগে অন্‌মুড়ের উপর দিয়া এই পথে গোয়ার ভিতর হইতে মোটর বাস, মালবাহী লরী, গরু-মহিষের গাড়ি, এইসব যাওয়া-আসা করিত। বেলগাঁও হইতে এই পথে গোয়ায় আসা-যাওয়া করিতে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগিত। তাই এই পথই ছিল বেলগাঁও হইতে গোয়ায় তরিতরকারি ও অন্যান্য মালপত্র চালান দেওয়ার প্রধান রাস্তা। অন্‌মুড়ে একটি কাস্টম্‌স পোস্ট এবং ডাক বাঙলো রাখার কারণও ছিল এই রাস্তা। এখন সে রাস্তা বন্ধ; বাস-লরীও বন্ধ। কাস্টম্‌স বাঙলোও তাই এখন খালি। তবু বর্ডার পার হইয়া শুল্ক ফাঁকি দিয়া যাহাতে চোরাই চালান কারবার না

চলিতে পারে, তার জন্য ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের সশস্ত্র প্রহরীরা গোয়া-ভারত সীমান্ত বরাবর, পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতরে, দু মাইল, চার মাইল অন্তর অন্তর, ছোট ছোট একটি পোস্ট বা ছাউনী তৈরি করিয়া বর্ডার পাহারা দেয়। কিন্তু তাহার জন্য অনুমুড়ে কোন বড় চুঙ্গী অফিস বা চেক্ পোস্ট রাখার দরকার করে না। কাস্টম্স বাঙলোতে এখন তাই শুল্ক বিভাগের কোনো বড় অফিসার বা দারোগাবাবুদের আড্ডা নাই। পিটার আল্‌ভারিস্ ও গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস সেই কারণেই এখানে বিনা ঝামেলায় আসিয়া তাঁহাদের 'টেম্পোরারি' আস্তানা গাড়িতে পারিয়াছেন। আমাদের বর্ডার পার করিয়া দিয়া তিনি বেলগাঁও ফিরিবেন। ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা এইসব দেখিয়াও দেখিতেছেন না। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে সব বর্ডারেই আজকাল এইরকম হইতেছে। সরকার না হোন, অন্তত সরকারী কর্মচারীরা সকলেই গোয়া-মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আন্তরিকভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন। কিছু-না-কিছু সাহায্য সবারই কাছে পাওয়া যাইতেছে। এমন কি, বাঙলোর পিওনটাকে পর্যন্ত কিছু পয়সা দিয়া, পিটার বর্ষার সেই ঠাণ্ডা ভোরে আমাদের জন্য চায়ের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছেন!

লরী হইতে নামিয়া আমায় বাহিরে বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হয় নাই। কিছুটা চায়ের লোভে, আর কিছুটা পিটারের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজের কথাবার্তা সারিয়া লইবার জন্য, আমি পিটারের সাথে সাথেই বাঙলোর ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিলাম। ঘরের মেঝেতে তখনও চার-পাঁচজন লোক ঠাণ্ডায় চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। টেবিলের উপরে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। চা আসিয়া গেল। সদ্য জ্বর ছাড়া শরীরে, বর্ষা ভোরের ঠাণ্ডার ভিতর, চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া পিটারকে মনে মনে কত যে ধন্যবাদ দিলাম, তা না বলিলেও চলে। যাহারা ঘুমাইয়া ছিল, পিটার তাহাদের মধ্য হইতে দু'জনকে জাগাইয়া দিলেন। তাহারা আমাদের গাইড। গোয়ার ভিতর হইতে তাহারা আসিয়াছে আমাদিগকে পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া লোকালয়ে পেঁছানোর পথ দেখাইয়া দিবার জন্য। পিটার তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মারাঠী-কোঙ্কনী দুই ভাষায় মিশাইয়া পিটার তাহাদের কি বলিলেন, তাহারাই বা উত্তরে কি বলিল, কিছুই বুঝিলাম না। শুধু 'পুঢ়াঁরী,' 'পুঢ়াঁরী'; 'ওয়াল্‌পই', 'ওয়াল্‌পই';—এই রকমের কয়েকটি কথা কানে গেল। পরে পিটার আমাকে যা বলিলেন, তাহা হইতে এইটুকু বোঝা গেল যে, আমাকে পিটার তাহাদের কাছে সত্যাগ্রহী দলের নেতা বা অধিনায়ক বলিয়া চিনাইয়া দিতেছিলেন; 'পুঢ়াঁরী' কথার অর্থ নেতা। তাহাদেরকে পথে আমার কথা শুনিয়া কাজ করিতে হইবে সেই কথা তিনি তাহাদের বুঝাইয়া দিতেছিলেন। তাহাদের উপর নির্দেশ—তাহারা আমাদের গোয়ার ভিতরে গিয়া 'ওয়াল্‌পই' বাজারের দিকে যাওয়ার পথ ধরাইয়া দিবে। তাহারা নিজেরা আমাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যাইবে না; 'ওয়াল্‌পই'য়ের পথ ধরাইয়া দিয়া আমাদের ছাড়িয়া দিবে।

গাইড্ দু'জন গোয়া নাশনাল কংগ্রেসের সমর্থক দু'জন কৃষক যুবক। রাজনীতি খুব ভাল জানে না বা বোঝে না। তবে এইটুকু জানে যে, হিন্দুস্থান বা ভারত তাহাদের নিজেদের দেশ আর গোয়া তাহারই অন্তর্গত একটি ছোট অংশ মাত্র। গোয়া আর ভারতবর্ষ যে আলাদা, কথায় বার্তায়, আচারে ব্যবহারে, ধর্মে—সেই কথা কখনো তাহারা মনে করিতে পারে না; তাহাদের মনে সেইকথা ওঠা সম্ভবও নয়। গোয়ার রাজধানী পঞ্জিম (মারাঠীরা বলে 'পঞ্জী', কোঙ্কনী অনুনাসিকে 'পঞ্জীঁ' বা গোয়ার ভিতরকার বড় শহর মাপ্‌সা,

মাড়গাঁও এইসব জায়গায় তাহারা দু-চারবার গিয়াছে। এইদিকে বেলগাঁও পর্যন্ত দু-একবার ঘুরিয়া গিয়াছে। বেলগাঁও যে পাঞ্জিম মাড়গাঁও মাপ্সার চেয়ে অনেক বড় শহর, পুণা, বোম্বাই, দিল্লী, এইসব আরও বড়—এইসব ধারণাও তাহাদের আছে। ভারত এখন 'স্বতন্ত্র' হইয়া গিয়াছে, ইংরাজের রাজত্ব আর সেখানে নাই, সেকথা তাহারা জানে। 'মহাত্মা গান্ধী' ভারতের সবচেয়ে বড় 'পুঢ়াঁরী' ছিলেন। এখন পণ্ডিত নেহরু সেই জায়গায় আছেন। তিনি ভারতবর্ষের 'পন্ত্-প্রধান' (মারাঠী-কোঙ্কনী কথা; অর্থ প্রধানমন্ত্রী); তাঁহার খুবই ক্ষমতা। পর্তুগীজ 'পাখ্লো'রা (=গোরা আদমী; সাদা চামড়ার লোক) যদি ভালোয় ভালোয় গোয়া ছাড়িয়া বিদায় না হয় তাহা হইলে পণ্ডিতজী শীঘ্রই এদেশ হইতে তাহাদের বিতাড়িত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। তবে সেই সঙ্গে গোয়ার ভিতরে গোয়ার লোকদেরও লড়িতে হইবে বই কি? গোয়ার ভিতরেও লোকে লড়িবে ও লড়িতেছে। হিন্দুস্থান হইতেও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সত্যাগ্রহীরা দলে দলে আসিতেছে। আর বেশি দেরি নাই। গোয়াও ভারতের মত 'স্বতন্ত্র' হইয়া 'স্বতন্ত্র' ভারতের মধ্যে 'বিলীন' হইয়া যাইবে (মারাঠী পরিভাষায় বিলীন মানে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাওয়া, merged হইয়া যাওয়া। কোঙ্কনীতেও মারাঠী ভাষায় এই সব কথা একই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়)। মোটের উপর, গোয়ার গ্রামাঞ্চলের সাধারণ হিন্দু কৃষিজীবীদের মতো আমাদের গাইড্ দুজনেই 'পাখ্লো' বা 'মিস্তী'দের (=ট্যাঁশ ফিরিঙ্গী; 'মিস্তী' কথাটা পর্তুগীজ 'মিস্তো' misto হইতে আসিয়াছে। অর্থ mixed বা মিশ্র জাতি) উপর বেজায় চটা। উহাদের দাপটে গোয়ায় বাস করা কঠিন। সেই 'পাখলো'দের তাড়ানোর জন্য সত্যাগ্রহীরা লড়াই করিতেছে। সুতরাং তাহাদের সর্বরকমে সাহায্য করা উচিত—এই ধরনের যুক্তি ও চিন্তাধারার ফলে তাহারা ক্রমে ক্রমে গোয়ার জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থকে পরিনত হইয়াছে। গোয়া-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলের এই সব কৃষিজীবী গ্রাম্য লোকেরাই গোয়ার সীমান্তের চারিপাশে অবস্থিত সাবন্তওয়াড়ি, বান্দা, ডোডামার্গ, এমন কি কখনো কখনো বেলগাঁও আর দক্ষিণে কারওয়ার পর্যন্ত আসিয়া গোয়ার জাতীয় আন্দোলনের গুপ্ত সংগঠকদের জন্য ভারত হইতে গোপনে খবরাখবর লইয়া যাইত; প্রয়োজন মত গোয়ার ভিতরের খবর ভারতে পেঁছাইয়া দিয়া যাইত। পর্তুগীজ পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া ভারত হইতে ইহারাই আন্দোলনের হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার, প্রচারপত্র এইসব লুকাইয়া গোয়ার ভিতরে লইয়া যাইত। সত্যাগ্রহীদের আন্দোলনের কোন সংগঠককে এইদিক হইতে পথ চিনাইয়া গোয়ার ভিতরে লইয়া যাওয়ার লোকের দরকার পড়িলে গাইড্ হইয়া আসিত এই সব লোকেরাই। কারণ ভারত-গোয়া সীমান্তের দুইপাশের সকল পথ তাহাদের যত ভাল করিয়া জানা আছে, এমন আর কাহারও নয়।

যে কাজে তাহারা দুইজনে আসিয়াছে—কোনমতে জানাজানি হইলে বা পুলিসে সন্দেহ করিলে—হাজতে বন্দী হইয়া চোরের মার খাইতে হইবে, সহজে উদ্ধার পাওয়া যাইবে না, তাহা তাহারা ভাল করিয়াই জানিত। গোয়ার শিক্ষিত-অশিক্ষিত কাহারও সেকথা তখন অজানা থাকা সম্ভব ছিল না। ১৯৫৪ সালের পর হইতে গোয়ায় প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে পর্তুগীজ পুলিস রাজদ্রোহের সন্ধানে, কিংবা পর্তুগালের বিরুদ্ধে গোয়ার জাতীয়তাবাদীদের ষড়যন্ত্রের সন্ধানে খানাতল্লাসী চালাইয়া গিয়াছে; নির্বিচারে সকলকে মারধোর, গ্রেপ্তার করিয়াছে। সন্দেহক্রমে ধরা পড়িয়া কিছুদিন হাজতে থাকিয়া আসিয়াছে, কিংবা পুলিস হেড কোয়ার্টারে গিয়া ভাল রকম মারধোর খাইয়া

ফিরিয়া আসিয়াছে—এইরকম লোক দু'চারজন করিয়া প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই তখন ছিল। 'রাজকরণ' অর্থাৎ 'স্বদেশী' বা 'পলিটিক্সের' সন্দেহে যদি পুলিস একবার ধরে, তাহা হইলে অব্যাহতি নাই, এইটুকু অন্য সকলের মত আমাদের গাইড-রাও জানিত। কিন্তু এইসব বিপদ ও ঝুঁকির কথা জানিয়া শুনিয়াও তাহারা ভয় পায় নাই বা পিছায় নাই।

পিটারের সঙ্গে মোটামুটি কথাবার্তা শেষ হইয়া যাওয়ার পর গাইড্ দু'জনেই হাত-মুখ ধুইয়া রওনা হইবার জন্য তৈরি হইয়া নিতে বাহিরে গেল। তখন বাহিরে আসিয়া দেখি আমাদের পরিচিত পুরাতন বন্ধু আত্মারাম পাতিল ইতিমধ্যে আমাদের দলের ভলান্টিয়ারদের হাত-মুখ ধোয়াইয়া, সত্যাগ্রহে রওনা হওয়ার আগে সেইদিনকার মত, সারা দিনমানের খাবার খাওয়াইয়া দিবার জন্য সারি বাঁধিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। আত্মারাম অভিজ্ঞ লোক, ক'দিন আগে মাত্র তিনি গোয়া হইতে ছাড়া পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়ার জন্য তিনি একেবারে পুণা হইতে আসার সময় 'ভাক্রি' (জোয়ারের রুটি), পরোটা ও কিছু সব্জি তরকারি, নিজের পরিচিত ভাল দোকান হইতে ফরমায়েস দিয়া তৈরি করাইয়া, ট্রেনে নিজের হেফাজতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। বনে-জঙ্গলে বা পরে, পর্তুগীজদের হাতে ধরা পড়িলে, হাজতে আবার কখন খাওয়া জুটিবে বলা শক্ত। পথও হাঁটিতে হইবে অনেকটা। তাছাড়া পর্তুগীজরা গ্রেপ্তারের পরে বেশির-ভাগ লোককেই হয়ত সেই দিনই কিংবা পরের দিন বর্ডার পার করিয়া বনে-জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়া যাইবে। তখন ভারতীয় এলাকায় লোকালয়ে পৌঁছিয়া, কাহার ভাগ্যে কখন কোথায় খাবার জুটিবে তাহা আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। কাজে কাজেই রওনা হওয়ার আগে, সত্যাগ্রহীদের সকলেরই কিছু কিছু করিয়া খাওয়াইয়া দেওয়ার ববস্থা করা হইয়াছিল। আমি নিজে আর তখন সদ্য জ্বরের পরে পরেই 'ভাক্রি' বা পরোটা খাওয়া সঙ্গত মনে করিলাম না—আর এক কাপ চা খাইয়া চাঙ্গা হইয়া নিলাম।

তখনও পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, অন্মুড় বাঙলোর সামনের পথ দিয়াই আমাদের সোজা রাস্তায় গোয়ায় ঢুকিতে হইবে। কিন্তু সেভাবে কোন নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী দলের পক্ষে যে কিছুতেই গোয়ার ভিতরে ঢোকা সম্ভবপর নয়, সেকথা আমি ভাবিয়া দেখি নাই। আমাদের সীমান্তরক্ষীরা যদি আমাদের কোন বাধা নাও দেয় (১৮ই মে গোরের সত্যাগ্রহ অভিযান হইতে আরম্ভ করিয়া আমার গোয়া যাওয়ার সময় পর্যন্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞা আইনত জারী থাকিলেও ভারতীয় পুলিস এ পর্যন্ত কোন ভারতীয় সত্যাগ্রহী দলকেই গোয়ার ভিতরে যাইতে বাধা দেয় নাই), 'নো ম্যানস ল্যান্ড' বা উভয় সীমান্তের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ এলাকাটুকু পার হওয়ার পর পর্তুগীজরা তাহাদের এলাকায় আমাদের কেন অমনি ঢুকিতে দিবে? এটা অবশ্য সহজ বুদ্ধির কথা। কিন্তু তাহা হইলেও আমার তাহা খেয়াল হয় নাই। সোজা পথে সত্যাগ্রহ করিতে চাহিলে সীমান্ত পর্যন্ত হয়ত যাওয়া যাইবে; এমন কি 'নো ম্যানস ল্যান্ড'টুকুও অতিক্রম করিয়া পর্তুগীজদের দরজার গোড়া পর্যন্ত পৌঁছানো যাইবে। কিন্তু তারপর?

কাজে কাজেই গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ ব্যাপারে কৌশল ছিল—সোজা পথে না গিয়া, যতটা পারা যায় পর্তুগীজ সীমান্তরক্ষী পুলিস বা মিলিটারীর দৃষ্টি এড়াইয়া, গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করা, ও তাহার পর গোয়ার ভিতরে লোকালয়ে পৌঁছাইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা। অর্থাৎ খালি সীমান্ত লঙ্ঘন করিলেই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সফল বা শেষ হইল না। সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়ার ভিতরে গিয়া সেখানকার জনসাধারণের

চোখের সামনে সকলের জ্ঞাতসারে পর্তুগীজ পুলিস বা সরকারী কর্তৃপক্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহাদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া গোয়াবাসীদের ভিতরে গোয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন বা প্রচার চালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং সীমান্তের উপরে ধরা পড়িয়া গেলে চলিবে না। কোনমতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া লোকালয়ে গিয়া লড়িতে হইবে।

আমাদের এই সত্যাগ্রহের এক দিক ছিল গোপনে ভারত-পর্তুগীজ সীমান্ত অতিক্রম করার দিক বা পুলিস ও সীমান্তরক্ষীদের ফাঁকি দিয়া গোয়ার ভিতরে ঢোকার দিক। দ্বিতীয় দিক ছিল, (গোয়ার ভিতরে গিয়া লোকালয়ে পেঁছানোর পরে) পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার দিক। এই দ্বিতীয় দিককে যথারীতি সত্যাগ্রহ বলা গেলেও, এই সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া আমরা যেভাবে গোপনে পুলিস ও সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ এড়াইয়া চুপিসারে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করিতাম, তাহাকে নীতিগতভাবে গান্ধীজীর পরিকল্পিত অহিংস সত্যাগ্রহের সঙ্গে কতখানি তুলনা করা যায়, বা প্রকৃত অর্থে 'সত্যাগ্রহ' বলা যায়, সে বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমি তাই আমাদের এই সত্যাগ্রহের নাম দিয়াছি "গেরিলা সত্যাগ্রহ"। কারণ, আমাদেরও 'গেরিলা যুদ্ধের' সৈনিকদের মত প্রথমে শত্রুর এলাকায় গোপনে প্রবেশ করিয়া তারপর লড়াই শুরু করার নীতি ছিল। অবশ্য একথাও এখানে স্বীকার করা ভাল যে, অহিংস সত্যাগ্রহের মৌলিক আদর্শগত বিচার ছাড়িয়া দিলে, বাস্তব ও ব্যবহারিক রাজ-নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে আন্দোলনের স্বার্থে এইভাবে পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে সীমান্ত লঙ্ঘন করার মধ্যে আমি নিজে দোষের কিছু দেখি না। তাই সত্যাগ্রহ অভিযানে রওনা হওয়ার অল্পক্ষণ আগে যখন জানিতে পারিলাম যে, আমরা পাকা সড়ক দিয়া মামুলি সত্যাগ্রহের পথে অগ্রসর হইতেছি না, তখন তাড়াতাড়ি করিয়া অভিযাত্রী দলের ভিতর অপেক্ষাকৃত দায়িত্বশীল ও পরিচিত বা বয়স্ক, যে কয়জন ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাদের গোটা দলটাকে সেইভাবে সাজাইয়া নিলাম। গাইড্দের দো-ভাষীর সাহায্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বুঝিলাম যে, পথ খুবই দুর্গম হইবে এবং পাহাড়ের উপর দিয়া বেশ কয়েকটা চড়াই-উতরাই পার হইয়া তবে লোকালয়ে পেঁছা সম্ভব হইবে।

আমাদের চলার পথে জঙ্গল যে খুব ঘন রকমের হইবে, তাহা তো চারিদিকে তাকাইয়া নিজের চোখেই দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু যে বিপদের কথাটা কেউ এতক্ষণ বলে নাই, এখন হঠাৎ সেটা কানে গেল। শুনিলাম গাইড্দের মধ্যে একজন বলিতেছে—গায়ে, হাতে-পায়ে তামাকের গুঁড়া ও কেরোসিন মাখিয়া নিতে পারিলে ভাল হয়; তাহা না হইলে জোঁকের উপদ্রবে পথ চলা সম্ভব হইবে না। বলে কি? পিটারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? ডাঃ সালাজার, সালাজারের গেস্টাপো দুর্দান্ত Pide বা ইণ্টারন্যাশন্যাল পুলিস, সিকিউরিটী পুলিস, Pide-র ইন্সপেক্টর অলিভেইরা, পুলিস কমাডাণ্ট রুম্বা, গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মন্তেইরো সকলের কথাই এই কয় দিনে কমবেশি যাহোক শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কই, পথে জোঁকের কথা তো কেহ আগে জানান নাই! এখন কোথায় কেরোসিন পাই আর কোথায় তামাক পাতার গুঁড়া পাই? তাড়াতাড়িতে যহোক কি করিয়া এক বোতল কেরোসিন ডাকবাঙলোর পিওনের কাছেই পাওয়া গেল। কয়েকটা সিগারেটও স্বেচ্ছাসেবকদের কারো কারো কাছ হইতে চাঁদা করিয়া সংগ্রহ হইল।

যে যা পারে, সেই কেরোসিন আর সিগারেটের তামাকের গুঁড়া, প্রত্যেকে মনকে প্রবোধ দিবার জন্য একটু একটু করিয়া, পায়ে ও হাতে মাখিয়া নিল—তাহাও সকলের ভাগ্যে জুটিল না! অবশ্য তাহাতে তাহাদের আফসোস করার মতো কিছু হয় নাই। কারণ আমরা যে কয়জন জোঁকের প্রতিষেধক হিসাবে কেরোসিন ও সিগারেটের তামাক হাতে-পায়ে লেপিয়াছিলাম, কার্যকালে দেখা গেল জোঁকের উপদ্রবে ভুগিয়াছে তাহারাই সবচেয়ে বেশি। কারণ রওনা হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে, মুষলধারে বৃষ্টির ভিতর দিয়া চলার ফলে, সেই কেরোসিন আর তামাক সব ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যায়। পরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বা ঘন বুনো ঘাসের ভিতর দিয়া চলার সময় গাছ হইতে টপাটপ লাফ দিয়া যেভাবে জোঁক গায়ে হাতে মাথায় পিঠে জামার ভিতর এবং শরীরে সর্বত্র আসিয়া লাগিতে আরম্ভ করিল, তখন কে কেরোসিন মাখিয়াছে, আর কে মাখে নাই, সে হিসাব-নিকাশ নিবার অবকাশ কাহারও হয় নাই।

রওনা হওয়ার সময় যখন আসিল, পিটার তাড়াতাড়ি তাঁহার নিজের গরম পুলোভার এবং শক্ত চপ্পল জোড়া আমায় নিতে বলিলেন। আমার পায়ে একজোড়া পুরানো এলবার্ট পাম্পশু ছিল। পিটার বলিলেন, হাল্কা চপ্পল না নিলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া এই এলবার্ট জুতা এত ভারি হইয়া উঠিবে যে, উহা পায়ে দিয়া বেশিদূর হাঁটা সম্ভব হইবে না। চপ্পল নেওয়াই সুবুদ্ধির লক্ষণ মনে করিয়া আমার এলবার্ট পিটারকে দিয়া আমি তাঁহার চপ্পলে পা ঢুকাইলাম। আমার গোয়ার উনিশ মাস বাসের বেশিরভাগ সময় এই মজবুত চপ্পলটি আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। পুলোভারটি পথে খোয়া যায়।

ইহার অব্যবহিত পরে বোধহয় পাঁচটা বাজিয়া পাঁচ বা দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা হইয়া পড়ি। গাইড্‌দের সঙ্গে রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার পর আমরা ইহা স্থির করি যে, আমরা পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলার সময় যতটা সম্ভব একজনের পিছনে একজন এই হিসাবে 'সিঙ্গল ফাইলে' অগ্রসর হইব। কারণ তাহা না হইলে একবার ঘন জঙ্গলের সরু আঁকাবাঁকা পথে ঢুকিলে, আর লাইন ঠিক রাখিয়া চলা সম্ভব হইবে না এবং কেউ কোথাও ছিটকাইয়া পড়িলে তাহার সন্ধান করাও যাইবে না। অবশ্য পরে পাহাড়ে আসল জঙ্গলের পথে যখন আমরা ঢুকিলাম, তখন কার্যত দেখা গেল আগে হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া আসার কোন দরকার আমাদের ছিল না। পাহাড়ের শ্যাওলা-পড়া পাথর আর পিছল মাটির উপর দিয়া ঘন কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ দুর্গম সেই পথে সিঙ্গল ফাইল ছাড়া অন্যভাবে যাওয়া যায় না। সিঙ্গল ফাইলে চলিতে গেলেও ধপাধপ আছাড় খাইয়া একে অন্যের ঘাড়ের উপর পড়িতে হয়।

রওনা হওয়ার সময়েই এটা ঠিক করিয়া নিই যে, সত্যাগ্রহী দলের পূর্বনিযুক্ত চালক বা অধিনায়ক হিসাবে আমি সবার আগে দলের সম্মুখে থাকিব। আমার সঙ্গে আমার সহকারী হিসাবে এবং পতাকাবাহী হিসাবে থাকিবেন বাংলার স্বেচ্ছাসেবক ও আমার পরম স্নেহভাজন নিতাই গুপ্ত ও শ্রীমান অজিত ভৌমিক। তাহাদের পরে থাকিবে কে. কুমার পিল্লাইয়ের নেতৃত্বে আগত কেরালার স্বেচ্ছা-সৈনিক দল, তারপর ভগৎ তুলসী-রামজীর নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ ও বিহার হইতে আগত দল। আর অভিযাত্রী দলের একেবারে শেষদিকে নাসিক ও মহারাষ্ট্রের দল। এইভাবে দল সাজাইয়া লইয়া পিটার, আত্মারাম পাতিল ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কোলাকুলি করিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া আমরা রওনা হইয়া পড়িলাম। 'আজাদ গোয়া জিন্দাবাদ!' 'পর্তুগাল গোয়া ছোড়ো!

আভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো!' 'গোয়া ভারত অলগ নহি! কভী নহী, কভী নহী!'— পুণা হইতে রপ্তকরা এই কয়দিনের পরিচিত স্লোগানগুলি, আর একবার জোরে হাঁক-ডাক দিয়া, নিজেরাই নিজেদেরকে সেগুলি শুনাইয়া, আমরা গোয়া অভিযানের পথে পা বাড়াইলাম।

তখনো আমরা ভারতীয় এলাকাতেই আছি। পাকা রাস্তা ছাড়িয়া ডানদিকের দিকে মোড় লইয়া দু' তিন মাইল অগ্রসর হইলে, পাহাড়ের উপর কাস্টমস গার্ডদের আর একটি ছাউনী আছে। সেটি ছাড়াইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা পর্তুগীজ এলাকায় পড়িব। গাইড্‌রা আন্দাজ দিল বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ মাইল পাঁচ ছয় হাঁটিয়া আমরা খাস গোয়ার ভিতরে লোকালয়ের কাছাকাছি পেঁছাইব। তারপর পর্তুগীজ পুলিস কখন কি নাগাদ আসিয়া আমাদের পথ আটকাইবে তাহা বলা শক্ত। তবে বোধহয় বেশি দেরি হইবে না। মোটামুটি আন্দাজ করা গেল বেলা ২টা ৩টা নাগাদ হয়ত লোকালয়ের ভিতরে গিয়া পুলিসের বা মিলিটারীর হাতে পড়িব। সুতরাং তাহার আগে পর্যন্ত আমরা বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পারিব—মন্দ কি? আগেই বলিয়াছি ভোর রাত্রিতে লরী হইতে অন্‌মুড়ে নামা অবধি শরীর বেশ সুস্থ ও সবল বোধ করিতেছিলাম। আমি অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক, হঠাৎ সে কথা যেন আমার মনে পড়িয়া গেল। আমারও মুখ দিয়া হিন্দী-ইংরাজীতে মিশানো Marching order বাহির হইয়া আসিল—"Friends! Forward march!" "দোস্তোঁ! মিত্রোঁ! আগে বঢ়ো।" পিছন হইতে নাসিকের ছেলেটিও মারাঠীতে রিনরিনে গলায় চীৎকার করিয়া সকলকে শুনাইয়া দিল "চলা! পুঢ়ে চলা!" চলো! আগে চলো!—আমরা দলসুদ্ধ চলিতে আরম্ভ করিলাম। মধ্যে এক আধজন এক একটি স্লোগানের হাঁক দিতেছে। আমরা ছাড়া সেখানে সেই স্লোগান শোনার লোক নাই, তাহার জবাব দিবার লোক নাই। আমরাই তার দোহার জবাব দিতেছি—"কভী নহী! কভী নহী! গোয়া-ভারত অলগ্ নহী...অলগ্ নহী!" ভোরের জঙ্গল পাহাড় সব কিছু প্রতিধ্বনিত করিয়া আওয়াজ উঠিতেছে—"আজাদ গোয়া জিন্দাবাদ!" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" "সালাজারশাহী হো বরবাদ!" অভিযানের এই আদি পর্বে তখন আমরা বেশ টাটকা উৎসাহের সঙ্গে দৃপ্ত দৃঢ় পদক্ষেপে পা ফেলিয়া দ্রুত আগাইয়া যাইতেছি... "অলগ্ নহী! অলগ্ নহী!" আমাদের আটকায় সাধ্য কার? এমন কোনো সালাজারকে বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই!

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের কয়েকজন তখনো চলিয়াছেন, ভারত সীমান্তের শেষ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিয়া আসিবেন। তাহার মধ্যে আছেন তরুণ বন্ধু রাম কাকোড়কর। রাম কাকোড়করের অগ্রজ পুরুষোত্তম কাকোড়করের নাম গোয়ার জাতীয় আন্দোলনের নূতন পর্যায়ে বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯৪৬ সালে ডাঃ লোহিয়া গোয়াতে গিয়া রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রসারের আন্দোলন আরম্ভ করিলে পর, সেই উপলক্ষে যে কয়জন গোয়াবাসী রাজনৈতিক নেতাকে পর্তুগীজরা গোয়া হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লিসবনের জেলে চালান দেয় ডাঃ পুরুষোত্তম কাকোড়কর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।*

---

* অন্য দুইজনের নাম ডাঃ রাম হেগ্‌ড়ে এবং শ্রীযুক্ত টি. বি. কুন্যা। হেগ্‌ড়ে ও কাকোড়কর গত বছর ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডাঃ কুন্যা কয়েক বছর আগে সেণ্ট্ জেভিয়ারের সমাধি প্রদর্শন উপলক্ষে গোয়াতে যে আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক ধর্ম উৎসব হয় তাহার নাম করিয়া এক

গত বছর তাঁহাদের দশ বছরের নির্বাসন দণ্ড পূরা হইলে তাঁহাদের লণ্ডনের পাসপোর্ট দিয়া পর্তুগাল হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই পাসপোর্ট বলে তাঁহারা পর্তুগাল হইতে লণ্ডনের পথে ভারতে ফিরিয়া আসেন। আমি যখন গোয়ায় রওনা হই, পুরুষোত্তম কাকোড়কর তখনো পর্তুগালে। রাম কাকোড়কর অবশ্য ১৯৫৪ সালের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কিছু বাদে আত্মগোপন করিয়া ভারতে চলিয়া আসেন। পর্তুগীজরা তাঁহার নামে গোয়াতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়া হুলিয়া জারী করিয়া দিয়াছিল। গোয়ায় থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি পলাইয়া ভারতে আসার পর পর্তুগীজরা মিলিটারী আদালতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে ১৮ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। রাম কাকোড়কর এদিকের পথ ঘাট সবই ভাল করিয়া জানেন। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের তরফ হইতে গোয়ার ভিতরকার সংগঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ সেই সময় তাঁহার হাতে ছিল। তাই পিটার তাঁহাকে ভারত সীমান্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে বলিয়াছিলেন। বন্ধুবর আত্মারাম পাতিল একবার গোয়ায় গিয়া বিরাশী সিক্কা ওজনের এক থাপ্পড় খাইয়া কানের ড্রাম ফাটাইয়া অর্ধ-বধির হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তখনো তাঁহার সখ মেটে নাই। আমরা সত্যাগ্রহে রওনা হওয়ার সময় অনমুড়ে তাঁহার ও অন্যান্যদের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। ইচ্ছা অন্তত শেষ কাস্টমস পোস্ট পর্যন্ত তিনি সঙ্গে থাকিবেন। আর এছাড়া আসিয়াছেন বেলগাঁও হইতে প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়ার একজন তরুণ রিপোর্টার। তার সঙ্গে ক্যামেরাও আছে। কিন্তু বেচারার দুঃখ মেঘের জন্য তিনি ভাল একটা শট নিতে পারিতেছেন না। আরও আফসোস তাঁর সঙ্গে একটাও ফ্ল্যাশ্ বাল্ব নাই। তাড়াতাড়িতে বেলগাঁওয়ে ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছেন। এ অবস্থায় কার না মন খারাপ হয়? তবে আমরা চলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের কিছুটা জোর করিয়া আনা আর কিছুটা পরিবেশের কল্যাণে পাওয়া মানসিক উত্তেজনা কখন যে তাঁহার মনেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে বুঝি নাই। বেচারা ছোট্ট-খাট্টো মানুষটি, ভারি একটা ওয়াটার প্রুফ ওভার কোট, ক্যামেরা সব কিছু লইয়া প্রায় দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে পা মিলাইয়া চলিয়াছেন এবং বারবার মিনতি করিয়া বলিতেছেন, গোয়া হইতে ফেরার সময় (সকলে এবং আমিও মোটামুটিভাবে এইটাই ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, আমাকে পর্তুগীজরা বেশি দিন আটকাইয়া রাখিতে সাহস করিবে না) আমি যেখান দিয়াই আসি, বেলগাঁওয়ে তাঁকে যেন নিশ্চয় খবর দিই; ইহাতে যেন অন্যথা না হয়। ইহার আগের দিন সন্ধ্যায় পি টি আই-এর আর একজন ভদ্রলোক সেই একই অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেওয়া ঠিকানাটাও পকেটের মধ্যে আছে! ইঁহাকেও প্রতিশ্রুতি দিলাম —নিশ্চয়ই তাঁহাকে খবর দিব। তা ছাড়া বেলগাঁও দিয়া ভিন্ন কোথা দিয়াই বা ফিরিব? সুতরাং খবর তিনি পাইবেনই। অদৃষ্ট দেবতা তখন বোধহয় উপরে বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিলেন।

যাই হোক, এইভাবে কথা বলিতে বলিতে ও একটানা হাঁটিতে হাঁটিতে কখন যে

পর্তুগীজ জাহাজের টিকিট কাটিয়া সেই জাহাজে চাপিয়া ফ্রান্সে পলাইয়া আসেন এবং সেখান হইতে পরে ভারতবর্ষে আসেন। কুন্যা অবশ্য সে সময় জেলে ছিলেন না, বাহিরে নজরবন্দী হিসাবে ছিলেন।

আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়া এক পাহাড়ী নদীর বুকে ক্রমে নামিয়া আসিয়াছি, তাহা খেয়াল করি নাই। খেয়াল হইল বাঁধভাঙ্গা জলের তোড়ের মত আওয়াজ শুনিয়া। তাকাইয়া দেখি পাহাড় হইতে ঢালু নালা পথ পাইয়া বিপুল বেগে বর্ষার জল নামিয়া আসিতেছে। জলের গভীরতা বেশি নয়, কিন্তু তোড় এত বেশি যে, তাহার ভিতর দিয়া ওপারে যাওয়া যাইবে কিনা সংশয়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। নদীর কাছে আসিয়া আমরা সকলে একটু থমকিয়া দাঁড়ানোর পর, গাইড্ দু'জন এদিক ওদিক তাকাইয়া নদীর বুকেই খানিকটা উপরের দিকে কয়েকটা উঁচু পাথরের মাথা জলের উপরে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া দৌড়াইয়া সেইদিকে গেল। তাহারা দুজনেই সেইগুলির উপর পা দিয়া অনায়াসে চট করিয়া পার হইয়া গেল। আমি তাহাদের পিছনে পিছনে যেই সেই চেষ্টা করিতে গিয়াছি, প্রথম পাথরটি যে শেওলা পড়িয়া পিছল হইয়াছিল, খেয়াল করি নাই—পা হড়কাইয়া নদীর জলের ভিতর পড়িয়া গেলাম। কাহার সাধ্য জলের সেই তোড়ের মধ্যে পা ঠিক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়! জলের ধাক্কায় ধাক্কায় আমি তখন ভাসিয়া যাইতেছি প্রায়; কিছুতেই সোজা হইয়া কোথাও শক্ত করিয়া পা রাখিতে পারিতেছি না। আমার পাশে বেচারী নিতাই গুপ্ত। তাঁহার বাঁ কাঁধে তাঁহার এবং আমার ঝোলা, ডান কাঁধে বিরাট এক তেরঙা রাষ্ট্রীয় ঝাণ্ডা (তিনিই আমাদের পতাকাবাহী)। পিছল পাথরের উপর দিয়া অতি সাবধানে, ডিঙ্গি মারিয়া পা ফেলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে এবং আর সকলকেই পার হইতে হইবে। তাঁহারা নিজেদের ঝোলা-ঝাণ্ডা সামলাইবেন, না জলের-স্রোতে-ভাসিয়া-যাওয়া তাঁহাদের 'লীডার'কে সামলাইবেন? এইদিকে লীডার তো নাকানি চোবানি খাইতে খাইতে বর্ষার নদীর জলের তোড়ে ভাসিয়া যাইতেছেন! পৃথিবীর অন্য কোথাও অন্য কোন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সত্যাগ্রহীদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা কখনও হইয়াছে কিনা জানি না। এরূপ হওয়ার সচরাচর কোন কারণ ঘটে না। কেননা সত্যাগ্রহের রীতি হইল প্রকাশ্য রাজপথে বুক ফুলাইয়া বিরুদ্ধ শাসক শক্তির সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু আমাদের সত্যাগ্রহ 'গেরিলা' সত্যাগ্রহ। দুর্গম পাহাড় বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমাদের প্রথম গোপনে সীমান্ত পার হইতে হইবে, তারপর শুরু হইবে আসল সত্যাগ্রহ। কাজেই দুর্গম পথের এইসব ঝক্কি পোহাইতেই হইবে, উপায় নাই। যাই হোক বেশ কিছু নাকানি চোবানি খাওয়ার পর, গাইড্ দুজন ও আরও কয়েকজন মিলিয়া, তাহাদের 'বীর' অধিনায়ককে চ্যাংদোলা করিয়া নদীর ওপারে টানিয়া তুলিল। তিনি তখন ভিজিয়া, চুপসাইয়া, হাঁপাইয়া বেশ কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন? তবে বেশি দমেন নাই। এখনই দমিলে চলিবে কেন? তাই একটু বাদে শরীর হইতে জল কিছুটা ঝরিলে পর, একটু সাব্যস্ত হইয়া গিয়া সেই ভিজা জামা-কাপড়েই আবার চলিতে শুরু করিলেন। কাপড় বদলাইলাম না, কারণ ততক্ষণে আবার মুষল ধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় চোখের চশমাটা ভাঙ্গে নাই। চশমাটা খুলিয়া খাপে পুরিয়া নিলাম। কারণ বৃষ্টির জলের ছাঁটের মধ্যে চোখে চশমা দিয়া পথ চলা যায় না। এইভাবে সেদিন আমাদের অভিযান আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, আমাদের সেইদিনকার দুর্গতির এই শেষ নয় আরম্ভ মাত্র।

॥ ৬ ॥

"সহ্যাচে" উঞ্চ কড়ে
স্বাগতাস সজ্জ খড়ে..."*

নদী পার হইয়া আমরা এইবার সহ্যাদ্রির গা বাহিয়া খাড়া চড়াই পথ ধরিলাম। পথ চলিতেছি বটে কিন্তু সেই নিবিড় ঘন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী জমিতে বড় বড় পাথরের চাঙড়ের ভিতর দিয়া পথ বলিয়া কিছু ঠাহর হইতেছিল না। গাইড দুজন আমাদের সামনে। তাহারা অনায়াসে লাফ দিয়া দিয়া এক একটি পাথরের চাঙড়কে সিঁড়ির ধাপের মত ব্যবহার করিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিল। খুব উঁচু কোন বড় চাঙড় সামনে থাকিলে তাহার পাশ কাটাইয়া ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া সহজেই সট্ সট্ করিয়া দ্রুতবেগে আগাইয়া যাইতেছিল। আমাদের পক্ষে যে তাহাদের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা তত সহজ হইতেছিল না, তাহা না বলিয়া দিলেও চলিবে। তার উপরে মুষলধারে বৃষ্টি। কোঙ্কনী বৃষ্টির আকাশফাটা তোড় যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সে বৃষ্টির রূপ কল্পনা করা কঠিন হইবে। সেই বৃষ্টির ভিতর, কোন পথ থাকিলেও, পথ ঠাহর হওয়া কঠিন। যাহা হোক্, তাহারই ভিতর দিয়া কোনমতে প্রায় মাইলখানেক চড়াই পথ ভাঙ্গিয়া, পর পর কয়েকটি টিলা পার হইয়া আসিয়া জঙ্গলের মধ্যে একটি টালি ছাদের বাড়ি দেখা গেল। বৃষ্টিতে আর শেওলাতে তার টালিও এত কালো হইয়া গিয়াছে যে, পঞ্চাশ গজ দূর হইতে সেইখানে বাড়িঘর আছে বলিয়া বোঝা যায় না। অনমেদের পরে ভারতীয় এলাকায় কাস্টমসের এইটিই শেষ বর্ডার পোস্ট। শুল্ক বিভাগের চার পাঁচজন সশস্ত্র বর্ডার গার্ড এখানে থাকে—গোয়া হইতে শুল্ক ফাঁকি দিয়া যাহাতে কেহ কোনোরকম চোরাই চালান কারবার না চালাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। অবশ্য তখনও পর্যন্ত গোয়ার বিরুদ্ধে ভারত গভর্নমেন্ট অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু গোয়া চিরকালই 'স্মাগলিং' বা চোরাই চালান কারবারের বড় আড্ডা। পর্তুগীজ গোয়ায় বিদেশ হইতে আমদানী প্রত্যেকটি জিনিসের উপর শুল্কের হার ভারতের তুলনায় বহুগুণে কম। কাজে কাজেই গোয়া সীমান্তকে চোরাই চালানকারবারীদের স্বর্গ বলিলেও চলে। অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি অবলম্বিত হওয়ার বহুকাল আগে হইতে, ভারত গভর্নমেন্টের শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য গোয়ার ভিতর হইতে সীমান্ত পার করিয়া গোপনে মাল পাচার করার কারবার চলিত। কাজে কাজেই গোয়ার চারিপাশে এইসব অঞ্চলে আমাদের গভর্নমেন্টের কাস্টমস্ বিভাগের তরফ হইতে বর্ডার পাহারা দিবার ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া আছে। অবশ্য কার্যত ইহার ফলে চোরাই চালান কারবার কতটা বন্ধ হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু আমাদের সামনে বর্ডার গার্ডদের এই ঘরটি দেখিয়া আমরা বৃষ্টির মধ্যে আপাতত একটা আশ্রয় পাইব মনে করিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হইলাম।

---

* "হে সহ্যাদ্রী! সহ্যাপর্বতমালার উত্তুঙ্গ শিখর তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য মাথা উঁচু করিয়া খাড়া আছে"—গোয়াতে প্রচলিত মারাঠী-কোঙ্কনী জাতীয় সঙ্গীতের একটি লাইন।

আমার নিজের অবস্থা তখন বেশ কাহিল। একবার নদীর ভিতর জলে নাকানি-চোবানি খাইয়াছি; তার উপরে এই বৃষ্টি। গার্ড পোস্টে গিয়া কোনমতে কাপড়-চোপড় বদলাইয়া নিতে পারিব, এবং একটু সাবধান হইয়া বৃষ্টি থামিলে গোয়ার দিকে আবার রওনা হইতে পারিব। সামনে খাড়াই দেখিয়া সেই কথাটাই মনে হইল বেশি করিয়া। সদ্য জ্বর-ছাড়া গায়ে জলে ভিজিয়া চুপসাইয়া আমার মনের সত্যাগ্রহী তেজ তখন যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। বৃষ্টি ও কপালের দোষে পুণা হইতে একটা প্লাস্টিকের পাতলা ওয়াটার প্রুফ কিনিয়া আনিয়াছিলাম। তাহার নীচে কাপড় জামা ভিজিয়া একশা হইয়া গিয়াছে; শীতের চোটে গায়ে কাঁপুনি ধরিয়া উঠিয়াছে। আমার সঙ্গের স্বেচ্ছা-সৈনিক সত্যাগ্রহীদের প্রায় একই অবস্থা। তবে তাহাদের 'লীডার' ছাড়া তাহাদের মধ্যে আর কেউ নদীর জলে পড়িয়া নাকানি-চোবানি খায় নাই। কিন্তু তাহাদেরও কাপড়-চোপড়, পারিলে বদলাইয়া দেওয়ার, কিংবা জল নিংড়াইয়া, যতটা হয় হাল্কা করিয়া দেওয়ার দরকার ছিল। অবশ্য তখনও কোম্পানী বৃষ্টি—'সাইন্'—কাকে বলে তাহা আমাদের জানা ছিল না। সবের এবং বৃষ্টির তো তখন সবে মাত্র শুরু। কিন্তু সে যাই হোক, বৃষ্টির মধ্যে তখনকার মত গার্ড পোস্টের ঘরে ঢুকিয়া একটু দম ধরা যাইবে বলিয়া আশা হইল।

রাম কাকোড়কর, আত্মারাম পাটিল ও পি টি আই-এর সেই ছেলেটি তখনও আমাদের সঙ্গে আছেন। গার্ড পোস্ট হইতে গোয়া এলাকার ভেতর পথ(?) ধরাইয়া দিয়া তাঁহারা বিদায় নিবেন। গার্ড পোস্টের বারান্দায় আসিয়া উঠিতেই যে কয়জন সিপাহী সেখানে ছিল তাহারা যেভাবে কাকোড়করকে ও আমাদের অভিনন্দন জানাইল, তাহাতে বুঝিলাম তাহারা কাকোড়করকে গোয়া কংগ্রেসের লোক বলিয়া বেশ ভালভাবেই চেনে। আমরা যে তাহাদের এখান দিয়া যাইব কাকোড়কর সে খবর তাহাদের আগে হইতেই দিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হোক তাঁহাদের এই ব্যবস্থায় আশ্রয় পাইয়া আমাদের ভিজা কাপড়-চোপড় বদলানো বা নিংড়ানোর কাজ মোটামুটি একরকম হইল। নিতাই শুদ্ধের ঝোলার ভিতর আমার একটি কাপড়, গেঞ্জী ও পাঞ্জাবী তখনও শুকনা ছিল। আমি ভিজা কাপড় বদলাইয়া সেই কাপড় পরিয়া নিলাম। সিপাহীরা নিজেদের জন্য চা তৈরি করিতেছিল। খাতির করিয়া তাহারা আমাকে সেই চায়ের কিছুটা ভাগ দিল। ভলান্টিয়ার-দেরও কারও কারও ভাগ্যে এক আধ গ্লাস করিয়া চা জুটিয়া গেল। স্থানীয় ভাষায় এলাকার এই আমাদের দেশ 'চহা' শব্দ (চায়ের মারাঠী নাম 'চহা' বা 'চহা')। ইহার পরে পর্তুগীজ 'শা' (পর্তুগীজ ভাষায় 'Tea'-র বদলে 'Cha' নামেই চা পরিচিত; কিন্তু উচ্চারণ 'শা')।

এখানে এইভাবে কাপড় বদলাইয়া চা খাইয়া তাজা হইয়া নিলাম বটে; কিন্তু বৃষ্টি থামে কই? গোয়ার এলাকা আর কতদূরে? আমাদের গাইড গার্ড পাহারা এবং আমাদের গাইড মুকুন্দ, সকলেই তখন আমাদের জানাইল ভারতের এই অঞ্চলের 'সাইন' যখন একবার আরম্ভ হইয়াছে তখন শুধু তাড়াতাড়ি বন্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। গোয়ার পর্তুগীজ এলাকাও এখান হইতে বেশি দূরে নয়। এই টিলার পিছনে আধ মাইল গেলেই এক মাইল দূরে। তবে সোজা পথ নাই, একটু ঘুরিয়া আরও মাইল দুই গেলেই আমরা খাস পর্তুগীজ এলাকার ভিতর পৌঁছাইব। সুতরাং আর দেরি করিয়া লাভ নাই। আমারও ভাবিয়া দেখিলাম দেরি করিলে, অন্ধকার ছাড়া সুবিধা কিছু নাই। কারণ আমরা বেলাবেলি গোয়ার লোকালয়ে পৌঁছিলে সত্যাগ্রহ করার পক্ষে, অর্থাৎ যদি আমরা প্রকাশ্যে

কোন রাজনৈতিক সভা-শোভাযাত্রা এইসব করিতে চাই, তাহার পক্ষে সুবিধাই হইবে। ঘড়ি দেখিলাম, বেলা তখন প্রায় আটটা। সুতরাং বৃষ্টির ভিতরই কাকোড়কর প্রভৃতির সঙ্গে শেষবারের মত কোলাকুলি করিয়া আবার সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম।

এখানে পথ আরও দুর্গম এবং জঙ্গলাকীর্ণ। পাহাড়ের গায়ে একরকমের বেত-জাতীয় গাছের ঝোপ এবং ঝাঁকড়া কাঁটা ঝোপের জঙ্গল দিয়া চারিদিক ঢাকা। তাহারই ভিতর দিয়া পথ করিয়া গাইড্ দুজন সমুখে সমুখে চলিয়াছে। আমরা তাহাদের পিছন পিছন সিঙ্গল ফাইলে একের পর এক গুটি গুটি করিয়া চলিয়াছি। বৃষ্টি তখন আর বেশি গ্রাহ্য করিতেছি না; গ্রাহ্য করিতে গেলে চলিবে না। অবশ্য দুইপাশে ঝোপ থাকায় একটু সুবিধাও আছে। কাদায়, কিংবা পাথরের উপরকার শেওলায়, পা হড়কাইলেই সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের ডালপালা ধরিয়া টাল সামলানো যাইতেছে। তবু মুশকিল এই যে, কাঁটা ছাড়া কোন ঝোপ নাই। তাই ঝোপের ডালপালা ধরিতে গেলেই সেই কাঁটায় হাত-পা কিছু কিছু ছড়িয়া যায়। পরনের ধুতি কাপড়-জামাও বেশ ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু তবু হাতের কাছে ধরার মত ঝোপের ডালপালা থাকায় বেশি আছাড় খাইতে হইতেছে না। পথচলা কোনমতে সম্ভব হইতেছে। আমাদের সত্যাগ্রহ সহজ পথের সত্যাগ্রহ নয়; বাঁকাচোরা দুর্গম পথের 'গেরিলা' সত্যাগ্রহ। সেই সত্যাগ্রহের পথে চলার সময় কাঁটা ঝোপ বা জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইতে গেলে চলিবে কেন? তাহার ভিতর দিয়া যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু বর্ষার দিনে এ পথে গোয়া যাওয়ার আসল বিপদ এতক্ষণে দেখা দিল জোঁকের আক্রমণে!

একে তো পাহাড়ে হাঁটিয়া ওঠার অভ্যাস নাই। হাঁপাইয়া দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে। বৃষ্টিতে, শেওলাতে, কাদায় পিছল পথ, কাঁটা-ঝোপ—এইসবের জন্য অসুবিধা যথেষ্ট হইলেও ভয় বা আতঙ্কের কিছু ছিল না। কিন্তু জোঁকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করি কি করিয়া? অনমুড় হইতে রওনা হওয়ার সময় প্রতিষেধক হিসাবে কেরোসিন এবং সিগারেটের তামাকের গুঁড়া হাতে-পায়ে একটু একটু করিয়া মাখিয়া লইয়াছিলাম। বৃষ্টির জলে তাহা কখন ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইয়া গিয়াছে! গার্ড পোস্ট হইতে রওনা হইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর বৃষ্টি যখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ পিছন হইতে নিতাই গুপ্ত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "—দা আপনার মাথা কেটে গিয়েছে; ঘাড় দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়ছে!" চীৎকার শুনিয়া থামিয়া গেলাম। মাথা আবার কাটিল কি করিয়া? মাথার পিছনে ঘাড়ের দিকে হাত দিয়া দেখি সত্যই রক্ত! রক্ত কিভাবে আসিল চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পিছন হইতে আর একজন চেঁচাইয়া বলিল 'জড়ু', 'জড়ু', বোধহয় 'জোঁক'! গাইডদের মধ্যে একজন সেই কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া একটি পাতার সাহায্যে জোঁকটি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ততক্ষণে সকলের 'জড়ু' বা জোঁকের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। বৃষ্টি বন্ধ হওয়াতে তখন চারিদিকে জোঁক বাহির হইয়াছে। মাটিতে জোঁক, ঘাসে জোঁক, ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের পাতা হইতে জোঁক! মাথার উপরে গাছের ডাল-পাতা হইতে মাথায়, ঘাড়ে টপ্ টপ্ করিয়া জোঁক লাফ দিয়া পড়িতেছে! এমনধারা জোঁকের সমারোহ কখনও দেখার সৌভাগ্য বা সুযোগ আমার হয় নাই! "ওয়া গুরুজী-কা ফতে! মহাত্মা গান্ধীজী-কি জয়!"—ইংরেজ গভর্নমেণ্টের লাট-বড়লাট, সশস্ত্র সেপাই-শান্ত্রী, মিলিটারী পাহারা, ইম্পিরিয়ালিজম্, এইসবের বিরুদ্ধে তো সবাই লড়িয়াছে; দরকার হইলে আরও লড়িবে! কিন্তু গোয়াতে

সালাজার সাহেবের বিরুদ্ধে লড়িতে আসিয়া আমরা যেভাবে জোঁকের সঙ্গে লড়িতেছি এমন আর কোথায় কোন সত্যাগ্রহী দল লড়িয়াছে, না লড়িবে? আমার জানা মতে পৃথিবীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ইতিহাসে জোঁক-বিরোধী সংগ্রামের দৃষ্টান্ত এই বোধহয় সর্বপ্রথম। কি সে দৃশ্য! কেহ লাফাইতেছে, কেহ জামা-গেঞ্জী খুলিয়া গা-হাত-পা ঝাড়িতেছে, কেহ জোঁকের রক্তচোষার কাটামুখে মাটি লেপিতেছে! এই সময় গাইড্ দুইজন আসিয়া জোঁক ঝাড়িবার কৌশল দেখাইয়া দিয়া গেল। ঝোপ হইতে একটি খস্‌খসে ধরনের পাতা ছিঁড়িয়া তাহার ঘসায় জোঁক কিভাবে গা হইতে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসে তাহা সকলকে হাতেকলমে দেখাইয়া দিল। তাহারা এইকথাও বলিল জোঁক দেখিয়া এইভাবে উদ্বাস্ত হইয়া উঠিলে চলিবে না। জঙ্গল ছাড়িয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ফাঁকা জায়গায় পৌঁছানো না যাইতেছে ততক্ষণ জোঁকের হাত হইতে একেবারে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে না—সারা পথেই জোঁক! কিন্তু প্রত্যেকে যদি পকেটে কয়েকটা করিয়া এই পাতা রাখে তাহা হইলে সহজেই গা-হাত-পা হইতে জোঁক ঝাড়িয়া ফেলিতে পারা যাইবে। এক-আধটা জোঁক হয়ত মাঝে মধ্যে অজান্তে জামা-কাপড়ের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহাতে ঘাব্‌ড়ানোর কিছু নেই। এ জোঁক বর্ষার ছোট জোঁক; বেশি রক্ত খায় না। বড় পাহাড়ী বিষাক্ত জোঁক এইদিকে নাই। সুতরাং এইখানে দেরি না করিয়া আগানো যাক্ আমরা এখন পর্তুগীজ এলাকায় ঢুকিয়া গিয়াছি। আর কয়েকটা চড়াই-উৎরাই পার হইলেই আমরা নদীর ধারে লোকালয়ে আসিয়া পৌঁছাইব তখন আর জোঁকের ভয় থাকিবে না। তখন নির্বিঘ্নে সত্যাগ্রহ করা যাইবে।

গাইডদের এই কথা শুনিয়া আমরা যে যতটা পারি আশ্বস্ত হইয়া আশে পাশের ঝোপ হইতে জোঁক-বিতাড়ন-পত্র কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া নিলাম এবং তাহার সাহায্যে একে অন্যের গায়ের জোঁক ঝাড়িতে ঝাড়িতে একেবারে সরাসরি গোয়ার ভিতরে গিয়া সালাজারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আবার হাঁটা শুরু করিলাম। জোঁকের বিপদ সত্ত্বেও মনে মনে সকলে কিছুটা উৎসাহ বোধ করিতেছিলাম এইজন্য যে আর আমাদের 'গোয়ার দিকে' যাইতে হইবে না। আমরা এখন গোয়ার ভিতরেই আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন একবার পর্তুগীজ পুলিস বা মিলিটারী আমাদের বাধা দিতে আসিয়া গেলেই হয়! সত্যাগ্রহ কাকে বলে ভাল করিয়া একবার বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে!

পর্তুগীজ এলাকায় সত্যসত্যই আসিয়া পড়িয়াছি শুনিয়া চারিদিকটা একবার তাকাইয়া দেখিয়া নিলাম। খালি জঙ্গল আর পাহাড় ছাড়া জন-প্রাণী বা লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। পর্তুগীজদের নাম-নিশানা কিছুই চোখে পড়িতেছে না। আমরা তখন একটা বড় পাহাড়ের উপরে আছি। দূরে আরও উঁচু একটা পাহাড়ের পাশ ঘেঁষিয়া অনেক নীচে আবছা ধোঁয়া ধোঁয়া সবুজ ধানের ক্ষেত দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। কে জানে, সেইদিকে হয়ত লোকালয় থাকিলেও থাকিতে পারে। গাইডরা দুইজনেই মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল—"হ্যাঁ ঐ দিকেই আমরা যাইব।" জোঁকের কথা আর বেশি না ভাবিয়া, সকলেই তখন পা চালাইয়া হাঁটিতে লাগিলাম। যত তাড়াতাড়ি লোকালয়ে গিয়া পৌঁছানো যায় ততই ভাল। মেঘলা দিনে বেলা যতটা বোঝা গেল দশটা বোধহয় তখনও বাজে নাই। সুতরাং একটু তাড়াতাড়ি হাঁটিলে দুপুরের আগেই পৌঁছানো যাইবে এইরকম মনে হইতে লাগিল।

গোয়ার ভিতরের দিকে পর্তুগীজদের সীমান্ত পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত সম্পর্কে

দুইএকটি কথা এখানে বলিয়া যাওয়া দরকার। পর্তুগীজরা এতদিন পর্যন্ত এই সীমান্ত সম্পর্কে কোন মাথা ঘামায় নাই। সহ্যাদ্রি পর্বতমালা এবং ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্র উপকূল হইতে পূর্ব দিকে এবং পূর্ব হইতে দক্ষিণে বাঁকিয়া ক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত ধনুকের মত বাঁকিয়া ভারত-গোয়া সীমান্ত প্রায় দুইশ' মাইল চলিয়া গিয়াছে। গোয়ার উত্তর, পূর্ব বা দক্ষিণে সর্বত্র ভারত-গোয়া সীমান্তকে 'ওপেন ফ্রন্টিয়ার' বা খোলা সীমান্ত বলা চলে। ভারতের দিক দিয়া, গোয়া হইতে শুল্ক ফাঁকির চোরাই-চালান কারবার বন্ধ করিবার একটা স্বার্থ ছিল। সুতরাং ভারত হইতে এই সীমান্তের উপর কড়া নজর রাখিবার তবু একটা গরজ ছিল। কিন্তু ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে চোরাই মাল 'স্মাগলিং'-এর রপ্তানি ব্যবসা খুব বেশী রকম চলিত না; কোন দিন চলেও নাই। কাজে কাজেই পর্তুগীজ সরকারের তরফ হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার আগে পর্যন্ত, এই সীমান্ত পাহারা দিবার জন্য সেরূপ কোনো কড়া বন্দোবস্ত কোনো সময় হয় নাই। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পরেও উত্তরে সাবন্তবাড়ি-ডোডামার্গের দিক হইতে দক্ষিণে মাজাড়ী-কারওয়ার পর্যন্ত, দেড়শ' দুশ' মাইল এই সুদীর্ঘ সীমান্ত পাহারা দিবার কোন বন্দোবস্ত পর্তুগীজ সরকার করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে যেখানে সীমান্ত পার হইয়া ভারত হইতে গোয়া পর্যন্ত বড় বড় রাস্তা গিয়াছে, সেইখানে বা তাহার কাছাকাছি, আজকাল অবশ্য সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী দল বসানো হইয়াছে। কিন্তু সহ্যাদ্রির ঘন জঙ্গল আর পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়া এই সীমান্তের সর্বত্র পাহারা বসানোর ব্যবস্থা করাও খুব সহজ-সাধ্য নয়। এই সীমান্তে এইভাবে সাঁজোয়া পুলিস বা মিলিটারী বর্ডার-গার্ড বসাইয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে সেই কথা পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ কখনো কল্পনা করেন নাই। মারাঠা আমলে শিবাজীর পুত্র শম্ভাজী একবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়া গোয়ায় পর্তুগীজদের উপর আক্রমণ চালানোর আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু শম্ভাজী শেষ পর্যন্ত তাঁহার পরিকল্পিত সেই অভিযান আর চালান নাই। তাহার পরবর্তী কোন কালে পেশোয়া আমলে কিংবা ইংরাজ আমলে, স্থলপথে গোয়ার উপর কোন হানা আসে নাই। ওলন্দাজ, মারাঠা, মুসলমান পর্তুগীজ গোয়ায় সকলের আক্রমণ আসিয়াছে জলপথে সমুদ্রের দিক হইতে। কাজে কাজেই সমুদ্র উপকূলবর্তী সীমান্তকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, সেইদিকেই পর্তুগীজদের নজর ছিল বেশি। তাহাদের বেশির ভাগ দুর্গ তাই সমুদ্রের দিকে। ইংরেজ আমলে তো এই স্থল-সীমান্ত রক্ষা করার কথা পর্তুগীজদের ভাবিতেই হয় নাই। ভারত-গোয়া সীমান্ত সরকারী ম্যাপ বা জরীপের দাগেই আঁকা আছে মাত্র। মিলিটারী কায়দায় সে সীমান্তকে সুরক্ষিত করার বা তাহার জন্য পাহারা বসানোর ব্যবস্থা কোনদিন হয় নাই। আজ ভারতের সঙ্গে গোয়ার দখলীস্বত্ব লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি বাধিয়া ওঠা সত্ত্বেও, কিংবা ভারত হইতে গোয়া অভিমুখে সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও, তাহা হইয়া ওঠে নাই। কারণ সমস্ত সীমান্ত জুড়িয়া সম্পূর্ণ ভাবে তাহা করিতে গেলে, যে বিপুল ব্যয়-সম্ভার দরকার হয় মার্কিন সাহায্যেও আজ বোধহয় পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

কাজে কাজেই পর্তুগীজদের অলক্ষিতে, এমন কি প্রায় নিজেদেরও অজানিতে, ভারত সীমান্তের ওপার হইতে এপারে পর্তুগীজ এলাকায় আমরা এইভাবে হঠাৎ আসিয়া পড়ায় খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু পাহাড়ে-পর্বতে এইরকম দুর্গম জঙ্গলের ভিতর সীমান্ত পাহারা দিতে আসিবে আরামপ্রিয় পর্তুগীজরা সে বান্দা নয়—বিশেষ করিয়া

এই বর্ষা বৃষ্টির দিনে! এই পথে 'স্মাগ্লার', বা আমাদের মত 'গেরিলা' সত্যাগ্রহীরা, ছাড়া আর কে আসিবে? আমরা রওনা হওয়ার আগে পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লিখিয়া নোটিশ দিয়াছি; রেডিওতে অন্মূড় হইতে আমাদের রওনা হওয়ার খবর এতক্ষণ নিশ্চয় প্রচার হইয়া গিয়াছে। আমাদের অপেক্ষায় গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা কাসিমির মন্তেইরো তাহার লোকজন সিপাহী-শান্ত্রী লইয়া ওয়ালপই থানায় ৯ই জুলাই সকাল হইতে আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছিল বলিয়া পরে জানিতে পারি। আমরা সীমান্তের যেখানে ছিলাম সেখান হইতে ওয়ালপই অন্তত ১৮—২০ মাইল দূরে! কিন্তু মন্তেইরো এবং পর্তুগীজ পুলিস ভাল করিয়া জানিত যে গরজ আমাদের। আমরাই নিজের গরজে যথাসময়ে গোয়ার লোকালয়ে দেখা দিব। তখন আমাদেরকে আটকাইতে তাহার কতক্ষণ লাগিবে?

সেইদিনকার সেই বৃষ্টি-বাদলে পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের যে দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস এখানে না দিলেও চলিবে। এখন যতটা আন্দাজ করিতে পারি, বেলা দশটা হইতে বারোটার মধ্যে আমরা খুব সম্ভব বৃষ্টির ভিতর অন্ধকার-প্রায় জঙ্গলের পথে চলিতে চলিতে কোন একটা সময় ভুলদিকে মোড় নিই। সেই-দিনকার মত ঘন মেঘলা দিনে, বৃষ্টির ভিতর দিক চিনিয়া অগ্রসর হওয়ার উপায় আদৌ ছিল না। তাছাড়া, গোয়া কংগ্রেসের প্রেরিত এই গাইড্ দুইজন ছাড়া আমাদের কাহারও গোয়ার এইদিককার পথঘাট সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। মধ্যে মধ্যে আকাশ ফাটিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া চারিদিক জলের ঝাপটায়, আঁধারে ঢাকিয়া দিতেছে। চড়াইয়ে জঙ্গল, উৎরাইয়ে জঙ্গল—তাহার ভিতর দিয়া পথ চেনে সাধ্য কার? আমরা একবার চড়াই হইতে উৎরাইতে নামিতেছি, সেইখান হইতে আবার আর এক চড়াইয়ে উঠিতেছি। টিলা হইতে টিলায় যাইতেছি; দু'পা চলিয়াই প্রাণ হাতে করিয়া কোনমতে জঙ্গলের ঝোপ লতাপাতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুরতিক্রম্য সব খাদ পার হইয়া যাইতেছি। কিন্তু পথের বা লোকালয়ের আর হদিশ মেলে না! বারোটা বাজিয়া গেল, একটা বাজিয়া গেল, এইভাবে একটানা চলিতে চলিতে প্রায় বেলা ২॥টা—৩টার সময় আমার সন্দেহ হইল আমরা নিশ্চয় পথ ভুল করিয়াছি। কিন্তু ঠিক পথ কোন্টা? গাইড্দের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, 'আসিল বলিয়া!' 'পেঁছাইলাম বলিয়া!' কিন্তু লোকালয় দূরের কথা, মানুষের চলাফেরার সামান্য একটু নিশানা পর্যন্ত কোথাও চোখে পড়িতেছে না। কিছু আগে বেলা দশটা এগারোটার সময় দূরে একটা উঁচু পাহাড় আর ধানের ক্ষেত একটু আবছা আবছা দেখা যাইতেছিল। তাহাকে ছাড়াইয়া, সেই রকম উঁচু ও বড় আরও কয়েকটি পাহাড় পার হইয়াও, তখনকার আবছা দেখা সেই উঁচু পাহাড় বা তার পাশের ধানের ক্ষেতের কোনো সন্ধানই মিলিতেছে না। তখন মনে মনে ভীষণ প্রমাদ গণিলাম। আমার সঙ্গে ৫২—৫৪ জন সত্যাগ্রহী। ভোর ৫টা হইতে এই দুইটা-আড়াইটা পর্যন্ত সকালে একবার একটু ভাক্রি ও তরকারী ছাড়া কাহারও পেটে কিছু পড়ে নাই। ৮—৯ ঘণ্টা একটানা সকলে পাহাড়ে জঙ্গলে উঁচু নীচু দুর্গম পথে খালি পা চালাইয়া গিয়াছে। সকলেই তখন শ্রান্তিতে এবং অনিশ্চয়তার মানসিক হয়রানিতে প্রায় ঝিমাইয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছি। ইহাদের কোথায় আশ্রয় মিলিবে? কোথায় একটু খাবার বা মাথা গোঁজার জায়গা মিলিবে? বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার মধ্যে যেভাবে হোক্ কোনো লোকালয়ে পেঁছাইতে না পারিলে মহা বিপদ হইবে।

আমরা তখন খুব উঁচু একটা পাহাড়ের উপর খানিকটা খোলা জায়গা পাইয়া বিশ্রাম করার জন্য হাত পা ছড়াইয়া একটু বসিয়াছি। বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে। আমার মনে মনে দুশ্চিন্তা থাকিলেও শরীর তখন একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। ভাল করিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত লইতে পারিতেছি না, পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে এত হাঁপাইয়া পড়িয়াছি। আমি ঘাসের উপরে মাটিতে শুইয়া পড়িলাম; তারপর একটু দম ধরিয়া লইয়া গাইড্ দুইজনকে কাছে ডাকাইয়া নাসিকের স্বেচ্ছাসেবকটির সাহায্যে তাহাদের জেরা করিতে লাগিয়া গেলাম—গ্রাম বা লোকালয় আর কতদূর? তাহারা কি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে? এখন তো ঘড়িতে প্রায় তিনটা বাজিতে চলিল, আর কতক্ষণের মধ্যে গ্রামে পেঁছাইব? তাহাদের কথা-বার্তার হাব-ভাবে বুঝিলাম তাহারাও পথের হদিস হারাইয়া ফেলিয়াছে, যদিও লজ্জায় সেই কথা তাহারা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। তাহারা মোটামুটি যাহা বলিল তাহার নির্গলিতার্থ এই যে, যদিও একটু সময় লাগিতেছে, তবু তাহারা মনে করে গ্রামে পেঁছাইতে বেশি দেরী লাগিবে না। আর কিছুদূর গেলেই একটা নদী পাওয়া যাইবে। সেই নদী পার হইলেই ওয়ালপই যাওয়ার মোটরবাসের পাকা রাস্তায় আমরা উঠিব। তখন আশে পাশে বহু গ্রাম ও বাজার পাওয়া যাইবে। আমাদের চিন্তা করার কোন কারণ নাই। বরং এইখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া আবার অগ্রসর হওয়াই সমীচীন কাজ হইবে...ইত্যাদি।

আমাদের তাহারা সর্বরকমে ভরসা দিতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের কথার ধরনে এবং সুরে বেশ বুঝিতে পারিলাম তাহারা পথ হারাইয়াছে। তবে স্থানীয় লোক বলিয়া একটু একটু আন্দাজ করিতে পারিতেছে কোথায়, কোন দিকে, আমরা আছি। কিন্তু তাহারা যদি পথ হারাইয়াও থাকে, তাহা হইলেই বা কি করা যাইবে? বরং বেলা থাকিতে থাকিতে তাহাদেরকে পথ খুঁজিয়া পাওয়ার একটা শেষ চেষ্টা করিতে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ হইবে। আমি আমাদের সত্যাগ্রহী দলকে তাই ডাকিয়া বলিলাম আর বিশ্রামের দরকার নাই, সকলের আবার বেলাবেলি রওনা হইয়া পড়াই ভাল, এখনও তিন চার ঘণ্টা সময় আছে, ইহার মধ্যে লোকালয়ে গিয়া পেঁছাইতে পারিলে আর ভাবনার কোন কারণ থাকিবে না। শরীর অচল হইলেও সকলে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। গাইড্ দুইজনকে সমুখে রাখিয়া আবার সকলের হাঁটার পালা শুরু হইল।

বৃষ্টি এখন আর একেবারেই নাই। কোথাও কোথাও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিকালের রৌদ্র ওঠার উপক্রম করিয়াছে। জোঁকের উপদ্রবও তত বেশি নয়। আমি শরীরে আবার একটু জ্বর জ্বর ভাব অনুভব করিতেছি। সারাদিন যেভাবে জলে ভিজিয়াছি, তাহাতে জ্বর আসা বিচিত্র কিছু নয়। মাথা ধরিয়াছে...আগের মতই হাঁটিয়া চলিয়াছি...নিতাই গুপ্ত একটু দূরে পিছাইয়া পড়িয়াছেন...বেচারী ঝোলা-ঝাণ্ডা লইয়া বেশ নাজেহাল হইয়া উঠিয়াছেন.. মনে মনে ভাবিতেছি...'যদি শেষ পর্যন্ত আজ লোকালয়ে পেঁছাইতে না পারি, তাহা হইলে'? এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হইল দলে একজন লোক যেন কম। অজিত ভৌমিককে যেন দেখা যাইতেছে না; তাহার সাড়াশব্দও পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীমান অজিত বেশ লম্বা শক্ত জোয়ান লোক। দলের ভিতর থাকিলে তাহার চেহারা চোখে না পড়িয়া পারিবে না। কিন্তু কোথায় গেল সে? চীৎকার করিয়া সমস্ত লোককে থামিতে বলিলাম। তারপরে একটু ফাঁকা জায়গায় সকলকে সারি বাঁধিয়া 'ফল ইন্' করিয়া দাঁড় করাইয়া ভগৎ তুলসী রামজী ও নিতাই গুপ্তকে লিস্ট দেখিয়া একবার রোল্ কল্ লইতে বলিলাম। অজিত ভৌমিক যে নাই তাহা তো দেখিতেই পাইতেছিলাম। কিন্তু

দলের আর সকলে ঠিক আছে কিনা সেটাও একবার দেখিয়া নেওয়া দরকার। গণ্তিতে দেখা গেল খালি একজনই কম; বাকী ৫১ জন ঠিকই আছে, এক অজিত ভৌমিক নাই।

দুশ্চিন্তার উপর মহাদুশ্চিন্তা দেখা দিল। এই জঙ্গলে বিদেশে কোথায় গেল সে? অথচ ঘণ্টাখানেক আগেও তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছি! এই পাহাড়ী জঙ্গলের দেশে ঘন গাছপালা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়া আমরা যেভাবে অগ্রসর হইতে-ছিলাম, তাহাতে কেহ যদি পিছাইয়া পড়ে কিংবা রাস্তা চলিতে একবার মোড় নিতে ভুল করে—তাহা হইলে সে কোথায় গিয়া পড়িবে বলা কঠিন। আমরা নিজেরাই, সঙ্গে গাইড্ থাকা সত্ত্বেও, পথ হারাইয়া, দিশা হারাইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। দল ছাড়া হইয়া অজিত বেচারী একা একা এই জনমানব-হীন বন্য পার্বত্য-পথে কোথায় যাইবে? কোথায় আশ্রয় পাইবে? তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা নাই। কোনমতে যদি বা গোয়ার ভিতরে কোন লোকালয়ে গিয়া পেঁছায়, তাহা হইলেও সে এইদেশের ভাষা জানে না; হিন্দীও ভাল বলিতে পারে না—কিভাবে কি হদিশ করিবে? হয়ত লোকালয়ে পেঁছানোর আগেই রাত্রে সাপখোপ বা কোনও বন্যজন্তুর সম্মুখে পড়িয়া বেচারী বেঘোরে মারা যাইবে। তাহার উপর মারাত্মক রকমের রাগও হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে ভীষণ দুশ্চিন্তাও দেখা দিল। সত্যাগ্রহী হিসাবে অজিতও অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের মতই জানিয়া শুনিয়াই বিপদের মুখে আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব বাঙলার রিফিউজী পরিবারের ছেলে। পারিবারিক দায়িত্বের বোঝাও যে একেবারে তাহার মাথার উপরে নাই তাহা নয়। কতকটা গোয়া আন্দোলনের স্বাভাবিক আকর্ষণে, কতকটা আমার প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য ও মমতাবোধের দরুণ, কাহারও সঙ্গে বেশি কিছু পরামর্শ না করিয়া সত্যাগ্রহে যোগ দিতে চলিয়া আসিয়াছে। নিজেই বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া বেলগাঁও পর্যন্ত নিজের আসার খরচ যোগাড় করিয়াছে। সকল সত্যাগ্রহীর সঙ্গে যৌথ-সংগ্রামে যে যুবক গৌরবময় বিপদ বরণ করিয়া ধন্য হইতে পারিত, নিজের বন্ধু-বান্ধবকে সেই গৌরবের অংশভাগী করিতে পারিত, সে গোয়ার জঙ্গলে আজ কে জানে কোথায় ঘুরিয়া মরিবে? তাহার ভয়লেশহীন তরুণ বিপ্লবী জীবনের কি পরিণতি হইবে? আবার দেশে ফিরিতে পারিবে কি পারিবে না কে জানে? তাহার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা হয় কি বলিব?

কিন্তু এইভাবে আকাশ-পাতাল ভাবিয়াই বা কি করিব? বেশি দেরী না করিয়া, তিনচারজন স্মার্ট চালাক-চতুর গোছের ছেলে দেখিয়া তিন দল সার্চ পার্টি তৈরি করিয়া আমাদের আসার পথে পিছনে যতটা সম্ভব হয়, অন্তত মাইল দুয়েক পর্যন্ত, চারিদিকে অজিতের খোঁজ করিয়া আসিতে বলিলাম। একটি দলের সঙ্গে নিতাই গুপ্ত নিজে গেলেন। আমরা আর সকলে যেখানে ছিলাম, সেইখানে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অজিতের চিন্তা ছাড়া আর একটি বড় দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ তখন আমার মনের মধ্যে ছিল—সেই কথা আগেই বলিয়াছি। যতই চেষ্টা করি গোয়ার ভিতরে কোন লোকালয়ে—গ্রামে বা শহরে পেঁছানো যে আজ আর সম্ভব হইবে না তাহা ক্রমেই অবধারিত বলিয়া বুঝিতেছিলাম। কিন্তু এতগুলি শ্রান্ত ক্লান্ত অভুক্ত সত্যাগ্রহীকে লইয়া এই ঘোর বর্ষার ভিতর কোথায় আশ্রয় লইব? কোথায় মাথা গোঁজার একটু জায়গা পাইব? খাওয়া তো অদৃষ্টে জুটিবে না জানি; কিন্তু যে কোন মতেই হোক বৃষ্টির হাত হইতে সকলে আত্মরক্ষা করিতে পারি এমন একটু আশ্রয় চাই; তাহা না হইলে সমূহ বিপদ।

কিন্তু সেইরূপ কোনো আশ্রয় আশে পাশে খুঁজিয়া পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। আমার গায়ে তখন রীতিমত জ্বর আসিয়া গিয়াছে; যদিও জ্বরের উত্তাপ এবং একটু মাথাধরা ছাড়া শরীরে অন্য কোনো গ্লানি অনুভব করিতেছি না। পুণা হইতে রওনা হওয়ার পর পেটে দু'এক গ্লাস চা ভিন্ন আর কিছু পড়ে নাই। সেইজন্য কিছু শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করিতেছি। কিন্তু মনে মনে আসল ভয়, ইহার উপরে যদি আবার রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিতে হয় তাহা হইলে কি হইবে?

তখন প্রায় পৌনে পাঁচটা। এমন সময় গাইড্‌দের একজন আসিয়া জানাইল অল্প কিছুটা দূরে, নীচে আর একটি টিলার উপর দুটি বড় চালাঘর আছে। সে নিজে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। দূর গ্রামের কাঠুরিয়ারা বনে কাঠ কাটিতে আসিয়া সেইখানে বৃষ্টির সময় আশ্রয় নেয়; রান্নাবান্না করিয়া খায়। এখন চালা দুইটি সম্পূর্ণ খালি পড়িয়া আছে। ভিতরে ঢুকিয়াও দেখিয়া আসিয়াছে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আজ রাত্রের মত সকলে সেইখানে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহারা লোকালয়ের পথ যে সত্য সত্যই হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাও সে এই সময় একটু সংকোচের সঙ্গে হইলেও প্রথম খোলাখুলি স্বীকার করিল। আজ সন্ধ্যার ভিতরে পথ খুঁজিয়া আর কোন মতে লোকালয়ে যাওয়া সম্ভব হইবে না। তবে তাহারা এইটুকু বলিতে পারে যে, আমরা লোকালয় হইতে বা উত্তরের নদী হইতে খুব বেশি দূরে নাই। বেশি দূরে হইলে যে কাঠুরিয়াদের চালা থাকিত না নিজে নিজেও তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম।

আমি তাহার কথা শুনিয়া মনে মনে যে কি পরিমাণ আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম, তাহা লিখিয়া বোঝানো কঠিন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিংটনের মত "Come Bluecher or Come night" বলার মনের অবস্থাও তখন আমার নাই। কারণ আমাদের এই সত্যাগ্রহে কোন ব্লুচার এই ভর সন্ধ্যায় গোয়ার জঙ্গলে আসিয়া আমাদের বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিবেন না। বরং তাঁহার লোকজনকেই আবার কোথায় মাথা গুঁজিতে দিব, খাওয়াইব তাহাই আরেক বিরাট সমস্যা হইয়া দেখা দিবে! আর "Come night!" বলিয়া রাত্রির অন্ধকারকেও ডাকার সাহস হইতেছে না। কারণ ওয়েলিংটনের মত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষার পথ খোঁজা আমার সমস্যা ছিল না। আমরা নিতান্ত বৈষ্ণব অহিংস সত্যাগ্রহী। কপাল দোষে 'গেরিলা' সত্যাগ্রহের অভিযানে আসিয়া গোয়ার জঙ্গলে পথ হারাইয়াছি। বৃষ্টি-বাদলের রাত্রিতে মাথা গোঁজার একটা জায়গা না পাইলে সদল-বলে ভিজিয়া মরিব। তাহার চেয়ে যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, তবু মন্দের ভাল। রাত্রির আঁধারে বৃষ্টিতে ভেজার চেয়ে দিনের আলোয় যতক্ষণ পারা যায় অন্তত আশ্রয় খোঁজার একটা চেষ্টাও করা যায়। মনে মনে একটা ভরসা রাখিয়া চলা যায়। বর্ষার রাত্রিতে অসহায়ভাবে একজায়গায় বসিয়া বসিয়া ভেজা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না।

অপ্রত্যাশিতভাবে রাত্রিবাসের মত একটি জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনার কথা শুনিয়া ভগৎ তুলসীরামজীকে বলিলাম: "আপনি উহার সঙ্গে গিয়া দেখিয়া আসুন চালা ঘর দুইটি কেমন। ইতিমধ্যে আমাদের সার্চ পার্টিও হয়ত ফিরিয়া আসিবে। তখন আমরা সকলে গিয়া আজ রাত্রির মত ওখানেই আশ্রয় লইব; আর তা ছাড়া উপায়ই বা কি?" তুলসীরামজী অত্যন্ত ধৈর্যশীল স্থিতপ্রজ্ঞ লোক। বিপদে বেশি বিচলিত হন না। তিনি বলিলেন, "বাবুজী, আপনি বেশি চিন্তা করিবেন না। যিনি আমাদের এইপথে ডাকিয়া

আনিয়াছেন, সেই মালিকের উপর সব ভার আছে। তিনি যা হোক একটা ব্যবস্থা করিবেনই করিবেন। আপনি এখানে থাকুন আমি ওদিকের বন্দোবস্ত কি করা দরকার দেখিতেছি।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, "হায়! আমার যদি এইরকম বিশ্বাসের জোর থাকিত।" যাই হোক্ তুলসীরামজীকে দুইচারজন ছেলেকে সঙ্গে নিতে বলিলাম, যদি কোন দরকার পড়ে। তিনি গাইডটিকে ও জন দুই তিন ছেলেকে সঙ্গে লইয়া নীচের টিলার দিকে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ছয়টা সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গেল। মেঘলা আকাশে ক্রমে অন্ধকার নামিয়া আসিতে থাকিল। সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে আসিতেছে। কাল কোথায় ছিলাম, আজই বা কোথায়? কাল এতক্ষণে মিরাজের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে; তাহারই একটি কামরায় বসিয়া আমার জ্বরের দরুণ গোয়া যাওয়ার সব পরিকল্পনা পণ্ড হয় কিনা সেইকথা ভাবিয়া ভাবিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। আজ গোয়ার ভিতরে সহ্যাদ্রির বনাকীর্ণ সানুদেশে বসিয়া বর্ষার রাত্রিতে কোথায় মাথা গোঁজার মত একটু আশ্রয় পাই সে চিন্তা করিতেছি! কোথায় সালাজার, কোথায় সালাজারের দুর্দান্ত Pide পুলিস, আর কোথায় গোয়ার রুম্বা* আর মন্তেইরোর গোয়েন্দা চেলা-চামুণ্ডার দল? বন্ধু হিসাবে কোন Bluecher না আসুন, "Come Rhumba! Come Monteiro!" বলিয়া অদৃষ্টের কাছে আবেদন জানানোর ইচ্ছা হইতেছে। তাহারা আসিয়া আমাদের কি আর এমন বিপদ ঘটাইবে? মারধোর যা করার করিয়া তারপর অন্তত হাজতে পুরিয়া আটকাইয়া তো রাখিবে! সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া আবার এই ঠাণ্ডা রাত্রিতে বৃষ্টি মাথায় করিয়া জঙ্গলে বসিয়া থাকিতে হইবে না! নানাসাহেব গোরেকে তো শুনিয়াছি, ইচ্ছা মতন মারধোর করিয়া সোজা পাঞ্জিমে লইয়া গিয়াছে। শিরুভাই লিমায়ে তো এক গ্রামে ঢুকিয়া মিটিং করিয়া গ্রামে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তারপর নিজেই পুলিস-প্যাটেলকে (দফাদার) চিঠি দিয়া থানায় খবর পাঠাইয়াছিলেন পুলিস ডাকিয়া আনিতে! পুলিস সময় মতই আসিয়াছিল। দেশপাণ্ডের বেলায় পুলিস আগে হইতেই তাঁহাদের জন্য রাস্তা আটকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। দেশপাণ্ডের দল দেখা দিতেই—"who is Mr. Despande?" জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে ল্যাণ্ডরোভারে বসাইয়া গোরের মতই সিধা পাঞ্জিম লইয়া গিয়াছে। খালি আমার বেলাতেই পুলিসের কোন গরজ দেখা গেল না! বৃষ্টির ভয়ে তাহারা ওয়ালপই থানা ছাড়িয়া আর নড়িতে পারিল না! এদিকে আমরা পথ ভুলিয়া বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া মরিতেছি। জোঁকে গায়ের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে আর বুকে শ্লেষ্মা জমিয়া নিউমোনিয়া হওয়ার উপক্রম করিয়াছে! পর্তুগীজ পুলিসের বুদ্ধি এমন হইলে সালাজারের সাধের সাম্রাজ্য আর কয়দিন টিঁকিবে? হায়রে পোড়া কপাল! আমাদের অদৃষ্টে এ বর্ষার রাতে

---

* কাপ্তেন রুম্বা বহুদিন গোয়ার ও পর্তুগীজ ভারতের পুলিসের বড়কর্তা ছিলেন। আমি অবশ্য সে সময় জানিতাম না, আমার গোয়া প্রবেশের কিছু আগে তিনি ছুটি লইয়া লিসবনে চলিয়া যান। অবশ্য আমার ভয়ে নয়! গুজব, গভর্নর জেনারেল জেনারেল বেনার্ড গেদীস সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বনিবনা হইতেছিল না। তাই উপরে তদ্বির করার জন্য তিনি তখন লিসবনে গিয়াছিলেন। তিনি আর ফেরেন নাই।

পুলিসের হাজতও জুটিল না। আশ্রয় জুটিল সহ্যাদ্রির অধিত্যকায়..."সহ্যাচে" উঞ্চ কড়ে"! স্বাগত জানাইল পাহাড় জঙ্গল আর জোঁক! "স্বাগতাস সজ্জ খড়ে"! স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি হইয়াই ছিল! ক্রমে গোধূলির ক্ষীণ লাল আলো পশ্চিম আকাশের সিঁথি হইতে মুছিয়া গেল। চৌদ্দ ঘণ্টা আগে আজই ভোরে অন্‌মুড়ের কাস্টমস বাঙলোর সামনে সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ করার অধীর আগ্রহ লইয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে সমবেত হইয়াছিলাম। ভোরবেলার সেই সত্যাগ্রহ-রোমান্স-উচ্চকিত মন আর কারও নাই। বেচারী অজিত এই দুর্দান্ত জঙ্গলে কোথায় বেঘোরে পথ হারাইল কে জানে? তাহার অদৃষ্টে আরও কি দুর্গতি আছে কে জানে? সকলের শরীর মন দুই-ই ক্লান্তিতে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। শুকনা কোন একটা জায়গায় মাথা গুঁজিয়া শুইতে পারিলে বাঁচিয়া যাই। বর্ষার ধূসর মেঘে ঢাকা বিধবা আকাশের নীচে গোয়ার নাম-না-জানা পাহাড়ী টিলার উপর জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া আছি। আকাশে একটি তারাও নাই যে অঙ্গুলি তুলিয়া মাভৈঃ বলিয়া সাড়া দিবে, ভরসা দিবে। এমন সময় হঠাৎ নিতাই গুপ্তের গলার আওয়াজ কানে গেল—"এখন কি করব আমরা? অজিতবাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না!" ক্রমে মিনিট দশেকের মধ্যে সব কয়টি দল ফিরিয়া আসিয়া সেই একই রিপোর্ট দিল।†

তখন সত্যই আর কিছু করার নাই। চারিদিকে জঙ্গল আর মিশকালো অন্ধকার। অজিতের কথা ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ইতিমধ্যে ভগৎ তুলসীরামজী তাঁহার সঙ্গে যে গাইডটি গিয়াছিল এবং আরও একজন ভলান্টিয়ারকে দিয়া খবর পাঠাইয়াছেন আমাদের হঠাৎ পাওয়া সেই চালার ঘর-দুয়ার খুব ভাল। তিনি সবটা পরিষ্কার করিয়া মেজেতে প্রথমে কাঠুরিয়াদের জমানো কাটা কাঠ সারি সারি বিছাইয়া তার উপর পুরু পোয়াল বিছাইয়া দিয়াছেন। চালা দুইটির একটিতে নাকি এক গাদা শুকনা পোয়ালও ছিল! এবং তাহার উপরে আরও ভাল খবর—সেখানে কাঠুরিয়াদের উনান হাঁড়িকুড়ি সবই রাখা আছে। ইচ্ছা করিলে শুধু রাত্রিবাস করাই নয়, রান্না করিয়া খাওয়াও সম্ভব হইবে। টিলার নীচে পরিষ্কার জলের একটি ঝরণাও আছে। চিন্তার কোন কারণ নাই!

বুঝিলাম আজ তুলসীরামজীর মালিক নিজে আমাদের ভার লইয়াছেন! আর কিছু না হোক্ একটা ছাদের নীচে শুকনা জায়গায় হাত পা ছড়াইয়া শোয়া যাইবে। আর ভয় নাই— Strike the tent!

সবাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীচের টিলার দিকে চলিলাম।

---

† তখন জানিতাম না; পরে ম্যাপ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম আমরা অন্‌মুড় হইতে খুব-সম্ভব মাইল ১২—১৪'র ভিতরেই ছিলাম। আমরা যে জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছিলাম তাহা ভিরোন্দে'র পুলিস চৌকী হইতে মাইল ছয়েক দূরে। আমাদের গাইডরা বৃষ্টির ভিতর পথ হারাইয়া ফেলায় আমরা সেদিন অন্‌মুড় আর ভিরোন্দে'র মাঝামাঝি যায়গায় সহ্যাদ্রির পাহাড় আর জঙ্গলের ভিতরে চক্কর কাটিয়া প্রায় ৩০—৩৫ মাইলের মত হাঁটিয়া ছিলাম। কিন্তু মোটের উপর, আমাদের গন্তব্য পথ হইতে খুব বেশি দূরে গিয়া পড়ি নাই।

॥ ৭ ॥

অরণ্যে রাত্রিবাস

গোয়ায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গলে পথ হারাইয়া আমাদের যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ, গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় আমাদের যে এইভাবে গোপনে পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গাইয়া অরণ্য ভেদ করিয়া গোয়ায় ঢুকিতে হইবে তাহার জন্য মোটেই তৈরি হইয়া আসি নাই। পুণা হইতে রওনা হওয়ার আগে যদি এ সম্পর্কে কিছু আঁচ পাইতাম তাহা হইলে আমরা সেইভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারিতাম; মনে মনেও বটে এবং অন্যভাবেও। কিন্তু আমাদের গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুণা ও বেলগাঁও হইতে যাঁহারা পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে ইহার কোনো আভাস-ইঙ্গিত আমরা পাই নাই। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্ব আমারও কিছুটা ছিল। কিন্তু পুণায় আসিয়া হঠাৎ আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহা হইয়া ওঠে নাই। মোটের উপর একটা বিদেশী রাজ্যে বিদেশী গভর্নমেণ্টের অধিকারভুক্ত এলাকায় গিয়া, সঙ্গোপনে তাহাদের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া সত্যাগ্রহ করিতে যাওয়ার পরিকল্পনাকে যে ধরনের গুরুত্ব আমাদের দেওয়া উচিত ছিল তাহা আমরা দিই নাই। আমাদের মনে ক্ষুদে পর্তুগাল সম্পর্কে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবও হয়ত কিছুটা কাজ করিতেছিল। ইংরেজ আমলে এইদেশে রাস্তাঘাটে যে ধরনের প্রকাশ্য সত্যাগ্রহ হইত তাহার অভিজ্ঞতার কথাটাই আমাদের মনে ছিল বেশি করিয়া। সত্যাগ্রহ করিতে গেলে পুলিসের হাতে মার-ধোর খাইতে হইবে, জেলে যাইতে হইবে; দরকার হইলে গুলিগোলারও সম্মুখীন হইতে হইবে—সেটা ধরিয়াই নেওয়া থাকে। গোয়া সত্যাগ্রহেও সেই ধরনেরই কিছু একটা ব্যাপার ঘটিবে, তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়, এইটাই আমরা সকলে মনে মনে ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু পর্তুগীজ সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া, প্রকাশ্য রাজপথ এড়াইয়া, পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া গেরিলা কায়দায় গোপনে ঢুকিতে গেলে এই ঝড়-বৃষ্টির দিনে কখন কি অবস্থায় পড়িব তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি নাই বা তাহার জন্য তৈরি হইয়া আসি নাই। গোপন পথ-ঘাট, গোয়া-সীমান্তের ভূসংস্থান বা 'টপোগ্রাফি' ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্য যেটুকু খোঁজখবর নেওয়ার, বা প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করার প্রয়োজন যে কোনো সহজবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মনে এই অবস্থায় উঠিতে পারিত, ওঠা উচিত ছিল, তাহা আমাদের মনে ওঠে নাই। পথে দরকার পড়িতে পারে মনে করিয়া ইলেক্‌ট্রিক টর্চের আলো বা একটি পেন্সিল কাটা ছুরি পর্যন্ত কেহ আনে নাই।

একথা স্বীকার করিতে আমার মনে কোনো সংকোচ নাই যে, গোয়া-আন্দোলনে আমরা সকলেই প্রথম হইতে যে পরিমাণ ভাব-প্রবণতার দ্বারা চালিত হইয়াছি, আন্দোলনের বাস্তব সংগঠনে বা উদ্যোগ-আয়োজনে আমরা সব সময় সেই অনুপাতে বাস্তব বুদ্ধি বা দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারি নাই। এটা বোধহয় আমাদের জাতীয় চরিত্রের খানিকটা বৈশিষ্ট্যও বটে। খালি আমাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপলক্ষেই যে এ মন্তব্য প্রযোজ্য তাহা নয়। গোয়া সম্পর্কে আমরা সরকারীভাবে হোক (গভর্নমেণ্টের দিক হইতে) আর

বে-সরকারীভাবে জনসাধারণের তরফ হইতে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ হইতে হোক, যখনই আমরা যা কিছু করিয়াছি, তাহার পিছনে আমাদের এই বাস্তবতা-বোধ-বর্জিত ভাব-প্রবণতাই বেশি মাত্রায় কাজ করিয়াছে। 'বাস্তবতাবোধ-বর্জিত' বিশেষণটি এইখানে ব্যবহার করিতেছি খুব সংকীর্ণ অর্থে—যে কোন আন্দোলন বা গণ-সংগ্রাম চালাইতে গেলে যে পরিমাণ 'কেজো' বুদ্ধির দরকার তাহার একান্ত অভাবের কথা মনে করিয়া। সোজা কথায়, আমরা যে কৌশলে পর্তুগীজ সীমান্ত অতিক্রম করিতে চাহিয়াছিলাম—যে মৌসুমে এবং যে পথে—আমাদের সাজ-সজ্জা, যোগাড়-যন্ত্র আদৌ সে ধরনের ছিল না। আমাদের দুর্ভোগ এবং বিড়ম্বনার মাত্রাটাও সেইজন্য একটু বেশি হইয়াছিল।

তবু অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন ছিল বলিয়া এই অবস্থাতেও, সেই পাহাড় এবং ঘোর জঙ্গলের ভিতরেও নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রাত্রিবাসের একটি আশ্রয় মিলিয়া গেল। সারাদিন ধরিয়া সেই 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'র ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে হয়রান হইয়া বার বার বৃষ্টিতে ভিজিয়া, নাকালের চূড়ান্ত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত যে ওই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় পাওয়া যাইবে, তাহা কেহ ভাবিতেই পারি নাই। তুলসী রামজীর সঙ্গে ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের একজন আসিয়া এক গাল হাসিয়া মারাঠী ভাষায় খবর দিল—"হী জাগা চাংলা আহে, আম্হী=[আহ্মী] সগ্‌ড়ে ঠাক্ ঠিক লাবুন ঘেত্‌লে, আতাঁ য়েতে আরামাত পড়ুন রাহান্যাস্ হরকৎ নাহী" (জায়গাটা খুব ভাল, আমরা সেখানে সবকিছু ঠিক ঠাক করিয়া লইয়াছি, এখন এইখানে শুইয়া হাত পা ছড়াইয়া আরাম করা যাইবে)—মারাঠী কথা তখন খুব ভাল রকম বুঝি না। অজিত বেচারী কোথায় এই রাত্রে বেঘোরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে সে দুশ্চিন্তা মনে আছে। তবু খুশী না হইয়া পারিলাম না। তুলসী রামজী নীচে কি করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য এক এক করিয়া ক্রমে অনেকেই নীচের টিলায় নামিয়া গিয়াছিলাম। আমরা যে কয়জন তখনো ছিলাম আর অজিতকে যাহারা খুঁজিতে গিয়াছিল সকলে মিলিয়া আমরাও নীচের টিলার কাঠুরিয়াদের সেই কুঁড়েঘরের উদ্দেশ্যে গেলাম।

নীচের টিলাটি বেশি দূর নয়, ফার্লঙ দুই তিন হইবে। আমরা পাহাড়ের যে দিকটায় বসিয়াছিলাম তাহার পিছনের কাছ ঘেঁষিয়া। কিন্তু নীচে নামিয়া যাওয়ার পথটি মোটামুটি বেশ পরিষ্কার ছিল। আর টিলার মাথায় যেখানে কাঠুরিয়াদের একচালা ঘর দুইটি দাঁড়াইয়া সে জায়গাটাও পরিষ্কার ছিল। পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গায় ছোট একটুখানি যেন টাক পড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপরেও জঙ্গল, নীচেও বেশ ঘন জঙ্গল। কিন্তু কি করিয়া যেন ঐ জায়গাটুকুতে কোনো গাছপালা গজায় নাই। অল্প কিছু ঘাস আছে। লাল পাথর, কাঁকর ও মাটি মেশানো জমি। জল দাঁড়ায় না বলিয়া জমি ভিজা হইলেও বৃষ্টির দিনের পক্ষে শুকনাই বলা চলে। তাহার উপরে পাশাপাশি দুইখানা একচালা ঘর। কাঠুরিয়ারা জায়গাটা মোটের উপর বাছিয়াছে ভাল। আরও নীচে কিছু দূরে একটি ঝরণা নদীর জল আসিয়া পড়িতেছে। সেখানে জমি কতকটা সমান বলিয়া জলের বেগ কম। বেশ স্বচ্ছ পরিষ্কার জল। বর্ষার দিনে এই লাল মাটি লাল পাহাড়ের দেশে কোথাও কেন ঘন ঘোলা লাল জল নামিয়া আসে, আর কোথাও বা সেই একই বৃষ্টির জল সেই একই পাহাড়ের ভিতর হইতে কলের জলের মত স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও পরিশ্রুত হইয়া নামিয়া আসে, প্রকৃতির সে 'ফিল্‌টার প্রসেসে'র রহস্য আমি বুঝি নাই। কিন্তু সেই পরিষ্কার উষ্ণ জলের ধারা দেখিয়া জ্বর গায়েও স্নান করার একটা ইচ্ছা হইল।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখি, আমাদের 'বিছানা' একেবারে বিছানো হইয়া গিয়াছে! কাঠুরিয়াদের কিছু কাটা চেলা করা কাঠ দুই ঘরে 'স্ট্যাক্' করা ছিল। ভগৎ তুলসীরাম সেইগুলিকে মেঝেতে বিছাইয়া তাহার উপর পোয়াল দিয়া দিয়াছেন। পোয়ালগুলি কেন কিভাবে আসিল বলা কঠিন। কিন্তু ঘরের ছাউনীতে পোয়াল দেখিয়া আন্দাজ করিলাম, ছাউনীর কাজে লাগে নাই এমন বাড়তি পোয়াল কিছু হয়ত থাকিয়া গিয়াছিল। যাহা হোক, সেইগুলি আমাদের পরম উপকারে আসিল। দুই ঘরেই ছেলেরা তখন কাঠ জ্বালিয়া ধুনী তৈয়ারী করিয়া নিয়াছে। অনেকেই ঝরনায় স্নান করিয়া পরিষ্কার হইয়া নিয়াছে। যাহারা স্নান করে নাই, তাহারা অন্তত মুখ হাত পা ধুইয়া নিয়াছে। কেহ কেহ ধুনীর আগুনের তাপে তাহাদের জামা কাপড় শেঁকিয়া নিতেছে। সে সব এক-চোখ দেখিয়া লইয়া আমি তাড়াতাড়ি নিতাই গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া একেবারে পুরা অন্ধকার নামিয়া আসার আগে ঝরনায় স্নান করিয়া নিতে গেলাম।

হিন্দীতে কথা আছে, ঈশ্বর যখন নাকি দেন একেবারে ছাদ-ছপ্পড় ফুঁড়িয়া দিতে থাকেন। সবেমাত্র ঝরনার দিকে পা বাড়াইয়াছি এমন সময় সেই নাসিকের ছেলেটি কাছে আসিয়া একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি তাহাকে দু' তিনটি টাকা দিতে পারিব কিনা। আমি আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"তুমি এই ভর সন্ধ্যায় জঙ্গলের ভিতর টাকা দিয়া কি করিবে?"

সে বলিল—"আমাদের ক্ষুধা পাইয়াছে।"

ক্ষুধা তো তখন আমারও পাইয়াছে, পেটের ভিতরে ধুনী জ্বলিতেছে; পাল্টা প্রশ্ন করিলাম—"ক্ষুধা পাইলেই বা, এ জঙ্গলের ভিতর পকেটে টাকা পয়সা থাকিলেই বা খাবার জিনিস পাইতেছ কোথায়?"

এই কথার উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহা অপ্রত্যাশিত শুভ-সংবাদ। মর্মার্থ এই যে, অজিত ভৌমিককে খোঁজার সময় তাহারা যেইদিকে গিয়াছিল সেইদিকে প্রায় মাইলখানেক দূরে তাহারা কয়েক ঘর লোকের বাস দেখিয়া আসিয়াছে। এই লোকগুলি এইদিককার পাহাড়ী চাষী লোক; সত্যাগ্রহের কথা তাহারা জানে। অবশ্য সেখানে ৫০—৫২ জন লোকের আশ্রয় নেওয়ার মত জায়গা নাই। আমাদের সার্চ পার্টী তাহাদের অজিত ভৌমিকের চেহারা ও কাপড়-চোপড়ের বর্ণনা দিয়া বলিয়া আসিয়াছে যে, এইরকম কোন বিদেশী লোক, কোংকনী-মারাঠী বলিতে পারে না, যদি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে যেন সে আশ্রয় পায়। সেই গ্রামে গেলে চাল ডাল পাওয়া যাইতে পারে; আর হাঁড়ি-কুঁড়ি বাসন-পত্র তো এই ঘরেই আছে। যে বসতি তাহারা দেখিয়া আসিয়াছে সেইখানে মোটে ৩।৪ ঘর গরীব লোকের বাস, আর গোয়ায় এখন চাল দুষ্প্রাপ্য। আমাদের আশ্রয় স্থলে হাঁড়ি, উনান এইসব দেখিয়া তাহাদের রান্না করিয়া খাওয়ার কথা মনে হইয়াছে। সুতরাং কিছু টাকা থাকিলে সের পাঁচেক চাল, ডাল, অল্প কিছু নুন কিনিয়া আনিয়া রাত্রেই সে খিঁচুড়ি রান্না করিয়া সকলকে কিছু কেছু খাওয়াইয়া দিতে পারিবে।

সারা পথ ছেলেটিকে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। ফুর্তিবাজ, কাজের ছেলে 'resourceful' তবে 'resource'-টা বেশিরভাগ তার মনের ভিতর হইতে সংগ্রহ করিয়া নেয়। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও দমে না, হাসিয়া নিজের সকল দুঃখ কষ্ট উড়াইয়া দেয়। অন্যের বিপদে বা অসুবিধায় দৌড়িয়া সাহায্য করার জন্য আগাইয়া যায়।

সুতরাং তাহার কথায় আমার অবিশ্বাস হইল না। তাহা ছাড়া, এই জঙ্গলে সে নিজের কোন মতলবে নিশ্চয়ই আমার কাছ হইতে টাকা চাহিতেছে না। আমাদের ঘরে কাঠুরিয়াদের রান্নার হাঁড়ি-কুড়ি সবই আছে; কয়েকটা টাকা হইলেই যদি সকলের ভাগ্যে খাওয়া জোটে ক্ষতি কি?

স্বেচ্ছাসেবকদের সকলের মতই আমিও বেলগাঁওয়ে গোয়া কংগ্রেসের অফিসে আমার টাকা-পয়সা সব কিছু জমা রাখিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইলেও আমি একেবারে পকেট খালি করিয়া আসি নাই। দু' তিনটি পাঁচ টাকার নোট ও খুচরা কয়েকটা এক টাকার নোট মনিব্যাগে ছিল। আমি দুটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। তুলসীরামজীর 'মালিক' এই ঘোর জঙ্গলে মাথা গোঁজার আশ্রয় যখন জুটাইয়া দিয়াছেন, তখন কে জানে ক্ষুধার অন্নও হয়ত তিনিই জুটাইয়া দিবেন! তিনি কপালে অন্ন মাপিয়া রাখিলে আটকাইবে কে? তাছাড়া আগেই বলিয়াছি আমার নিজেরও তখন দারুণ ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। সুতরাং একটি উৎসাহী ছেলের খাবার যোগাড়ের একটা সৎ চেষ্টাকে নিরুৎসাহের ঠান্ডা জল দিয়া দমাইয়া দেওয়ার কথা কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না। পুড়েগাঁওকরকে টাকা কয়টি দিয়া ঝরনার দিকে নামিয়া গেলাম। তখন চারিদিক প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু পথ মোটামুটি পরিষ্কার বলিয়া আবছা অন্ধকারেও পথ দেখিয়া যাইতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না।

ঝরনায় নামিয়া দেখি স্রোতের জল বলিয়াই হোক, বা অন্য কোন কারণে হোক, জলটা বেশ আরামদায়ক রকমের গরম। গায়ে জ্বর থাকা সত্ত্বেও তাই স্নান করিয়া মোটের উপর বেশ ভাল লাগিল। তাছাড়া হাতে-পায়ের কাদা, জামা-কাপড়ে ঘাম আর আছাড় খাওয়ার ফলে কাদা লাগিয়া একাকার অবস্থা; তাহার উপরে জামা-কাপড়ের ভিতরের দিকে জোঁকের শোষা রক্ত (তাও আবার জায়গায় জায়গায় শুকাইয়া চড়চড় করিতেছে)—এইসবের ফলে নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। ভাল করিয়া সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া সেই অস্বস্তি ও গ্লানির হাত হইতে মুক্তি পাওয়া গেল। আমাদের নিতাই কঠোর ব্রহ্মচারী লোক। সে যে কি ভাবিয়া সত্যাগ্রহ অভিযানের পথে একটি গোদ্‌রেজের সাবান তাহার ঝোলার ভিতরে লইয়াছিল জানি না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় গোমন্তক-সহ্যাদ্রির অরণ্য প্রান্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সেই ঘোর অরণ্যের ভিতরেও আমাদের যেন সব কিছু হাতে হাতে যোগাইয়া দিতেছিলেন। প্রথম ঘর জুটিল; তার পর ক্ষুধার অন্ন হয়ত পাওয়া যাইবে সে আশা দেখা দিল; ঝরনার গরম জলে আরাম করিয়া সাবান মাখিয়া স্নান করিলাম—ইহার উপর আর কি চাই? "ধন্ ধন্ গুরুজী মহারাজ, জিন্হেঁ চিড়িয়াসে বাজ তোড়াঞ্‌"—সেই পরমারাধ্য গুরুদেবের জয় হোক, যিনি চড়াই পাখী দিয়া বাজ শিকার করান, মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে দিয়া গিরি লঙ্ঘন করান! আমরাও সহ্য-গিরি লঙ্ঘন করিয়া পথ হারাইয়া সারাদিন বেঘোরে ঘুরিতেছিলাম; এতক্ষণে বোধহয় তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল। তবে তাহা আমার মত পাষণ্ড লোকের জন্য নিশ্চয় নয়, বোধহয় তাঁহার মহাভক্ত তুলসী রামজী আমাদের সঙ্গে আছেন বলিয়া তাঁহার কৃপা হইয়া থাকিবে!

এইসব কথা পাঁচ-সাত নানান রকম ভাবিতে ভাবিতে উপরে আসিয়া দেখি, আমাদের ভলান্টিয়ারেরা সকলে তখন একেবারে হাত-পা টান করিয়া "আরামাঁত পড়ুন" রহিয়াছে। বিকাল হইতেই আমাদের এইদিকটায় আর বৃষ্টি ছিল না। দুই ঘরেরই এক টের দিয়া চালার বাখারির সঙ্গে বাঁধিয়া পাশাপাশি করিয়া ধুতি, পাজামা হাফ-প্যান্ট শার্ট-কুর্তা

টান করিয়া টাঙাইয়া দিয়াছে। অনেকেই ইতিমধ্যে ধুনীর আগুনে নিজের নিজের কাপড়-জামা কিছু কিছু সেঁকিয়া শুকাইয়াও নিয়াছে। ঘর দুইটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যথেষ্ট বড় হইলেও আমাদের ৫১—৫২ জন লোককে পুরাপুরি জায়গা দেওয়ার মত বড় নয়। এতগুলি লোকের শোওয়ার জায়গা করিতে হইলে সেইখানে চাপাচাপি করিয়া শোয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যাই হোক্ উহারই ভিতর কেহ না নিজের ঝোলা বা ছোট হ্যাভার স্যাক্ মাথায় লইয়া, কেহ-বা চালা কাঠের টুকরার উপর গামছা বা চাদর জড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। মেজের কাঠের উপর সব জায়গায় দেয়ালের খড় এমন কিছু পুরু করিয়া বিছানো নাই। গায়ে এব্ড়ো-খেব্ড়ো চ্যালা কাঠের খোঁচা বেশ বেঁধে। তাহার উপরে গামছা কাপড়, চাদর, পাত্লুন, যে যা পাইয়াছে, বিছাইয়া লইয়া যে যেমনভাবে পারে শুইয়া পড়িয়াছে। ভগৎ তুলসীরাম আমার আগেই স্নান করিয়া আসিয়াছিলেন। স্নান করিয়া আমি ঘরে ফিরিতেই তিনি বলিলেন—"বাবুজী, কাল কি হইবে জানি না, তবে এখন মনে হইতেছে আজ রাত্রির মত আর কোন চিন্তার কারণ নাই। পুড়েগাঁওকর ও ভরদ্বাজ (নাসিকের ভলাণ্টিয়ারটি ও আমাদের গাইডদের মধ্যে একজন) নীচের বস্তিতে চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিতে গিয়াছে। মালিকের ইচ্ছা থাকিলে এই বনেও তৈরী ভাত মিলিবে। মনে হইতেছে, আপনি ভৌমিকবাবুর জন্য খুব চিন্তিত আছেন। কিন্তু চিন্তা করিয়া লাভ নেই, স্বয়ঃ ঈশ্বর তাঁহার ভার লইয়াছেন। বরং আপনি এখন একটু শুইয়া আরাম করুন; আমিও শুইতে চলিলাম। আপনিও আর দেরি করিবেন না। কাল তো ভোরে ভোরে উঠিয়া হাঁটিতে হইবে, সুতরাং এখন যতটা হয় হাত-পা'কে বিশ্রাম করাইয়া নিন।"*

---

*শ্রীমান অজিত ভৌমিক অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া প্রায় ছয়-সাত দিন বাদে বেলগাঁও ফিরিয়া আসেন। প্রথম তিন-চার দিন পথ হারাইয়া তিনি পাহাড়-পর্বতে ও জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে থাকেন। পথে বৃষ্টিতে ভিজিয়া, জোঁকের অত্যাচারে সেই নিরাশ্রয়-নির্বান্ধব জনশূন্য দেশে অনাহারে, অনিদ্রায় তাঁহার অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে আমি মুক্তি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কাহিনী শুনি। দিনের বেলায় ক্ষুধার জ্বালায় বন্যফল কুড়াইয়া খাওয়ার ও কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার চেষ্টা করিতেন এবং আন্দাজে দিক্ নির্ণয় করিয়া লোকালয়ের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে ও সেই দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেন। রাত্রি হইলে বন্যজন্তু ও জোঁকের ভয়ে আশ্রয় নিতেন গাছের উপরে। ঘুমে যাহাতে অচেতন হইয়া নীচে পড়িয়া না যান, তাহার জন্য পরনের কাপড় খুলিয়া গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইত। প্রায় চার দিন এই ভাবে অজানা জঙ্গল পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় তিনি গোয়ার ভিতরে একটি গ্রামে পৌঁছান এবং সেখানে গ্রামবাসীদের কাছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে কোন মতে নিজের পরিচয় দেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে সত্যাগ্রহী জানিয়া ভালভাবে অভ্যর্থনা করে এবং তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া সেবা-শুশ্রূষার ও খাওয়ানোর আয়োজন করে। কিন্তু পুলিসের ভয়ে তাঁহাকে একটি বাড়ীর মাচায় লুকাইয়া রাখে। জ্বরাক্রান্ত ও প্রায় অচেতন অবস্থায় সেই জায়গা হইতে পরের দিন মিলিটারী পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। থানায় যে কয়দিন তিনি ছিলেন অমানুষিক প্রহার ভিন্ন আর বিশেষ কিছু তাঁহার ভাগ্যে জোটে নাই। প্রথম দিন পুলিস তাঁহাকে কিছুই খাইতে দেয় নাই। পরের দিন একজন গোয়ানীজ দেশীয় পুলিস দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে কিছু খাইতে

ঈশ্বর ভক্ত তুলসীরামের পরামর্শই তখন সবচেয়ে সৎ পরামর্শ বলিয়া মনে হইল। তবু নিজে শুইয়া পড়ার আগে কে কোথায় জায়গা পাইয়াছে, কে কোথায় শুইয়া পড়িয়াছে একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। দুই ঘরেই জনা তিন-চারেক করিয়া ছাড়া প্রায় সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম যে সত্যাগ্রহীদের যে দল যে প্রদেশ বা যে জেলা হইতে আসিয়াছে, যতটা পারে একত্র শোওয়ার জায়গা করিয়া লইয়াছে। বিদেশে বিপাকে নিজেদের মনের অজ্ঞাতেও লোকে বোধহয় কিছুটা 'clannish' গোত্রসচেতন হইয়া ওঠে, পরিচিত চেনা-জানা লোকেরা যতটা পারে কাছে থাকিতে চায়। তাছাড়া আমাদের দলটা কতকটা আন্তঃ-প্রাদেশিক অভিযাত্রী দল হওয়াতে, বিভিন্ন অঞ্চলের ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার দরুণ কথাবার্তা বলবার বা খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করার অসুবিধাও ছিল। তবু দেশের লোকের কাছে থাকিলে লোকে যতটা মানসিক স্বস্তি অনুভব করে, ততটা অন্যদের কাছে থাকিয়া হয় না। কেরল হইতে কুমার পিল্লাইয়ের নেতৃত্বে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কেও মনে মনে একটা চিন্তা ছিল। বেচারীরা উত্তর ভারতের কোন ভাষাই বুঝে না। কুমার পিল্লাই নিজে ইংরেজী ও হিন্দী দুই ভাষাই অনর্গল বলিতে পারেন, কিন্তু অন্যেরা মালয়ালী ভাষা ছাড়া কিছু বুঝিতে বা বলিতে পারে না। তাহাদের ঘরে গিয়া দেখি তাহাদের কেহই কোন ভাষাতেই কথা বলিতেছে না; ঘুমে মড়ার মতন অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে।

আমার নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি নিতাই গুপ্ত কোথা হইতে 'ওয়েস্ট

দেয়। তাহার পর দিন হইতে তাঁহাকে একবেলা করিয়া খাইতে দিত। প্রথমে তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল তিনি বোধহয় ভারত হইতে প্রেরিত কোন মিলিটারী গুপ্তচর বা গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু গোয়াতে পুলিসের হাতে আমরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর আমি পুলিস কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলাম যে, আমাদের দলের একজন সত্যাগ্রহী পথ ভুলিয়া ছিট্‌কিয়া পড়িয়াছে। তাহার নাম ও চেহারার বিবরণও দিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই খবর থানায় আসিয়া পেঁীছানর পর তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত আমাদের দলের অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের মত মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু মুক্তি দেওয়ার আগে পর্তুগীজ পুলিসের রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে আর একবার নৃশংসভাবে প্রহার করা হয় এবং হাজত হইতে বাহিরে ছাড়ার আগে ব্লেড় দিয়া তাঁহার দুই পায়ের তলাকার চামড়া পরিষ্কার করিয়া কাটিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তাঁহাকে সেই অবস্থায় সশস্ত্র পুলিসের পাহারায় প্রায় দুই মাইল পথ জোর করিয়া হাঁটাইয়া আনিয়া বেলগাঁওয়ের ট্রেনে বসাইয়া দেওয়া হয়। তখনও ভারতের সঙ্গে গোয়ার রেলপথে যোগাযোগ বন্ধ হয় নাই; ইহার অল্প কিছুদিন বাদেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহাকে গোয়া-সীমান্ত পর করিয়া দিয়া তাঁহার পুলিস প্রহরীরা চলিয়া যায়। ভারত এলাকায় আসিয়া অবশ্য তাঁহার আর বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। ট্রেনের সহযাত্রীরা, রেলকর্মচারী ও ভারতীয় পুলিসের লোকেরা তাঁহার পরিচয় জানিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন ও বেলগাঁও পর্যন্ত সযত্নে তাঁহাকে পেঁীছাইয়া দেন। বেলগাঁও পেঁীছিলে সেখানকার সদর হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়। তিনি ভারতে আসিয়া পেঁীছাইলে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে যে সংবাদ ব্রডকাস্ট হয়, জনৈক গোয়ান সুব-শেফের নিকট হইতে পঞ্জিম হাজতে বসিয়া তাহা আমি গোপনে জানিতে পারি। কিন্তু তাঁহাকে কি ভীষণ দুর্গতি ও শারীরিক নির্যাতনের ভিতর দিয়া এই কয়দিন কাটাইতে হইয়াছে দেশে না ফেরা পর্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই; খালি এইটুকু জানিতাম যে তিনি ভারতে ফিরিয়াছেন।

কটনে'র মোটা সুতার একটি কম্বল যোগাড় করিয়াছেন। সেটি একটু ভিজা ভিজা মতন। তাহার উপরে প্লাস্টিকের ওয়াটার প্রুফ্‌টা বিছাইয়া লইয়া দিব্যি বিছানা হইয়া গেল। বিছানার চেয়ে শোওয়াটাই তখন দরকার ছিল বেশি। নিতাই গুপ্তও কাছাকাছি তাঁহার শয্যা রচনা করিলেন। কখন নিবিড় ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছি তাহা মনেও নাই। জীবনে এমন ঘুম ঘুমাইয়াছি বলিয়া বড় বেশি মনে পড়ে না। মাঝ রাতে একবার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—সে খালি ঈশ্বর কপালে অন্ন মাপাইয়াছিলেন বলিয়া। নাসিকের পুড়েগাঁও-করের আশাবাদ এবং উদ্যোগের কল্যাণে সে রাত্রে সত্য সত্যই আমাদের কপালে অন্ন জুটিয়াছিল।

সেই অন্ধকার সন্ধ্যায় পাহাড়ের নীচে হঠাৎ দেখা সেই চাষীদের বস্তি হইতে জঙ্গল বন-বাদাড় ভাঙ্গিয়া সে সত্যই শেষ পর্যন্ত কয়েক সের চাল, ডাল সংগ্রহ করিয়া আনে; খানিকটা নুন আনিতেও ভুলে নাই। সে নিজে অন্য সকলের মতই পরিশ্রান্ত ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে এক জাতীয় লোক থাকে যাহারা নিজের সুখ-সুবিধার দিকে না তাকাইয়া অন্যের জন্য হয়রানি ভুগিয়া আনন্দ পায়—নাসিকের পুড়েগাঁওকর তাহাদেরই এক গোত্রের। আজ সে কোথায় জানি না। সেই রাত্রির পর আর একদিন মাত্র সে আমার সঙ্গে ছিল। গোয়া মিলিটারী পুলিসের হাতে বন্দী হওয়ার পর তাহাদের সকলের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। গোয়ার পর্তুগীজ পুলিস তাহাদের সকলকে ডোড়ামার্গের নিকট-বর্তী সীমান্তে আনিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়। তাহাকে আমি বাড়িঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বাড়িঘরে তেমন কেউ নাই। এখানে ওখানে সে সামান্য চাকরি বাক্‌রি করিয়া খায়। ১৯৪২ সালের 'কুইট্‌ ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে ভলাণ্টিয়ার হিসাবে জেল খাটিয়াছে। তখন তাহার বয়স খুবই কম ছিল, স্কুলে পড়িত। তার পর জেল হইতে বাহির হইয়া আর লেখাপড়া করিতে পারে নাই। জীবনে বন্ধন এক মা ছিলেন, মা আজ কয়েক বছর হইল মারা গিয়াছেন। একটি ছোট ভাই আছে, সে দেশে কাকার কাছে থাকে। একান্ন-বাহান্ন সালে নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের ভলাণ্টিয়ার হিসাবে কাজ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনে হয়, স্বরাজের পর কংগ্রেস আর আগেকার মত "চাংলি" (ভাল) নাই, কেমন যেন "বাইট" (খারাপ) হইয়া গিয়াছে। তবে সে এখন আর "রাজকরণের" (পলিটিক্‌স্‌) কাজ করে না। তাহার ভাল লাগে না। অন্য কোন পার্টি বা রাজনৈতিক দলের খবর রাখে না। তবে সোস্যালিস্ট পার্টির কথা শুনিয়াছে। নানাসাহেব সোস্যালিস্ট পার্টির লোক। দেশের কাজের জন্য আবার পার্টির দরকার কি তাহা সে বুঝিতে পারে না। তবে বড়লোকদের বিরুদ্ধে গরীব লোকদের একটা পার্টি থাকিলে মন্দ হয় না। অবশ্য এইসব কথা সে ভাল বোঝে না। তবে সে মহারাষ্ট্রের লোক, আজ গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য দেশের ডাক আসিয়াছে। সেইজন্যই সে ছুটিয়া আসিয়াছে। পুলিসের লাঠিতে তাহার কোন ভয় নাই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৯৪২ সালে লড়িয়া দেশের লোক কত মার খাইয়াছে, পর্তুগীজদের আর কত জোর? ইংরেজদের চাইতে নিশ্চয়ই তাহাদের ক্ষমতা বেশী নয়। পরের দিন আবার আমাদের অভিযান শুরু হইলে পর অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরকম নানান কথা বলিতে বলিতে আমার পাশাপাশি সে পা চালাইয়া আসিয়াছিল। সেইদিন দুপুরবেলার পর আর তাহার সহিত দেখা হওয়ার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু আগের দিনের সেই বিপুল দুর্যোগে ঝড়বৃষ্টির ভিতরে পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে পথ হারাইয়া যখন আমরা ঘুরিতেছিলাম তখন তাহার

অদম্য আশাবাদ, উৎসাহ এবং সাহসের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা সহজে ভুলিবার নয়।

সেই রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিল নিতাইয়ের ধাক্কাধাক্কিতে। খুব বিরক্তির সঙ্গে জাগিয়া দেখি, সকলের প্রায় খাওয়া হইয়া গিয়াছে। এক পাশে পুড়েগাঁওকর এবং আরও দুই তিনজন সহ আমার ও নিতাইয়ের জায়গা করিয়া গরম খিচুড়ি বাড়িয়া দিয়াছে। চোখে ঘুমের ঘোর থাকিলেও সেই বাড়া গরম খিচুড়ি খাইব না এত নির্বোধ আমি নিশ্চয়ই নই। গরম খিচুড়ি দেখিয়া নিদ্রা-স্তিমিত ক্ষুধা আবার যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অবশ্য ক্ষুধা যে পরিমাণ ছিল খিচুড়ি সেই অনুপাতে সামান্যই ছিল। কারণ চালে-ডালে মিশাইয়া পাঁচ সেরের বেশী সংগ্রহ করা যায় নাই। আর খাওয়ার লোক একান্ন জন। দু' চার হাতার বেশী করিয়া কাহারো ভাগ্যে জোটে নাই। তাহাই চাটিয়া পুটিয়া খাইয়া ও পেট ভরিয়া জল খাইয়া লইয়া সকলে আবার নিজের নিজের বিছানায় গড়াইয়া পড়িলাম। খাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়িতে দেরি হয় নাই। ভোর হইতেই যতটা সকাল সকাল পারা যায় বাহির হইয়া পড়িতে হইবে ইহা আগে হইতেই স্থির করা ছিল। আগেই বলিয়াছি, সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং এক ঘুমেই বাকী রাতটুকু কাটাইয়া প্রায় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় ঘুম হইতে উঠিয়া ঝরনার জলে মুখ হাত ধুইয়া লইয়া আবার আমাদের অভিযানের পথে পা বাড়াইলাম।

॥ ৮ ॥

গোমন্তকের লোকালয়ে

রাতে কাঠুরিয়াদের ঘরে আশ্রয় পাওয়াতে এই কথা আন্দাজ করিতে কষ্ট হয় নাই যে, আমরা লোকালয় হইতে খুব বেশী দূরে নাই। পুড়েগাঁওকর পাহাড়ী চাষীদের যে ছোট বস্তি হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া আনে তাহার অস্তিত্বও সেই কথা আরও বেশী করিয়া প্রমাণ করিতেছিল। সকাল বেলায় আমাদের গাইড দু'জন ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইয়া সেই একই কথা বলিল যে, আমরা পথ ভুলিয়া একটু বেশী দূরে আসিয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু আর মাইল ছয়েক বা আষ্টেক হাঁটিয়া গেলেই আমরা নদীর ধারে পেঁছাইব। সেই নদী পার হইলেই ওয়ালপইয়ের রাস্তা পাওয়া যাইবে। সুতরাং সকালে রওনা হওয়ার সময়, খালি মুখ হাত ধুইতে বা প্রাতঃকৃত্য সারিতে যেটুকু সময় লাগে তাহার চেয়ে বেশী দেরি না করিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। বৃষ্টি না থাকিলেও আকাশ সকাল হইতে ঘনমেঘাচ্ছন্ন হইয়া যেন গোম্‌ড়া মুখ করিয়া বসিয়াছিল। সকালের আলো, না বিকালের আলো তাহা বোঝা কঠিন। তবে, সবে রাত্রি কাটিয়া আলোর উন্মেষ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সকাল বলা যাইতেছিল। আজ সকালে অবশ্য কালকার মত উৎসাহ উদ্যমের জোর নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সকাল সকাল লোকালয়ে পেঁছিলে যে কাজে সকলে আসিয়াছি সেই কাজে ভালভাবে লাগা যাইবে সেই কথা মনে করিয়া আমরা সকলেই জোরে পা চালাইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।

এবার আমাদের পাহাড়ে ওঠার পালা নয়; পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামার পালা।

আগের দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া ক্রমশ চড়াইয়ে উঠিতেছিলাম, আজ ক্রমশ নীচের দিকে যাইতেছি। জঙ্গল ক্রমে ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতেছে। পাহাড়ে উতরাইয়ের পথে নামিতে ভাল, দৌড়াইয়া নামা যায়। কিন্তু আমাদের মুশকিল এই, কাল পাহাড়ে উপরের দিকে ওঠার সময় এবং সারাদিন হাঁটিয়া হাঁটিয়া যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেকেরই গায়ে, হাতে, পায়ে—বিশেষ করিয়া পেশীতে পেশীতে—ভীষণ ব্যথা হইয়াছে। নীচে নামার সময় শরীরের ভারে স্বভাবতই চলার বেগ দ্রুত হয়। কিন্তু তাতে পায়ের 'মাস্‌লে' ব্যথা থাকায় দৌড়িয়া নামিতেও কষ্ট হইতেছে। তাহার উপর নামার পথও কম পিছল নয়। কালকের অভিজ্ঞতা মনে করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া সামলাইয়া সামলাইয়া নামিতে হইতেছে। তবু তাহারই মধ্যে যতটা তাড়াতাড়ি পারা যায় সকলে চলিতেছি। নিতাই ঝাণ্ডা হাতে নিয়া একটু আগে আগে গাইডদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। আমি পুড়েগাঁওকরের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিতেছি। কিন্তু মোটের উপর আমাদের গতি নীচের দিকে। এইভাবে মাইল দুয়েক চলিয়া ক্রমশ আমরা একেবারে যেন পাহাড়ের নীচে সমান জমিতে বেশ একটা প্রশস্ত উপত্যকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেটা চষা ধানের জমি। বীরভূমে লালমাটির দেশে ভাদ্রের বর্ষায় উঁচু আল দেওয়া খেত যাঁহাদের দেখা আছে, তাঁহারা সেই জমির চেহারা কিছুটা আন্দাজ করিতে পারিবেন। অবশ্য কোঙ্কনের বা গোয়ার ধানের খেতের সত্যকার তুলনা মিলিবে কেরলের পাহাড়ী অঞ্চলে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্তী মালাবার উপকূল ও কোঙ্কন উপকূল—এই দুইয়ের মধ্যে ভৌগোলিক বা ভূসংস্থানগত বা আবহাওয়াগত তফাত খুবই কম। উভয় অঞ্চলের গাছপালা, পশুপাখীও (flora and fauna) এক ধরনের। একই সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বোম্বাইয়ের দক্ষিণ হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত একটানা চলিয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের দক্ষিণ দিকে কোলাবা ও রত্নগিরি জেলা হইতে কারওয়ার বা ম্যাঙ্গালোর বন্দর পর্যন্ত সহ্যাদ্রির পশ্চিম পাশ আর আরব সাগরের অন্তর্বর্তী উপকূলকে কোঙ্কন বলা হয়। ম্যাঙ্গালোরের দক্ষিণে মালাবারে কোঢ়িকোড (কালিকট), কোচিন হইতে আলেপ্পী কুইলন, ত্রিবান্দ্রাম (তিরুবনন্তপুরম্‌) বা কন্যা কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত পার্বত্য উপকূলের নাম মালাবার উপকূল। তবে মালাবার উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা একটু ভিতরের দিকে ঘেঁষিয়া গিয়াছে। কোঙ্কনে, বিশেষ করিয়া গোয়ার কাছে বা রত্নগিরি জেলায় পর্বত একেবারে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। তাহা না হইলে, এই দুই অঞ্চলের মধ্যে চেহারায় তফাত কোথায় তাহা শুধু চোখে ধরা কঠিন। উভয় অঞ্চলের পাহাড়ে একই লাল রংয়ের ল্যাটেরাইট ঝামা পাথরের চাঙড় পাওয়া যায় বেশী। মাটিও একই রকমের গাঢ় লালচে কিংবা গেরুয়া রংয়ের। কাজে কাজেই ভরা বর্ষার ভিতরে আমন ধানের চাষও পাহাড়ের কোলে বা উপত্যকায় একই ধরনে হয়। গতকাল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া চোখ ধরিয়া গিয়াছিল। আজ পাহাড় হইতে নামিয়া ধান খেতের পরিচিত চেহারা দেখিয়া যেন সকলে খানিকটা আশ্বস্ত হইলাম। ধান খেত যখন দেখা গিয়াছে গ্রামেরও তখন আর নিশ্চয়ই খুব বেশী দেরি নাই। সত্যই তাই; ধান খেতের পাশ দিয়া, পায়ে চলার মত যে একটু রাস্তা ছিল সেটা ধরিয়া, আরো মাইলখানেক চলিয়া হঠাৎ একটু উঁচু মতো জায়গায় আমরা আম কাঁঠালের গাছে ঘেরা একটি ছোট গ্রামের ভিতরে আসিয়া পড়িলাম। গোয়ার পর্তুগীজ এলাকায় আমাদের প্রথম গ্রাম।

আমরা পূর্বদিক হইতে এই চব্বিশ ঘণ্টায় সহ্যাদ্রি অতিক্রম করিয়া এখন তাহার অপর পারে কোঙ্কনী গোমন্তকে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন যে আমরা সত্য সত্যই পর্তুগীজ এলাকার মধ্যে আসিয়া গিয়াছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদিও পর্তুগীজ শাসনের কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন তখনও চোখে পড়িতেছে না তাহা সত্ত্বেও যতটুকু দিক নির্ণয় করা তখন আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল তাহা দিয়া বেশ বুঝিতেছিলাম, আমরা আবার পূর্বদিকে ভারতীয় এলাকায় ফিরি নাই, গোয়ার ভিতরেই আসিয়া পড়িয়াছি।

এখন হইতে আমাদের সত্যাগ্রহের গোপন 'গেরিলা' পর্যায় শেষ হইয়া আবার প্রকাশ্য আইন অমান্যের পর্যায় বা রাজনৈতিক পর্যায় (অহিংস প্রতিরোধের পর্যায়) শুরু হইবে। কিন্তু তাহার আগে, যদি সম্ভব হয়, গ্রামের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিতে হইবে অবস্থাটা কি। কিছুটা জিরাইয়া, চা পাওয়া গেলে চা টা খাইয়া নিয়া একটু স্বাব্যস্তভাবে প্রকাশ্য সত্যাগ্রহে নামিতে পারিলে ভালো। তাই বুদ্ধি-পরামর্শ করিয়া আমরা প্রথমে গাইড দুজনের সঙ্গে পুড়েগাঁওকরকে গ্রামে ঢুকিয়া গ্রামের লোকে আমাদের কিভাবে গ্রহণ করিবে তাহা অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। আমরা গ্রামের কাছে আসিয়া একটু আস্তে আস্তে ধীরগতিতে চলিতে লাগিলাম। গাইডদের সঙ্গে করিয়া পুড়েগাঁওকর আগাইয়া গেল। আমাদের অবশ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। খুব ছোট চাপাচাপি বসতির চাষী গ্রাম। মিনিট পাঁচ-সাতেকের মধ্যে গ্রামের একজনকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া পুড়েগাঁওকর আমাদের ভিতরে যাইতে বলিল। আমরা গ্রামে গিয়া প্রথম ঢুকিলাম, একেবারে একটি চাষী বাড়ির ভিতর দাওয়ায়। আমি সেখানে যাইতেই আমাদের গাইড দু'জন ও গ্রামবাসী দু'তিনজন 'পুঢারী', 'পুঢারী' বলিয়া একটু অনুনাসিক ভাষায় কি যেন বলাবলি করিল। তারপরে একজন আমাকে ইঙ্গিতে একটি ঘরে বারান্দায় খাটের উপর বসিতে অনুরোধ করিল; এবং অন্যান্যদের 'ব'সা', 'ব'সা' বলিয়া বসিতে বলিল ('ব'সা' মারাঠী 'বসা' কথার কোঙ্কনী সংস্করণ : অর্থ বসু, বস বা বসুন)। তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া তাহারা আমাদের দেখিয়া যে খুব অখুশী বা বিস্মিত হইয়াছে সেরকম মনে হইল না। গাইড দু'জন তো তাহাদের দেশেরই লোক এবং স্থানীয় অঞ্চলের লোক। তাছাড়া পুড়েগাঁওকর উত্তর মহারাষ্ট্রের লোক হইলেও কোঙ্কনী ভাষা কিছু কিছু বলিতেও পারে, বোঝে তো বটেই। তাহারা আসিয়া আমরা কে এবং কি উদ্দেশ্যে কোথা হইতে আসিয়াছি তাহাও বলিয়াছে। আমরা যে সত্যাগ্রহী এবং আমিই যে এই সত্যাগ্রহী দলের 'পুঢারী'—নেতা বা পরিচালক, সেটাও তাহারা গৃহকর্তা ও গ্রামের লোকেদের বলিয়াছে। আমরা বেশীক্ষণ থাকিব না। খানিকক্ষণ জিরাইয়া নিয়া, সম্ভব হইলে যদি কিছু খাবার পাওয়া যায় তাহা খাইয়া আমরা চলিয়া যাইব সেটাও তাহারা ততক্ষণে শুনিয়াছে।

গৃহকর্তা একটু বয়স্ক চাষী। পুড়েগাঁওকর ও গাইডদের সাহায্যে যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, আমরা যদিও পাখলোদের চাই না, তাহাদের বিরুদ্ধে বেশী কিছু করিতে আমরা সাহস পাই না, কারণ শুনিয়াছি, সত্যাগ্রহীদের উপর তাহাদের খুব রাগ এবং কোন গ্রামে সত্যাগ্রহী গিয়াছে একথা জানিতে পারিলে তাহারা গ্রামের লোকেদের মারধোর করে। আমরা গরীব লোক, আমাদের উপর তাহারা অত্যাচার করিলে তাহার কোনো প্রতীকার করার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের গ্রাম থানা হইতে অনেক দূর বলিয়া এ গ্রামে কোনো পাখ্‌লো বা পুলিস কখনো আসে নাই। সামনে একটি ব্রাহ্মণদের গ্রাম আছে তাহাদের অবস্থা ভালো। সে গ্রামে নাকি একদিন পুলিস আসিয়া অনেককে ধরিয়া নিয়া

গিয়াছে সত্যাগ্রহের জন্য। তবে তোমরা হিন্দুস্থান হইতে দেশের জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছ, তোমরা যদি এখানে বিশ্রাম করিতে চাও আমাদের কোনো আপত্তি নাই। পাখ্লোদের রাজত্ব আর থাকিবে না; তবে আমরা একেবারে 'খেড়ে গাঁওয়ের' (গৈ গাঁও, ছোট সামান্য গ্রাম), আমরা 'রাজ করণের' কথা বেশী জানি না, তবে এই বিধর্মী পাখলোরা যত না থাকে তত মঙ্গল। শুনিয়াছি, পণ্ডিত নেহরু নাকি হিন্দুস্থান হইতে পাখ্লোদের তাড়াইয়া দিয়াছেন, গোয়া হইতেও ইহাদের যাইতে হইবে। আর হাজার হোক, আমরা 'রানে', আমরা পাখ্লোদের ভয় করি না; তবে অনর্থক বিপদে পড়িতেও চাই না'। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ সে বকিয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য যাহারা ছিল তাহারা কয়েক ঘটি জল আনিয়া দিয়া আমাদের হাত পা ধুইয়া নিতে বলিল। কথাবার্তায় এই বুঝিলাম, এখানে চা পাওয়ার কোনো আশা নাই। তবে এখানে কিছুটা জিরাইয়া নিতে বা পথঘাটের হদিস পাইতে কোনো অসুবিধা হইবে না।

আমরা যে গ্রামে প্রথম আসিয়া প্রবেশ করি তাহাও স্বাধীনতাপ্রিয় 'রানে'দের দেশ, সাংগে' তালুকের মধ্যে। এই গ্রামে আসিয়া প্রথম গোয়ার ভিতরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইলাম। গ্রামটি সম্পূর্ণ হিন্দু গ্রাম; ত্রিশ-চল্লিশ ঘর লোকের বাস। অশিক্ষিত, দরিদ্র কৃষিজীবী গ্রাম। পর্তুগীজ পুলিস বা মিলিটারীর ভয় তাহাদের যথেষ্টই আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা সত্যাগ্রহী হিসাবে 'হিন্দুস্থান' বা ভারত হইতে তাহাদের মুক্তির জন্য আসিয়াছি; বিদেশী ও বিধর্মী পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাহাদের হইয়া লড়িব বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে তাহাদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা এবং সম্ভ্রম বোধও রহিয়া গিয়াছে। একদিকে যে কোনো দেশের সাধারণ মানুষের মতো, শাসকশক্তির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হইয়া বিপদে জড়াইয়া পড়ার অনিচ্ছাও মনে মনে কাজ করিতেছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে দেশের মুক্তি-যোদ্ধাদের সম্ভব মতন সম্মান দেখানোর বা তাহাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, সাহায্য করার আগ্রহ আছে। কিন্তু তাহাদের সাধ্য অল্প: আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। যে কয়েকটি লোক সেখানে আমাদের দেখার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বা আমাদের হাত পা ধোয়ার জলটল আনিয়া দেওয়ার জন্য এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করিতেছিল, তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব বোঝা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নাই। তাহারা আমাদের সম্ভব মতন সাহায্য করিতে পিছ-পাও নয়। অথচ আচম্কা পর্তুগীজ মিলিটারী ও পুলিসের হাতে কোনো বেশী বিপদে পড়িতেও চায় না; তাহা এড়াইতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে ভালো।

এতক্ষণে আমি একবার বাড়িটির চেহারার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। ভাষার তফাত ছাড়া বাংলা দেশের পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করিয়া রাঢ় দেশের যে কোন ছোট চাষী-বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির তফাত কোথায়? তেমনি মাটির দেওয়াল, মাটির দাওয়া, নীচু খড়ের চালা। উঠান লাল মাটি ও গোবরে লেপা। এমন কি উঠানের এক কোণে একটি ঝাঁকড়া তুলসীর গাছ পর্যন্ত আছে। অবশ্য বাংলা দেশের তুলসী গাছ অতো বড় আর অতো ঝাঁকড়া হয় না। তবু তুলসী গাছটি দেখিয়া মনে মনে কেমন যেন লোকগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করিতে লাগিলাম। চারিদিকে আম, কাঁঠাল, পেঁপে আর নারিকেলের গাছ। উঠানের একপাশে একটি গোয়াল ঘর। বর্ষার দিন বলিয়া গরুগুলিকে ছাড়া হয় নাই। গরুগুলিকে খাওয়ানোর মাটির পাতলা জাতীয় পাত্রগুলির আকার বাংলা দেশ হইতে একটু বড় ও ভিন্ন সাইজের। ঘটি গেলাস বাসনপত্রগুলির আকার প্রকারে একটু

একটু তফাত আছে; কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু তফাত চোখে পড়িল না। আমার ডাঃ সালাজারের কথা মনে পড়িল—'গোয়া পর্তুগালের অচ্ছেদ্য অংশ; পর্তুগালের সঙ্গে পাঁচশ বছরের যোগাযোগে গোয়াবাসীকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়া পর্তুগীজ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।' গোয়ার ভিতরে লোকালয়ের প্রথম গ্রামের চেহারা দেখিয়া সে কথা মনে হইল না। আমাদের গৃহকর্তার পরনে ঠেটী ছ'হাতী ধুতি; মাথায় মারাঠী ধরনের একটি টুপী; গলায় দু' কণ্ঠী তুলসীর মালা। সালাজারের "assimilado" বা একাত্মীকরণের নীতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন গোয়ার এই এক গ্রাম; যেখানে আজও তুলসী তলায় বসিয়া বিঠ্ঠলের (বিষ্ণুর) পূজা হয়। পাঁচশ বছর ধরিয়া পর্তুগাল সাম্রাজ্যবাদীদের "assimilado" (আসিমিলাদু, assimilated) নীতি গোমন্তকের হিন্দুচাষীর তুলসী-তলা ও বিঠ্ঠলকে assimilate করিতে বা হজম করিতে পারে নাই।

দুঃখের বিষয়, কোঙ্কনী গোমান্তকের বিষ্ণু উপাসক এইসব গ্রাম ও গ্রামবাসীদের কথা আমাদের ভালো করিয়া জানা নাই। আমি গোয়া হইতে মুক্তি পাইয়া ফেরার পর আমাকেও বহুলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আচ্ছা, গোয়ানীজরা তো আসলে খৃষ্টানই?" অর্থাৎ তাহারা তো পর্তুগালকে চাহিবেই! এই রকম ধারণার পিছনে গোয়ার আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত অবস্থা সম্পর্কে যে অজ্ঞতা কাজ করে তাহারও যেমন তুলনা পাওয়া ভার তেমনি তুলনা পাওয়া ভার গোয়ার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে এই ধরনের প্রশ্নে যে অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ পায়, তাহারও। গোয়ার ক্যাথলিক খৃষ্টান জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে অবিশ্বাস বা সংশয় প্রকাশ করিয়া আমরা যে মারাত্মক অবিচার করি তাও যেমন একান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত, গোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আধা-পর্তুগীজ ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান—আমাদের এই ধারণাও গোয়া সম্পর্কে ঠিক সেই একইরূপ অজ্ঞতার ফল।

আমরা খুব বেশীক্ষণ এই গ্রামে অপেক্ষা করিয়া আমাদের আশ্রয়দাতাদের বিপদগ্রস্ত করিতে চাহিলাম না। আমাদের নিজেদেরও তাড়াতাড়ি ছিল। কারণ, শেষ পর্যন্ত আমরা যখন গোয়ার লোকালয়ের ভিতরেই আসিয়া পড়িয়াছি, তখন যত তাড়াতাড়ি হয় আরও বড় গ্রামে বা হাট বাজারে গিয়া সত্যাগ্রহ করার এবং সম্ভব হইলে প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য গোয়ার জনসাধারণকে জানানোর এবং বোঝানোর সুযোগ নিতে চাহিতেছিলাম। একবার পুলিস সামনাসামনি আসিয়া পড়িলে আমাদের সে মতলব পণ্ড হইবে। কাজেকাজেই এই গ্রামে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখিলাম না। এখানে আমাদের আসার বা এই গ্রামে ঢোকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিছুটা জিরাইয়া নেওয়া আর কিছুটা এদিককার পথঘাটের ভালো করিয়া সন্ধান নেওয়া যাহাতে আমরা আমাদের গন্তব্যের লক্ষ্যস্থল ওয়ালপই বাজার ও থানার দিকে ঠিক ঠিকভাবে অগ্রসর হইতে পারি। গোয়ার সাধারণ মানুষ আমাদের কিভাবে গ্রহণ করে এবং এদিককার রাজনৈতিক আবহাওয়াটা কি রকম, মানুষগুলি কি রকম তাহা জানার ও বোঝার ইচ্ছাও খানিকটা ছিল। সে কৌতূহল এ গ্রামে কিছুটা পরিতৃপ্ত হইল।

অবশেষে সেখান হইতে যখন আমরা ওঠার উপক্রম করিতেছি সেই সময় কিছু দুধ, চিনি ও পাকা কলার উপচার আসিল। পরিমাণে খুব বেশী নয়। কারণ যে পরিমাণে আসিলে আমাদের একান্নো বাহান্নো জন লোকের সকালের জলযোগের পক্ষে যথেষ্ট হইত তাহা অত ছোট গ্রামে যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। গৃহপতি সেই সামান্য উপকরণ দিয়া

আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করার জন্য কিছুটা সংকোচ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমাদের তো ইহার বেশী আর কিছু নাই; কিন্তু ইহাই কিছু কিছু মুখে দিয়া তবে আপনারা আবার রওনা হইবেন।" বলা বাহুল্য, নিমেষ না ফেলিতে আমাদের স্বেচ্ছা-সৈনিকের কল্যাণে সে দুধ চিনি, কলা শেষ হইয়া গেল। আমরাও আর অনাবশ্যক সেখানে অপেক্ষা না করিয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এখন আমরা পাহাড় হইতে উতরাইয়ের পথে নামিতেছি। এই গ্রাম হইতে বাহির হইয়াই, অল্প দূরে আসিয়া, আমরা বেশ চওড়া রাস্তা পাইয়া গেলাম। রাস্তা ক্রমশ ঢালু হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। গ্রামেই খবর পাইয়াছিলাম, আর বেশীদূর হয়ত আমাদের হাঁটিতেও হইবে না; ক্রোশ দুয়েক আগাইয়া গেলেই নদীর ধারে ভিরোণ্ডে' গ্রাম। সেই নদী পার হইলেই ওয়াল্‌পইয়ের দিকে যাওয়ার রাস্তা।

ওয়াল্‌পই পর্যন্ত অবশ্য আমাদের সত্যাগ্রহ করিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয় নাই। ভিরোণ্ডে'র কাছে নদীর পাশেই পর্তুগীজ মিলিটারী বাহিনী ও পুলিস অফিসারদের একদল রাইফেল, বন্দুক, স্টেনগান, লাঠি, রবারের তৈরি বেটন বা ট্রাঞ্চিয়ন প্রভৃতি উপচার নিয়া আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

॥ ৯ ॥

গোয়ার মানুষ

গোয়াতে পর্তুগীজ এলাকায় লোকালয়ে পা দিবার পর এই প্রথম গ্রামটিতে আমরা সেদিন যে অভ্যর্থনা ও আদর যত্ন পাইয়াছিলাম, তাহা মোটের উপর আমাদের কাছে খুব নিরুৎসাহজনক বলিয়া মনে হয় নাই। গোয়ার ভিতরে আমাদের সত্যাগ্রহের পিছনে জনসাধারণের ভিতর হইতে কি পরিমাণ সমর্থন পাওয়া যাইবে না-যাইবে সে বিষয়ে আমাদের মনে গোড়া হইতেই কিছুটা সন্দেহ ছিল। পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে গোয়ার ভিতরে গোয়ার স্থানীয় জনসাধারণের আসল মনোভাব কি সে বিষয়ে আমাদের দলের কাহারও কোনোরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। ইহাও আন্দাজ করিতে পারিতেছিলাম যে পুলিসের ধর-পাকড় এবং অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সেখানকার লোকেরা নিশ্চয় খুবই ভয়ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিবে। মনে মনে ইচ্ছা বা সহানুভূতি থাকিলেও তাহারা কিছুতেই প্রকাশ্যে আমাদের সমর্থনের জন্য আগাইয়া আসিতে পারিবে না। তা'ছাড়া গোয়াবাসীদের সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও চালচলন সম্পর্কে আমরা, অন্ততপক্ষে আমি নিজে—খুব বেশী কিছু জানিতাম না। কাজে কাজেই আমরা তাহাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইলে পর আমাদের সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব কি ধরনের হইবে সে বিষয়ে মনে মনে বেশ একটা অনিশ্চয়তা অনুভব করিতে-ছিলাম। গোয়ার ভিতরকার আন্দোলনের সঙ্গে বাহিরের আন্দোলনের, অর্থাৎ ভারতে যে গোয়ামুক্তি আন্দোলন চলিতেছিল তাহার, খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিলে অবশ্য এটা

হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিক হইতে আর সে রকম যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নাই।

আমাদের দেশে অনেক সময় লোকে সাধারণত এইটাই ধরিয়া নেয় যে গোয়ার বেশীর ভাগ লোক রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান এবং কিছুটা আধা-পর্তুগীজ, আধা-ফিরিঙ্গী ধরনের। সুতরাং তাহারা প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে, বিজাতীয় ভাবাপন্ন এবং পর্তুগীজ শাসনের সমর্থক; অন্তত রোমান ক্যাথলিকেরা তো বটেই। আমি গোয়া হইতে ফেরার পর অনেকেই আমাকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"গোয়ার লোক কি সত্য সত্যই পর্তুগীজ শাসনের অবসান চায়? গোয়ার বেশীর ভাগ লোকই কি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী নয়?" উত্তর-ভারতে এবং কিছুটা পূর্ব-ভারতেও অনেকের মনেই এই ধরনের সংশয় আছে বলিয়া দেখিয়াছি। ইহার পিছনে আমাদের অনেকের মনেই যে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক মানসিকতা কাজ করে তাহার কথা এখানে না তুলিলাম। তবে গোয়ার ভিতরে ঢোকার পর হইতে উনিশ মাস ধরিয়া (যদিও আমি জেলের ভিতরেই ছিলাম) নানানভাবে, আমাদের সহবন্দী ছাড়াও, গোয়ার অধিবাসী নানান্ ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হইয়াছে। আমার সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া বলিতে পারি গোয়ার অধিবাসীদের সম্পর্কে উপরোক্ত দুইটি ধারণাই সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমত গোয়ার বেশীর ভাগ লোক ক্রিশ্চিয়ান বা ফিরিঙ্গী নয়। হিন্দু সভ্যতা, আচার-ব্যবহার ও কৃষ্টির প্রভাব সেখানে খুবই প্রবল। এমনকি রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও তাহার প্রভাব কিছু কম নয়। পৃথিবীর আর কোথাও ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে 'বাহ্মান' বা 'ভামন' (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ), 'শরাদ' (ক্ষত্রিয়) বা 'ছরাদ'দের মধ্যে জাতিভেদ আছে বলিয়া আমি জানি না। ভামন বা ছরাদ ক্যাথলিকদের সঙ্গে অন্যান্য ক্যাথলিকদের বিবাহ সম্পর্কে বা অন্য প্রকারের সামাজিক মেলামেশা বা লেন-দেনের কথা গোয়াতে কেহ ভাবিতেও পারে না। দ্বিতীয়ত, গোয়ার অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের দেশপ্রেম—ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের মর্যাদাবোধ বা আকর্ষণ, বিদেশী শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা—জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের অন্য যে কোনো অঞ্চলের লোকেদের চেয়ে কম নয়। মনে রাখিতে হইবে গোয়ার উচ্চপদস্থ হিন্দু সরকারী কর্মচারী বা ধনী হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতর পর্তুগীজ সমর্থকের অভাব নাই, ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যেও নাই। এখানে নাম করা সংগত হইবে না, কিন্তু আমি গোয়ার অধিবাসী অনেক এমন হিন্দু মোহন্ত ও মঠাধীশের কথা জানি যাঁরা পর্তুগীজ শাসনের ঘোরতর সমর্থক। সেখানকার এক সাধু মহারাজকে তো সংস্কৃতে শ্লোক লিখিয়া (তিনি কোঙ্কনী বা মারাঠীতে কথা বলেন না) বড়লাট জেনারেল চের্নাদ গেদীসকে নিজের মঠে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়া এ আশ্বাস দিবার কথা শুনিয়াছি যে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরম" ভারতের বুক হইতে পর্তুগীজ শাসনের অবসান হইবে না! পর্তুগীজরা সেই সার্টিফিকেট খবরের কাগজে ছাপাইয়া গোয়াময় প্রচার করিয়াছিল; ইহা বেশী দিনের কথা নয়. ১৯৫৬ সালের দুর্গাপূজা বা 'দশেরা'-র সময়। মোটের উপর একথা সহজেই বলা যায় যে, গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান বনাম হিন্দু বলিয়া কোন প্রশ্ন জড়িত নাই। আমি যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ (মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী ও কণ্ট্রাক্টরের কথা বাদ দিলে) এবং শিক্ষিত রোমান ক্যাথলিকদেরও অধিকাংশ গোয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক। তবে সাধারণ রোমান ক্যাথলিক

ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক, সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবী বা ঐ উপকূল অঞ্চলেরই দরিদ্র কৃষকদের মধ্য হইতে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা রাজনৈতিক দিক দিয়া খুবই অনগ্রসর। ক্যাথলিক পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের প্রভাব তাহাদের উপর খুবই বেশী। ইহারা জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়; রাজনীতি সম্পর্কেই তাহাদের কোনো ধারণাই নাই। বিপদে আপদে তাহারা রোমান ক্যাথলিক চার্চের সংগে সংশিলষ্ট বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে নানারকমের সাহায্য পায়। চার্চের স্কুলেই, যতটুকু হোক, লেখাপড়া শেখে। এইসব কারণে প্রত্যক্ষভাবে না হোক, প্রকারান্তরে তাহারা পর্তুগীজ শাসনের সমর্থক হিসাবে থাকে। কারণ গোয়াতে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের সংগে রোমান ক্যাথলিক চার্চের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু অপরপক্ষে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে গোয়াতে গোয়ানীজ ক্যাথলিক পুরোহিতেরা বিশেষ করিয়া নীচের দিকে পর্তুগীজদের উপর খুব বেশী সন্তুষ্ট নন। মুক্তি-আন্দোলনের প্রথম দিকে ইঁহাদের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ও সমর্থনের ফলে আন্দোলনের যথেষ্ট সাহায্যও হইয়াছিল, কিন্তু পরে পর্তুগীজ আর্ক-বিশপ ও প্যাট্রিআর্কের চেষ্টায় দেশী পুরোহিতদের, অন্তত লোক-দেখানো ভাবে পুরাপুরি 'রাজভক্ত' বানানো সম্ভব হইয়াছে। গোয়ার এই সময়ে যিনি প্যাট্রিআর্ক ছিলেন সে ভদ্রলোক পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর উৎসাহী সমর্থক; তিনি নিজেও একজন পর্তুগীজ। গোয়াতে ইউরোপীয় জেসুইট ক্যাথলিকদের নানা রকমের মিশনারী প্রতিষ্ঠান আছে; তাহাদের প্রভাব মোটামুটিভাবে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের সমর্থনে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও গোয়ার শিক্ষিত ক্রিশ্চিয়ান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতর, বিশেষ করিয়া যুবকদের মধ্যে পর্তুগীজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসার বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

ক্যাথলিক গোয়াবাসী হইলেই ফিরিঙ্গিয়ানায় অভ্যস্ত এবং পর্তুগীজ শাসনের সমর্থক এইরূপ যাঁহারা ধরিয়া নেন, তাঁহাদের একথা জানানো প্রয়োজন যে এখন গোয়ার ভিতরে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী আছেন (মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা এখনো প্রায় ৩৫০-এর মত; এ ছাড়া সকল সময় গড়পড়তা ৪০০ হইতে ৫০০ রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোক পুলিসের হাজতে আটক থাকে) তাঁহাদের মধ্যে ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের সংখ্যা গোয়ার ক্রিশ্চিয়ান জনসংখ্যার অনুপাতে বেশী ছাড়া কম নয়।* মোট রাজনৈতিক বন্দীদের ভিতর বা রাজনৈতিক কারণে যাহারা

---

* ১৯৫০ সালের সেন্সাস অনুযায়ী গোয়া, দমন, দাদরা ও নগর হাভেলী এবং দিউ নিয়া পর্তুগীজ ভারতের মোট জনসংখ্যা ৬৩৭,৫৯১; তাহার মধ্যে গোয়ার জনসংখ্যা ৫৪৭,৪৪৮। গোয়াতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপঃ—

ধর্ম			জনসংখ্যা	অনুপাত
হিন্দু	...	...	৩০৭,১২৭	৫৬·২৮
ক্রিশ্চিয়ান	...	...	২৩০,৯৮৪	৪২·১০
মুসলমান	...	...	৮,৪২০	১·৫০
পার্সী	...	...	২৮	·১২
বৌদ্ধ	...	...	৫৬	
অন্যান্য	...	...	১৯২	

কোন সময় গ্রেপ্তার হইয়াছে এমন লোকেদের ভিতর হিন্দুদের মোট সংখ্যা ক্রিশ্চিয়ানদের সংখ্যার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। গোয়ার ভিতরকার মুক্তি-আন্দোলনে যাঁহাদের নেতৃস্থানীয় বলা যায় তাঁহাদের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম হইবে না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা দশ-বারো বছর, কেহ চৌদ্দ, পনরো-ষোলো, কেহ-বা বিশ-একুশ বছর পর্যন্ত মেয়াদ মাথার উপর নিয়া আজও সাজা ভোগ করিতেছেন।

বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় ক্রিশ্চিয়ান রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এমন সম্ভ্রান্ত অভিজাত ক্যাথলিক পরিবারের লোকও আছেন যাঁহারা নিজেদের বাড়িতেও কথাবার্তায় পর্তুগীজ ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করেন না। যেমন, ডাঃ ফুর্তাদো; প্রায় ৬০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ বনিয়াদী গোয়ানীজ ক্রিশ্চিয়ান বংশের লোক। খালি পর্তুগীজ ও কোঙ্কনী ভাষা জানেন; ইংরেজী বা হিন্দি জানেন না (জেলে পরম উৎসাহের সঙ্গে দুই-ই শিখিতে আরম্ভ করেন!)। পর্তুগীজ পুলিস অফিসারদেরও তাঁহার সঙ্গে সমীহ করিয়া কথা বলিতে দেখিয়াছি। তিনি নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান রোমান ক্যাথলিক এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ বহুদিন হইতে বনিয়াদী পর্তুগীজ চাল-চলন ও আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। কিন্তু এ যুগের দেশ ও রাষ্ট্রজাতিগত জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এমনই জিনিস যে, এসব সত্ত্বেও তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও গোয়া মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিয়া দীর্ঘ কারাবরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীযুত ফাবিয়ান্ দা কস্তা মাড়গাঁওয়ের কাছে সেরাউলি' গ্রামের সম্ভ্রান্ত ক্রিশ্চিয়ান বাড়ির তরুণ যুবক—গ্রামের পাদ্রী এবং আর্ক বিশপের সঙ্গে লড়িয়া নিজের তিন ছেলের নামকরণ করিয়াছেন 'জওহর', 'জয়প্রকাশ', 'রবীন্দ্রনাথ'! আট বছর দশ বছর আগে নিজের ছেলেদের নামকরণ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যে জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রবণতার প্রকাশ দেখা গিয়াছিল, আজ আওয়াদা দুর্গের সেলে রাজবিদ্রোহের অপরাধে ষোলো বছরের মেয়াদ মাথা পাতিয়া নেওয়ার ভিতর দিয়া তাহার পরিণতি ঘটিয়াছে।

পঞ্জিমের জজ্, অপর এক ডাঃ ফুর্তাদোর কথাও এখানে না বলিয়া পারিতেছি না। গোয়ার পর্তুগীজ বড়লাট হুকুম দিলেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের গোয়ানীতির ঘোষণা সম্পর্কে প্রতিবাদ করিয়া বিবৃতি দিতে হইবে। ডাঃ ফুর্তাদো বিচারপতি, ন্যায়াধীশ। কিন্তু সালাজারের Estado Novo-র (নূতন রাষ্ট্র; New State) ভিতরে অতি সম্মানভাজন বিচারপতিরও মত ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যের কোন মর্যাদা নাই; সালাজারী শাসনের তাহা নিয়ম নয়। কিন্তু সালাজারের ভ্রূকুটির উপরেও যে কোন মানুষের স্বাধীন মত ও বিশ্বাস পোষণ করার যে সহজাত অধিকার আছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া তেজস্বী জজ ফুর্তাদো পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেলকে উত্তর দিলেন ঃ

"I can understand that as a representative of a Colonial power, Your Excellency should try to force me not to be against the Power you represent; but I would never allow you to trample on my

---

সারা পর্তুগীজ ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত কিছু বেশী শতকরা ৬০·৯; ক্রিশ্চিয়ানদের শতকরা ৩৬·৮। কারণ দিউ, দমন ও দাদরা ও নগর হাভেলীতে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রিশ্চিয়ানদের তুলনায় অনেক বেশী।

birth-right of being for India in order that the most beautiful sentiment, which is second only to God's will, might not be defiled."

("আমি একথা বুঝি যে, একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে আপনি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহাতে আমি না যাই সেজন্য আমার বিরুদ্ধে আপনার সর্বশক্তি আপনি প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু ভারতীয় হিসাবে ভারতের পক্ষে থাকার আমার জন্মগত অধিকারকে আপনি যে পদদলিত করিবেন তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। তাহা করিতে দিলে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুজ্ঞার পরেই মানুষের সবচেয়ে যে সুন্দর ও মহান্ মনোবৃত্তি—দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেম, তাহার প্রতি অসম্মান দেখানো হইবে; আমি কখনো তাহা করিতে পারিব না"।)

জজ্ ফুর্তাদোর জজিয়তী ইহার পরে এক মুহূর্তও যে আর টেঁকে নাই, সে কথা বোধহয় না বলিয়া দিলেও চলিবে। ফুর্তাদোর এই দৃপ্ত প্রতিবাদ বা তাহার পিছনে যে দেশপ্রেমের নিদর্শন আছে ভারতে তাহা হয়ত আমাদের কাছে এমন কিছু নূতন নয়। কিন্তু এখানে এইটুকুই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করার বিষয়, গোয়াতে একজন ক্রিশ্চিয়ান রোমান ক্যাথলিক সরকারী কর্মচারীর কলম দিয়া কথাগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে। গোয়াবাসী ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের বিজাতীয় ভাবাপন্ন এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া আমরা অনেক সময় যে সহজেই ধরিয়া নেই তাহার পিছনে যে কোনো সত্যতা নাই, উপরে যে কয়জনের কথা বলিলাম তাঁহারাই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর এ খালি এখানে ওখানে দু' একজনের কথা নয়। টেরেখোল সত্যাগ্রহের নেতা টোনী ডি'সুজা-র কথা আগেই বলিয়াছি। অন্যান্য বন্দীদের মধ্যে টোনীর ছোট ভাই হেনরী, ডাঃ জে এফ মার্টীন্স, আন্তোন ভিয়েগাস, আল্ভায়ো পেরেইরা, আল্ফোন্সো আলফ্রেড, আল্ফোন্সো আলবের্ত, রক্ ফের্নান্দিস্, জোয়াকিম পিণ্টু, জেম্স্ ফের্নান্দিস্ প্রমুখ আরো অনেকের নাম এখানে করা যাইতে পারে। গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহ ও মুক্তি-আন্দোলনের সংগঠক ও নেতাদের মধ্যে ইঁহাদের স্থান নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে। আমরা মুক্তি পাওয়ার মাস দুই আগে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রায় ২৫ জন অতি সম্ভ্রান্ত ক্রিশ্চিয়ান পরিবারের লোককে সন্দেহে আটক করিয়া আগুয়াদা দুর্গে আনা হয়। ১৯৪৬ সালে ডাঃ হেগ্ড়ে এবং শ্রীযুত পুরুষোত্তম কাকোড়করের সঙ্গে যাঁহাদের পর্তুগালে লিস্বনে পাঠানো হইয়াছিল—ডাঃ টি ব্রাগান্সা কুন্যা., শ্রীযুত জোসে ইনাসিও লয়লা—দু'জনেই সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক পরিবারের লোক। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান সংগঠক ও নেতা পিটার আল্ভারিসের কথা বোধহয় সকলেই জানেন। গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের একটি অত্যন্ত সুস্থ ও আশাব্যঞ্জক দিক এই যে—এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বর্জিত। গোয়ার মুসলমানের সংখ্যা ৮।৯ হাজারের বেশী হইবে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন মুসলমান কর্মীও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এবং পাকিস্তান হইতে সুহ্রাবর্দী প্রমুখ নেতাদের উস্কানী সত্ত্বেও গোয়াতে জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের ভিতর হিন্দু-ক্রিশ্চিয়ান-মুসলিম বলিয়া কোন ভেদবুদ্ধি জাগে নাই। আমার উনিশ মাস গোয়াবাসের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি নাই।

গোয়াবাসীদের সম্পর্কে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক ধারণা করেন বোম্বাই,

কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরের প্রবাসী গোয়ানীজ্‌দের দেখিয়া। গোয়ানীজ বাট্‌লার, খানসামা, বাবুর্চি এবং জাহাজের খালাসীরা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া থাকে। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সময় যখন খুব বেশী রকম ফিরিঙ্গিয়ানা বা ইংরেজীয়ানার প্রভাব ছিল তখন তাঁহাদের অনেকের বাড়িতে গোয়ানীজ বাবুর্চি-খানসামা রাখার একটা ফ্যাশন ছিল। বোম্বাই অঞ্চলের বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় সে ফ্যাশন আজও আছে; কলিকাতাতেও আছে। গোয়ানীজ বাবুর্চিদের রান্নার, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় সাহেবী রান্নার খুব সুনাম আছে। বোম্বাই বন্দরের ডকে বা জাহাজ-ঘাটায় গোয়ানীজ নাবিক ও ডক শ্রমিকদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কিন্তু তাই বলিয়া গোয়ার অধিবাসীরা খালি খানসামা, বাবুর্চি এবং জাহাজের খালাসীর জাত নয়। তবে এইসব শ্রেণীর প্রবাসী গোয়ানীজ্‌রা অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক কিছুটা পর্তুগীজ-ইউরোপীয় প্রভাবের ফলে, আর কিছুটা বোম্বাই অঞ্চলের সস্তা ফিরিঙ্গিয়ানার দরুন সহজেই এদেশে আসিয়া আধা-ফিরিঙ্গি গোছের বনিয়া যায়। রাজনৈতিক দিক দিয়া এইসব প্রবাসী গোয়ানীজ্‌রা খুবই অনগ্রসর এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার অনেকদিন পরেও তাহারা সেই আন্দোলনের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয় নাই। বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে এই ধরনের গোয়ানীজদের দেখিয়াই আমরা গোয়াবাসীদের সম্পর্কে ধারণা করি।

একথা বলাই বাহুল্য, প্রবাসী গোয়ানীজ্‌রা সকলেই এই জাতীয় নন। অতি উচ্চশিক্ষিত ও কৃতী গোয়াবাসীর অভাব এদেশে নাই। হিন্দু ও রোমান ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহার মধ্যে আছেন। গোয়া মুক্তি-আন্দোলনে তাঁহারা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেছেন ও করিবেন। ভারতে প্রবাসী গোয়ানীজ্‌রা তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে এই মুক্তি-আন্দোলনে আশানুরূপ অংশ গ্রহণ করেন নাই—সময় সময় এই ধরনের একটা অভিযোগ বা অনুযোগ শোনা যায়। আমি নিজে এ সম্পর্কে যাহা জানি, তাহা হইতে এই ধরনের অভিযোগের কোনো সত্যকার ভিত্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু গোয়ার ভিতরে যাওয়ার পরে, আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রবাসী গোয়ানীজ্‌দের দেখিয়া, গোয়ার ভিতরকার গোয়াবাসীদের—অর্থাৎ "Goan Goanese"-দের সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। যাঁহারা শুধুমাত্র সেইভাবে গোয়াবাসীদের সম্পর্কে ধারণা করেন, তাঁহাদের পক্ষে গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থা বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

॥ ১০ ॥

গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহ্য ঃ অতীতের কয়েকটি পৃষ্ঠা

আমাদের দেশে অনেকেই এ খবর রাখেন না যে, আধুনিক যুগে গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ঐতিহ্য কমপক্ষে দেড়শ-দুইশ বছরের পুরাতন। সে আন্দোলনে ক্রিশ্চিয়ানরা যেমন অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি করিয়াছে হিন্দু। গোয়ার অধিবাসী এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ভিতর এ বিষয়ে কোনো তারতম্য করা যায় না।

গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনের প্রথম আড়াইশ' বছরের ভিতর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে কুড়িবার সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৭৮৬-৮৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৩ সাল পর্যন্ত গোয়াতে অন্ততপক্ষে আরও উনিশ-কুড়িবার পর্তুগীজ বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। এই সব অভ্যুত্থানের ভিতর কয়েকটিকে অবশ্য নিছক সামরিক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে এই সব অভ্যুত্থানের পিছনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রেরণা কাজ করিতেছিল এবং ব্যাপক গণ-সমর্থন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ নাই। ১৭৮৭ সালের "Priests' Rebellion" বা "Pinto's Rebellion" এই ধরনের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বিদ্রোহ প্রচেষ্টার প্রথম নিদর্শন। কয়েকজন গোয়াবাসী দেশীয় ক্যাথলিক ধর্মযাজক এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক হিসাবে সম্মুখে আসেন বলিয়া ইহাকে কখন কখন "ধর্মযাজকদের বিদ্রোহ" বলিয়া উল্লেখ করা হয়; আবার ইহার পিছনে গোয়া ও লিস্‌বনের প্রসিদ্ধ গোয়াবাসী ধনী ব্যবসায়ী জোসে আন্তনিও পিন্তু-র ও তাঁহার পরিবারের লোকদের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য কাজ করিতেছিল বলিয়া ইহাকে কখন কখন "পিন্তু-র বিদ্রোহ" নামেও উল্লেখ করা হয়। এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টার পিছনে সমসাময়িক ইউরোপের এবং ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী রাজনৈতিক ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রেরণা ছিল। মনে রাখিতে হইবে গোয়া পর্তুগীজ অধিকারে থাকার দরুন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের জনসাধারণের চেয়ে গোয়ার শিক্ষিত লোকেরা বহুকাল আগেই ইউরোপের ও আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। গোয়াতে পর্তুগীজ আধিপত্যের ইতিহাস তখন প্রায় ৩০০ বছরের। ধর্মযাজকদের এই বিদ্রোহ যে সময়ের কথা, তখন পর্তুগালে লিসবন প্রভৃতি শহরে বহু গোয়াবাসী ধর্মযাজক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী বসবাস করিতেন; গোয়া হইতে লিস্‌বনে আসা-যাওয়া করিতেন। লিস্‌বন হইতে ফ্রান্সের মার্সেইএ, পারী প্রভৃতি কেন্দ্রের সঙ্গেও তাঁহাদের যোগাযোগ করার সুবিধা ছিল। সমগ্র ইউরোপে, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে, তখন মানুষের মনে নূতন চিন্তাধারার বিপুল আলোড়ন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং সে আলোড়নের ঢেউ অনিবার্যভাবে ইউরোপ হইতে ক্রমে পর্তুগালে লিস্‌বন এবং লিস্‌বন হইতে গোয়াতেও আসিয়া পোঁছায়।

গোয়াতে এই সময় পর্তুগীজ ক্যাথলিক পুরোহিত ও ধর্মযাজকদের (পাদ্রী) সঙ্গে গোয়ার দেশীয় ক্যাথলিক পুরোহিত ও ধর্মযাজকদের পদাধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে খুবই

তারতম্য ছিল। ঠিক তেমনি পর্তুগীজ সৈন্যদল ও সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে গোয়াবাসী দেশীয় সৈন্য ও সামরিক কর্মচারীদের বেতন, সুখ-সুবিধা এসব বিষয়েও যথেষ্ট তফাত ছিল। সর্বশ্রেণীর দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে পর্তুগীজ রাজকর্মচারী বা গোয়ার বাসিন্দা পর্তুগীজ অভিজাতদের ব্যবহারও নিতান্তই খারাপ ও অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল। এই সব কারণে ধীরে ধীরে লোকের মনে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হইতেছিল।

১৭৮৬-৮৭ সালের বিদ্রোহ প্রচেষ্টার প্রধানতম সংগঠক ছিলেন পঞ্জিমের পাদ্রী ফ্রান্সিস্কো কুতো এবং দিভারের পাদ্রী আন্তনিও গন্সালভেজ। দুজনেই অত্যন্ত উচ্চ-শিক্ষিত, তেজস্বী ও নির্ভীক ধর্মযাজক হিসাবে সমগ্র গোয়াতে ও পর্তুগালে বিখ্যাত ছিলেন। ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু মহামান্য পোপ স্বয়ং তাঁহাদের দুইজনকেই গোয়াতে বিশপ পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেও গোয়ার পর্তুগীজ ভাইসরয় ও আর্কবিশপ দুজনে মিলিয়া গোয়াবাসী দেশীয়দের মধ্য হইতে কাহাকেও বিশপের মর্যাদায় নিযুক্ত হইতে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি করিয়া, শেষ পর্যন্ত তাহা হইতে দেন নাই। পাদ্রী কুতো ও গন্জালেস তখন প্রথম মনে করেন যে এ বিষয়ে প্রতীকার পাইতে হইলে পর্তুগালে গিয়া দরবার করিতে হইবে। কিন্তু পর্তুগালে আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গে এবং দু'জনেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গোয়াতে গোয়াবাসী দেশীয় জনসাধারণের সত্যকার আত্মমর্যাদা, গোয়াতে ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা দরকার সবার প্রথমে। তখন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে লিস্বন-প্রবাসী গোয়াবাসী বুদ্ধিজীবী ও সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সেখানেই তাঁহাদের বিদ্রোহ পরিকল্পনা ধীরে ধীরে রূপ নেয়। লিস্বনের গোয়াবাসীদের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে জোসে আন্তনিও পিন্তো ভিন্ন, ব্রাদার কুস্তোদিও সান্তা মারিয়া, ব্রাদার দিদে সান্তো অগুস্তিনো, জোয়াকিম আন্তনিও ভিন্সেন্ত, পাদ্রী কায়তানো ভিক্তোরিও ফারিয়া এবং তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্, চিকিৎসক ও উদারনৈতিক চিন্তাবীর আবে ফারিয়া অন্যতম।* ইহা ফরাসী বিপ্লবের ঠিক অব্যবহিত দুই তিন বছর আগেকার কথা এবং যতদূর বোঝা যায়, আবে ফারিয়া এবং তাঁহার পিতার আদর্শনৈতিক প্রভাবের ভিতর দিয়া য়ুরোপের নূতন যুগের উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গোয়ার এই বিপ্লবী রাজ-বিদ্রোহীদের মনেও সংক্রামিত হয়।

১৮৮৭ সালে কুতো ও গন্সাল্ভেজ দেশে ফিরিয়া আসেন এবং দেশীয় সৈন্যদলের

---

* আলেকজান্দার দুমার 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো' উপন্যাসে ইঁহার বিষয়ে দুমা উল্লেখ করেন ও আবে ফারিয়া নামেই তিনি ফারিয়া চরিত্রের প্রতিরূপ চিত্রন করেন। গোয়াতে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ লিসবনে আসিয়া পৌঁছাইতেই আবে ফারিয়া ফ্রান্সে মার্সেইএ-তে পলাইয়া আসেন ও মার্সেইএ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। আবে ফারিয়া সম্মোহনবিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ডাঃ মেস্মেরের পর তিনিই সর্বপ্রথম সম্মোহন বা হিপ্নোটিজ্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ক্যাথলিক ধর্মযাজক হিসাবে শিক্ষালাভ করিলেও তিনি ফ্রান্সের বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। হিপ্নোটিজ্ম সম্পর্কে তাঁহার বৈজ্ঞানিক মতামতের জন্য ও বিপ্লবী চিন্তাধারার জন্য ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায় হইতে বহিস্কৃত হন।

সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পান। গোয়াতে এই বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের বিশ্বাসঘাতকায় এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হইতে পারে নাই। বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ইহার পরে সামরিক আদালতে যে বিচার হয়, তাহাতে পনরোজন দেশীয় সামরিক অফিসারের প্রাণদণ্ড হয়। পুরোহিতদের সকলকে পর্তুগালে পাঠাইয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় যিনি বিচারপতি ছিলেন তাঁহার রায়ে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল পোল্ডা, বাড়দেশ এবং অন্যান্য কেন্দ্রে গোয়াবাসী দেশীয় সৈন্যদের সহায়তা নিয়া পর্তুগীজদের ও পর্তুগীজ রাজশক্তিকে সশস্ত্র বিদ্রোহের ভিতর দিয়া গোয়া হইতে চিরতরে বিতাড়িত করা এবং তাহার পর **গোয়াতে একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লী-সমাজ বা পল্লী-পঞ্চায়েত হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে দেশের শাসন পরিচালনা করা।"** ১৭৮৬-৮৭ সালে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তনও ভালো করিয়া হয় নাই; গোয়ার প্রথম মুক্তি-যোদ্ধারা তখনই গোয়াতে স্বাধীন জাতীয় সাধারণন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে!

ঐতিহাসিকেরা অনেকে মনে করেন ভারতের দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতান ও য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে কুতো ও গন্‌সাল্‌ভেজ গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে টিপু দক্ষিণে কারওয়ারের দিক দিয়া গোয়া আক্রমণ করিবেন; ফ্রান্স পর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। বলা বাহুল্য এসব পরিকল্পনা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত কাজে কিছুই পরিণত হয় নাই।

ইহার পরবর্তী যুগে গোয়াতে ১৮২১, ১৮২৩ ও ১৮২৪ সালে তিনবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়।

১৮৫২ সালে গোয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে রাজপুত বংশজাত 'রানে'দের ভিতর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও ক্রমে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। 'রানে'দের প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয় বিখ্যাত দীপাজি রানের নেতৃত্বে। দীপাজির কৃষক সৈন্যদল পর্তুগীজদের বহু দুর্গ দখল করিয়া লয় এবং দক্ষিণে কেঁপে ও কানাকোন পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সময় হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়ের 'রানে'রা পাঁচবার সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। রানেদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টার পিছনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রেরণা বেশী করিয়া কাজ করে। ইন্‌কুইজিশনের আমলে তো বটেই এবং তাহার পরেও, গোঁড়া পর্তুগীজ আর্কবিশপদের প্ররোচনায় হিন্দুদের উপর যথেষ্ট ধর্মীয় অত্যাচার হইত। রানেদের বিদ্রোহ প্রথম দিকে প্রধানত এই ধর্মীয় অত্যাচারের প্রতিবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং এই শতাব্দীর প্রথমে ভারতের আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবও ক্রমে গোয়ার রানেদের ভিতরেও ছড়াইয়া পড়ে। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই সময়ে প্রায় একার্থক দাঁড়াইয়া যাইতে থাকে। একথা বলাই বাহুল্য, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সমর্থন সকল সময় পর্তুগীজ রাজশক্তির দিকে ও পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের দিকেই থাকিত; বিদ্রোহীদের দিকে নয়।

'রানে'দের শেষ বিদ্রোহ হয় ১৯১১—১২ সালে। বিদ্রোহী 'রানে'রা শেষবার পরাজিত হওয়ার পর তাহাদের ভিতর হইতে কয়েক হাজার তরুণ যুবককে বন্দী করিয়া আফ্রিকার

জঙ্গলে চালান দেওয়া হয়। সেখানে গিয়া কয়েক বছরের মধ্যেই তাহারা অর্থাভাবে, অনাহারে, রোগে ও মহামারীতে জীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বহুকাল আগে রাজপুতানা হইতে যে সমস্ত রাজপুত সৈনিক আসিয়া মারাঠা সৈন্যদলে যোগ দিত বা চাকুরী নিত (শিবাজীর আমল হইতে পেশোয়াদের আমলে এই রীতি অব্যাহত ছিল) তাহারাই মহারাষ্ট্রে নিজেদের 'রানা' বা 'রানে' বলিয়া পরিচয় দিত। পর্তুগীজরা শেষদিকে গোয়ার আশেপাশে যে সব জায়গা দখল করে সেই সব জায়গায় বহুদিন ধরিয়া ভোঁসলে বংশের রাজন্য ও ভূস্বামীদের বসবাস ছিল, যেমন পেড়নে, সাতারী, সাঁক্‌লি, সাংগে প্রভৃতি তালুকে। এইসব অঞ্চল গোয়াতে 'Nova Conquistas' ('New Conquests') নামে পরিচিত। ১৭৪৫ সালের আগে পুরাতন গোয়া শহর, জুয়ারী-মাণ্ডভী নদীর মোহনায় কয়েকটি দ্বীপ আর বাড়দেশ ও সাল্‌সেট্ তালুক (পর্তুগীজ ভাষায় তালুককে বলা হয় 'Concelho') ছাড়া পর্তুগীজদের দখলে অন্য কোন এলাকা ছিল না। কিন্তু মারাঠা রাজন্যদের ঘরোয়া ঝগড়ার সুযোগ নিয়া, তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহাদের পুরাতন এলাকার আশেপাশে বহু তালুক দখল করে; কোনোটা অস্ত্রবলে, কোনোটা কূটনীতির জোরে। সাতারী তালুক তাহারা নাকি সোজাসুজি ভোঁসলেদের নিকট হইতে কিনিয়াই নেয়। রানেরা অনেকে তাহার পূর্ব হইতেই এই সব অঞ্চলে বসবাস করিত; আজও করে। ইহাদের অধিকাংশই এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল; যদিও সাঁক্‌লিতে এখনও পুরাতন 'রানে' জমিদার বংশের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। ব্রাহ্মণ জাতির সম্মানের কথা বাদ দিলে, গোয়ার এইসব অঞ্চলে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে ক্ষত্রিয় 'রানে'-ঐতিহ্যের সম্ভ্রম ও প্রভাব অত্যন্ত বেশি। এদিককার সকলেই নিজেদের 'রানে' বলিয়া বা কোনো 'রানে' বংশের কাছাকাছি লোক বলিয়া পরিচয় দিতে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেন। গোয়ার সমসাময়িক কালের জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে যে সব সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাহার কয়েকটির ছত্রে ছত্রে ইহার সুন্দর নিদর্শন আছে; যেমনঃ—

"ত্রিবার, মঙ্গল বার! আজ্‌লা ত্রিবার, মঙ্গল বার!
স্বাতন্ত্র্যাঁচী সিংহ-গর্জনা আতাঁ ইথে উঠনার!
সহ্য পর্বতা, ভার্গব সিন্ধু, উভারুনী হাথ
লাখ মুখানে লল্‌করুনিয়া দ্যা তিজলা সাথ
হে রান্যাঞ্ছা, উঠা সিড়ানোঁ, লাবা লাল তিড়ে!
অন্‌বায়ুনো ফুল্‌বা অমচ্যা হৃদয়াতীল ইঙ্গ্‌ড়ে..."

"আজ অতি পবিত্র দিন, অতি শুভ দিন। আজ এখন হইতে এখানে স্বাধীনতার সিংহগর্জন উঠিবে। ঐ দেখ সহ্যাদ্রি পর্বতমালা আর ভার্গব সিন্ধু (আরব সমুদ্র; ভৃগু-পুত্র পরশুরাম এই সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বা কিংবদন্তী অনুযায়ী মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কন অঞ্চলে আরব সমুদ্রকে ভার্গব সিন্ধু বলা হয়) হাত তুলিয়া আজিকার এই দিনকে স্বাগত জানাইতেছে! লক্ষ মুখে লল্‌কার ধ্বনি তুলিয়া তাহার সঙ্গে সাথ দাও। হে 'রানে' বংশধরগণ! (রান্যাঞ্ছা) মাথা তুলিয়া একবার সোজা হইয়া দাঁড়াও, তোমাদের প্রশস্ত ললাটে মুক্তি-মাঙ্গলিকের রক্ততিলক গ্রহণ কর! অনুকূল হাওয়ার বেগে তোমার হৃদয়ের ভিতরকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে স্ফীত করিয়া তাহাকে মুক্তির দীপ্ত হোমানলে পরিণত কর......!"

একথা বলা বাহুল্য, যে দেশের এবং যে সমাজের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে

স্বাধীনতার জন্য এইরকম জোরালো উদ্দীপনাময় আহ্বান ধ্বনিত হইয়া ওঠে, সমষ্টিগত-ভাবে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা অনগ্রসর সে কথা কে বলিবে? পঞ্জিমের পুলিস হাজতে, মানিকোম্ বন্দীশালায়, আগুয়াদা দুর্গে হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চিয়ান সকল রাজনৈতিক বন্দীকে দিনের পর দিন এক সাথে এক সুরে গলা মিলাইয়া এই গান গাহিতে শুনিয়াছি। রেইস্ মাগুস্ ও আগুয়াদা দুর্গের ভিতর হইতে চারি পাশের পর্বত-সমুদ্র-অরণ্য কম্পিত করিয়া আজও স্বাধীনতার সেই সিংহগর্জন ধ্বনিত হইতেছে।*

॥ ১১ ॥

গ্রেপ্তার : সালাজারের পিটুনী পুলিসের হাতে

আমরা যে গ্রামের কাছে নদীপারে আসিয়া গ্রেপ্তার হই তাহার নাম বিরোন্দে' বা ভিরোন্দে'। আমাদের বিশ্রামস্থল প্রথম গ্রাম হইতে বিরোন্দে' পর্যন্ত পথের কথা এখন সংক্ষেপ করিয়া আনা ভালো। কারণ পথও এখন আমাদের প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এবার মার খাওয়ার পালা আরম্ভ হইবে। পথে আরো তিন-চারটি গ্রাম পড়া সত্ত্বেও আমরা আর কোনো গ্রামের ভিতর ঢুকি নাই। প্রথম গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাইল খানেক আগাইয়া যাওয়ার পর দেখিতে পাইলাম একজন কোঙ্কনী হিন্দু যুবক রাস্তার বিপরীত দিক হইতে হন্ হন্ করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। বৃষ্টির দিন বলিয়া মাথা ও ঘাড়ের উপর দিয়া আড়াআড়ি দু'পাশের সেলাই কাটা একটা মোটা চটের বস্তা ওয়াটার-প্রুফের মতো করিয়া ফেলিয়া নিয়াছে। সেই চটের একটা কোণা চূড়ার মতো তাহার মাথার উপরে খাড়া হইয়া আছে, আর তাহার নীচে চটের ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখ দেখা যাইতেছে। পরনে একটি খাকী হাফ্ প্যান্ট আর আধ-ভেজা, আধ-ময়লা গোছের একটি সাদা শার্ট, পায়ে একটা মোটা চামড়ার দেশী সেলাই চপ্পল। বেশ জোর পায়ে সে আগাইয়া আসিতেছিল; সম্মুখে হিন্দুস্থানের তি-রঙা ঝাণ্ডা কাঁধে করিয়া

---

* উপরে গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের পুরাতন ঐতিহ্যের কথা বলিয়াছি। এখানে এই প্রসঙ্গে একজন গোয়াবাসীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তিনি নিজে প্রচলিত অর্থে বিদ্রোহী বা রাজদ্রোহী না হইলেও, ভারতের আধুনিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয় ভাবধারার ইতিহাসে তাঁহার নাম নিশ্চয় গৌরবোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকা উচিত; তিনি ডাঃ ফ্রান্সিস্কো লুইজ গোমেজ। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার রচনাবলী ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া ডাঃ গোমেজ যে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অতি সঙ্গতভাবে মহামতি রানাড়ে, দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রষ্টাদের পাশাপাশি তাঁহার নাম করা যাইতে পারে। ডাঃ গোমেজ গোয়া হইতে পর্তুগীজ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত দুইবার, গোয়ায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও গোয়ার জনসাধারণের অন্যতম নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক

এতগুলি লোককে মিছিল করিয়া আসিতে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমরা প্রায় লোকালয়ে আসিয়া পড়িয়াছি এই ধারণায় ছেলেরা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া শ্লোগান হাঁকিতেছিল—"ভারত গোয়া অলগ্ নহী!"......ইত্যাদি। সেই আওয়াজও হয়ত তাহার থমকিয়া দাঁড়ানোর একটি কারণ। যাই হোক, আমরা ক্রমে তাহার কাছাকাছি আসিতে সে কোঙ্কনী ও হিন্দীতে মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কি বেলগাঁও হইতে আসিতেছেন? আপনারা কি হিন্দুস্থানের সত্যাগ্রহী?" তাহার কথা শুনিয়া আমাদের সেই গাইড দুজন এবং পুড়েগাঁওকার সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়া উত্তর দিল—"হ্যাঁ! কিন্তু তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? আমরা গোয়া কংগ্রেসের লোক। সত্যাগ্রহ করার জন্য বেলগাঁও হইতে আসিয়াছি, ওয়াল্‌পইয়ের দিকে যাইতে চাই। এখান হইতে ওয়াল্‌পই কত দূরে? আমাদের ওয়াল্‌পই যাওয়ার সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিতে পার?" ইহার উত্তরে সে যাহা বলিল তাহাতে বুঝিলাম ওয়াল্‌পই পর্যন্ত হয়ত আর আমাদের কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না। তাহার বহু আগেই ডাঃ সালাজারের পিটুনী পুলিস এবং মিলিটারী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে। শুধু তাই নয়, আমরা হয়ত এই দিক দিয়া গোয়ার ভিতরে আসিয়া পড়িতে পারি সেই আন্দাজে এ অঞ্চলে চারিপাশে জীপ ও মোটর বাইকে করিয়া পুলিস ও গোয়েন্দাদের আনাগোনা শুরু হইয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই এখন সম্মুখের কোনো গ্রামে ঢুকিয়া যে প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করিয়া আমাদের কথা জনসাধারণকে বলার সুযোগ পাইব তাহা মনে হইল না। দেড় দিন ধরিয়া যে অবস্থায় আমরা বন-জঙ্গল ও পাহাড়ের চড়াই-ওৎরাই ঠেলিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া চুপসাইয়া, না খাইয়া, পথ চলিয়া আসিয়াছি তাহাতে পুলিসের কথা শুনিয়া আমরা মোটেই দমিয়া গেলাম না। বরং এবার যা হোক, আমাদের একটা 'গতি' হইবে এবং নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষ হইবে—মনে করিয়া সকলেই মনে কিছুটা বেশ আশ্বস্ত বোধ করিতেই লাগিলাম। সালাজারের পুলিস তাহা হইলে তাঁহার গোয়ার জমিদারী পাহারা দেওয়ার জন্য ঠিকই হাজির আছে! আর যাই হোক. আবার পুরা আর একটা দিন আমাদের পথে-বিপথে প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রায় হাঁটিয়া মরিতে হইবে না!

লা মার্তিনের নিকট ১৮৬১ সালে লিখিত তাঁহার একটি চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহা হইতেই তাঁহার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে:—

"I was born in the East Indies, once the cradle of poetry, philosophy and history and now their tomb.

I belong to that race which composed the Mahabharata and invented chess—two works which bear in them something of the eternal and infinite........

I ask for Indian liberty and light; as for myself, more happy than my countrymen. I am free—'*civis sum*': these titles would suffice to introduce me to you who admire my country and love mankind."

"পূর্ব ভারতে আমার জন্ম, যে দেশ কাব্য, দর্শন ইতিহাসের উৎসস্থল আর আজ তাহার সমাধিস্থান!

"আমি সেই জাতির লোক যাহারা অতীতে মহাভারত রচনা করিয়াছিল; সতরঞ্চ খেলার

এই ছেলেটির সংগে কথাবার্তায় যা খবর পাওয়া গেল তাহার সারমর্ম এই ঃ

আমরা এদিক দিয়া আসিতে পারি বলিয়া গতকাল দুপুর হইতে নদীর ওপারে বিরোন্দে পুলিস চৌকির আশেপাশে এবং নদীর এপারেও পুলিস কয়েকবার জীপে করিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এবং গ্রামের লোকেদের শাসাইয়া গিয়াছে যে সত্যাগ্রহীরা আসিলে তাহাদের কেউ যেন থাকার জায়গা বা খাবারদাবার না দেয় এবং সত্যাগ্রহীদের দেখা গেলেই সংগে সংগে যেন নিজেরা গিয়ে পুলিসে খবর দেয়। আগেই বলিয়াছি, আমরা সীমান্তের যে দিক হইতে আসিতেছিলাম সেটা 'রানে' অঞ্চল এবং প্রধানত হিন্দু অঞ্চল। পর্তুগীজ পুলিস এমনিতেই ইহাদের উপর তত প্রসন্ন নয়। প্রথম গ্রামেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম এবং এই যুবকটির কাছেও শুনিলাম, এদিককার কোনো কোনো গ্রামে ধর-পাকড়, খানা-তল্লাসী এবং গ্রামবাসীদের উপর পাইকারী হারে ঢালাও মার-ধোর ইতিমধ্যে শুরু হইয়া গিয়াছে। নদীর ওপারে বিরোন্দে হইতে ওয়ালপইয়ের রাস্তায় পুলিস ও মিলিটারীর জোর টহলদারী চলিতেছে। বিরোন্দে ফাঁড়িতে একদল পুলিশ ও মিলিটারী ক্যাম্প করিয়া আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমরা যেখানে আছি সেখান হইতে নদীর ধারে পৌঁছাইতে আরো মাইল ৬-৭ হাঁটিতে হইবে। পথে আরো দু-তিনটি গ্রাম পড়িবে বটে। কিন্তু সে সমস্ত গ্রামের লোক পুলিসের ভয়ে এত আতংকগ্রস্ত হইয়া আছে যে, আমরা যদি সে সব জায়গায় মিটিং করিতে যাই, বেশি লোক সাহস করিয়া আগাইয়া আসিবে না। তা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই 'সি-আই-ডি' গোয়েন্দা ('সি-আই-ডি' কথাটা গোয়াতেও বেশ প্রচলিত আছে দেখিয়াছি, যদিও পর্তুগীজরা তাহাদের পুলিসের গোয়েন্দাদের সি-আই-ডি বলে না। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিসের সরকারী নাম সি-আই-ডি নয়, কিন্তু সাধারণ লোকে সি-আই-ডি বলিতে পুলিসের গুপ্তচরদেরই বোঝে) ঘোরাফেরা

আবিষ্কার যাহাদের—ভারতের সেই দুই অবদান শাশ্বত সীমাহীন অনন্তের ছাপ যাহার উপর পড়িয়াছে...।

আমি আজ ভারতের হইয়া স্বাধীনতার দাবী করিতেছি; নূতন যুগের স্বাধীন চিন্তাধারার আলো ভিক্ষা করিতেছি; যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার দেশবাসীদের চেয়ে সৌভাগ্যবান, কারণ, এখানে ফ্রান্সে অন্তত নাগরিক স্বাধীনতার অধিকারটুকু আমার আছে। আমার দেশের প্রতি আপনি শ্রদ্ধাবান, মানবপ্রেমিক আপনি; আশা করি আমার এই পরিচয়ই আপনার কাছে যথেষ্ট হইবে যে আমি স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী।"

সালাজারের আমলে ডাঃ গোমেজকে কোথায় থাকিতে হইত তাহা সহজেই যে কোনো লোক কল্পনা করিতে পারেন!

একমাত্র ডাঃ গোমেজ-ই নন। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও এই শতাব্দীর প্রথমে ইনাসিও লয়লা, ডাঃ সুরারিস, কোরীয়া আফোনসো প্রমুখেরা গোয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সকলকেই গোয়া হইতে ভারতে পলাইয়া আসিতে হয়। এমনকি ডাঃ সালাজারের আমলেও ১৯৩২ সালে যখন নূতন ঔপনিবেশিক আইন বা Lei Colonial অনুযায়ী গোয়া সহ সমস্ত পর্তুগীজ উপনিবেশের সীমাবদ্ধ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বিলুপ্ত সে সময় ডাঃ মেনেজীস ব্রাগাঞ্জা যেরূপ সাহস ও নির্ভীকতার সংগে তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসংগে স্মরণীয়। তবে ডাঃ ব্রাগাঞ্জাকে সালাজার কারারুদ্ধ করিতে পারেন নাই; তাহার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

করিতেছে। আমরা কোনো গ্রামে গেলেই তাহারা সত্য-মিথ্যা নানারকম রিপোর্ট দিয়া গ্রামবাসীদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করিবে। তাহার চেয়ে আমরা যদি সোজাসুজি বিরোন্দে' এবং ওয়ালপইয়ের দিকে যাই তাহা হইলে আর কিছু না হোক সরাসরি পুলিসের সঙ্গে মুকাবিলা করিতে পারিব।

যুবকটির কাছ হইতে এই রিপোর্ট পাইয়া আমরা পথে কোথাও আর অপেক্ষা না করিয়া যত তাড়াতাড়ি পারি বিরোন্দে'-ওয়ালপইয়ের রাস্তায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত করিলাম। আগেই বলিয়াছি তখন আর আমাদের সভা-সমিতি, মিটিং করার মতো উৎসাহও বড় বেশি ছিল না; বরং পর্তুগীজ পুলিসের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া এস্পার-ওস্পার একটা হইয়া যাক, আর হাঁটিতে পারা যায় না—এই মনোভাবটাই তখন সকলের মধ্যে প্রবল।

সোজা কথায় তখন আমাদের নিজেদের মনের অবস্থাও খুব বেশি সত্যাগ্রহ সংগ্রাম করার মতো উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল না। সত্যাগ্রহ করা স্থগিত রাখিয়া আমরা অল্প কয়েকজন যদি এইভাবে সঙ্গোপনে গোয়ার ভিতরে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে হাত দিতাম, আমার ধারণা, তাহাতে কাজ হইত বেশি। গোয়ার ভিতরে জনসাধারণের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যে ব্যাপক পর্তুগীজবিরোধী মনোভাব আছে তাহাকে আরো ভালোভাবে সংগঠিত করিতে পারিতাম। ১৯৫৪ সালের টেরেখোল সত্যাগ্রহের পর গোয়াতে পর্তুগীজ পুলিস ভয় পাইয়া যেরকম ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী চালাইতে শুরু করে তাহাতে গোয়ার ভিতরে ন্যাশনাল কংগ্রেসের যেটুক সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। নেতা হিসাবে যাঁহারা সম্মুখে থাকিতে পারিতেন তাঁহারা সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া যান। ইংরেজ আমলে ইংরেজদের আইনকানুন যে ধরনের ছিল, তাহাতে আমরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন করার ও সংগঠন গড়িয়া তোলার যে সুযোগ ভারতবর্ষে পাইয়াছিলাম, ফ্যাশিস্ট একনায়কত্বের দেশে, বিশেষ করিয়া পর্তুগালের মত ফ্যাশিস্ট দেশের কোনো উপনিবেশে, যে সে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না ও যাইবে না, তাহা আমরা, অর্থাৎ এদেশের গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকেরা কোন সময় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া চিন্তা করিয়া দেখি নাই। মহাত্মাজীর অবদান হিসাবে আমরা 'সত্যাগ্রহ'-কে প্রায় সর্বরোগ-হর দাওয়াইয়ের মতো সর্বত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। গোয়ার বাস্তব পরিবেশে তাহার প্রয়োগ কতদূর কার্যকরী হইবে বা হইবে না, সেখানে অন্য কোনোভাবে জনসাধারণের ভিতর রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগঠন গড়িয়া তোলা সম্ভবপর কি না, এ সব সম্পর্কে আমরা কোনো সময় বেশি মাথা ঘামাই নাই।

অবস্থার চাপে পড়িয়া ইহার কিছু পরে গোয়া-মুক্তি আন্দোলন গুপ্ত সংগঠন ও সন্ত্রাসবাদের পথ নিতে বাধ্য হয় বটে। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে গুপ্ত সংগঠনের পথে সত্যকার গণ-প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার যে সুযোগ ছিল এখন আর তাহা নাই। অবশ্য ১৯৫৪-৫৫ সালে এভাবে গণ-প্রতিরোধ সংগঠনের চেষ্টা যে একেবারেই হয় নাই তাহা নয়। আমি যতদূর জানি, পুণা মহারাষ্ট্রের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের চেষ্টায় গোয়ায় এই ধরনের সংগঠন গড়িয়া তোলার কিছু কিছু চেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে পুণার প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির মহিলা কর্মী শ্রীমতী সিন্ধু দেশপাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু দেশপাণ্ডে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দুই-দুইবার আত্ম-

গোপন করিয়া গোয়ার ভিতরে যান এবং ১৯৫৪-র শেষ দিকে ও ১৯৫৫-র প্রথম দিকে গোয়ার ভিতরে আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ঘুরিয়া রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ চালান। গোয়াতে শিক্ষিত হিন্দু ও ক্রিশ্চিয়ান মহিলাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ তাঁহার চেষ্টাতেই সম্ভবপর হয়। অবশ্য দুইবারই শ্রীমতী দেশপাণ্ডে আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার হইয়া যান। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তারের পর মিলিটারী ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁহার বারো বছরের সাজা হয়। কিন্তু হৈ-চৈ করিয়া ঝাণ্ডা কাঁধে করিয়া সত্যাগ্রহী দল পিছনে লইয়া শ্লোগান দিতে দিতে গোয়ায় ঢোকেন নাই বলিয়া গোয়া মুক্তি আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক হিসাবে শ্রীমতী দেশপাণ্ডের নাম আজও এদেশে বেশি লোকে জানে না। গোয়ার ভিতরে আর একজন লোকও বিশেষ দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে বহুদিন আত্মগোপন করিয়া রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ চালান। এক গোয়ার ভিতরকার রাজনৈতিক কর্মীরা ছাড়া এবং পর্তুগীজ পুলিসেরা ছাড়া তাঁহার নাম আজও এদেশে বড় কেউ জানে না। তিনি একজন মালয়ালী এঞ্জিনীয়ার-কনট্রাক্টর, গোয়ার ভিতরে তিনি মোহন নায়ার নামে পরিচিত ছিলেন। পর্তুগীজ পুলিসও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে সন্দেহ করে নাই। গোয়াতে উচ্চপদস্থ পর্তুগীজ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল এবং সরকারী কনট্রাক্টরদের মধ্যে তাঁহার স্থান বেশ উঁচু ছিল। ভদ্রলোক অনর্গল কোঙ্কনী ও পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলিতে পারেন এবং অনেক দিন গোয়ায় ছিলেন। তিনি খুব সঙ্গোপনে কাজ করিতেন এবং গা ঢাকা না দিয়া, প্রকাশ্যে চলাফেরা করিয়াও বহুদিন পর্যন্ত পুলিসকে কোনমতে জানিতে দেন নাই যে, তিনি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে ১৯৫৫ সালের ৬ই এপ্রিলের সত্যাগ্রহের পর (ঐ দিন মাপুসা শহরে শ্রীযুক্তা সুধাবাঈ যোশীর সভাপতিত্বে গোয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গোয়া জুড়িয়া প্রত্যেকটি শহরে প্রকাশ্য সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠান হয়) তাঁহার কার্যকলাপ পুলিসের কাছে জানাজানি হইয়া যায়। পর্তুগীজ পুলিস আজও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। কারণ ইহার কিছুদিন বাদেই তিনি গোয়া হইতে ভারতে পলাইয়া আসেন। পরে বহু রাজনৈতিক মামলায় পর্তুগীজ পুলিসের চার্জশীটে তাঁহার নাম—'Primeiro Conspirador' বা 'Principal Conspirador'—প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মোহন নায়ার ছাড়াও আরো দু-একজন ভারতীয় অধিবাসী এ ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের ঘাড়ে অনেক ঝুঁকি নিয়া বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নানান কারণে এখানে তাঁহাদের নাম করা সঙ্গত হইবে না।

আমাদের পক্ষে তখন নিজেদের সত্যাগ্রহ অভিযান মাঝপথে থামাইয়া দিয়া মাঝপথে এভাবে গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠনের পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং নিলেও যে তাহা কার্যকরী হইত না তাহা না বলিলেও চলিবে। কারণ আমরা সেরকম কোনো পরিকল্পনা নিয়া গোয়াতে আসি নাই; আসিয়াছিলাম সত্যাগ্রহ করিয়া পর্তুগীজ পুলিসের হাতে মারধোর খাইয়া তার পর আবার 'ভালো ছেলে'র মতো ফিরিয়া যাইতে। আমাদের নজর বেশি করিয়া ছিল 'পলিটিকাল ডেমনস্ট্রেশনে'-র দিকে। আমাদের সত্যাগ্রহের ফলে পর্তুগীজদের হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটিবে সে আশা নিশ্চয়ই ছিল না ('খাঁটি' সত্যাগ্রহীদের অবশ্য তাহাই থাকা উচিত!); কিন্তু আমরা মার খাইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহা নিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে নিশ্চয়ই পর্তুগীজ সরকারকে খুব গালাগালি করা চলিবে; চারিদিকে হৈ-চৈ হইবে, পর্তুগীজ সরকারের উপর গোয়ার ব্যাপারে চাপ দেওয়ার

সুবিধা হইবে—এই সব পরিকল্পনাই আমাদের মনে বেশি ছিল। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি হয় পর্তুগীজ পুলিসের সামনা-সামনি হওয়াই আমাদের পক্ষে সমীচীন এই ভাবিয়া আমরা যুবকটিকে বলিলাম, আমাদের বিরোন্দে'-ওয়ালপইয়ের সোজা রাস্তা ধরাইয়া দিতে। তাহার কথাবার্তা হইতে আমরা ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, সে মোটামুটিভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন, সে ঠিক এদিককার লোক নয়; বেশ কিছু দূরে তার বাড়ি। নিজস্ব কোন প্রয়োজনে সামনের কোনো গ্রামে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে। পুলিস সম্পর্কে তাহার নিজের মনেও যথেষ্ট ভয় আছে। পথের মধ্যে হঠাৎ সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে জড়াইয়া পড়ার ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমাদের যদি পথ দেখাইয়া দিলে সাহায্য হয়, তাহা হইলে আমাদের কিছু দূর আগাইয়া বড় রাস্তা ধরাইয়া দিতে সে রাজী আছে; তবে নদীর পার পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে আসিবে না। কারণ, পুলিস যদি কোনো মতে জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না—পাখ্‌লোরা তাহাকে হাজতে পিটাইয়াই মারিয়া ফেলিবে। এই কথা বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল—"আপনারা হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছেন, আপনাদেরকে তাহারা ভয় করে, আপনাদের পিছনে হিন্দুস্থানের সরকার আছে; হয়ত আপনাদের দু-চারবার মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তাহার বেশি কিছু করিবে না। কিন্তু বেটারা যদি গোয়ার ভিতরের কাহাকেও পায়, মারিতে মারিতে একেবারে মারিয়াই ফেলিবে। অনেককে এভাবে মারিয়া ফেলিয়াছেও। আমাদের হইয়া তাহার প্রতিকার করার কেহ নাই!" এ কথাটার বাস্তব অর্থ কি, তখন বুঝি নাই। সাত মাস পর্তুগীজ পুলিসের হাজতে থাকিয়া দিনের পর দিন নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি এ কথা কত সত্য এবং কত মর্মান্তিকভাবে সত্য। কিন্তু তাহার মনে এ ভয় থাকা সত্ত্বেও সে আমাদের সঙ্গে আসিল। আমরাও বড় রাস্তা না ধরিয়া তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিলাম না। কারণ, গতকাল ঠেকিয়া শিখিয়া আমাদের সঙ্গের গাইডদের উপর খুব বেশি ভরসা তখন আমাদের আর ছিল না। তাহারা এদিককার পথ ঠিক ঠিক চেনে কি না কে জানে? তা ছাড়া তাহারাও আর বেশীক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকিবে না; আমাদের বড় রাস্তা ধরাইয়া দিয়াই তাহারা চলিয়া যাইবে, খালি সে রাস্তা তাহারা চেনে না বলিয়া এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। কাজে-কাজেই পথের মধ্যে এই ছেলেটিকে পাইয়া আমরা পথ সম্পর্কে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। আগেই বলিয়াছি, পুলিসের হাতে পড়ার ভয় তখন আমাদের মনে আর ততটা কাজ করিতেছিল না; কিন্তু কোনোমতেই আমরা আবার গতকালের মত পথ হারাইতে রাজী ছিলাম না।

অবশ্য ডাঃ সালাজারের লাঠিয়াল ও বরকন্দাজদের দেখা পাওয়ার জন্য আমাদের সেদিন আরো ৬।৭ মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখনকার হাঁটায় আর কালকার মত দুর্ভোগ ছিল না। আরো কিছু দূরে গিয়া আমরা একেবারে বড় সড়ক পাইয়া যাই। কোঙ্কন বা মহারাষ্ট্রের পাহাড় অঞ্চলের পথঘাট যাঁহারা দেখিয়াছেন (কিংবা দক্ষিণে মালাবার বা কেরল অঞ্চলের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে) তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন, এ সব অঞ্চলে বাঁধানো পাকা রাস্তার তত দরকার হয় না। পাহাড়ের গা কাটিয়া চওড়া রাস্তা কোনোমতে তৈয়ারী করিতে পারিলেই হয়; খোয়া দিয়া কিংবা পীচ বা কংক্রীট দিয়া রাস্তা বাঁধানোর দরকার ততটা হয় না। কারণ এদিককার মাটিও শক্ত আর পাথর-কাঁকর মিশানো ঢালু রাস্তায় জল কাদা জমিতে পায় না। আমাদের হঠাৎ পাওয়া পথের সাথী মাইল দুই-তিন

এই রাস্তায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মাঝামাঝি এক জায়গায় আমাদের নিকট হইতে বিদায় নিল। যাওয়ার সময় সে বলিয়া গেল, "আপনারা এই রাস্তা কিছুতেই ছাড়িবেন না; এই রাস্তা বরাবর আর কিছুটা গেলেই আপনারা নদীর ধারে পৌঁছিবেন। সেখানে কোনো খেয়াঘাট নাই, কিন্তু ছোট ছোট নৌকা পাওয়া যায়। দু-চার আনা দিলে পার হইতে পারিবেন। নদী পার হইয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আপনাদের ওয়ালপই যাওয়ার রাস্তা দেখাইয়া দিবে।" আমাদের গাইডরাও আর কিছুদূর গিয়া এই রাস্তা হইতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দেয়। স্থানীয় যুবকটি নিজের কাজে চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা দুজনে আমার কাছে আসিয়া নিজেদের বাড়ির পথে যাওয়ার অনুমতি চাহিল। তাহারা জানাইল, তাহাদের বাড়ি এ অঞ্চল হইতে অনেক দূরে পড়িবে। আমরা যখন বড় রাস্তা ধরিয়া ফেলিয়াছি তখন তাহাদের আর আমাদের সঙ্গে আসার দরকার নাই। তা ছাড়া তাহারাও আচমকা পুলিসের হাতে পড়িতে চায় না। তাহাদের পথ ভুল করার দরুন যে আমাদের অনেক কষ্ট হইয়াছে সেজন্য বার বার মাপ চাহিয়া তাহারাও ক্রমে বিদায় নিল।

এবার আমরা সম্পূর্ণ রকমে একা একা, নিজেরা-নিজেরা চলিতেছি। সঙ্গে পথ দেখানোর কেউ নাই। আজ পথে তত বৃষ্টিও নাই; মধ্যে মধ্যে রৌদ্রও দেখা দিতেছে, মধ্যে মধ্যে দু-এক পশলা হাল্কা বৃষ্টি আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিয়া যাইতেছে। আমাদের রাস্তার দু পাশে এখনও বেশ ঘন জঙ্গল এবং বড় বড় গাছ দেখিতেছি। সোজা চওড়া রাস্তা, পাহাড়ের ঢালু দিয়া নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। আমরা গ্রাম বা লোকালয়ের মত দেখিলেই চীৎকার করিয়া শ্লোগান দিতেছি—"সালাজার, গোয়া ছোড়ো! অভী ছোড়ো! জল্দি ছোড়ো!" এইভাবে চলিতে চলিতে কখন যে আমরা একেবারে একটি বেশ বড় গ্রামের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছি তাহা আমি খেয়াল করি নাই। ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন হঠাৎ "ওই যে নদী, ওই যে নদী!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে আমার চমক ভাঙ্গিল। তাকাইয়া দেখি, নদীর ধারে একটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তখন বেলা প্রায় বারোটা। গ্রামের কোনো কোনো বাড়ি হইতে মেয়েরা বা ছোট ছোট ছেলেরা কৌতূহলভরে আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। নিতান্ত ছোট অজ পাহাড়ী পাড়াগাঁ। লোকজনের চেহারা এবং বাড়িঘর দেখিয়া, বিশেষ করিয়া দু-একটি মাছ-ধরা জাল শুকাইতে দেখিয়া আন্দাজ করিলাম নদীর ধারে জেলেদের বসতি হইবে বোধ হয়। নদী পার হওয়ার নৌকা কোথায় পাওয়া যাইবে তাহার খোঁজ করিতে কাহাকেও পাঠাইব ভাবিতেছি, এমন সময় ভলান্টিয়ারদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, "পুলিস!" "পুলিস!" সম্মুখে এবং আশেপাশে তাকাইয়া দেখি কয়জন পর্তুগীজ এবং গোয়ানীজ পুলিস, কাহারও পরনে খাকী উর্দী, কাহারও পরনে নেভী ব্লু জীনের উর্দী, আর কয়জনের পরনে গ্রে রংয়ের মোটা ছিটের কাপড়ের উর্দী (এইটা পর্তুগীজ মিলিটারী সৈন্যদের সাধারণ পোশাক) স্টেন গান এবং সঙ্গীন চড়ানো রাইফেল হাতে করিয়া দু পাশ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া ফেলিতেছে। পুলিস দেখিয়া আমাদের ছেলেদের উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল—"পর্তুগীজ, গোয়া ছোড়ো!" "ভারত মাতা কী জয়!" "গোয়া ভারত অলগ্ নহী!" "জয় হিন্দ" যে যাহা পারে শ্লোগান দিতে আরম্ভ করিল। পুলিস তখন দু দিক হইতে সাঁড়াশী গতিতে আমাদের প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তখনও চলিতেছি। চলা এখন এই মুহূর্তে বন্ধ হইয়া যাইবে; পিঠে লাঠি এবং বন্দুকের কুঁদার বাড়ি আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবে। তবু উহারই ভিতর পুলিসের দলের সঙ্গে অফিসার

গোছের কেউ আছে কি না ঠাহর করার জন্য আমি একটু উদ্‌গ্রীব হইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইতেছি এমন সময় বেচারী নিতাই গুপ্ত! আমার জ্বর হইয়াছিল বলিয়া নিতাই গুপ্ত আমাকে জাতীয় পতাকা কাঁধে নিতে দেয় নাই; সম্মুখের দিকে একজন গোরা পুলিস বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া রাইফেলের কুঁদা দিয়া নিতাইয়ের হাতে একটি প্রচণ্ড ঘা মরিতেই জাতীয় পতাকা এবং তাহার ডাণ্ডা নিতাইয়ের হাত হইতে নীচে পড়িয়া গেল। নিতাই গুপ্ত তবু গ্রাহ্য না করিয়া পতাকা আবার তুলিয়া নিবার জন্য নীচু হইয়াছেন, আর একজন একটি রাইফেলের বাড়ি মারিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময় দেখি, ক্রশ বেল্ট পরা একজন অফিসার জাতীয় লোক আমাদের জাতীয় পতাকাটা ডাণ্ডা হইতে খুলিয়া তুলিয়া নিতেছে ও অপর হাত দিয়া পুলিসের দলকে আমাদের মারিতে বারণ করিতেছে। তাহার পিছনে দেখি একজন মোটা বেঁটে গোছের দো-আঁসলা ফিরিঙ্গী সাহেব, একটু ভদ্রগোছের চেহারা, পরনে খাকী প্যাণ্টের উপর সাদা শার্ট, মাথায় একটা জরীর সাজ পরানো, তারা লাগানো বারান্দাওয়ালা মিলিটারী টুপী স্টেন গান হাতে দৌড়িয়া আসিতেছে এবং ইংরেজি ও পর্তুগীজ মিশাইয়া চীৎকার করিতেছে—

"Nao! Nao! who, leader? who, leader? Que esta o chefe? o chef da Satyagrahi? O chefe? chefe?"

বলা বাহুল্য, তখনও আমি পর্তুগীজ ভাষা শিখি নাই; কিন্তু অনেক বছর আগে জেলে থাকিতে অল্প কিছু ফরাসী ভাষার চর্চা করা ছিল, তাই আন্দাজ করিলাম যে, 'শেফ্' 'শেফ্' বলিয়া সত্যাগ্রহী দলের নেতা বা পরিচালক কে তাহা জানিতে চাহিতেছে। ইতিমধ্যে পুলিস ও মিলিটারীতে মিলিয়া আমাদের একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তবু তাহারই ভিতরে দু'পা আগাইয়া গিয়া ইংরাজীতে বলিলাম, "আমিই এই সত্যাগ্রহী দলের লীডার, আমি ইহাদের নিয়া আসিয়াছি। আমাদের আসা সম্পর্কে আমরা গভর্নর জেনারেলকে চিঠি দিয়া জানাইয়াছি। আমরা মনে করি, বিদেশী পর্তুগীজ সরকারের গোয়াতে থাকার......"। এই পর্যন্ত বলিতে না বলিতেই সেই বেঁটে মোটা লোকটির ইশারায় পিছন হইতে চারজন জোয়ান গোছের পুলিস বা মিলিটারী সৈনিক তাহাদের বন্দুক কাঁধে ঝুলাইয়া নিয়া আমাকে চারিপাশ হইতে ধরিয়া প্রায় মাটি হইতে শূন্যে তুলিয়া নিয়া ভলাণ্টিয়ারদের কাছ হইতে আলাদা করিয়া কিছু দূরে সরাইয়া একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়া আসিল। মনে মনে তখন প্রমাদ গণিতেছি—"এবার বোধ হয় সকলের সামনে ফেলিয়া আমায় মারিবে"! কিন্তু আমাকে সরাইয়া নিয়া আসিয়া তাহারা কিছু বলিল না। খালি আমাকে নিজেদের মধ্যখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া চারজন চারদিক হইতে সঙ্গীন লাগানো স্টেন গান খাড়া করিয়া পাহারা দিতে থাকিল।

ওদিকে মারধোর তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিতাই গুপ্ত ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। বাঁ হাত দিয়া ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আছেন; মুখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি দুর্বহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; হাতটা বোধহয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে বাড়ি তাঁহার হাতের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে হাত না ভাঙ্গিলেই আশ্চর্যের কারণ হইত। অন্যান্য সমস্ত ভলাণ্টিয়ারদের তখন সারি বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া তাহাদের সম্মুখে ও পিছনে দু সারি রাইফেলধারী পুলিস পাহারা দিতেছে। পুলিসপক্ষের হাঁক-ডাক এবং লোকজনের আনাগোনা দেখিয়া বুঝিলাম কয়েকটি ডিঙ্গি নৌকা আনিয়া আমাদের ওপারে নিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা যে একেবারে নদীর কিনারায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম

তাহা আগে খেয়াল করি নাই। নদীর ওপারে তাকাইয়া দেখি সেখানে প্রায় দেড়শ 'দুইশ'জনের মত সশস্ত্র পুলিস এবং মিলিটারী সৈন্য জমা হইয়া আছে। দু'একটি জীপ দাঁড়াইয়া আছে। নদীর বুকে তিনটি চারটি ছোট ডিঙ্গী নৌকা আমাদের পারে আসিতেছে; নৌকার মাঝি ছাড়া প্রত্যেক নৌকায় একজন করিয়া রাইফেলধারী পুলিস বসিয়া। নৌকা আসিতে আসিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম যাহা হোক মার খাওয়ার হাঙ্গামা আমাদের কপালক্রমে বোধহয় অল্পের উপর দিয়া চুকিল! আমাদের যখন বিনা হাঙ্গামায় ধরিয়া ফেলিয়াছে এখন শান্তভাবে ওপারে নিয়া গিয়া হয় কোনো থানায় নিয়া যাইবে কিংবা দু'চারজন ছাড়া আর সকলকে আবার বর্ডার পার করিয়া ভারতের এলাকায় ফেলিয়া দিয়া যাইবে। নিতাই গুপ্ত ছাড়া অন্য ভলাণ্টিয়ারদের আর মার খাইতে হইল না মনে করিয়া, মনে মনে অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রায় উপক্রম করিতেছি এমন সময় প্রথম ডিঙ্গীতে প্রথম তিন চারজন ভলাণ্টিয়ার যাহারা ওপারে পৌঁছিয়াছিল তাহাদের আর্তনাদে আমার দিবা-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সালাজারের পিটুনী পুলিসকে আমি তখনো চিনি নাই।

এক একটি ডিঙ্গীতে চারজন পাঁচজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের ওপারে নিয়া যাওয়ার পর যেই তাহারা মাটিতে পা দিতেছে, মাটিতে তাহারা ভালো করিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই, এক এক ঝাঁক রাইফেলধারী পুলিস আসিয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—রাইফেলের কুঁদা, রবারের মোটা 'ট্রাঞ্চিয়ন' (রবারের শক্ত লাঠি), সাধারণ বাঁশের লাঠি, ছোট ছোট লোহার রড্, মোটা চামড়ার হাণ্টার চাবুক যে যাহা পারে তাহা দিয়া নৃশংসভাবে মারিতে শুরু করিতেছে। কাহারও মাথা কাটিয়া যাইতেছে, কাহারও হাত-পা, হাঁটু ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বাড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেও নিস্তার নাই। কাহারও মুখ দিয়া নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। কেহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র কিছু লোককে হাতে পাইয়া ঠিক এভাবে কেহ মারে ইহার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। হঠাৎ এক সময় ইহার মধ্যে চাহিয়া দেখি বৃদ্ধ ভগৎ তুলসীরাম কাঁধে পিঠে রাইফেলধারী পুলিসের প্রথম ধাক্কাতেই মাটিতে পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া আমার আর সহ্য হইল না, আমি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম—"Officer ! Officer !" আমার চীৎকার শুনিয়া ও উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিয়া সেই বেঁটে মোটা ইন্সপেক্টরটি (পরে জানিয়াছিলাম তাহার পদমর্যাদা পর্তুগীজ পুলিসের chefe বা ইন্সপেক্টর র‍্যাঙ্কের) আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"Que !" অর্থাৎ "what ?" "কী হইয়াছে"। আমি তখন রাগে এবং উত্তেজনায় কাঁপিতেছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই কি তোমাদের পর্তুগীজ সভ্যতা? আমাদের অপরাধ কি এই যে আমরা বিনা অস্ত্রে আসিয়া স্বেচ্ছায় তোমাদের হাতে ধরা দিয়াছি? একজন ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে শারীরিক আঘাত না করিবার মতো সামান্য মানবিকতা-বোধটুকু থাকাও কি তোমাদের পর্তুগীজ সভ্যতায় বারণ?" বলা বাহুল্য, আমার সেই উত্তেজনার মাথায় তাড়াতাড়িতে বলা ইংরাজী বোঝার মতো ইংরাজী জ্ঞান তাহার ছিল না। কিন্তু বোধহয় নদীর ওপারে হাত দিয়া বারবার দেখানোর দরুন এবং আমার উত্তেজনার ভাব দেখিয়া সে এটুকু বুঝিয়াছিল যে আমি বোধহয় আমাদের ভলাণ্টিয়ারদের উপর ওপারে যে মারধোর চলিতেছে সেই বিষয়ে কিছু বলিতেছি। আমার কথা শুনিয়া সে চীৎকার করিয়া একজনকে কাছে ডাকিল। এই লোকটি কাছে আসিতে দেখিলাম সে একজন গোয়ানীজ ক্রিশ্চিয়ান ভদ্রলোক। তাহার পরনে সাধারণ ভদ্রলোকের মতো লং প্যাণ্ট বা ট্রাউজার, একটি সাদা হাফ শার্ট, পা দুটিতে

জলকাদা হইতে কাপড়-ট্রাউজার বাঁচানোর জন্য রবারের লম্বা গাম বুট ঢোকানো। তাহাকে ইন্সপেক্টর সাহেব পর্তুগীজ ভাষায় আমাকে ইংরাজীতে কিছু বুঝাইয়া বলার জন্য বলিলেন। সে একটু পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—

"Mr. Chaudhuri, it is no use protesting against these things. You need not look to that direction—"

"মিঃ চৌধুরী এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করিয়া কোনো লাভ নেই। আপনার ওদিকে তাকাইয়া দেখার দরকার নাই।" ক্রমে সে আরো যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এইঃ "যে আপনাদের আসার জন্য এই বৃষ্টির দিনে দুই দিন ধরিয়া আমাদের কম নাকাল হইতে হয় নাই। আপনাদের খোঁজে আমাদের এই দুই দিন বহু জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছে। আমাদের সৈন্যেরা সেজন্য আপনাদের উপর ক্ষেপিয়া আছে। আপনারা গোয়া নিতে চান, আর গোয়া পাওয়ার জন্য এটুকু কষ্ট করিবেন না?"

তাহার কথা শেষ হইতে ইন্সপেক্টর সাহেব আসিয়া, তাঁহার গোয়ানীজ যুবক দোভাষীকে আমাকে অন্য কোথাও নিয়া যাইতে বলিল। ইন্সপেক্টর নিজেই গ্রামের দিকে আগাইয়া গিয়া সম্মুখে যে বাড়িটি ছিল তাহার লোকেদের ডাকিয়া এবং দু-একজন পুলিসকে ডাকিয়া কিছু বলিল। গোয়ানীজ যুবকটিও আমাকে আসিয়া বেশ ভদ্রভাবে বলিল—"চলুন! আমাদের এদিকে থাকার দরকার নাই, আমরা ওই বাড়িতে গিয়া বসি।" আমার চারপ্রহরী সহ আমি তাহার পিছন পিছন চলিলাম। আমার মনের উত্তেজনা তখন কিছুটা কাটিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম: কে জানে ভদ্রভাবে তো যাইতে বলিতেছে; কিন্তু এবার বোধহয় আমার পালা।

॥ ১২ ॥

বিরোন্দে'-র পুলিস চৌকীতে

আমার গোয়ান যুবক প্রহরী পিছন পিছন সম্মুখের ঘরের দাওয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মনে মনে যে বেশ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলাম তাহা এইমাত্র বলিয়াছি; অস্বস্তি এই ভাবিয়া—'এবার বোধহয় আমার পালা'। ওপারে আমার সহযাত্রীরা নদীর ঘাটের ধারে খোলা মাঠে মার খাইতেছে; আমাকে বোধহয় ঘরের ভিতর পুরিয়া মারিবে। এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হইবে? মনে মনে এইরকম আশঙ্কা করিতে করিতে কয়েক পা যখন অগ্রসর হইয়াছি হঠাৎ আমার গোয়ান প্রহরীর কথায় সচকিত হইয়া মুখের দিকে তাকাইলাম—"Mr. Chaudhuri, this is not the way to liberate Goa!" ("মিঃ চৌধুরী, গোয়াকে স্বাধীন করার পথ এ নয়"); আমি তাহার মুখ হইতে এই ধরনের কথা শোনার প্রত্যাশা করি নাই। আমার মুখ দিয়া কতকটা না ভাবিয়া প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল—"কেন" ("Why?") সে পাল্টা প্রশ্ন করিল—"Do you really think Mr. Chaudhuri, the Portuguese will really leave simply because a few hundred unarmed Satyagrahis are coming in?"

(মিঃ চৌধুরী, আপনারা কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন, কয়েক শ' করিয়া নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে আসিয়া ঢুকিতেছে বলিয়াই পর্তুগীজরা চলিয়া যাইবে?)। তাহার এ প্রশ্নের উত্তরে সত্যাগ্রহী হিসাবে আমার যে কথা বলা উচিত ছিল আমি তাহা বলি নাই। তাহার কথা বলার ধরনে আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগিয়াছে—কে এই যুবক? এ সুরে এই ধরনের কথা এ লোকটি বলিতেছে কেন? বেশভূষায় তাহাকে ঠিক পুলিসের লোক বলিয়া মনে হয় না। পরনে ভদ্রগোছের ট্রাউজার ও সাদা হাফ্ শার্ট; পায়ে গাম্‌বুট। হাতে পুলিসের রাইফেল বা স্টেন গান নয়, একটা সাধারণ দো'নলা পাখী মারা বন্দুক। আমি তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাকাইয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে? আপনি এই পুলিসের দলের সঙ্গে কেন আসিয়াছেন?" সে তাহার উত্তরে বলিল, "আমি আসি নাই; আমাকে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমার কথার উত্তর দিন। সত্যই কি আপনারা মনে করেন, এইভাবে অহিংস সত্যাগ্রহের পথে আপনারা গোয়া স্বাধীন করিতে পারিবেন?" বলা বাহুল্য, তখন আমাদের খুব কাছাকাছি কোনো পর্তুগীজ অফিসার কেহ ছিল না; সামনে পিছনে স্টেন-গান-ধারী আমার চারজন গোরা পর্তুগীজ প্রহরী আর পাশে দো'নলা বন্দুক কাঁধে পুলিসের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আগত এই গোয়ান যুবকটি। চেহারা দেখিয়া বেশ ভদ্র ও মার্জিত ধরনের লোক বলিয়া মনে হইতেছে। কথার ভাবে মনে হয় গোয়ার রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ক্ষীণভাবে হইলেও সহানুভূতিসম্পন্ন—ইহার কথার কি ধরনের জবাব দিলে পর ঠিক হইবে? একটু ভাবিয়া নিয়া আমি বলিলাম—"অহিংস সত্যাগ্রহীদের দেখিয়া পর্তুগীজরা ভয় পাইবে বা ভয় পাইয়া গোয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এমন মনে করার কোনো কারণ নাই বা আমরা তাহা মনে করি না। কিন্তু ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যায়ের প্রতিরোধে রুখিয়া দাঁড়ানোর অপরিহার্য কর্তব্য আমাদের আছে; একথা বিশ্বাস করি বলিয়াই আমরা আসিয়াছি"। সে কতকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে আর কতকটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহের সুরে উত্তর দিল—"হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের আপনারা জানেন না" ("May be, but you don't know these people")! আমার মনে তখন তাহার সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়াছে অনেক বেশি আমাদের সঙ্গের পর্তুগীজ গোরা সৈন্যেরা যে ইংরাজীতে আমাদের ভিতর এই কথাবার্তা বুঝিতে পারিতেছে না তাহা বেশ আন্দাজ করিতে পারিতেছিলাম। আমি এই সুযোগে আবার তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"আপনি কি করেন? আপনি পুলিসের সঙ্গে কেন আসিয়াছেন? আপনাকে দেখিয়া তো পুলিস কর্মচারী বলিয়া মনে হয় না।" উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম সে পুলিসের লোক না হইলেও মোটামুটি সরকার-ঘেঁষা পরিবারের লোক। পুলিসের কাজকর্মে হোক, কিংবা সরকারী কাজকর্মে হোক সাহায্য করার জন্য তাহাদের বাড়ির লোকের ডাক পড়ে। সেই হিসাবে তাহাকে তাহাদের বাড়ির প্রতিনিধি হিসাবে আসিতে হইয়াছে। বোম্বাইয়ে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন অনেক আছে; সে নিজেও অনেকবার বোম্বাই আসিয়াছে গিয়াছে। সে নিজে রাজনীতির লোক নয় বা তাহার বাড়ির লোকেও নয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে সত্যাগ্রহের বা পলিটিক্সের সাধারণ খবর রাখে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভিতর দিয়া কিছু হইবে বলিয়া সে বিশ্বাস করে না। সে একথাও জানাইল, মোটা বেঁটে মতন যে অফিসারটির কথায় সে আমাকে এখানে এই ঘরের দাওয়ার দিকে নিয়া আসিয়াছে, সে পর্তুগীজ হইলেও এখন কতকটা গোয়ার বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে। সে নাকি সত্যাগ্রহীদের প্রতি খুবই "সহানুভূতিসম্পন্ন" বা

"sympathetic"। অবশ্য "সহানুভূতিসম্পন্ন" বলিতে সে একথা বলিতে চায় নাই যে, এই অফিসারটি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সমর্থক। পরে জানিয়াছিলাম, ভদ্রলোক একজন Chefe বা সাব-ইনস্পেক্টর গ্রেডের লোক। সত্যাগ্রহীদের বেশি মারধোর করা বা নিজের হাতে তাহাদেরকে পিটানো এসব পছন্দ করে না। সেই অর্থে "সহানুভূতিসম্পন্ন"।

আমরা ততক্ষণে কথায় কথায় যে বাড়ির দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেখানে আসিয়া গিয়াছি। বাড়ির কর্তাকে সে ডাকিয়া দাওয়ার উপর একটা কিছু বিছাইয়া দিতে বলিল। নীচু দাওয়া; সেখানে কম্বল বিছানো হইলে পর যুবকটি আমাকে সেখানে বসিতে বলিল। আমার চার গোরা প্রহরী স্টেন-গানের মুখ আমার দিকে করিয়া গম্ভীর-ভাবে আমায় পাহারা দিতে থাকিল। আমরা যে জায়গায় আসিয়া বসিলাম, সেটা নদীর পার হইতে কিছুটা দূরে। সেখান হইতে ওপারের মারধোরের দৃশ্য দেখা যায় না; কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের মার-খাওয়া যন্ত্রণার আর্তনাদ সেখানেও আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমার কিছু করার উপায় নাই। তবে ভাবগতিক দেখিয়া এটুকু বেশ বুঝিতেছি, আমাকে এখনি বোধহয় আর মার খাইতে হইবে না। কারণ আমাকে মারিতে হইলে এভাবে এখানে আড়ালে নিয়া আসিয়া ঘরের দাওয়ায় কম্বল বিছাইয়া বসার ব্যবস্থা করিত না। শারীরিক-ভাবে মনে মনে কিছুটা নির্ভয় বোধ করিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে সেই বেঁটে-মোটা অফিসার ভদ্রলোক নিজেই আসিয়া ইংরাজীতে জানাইলেন—"ইউ গো লাস্ট" ("তোমাকে সবার শেষে যাইতে হইবে")। পরে আমাদের নূতন পরিচিত বন্ধু গোয়ান যুবকটির সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলিয়া আমায় কিছু বলিতে বলিলেন। তাহার 'Chefe'-এর জবানীতে সে আমায় জানাইল, অন্য সকলের নৌকা পার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এইখানে থাকিতে হইবে। তবে আমি যতক্ষণ তাঁহার চার্জে আছি ততক্ষণ আমার কোনো ভয় নাই, আমাকে কেহ কিছু বলিবে না। কিন্তু আমি ভিন্ন আমাদের দলের অন্যান্যদের সম্পর্কে তাঁহার কোনো দায়িত্ব নাই। খালি আমার যেন গায়ে হাত না দেওয়া হয় এই অর্ডার তাঁহার উপর আছে। অবশ্য পঞ্জিম যাওয়ার পর আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার হাতে অর্থাৎ ওয়াল্‌পই পর্যন্ত আমার কোনো ভয় নাই। আমি যেন গণ্ডগোল না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি। শোরগোল করার চেষ্টা না করিলে আমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই।

যাক, তবু খানিকটা পাকাপাকি আশ্বাস পাওয়া গেল যে, এখনই আমাকে মার খাইতে হইতেছে না! দেখা যাক, এর পরে কি হয়? আমাকে সেখানে স্টেন-গান-ধারী পাহারাওলাদের জিম্মায় বসাইয়া রাখিয়া যুবকটি ও মোটা শেফ ভদ্রলোক নদীর ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন। আমার সংগী তখন সেই চারজন স্টেন-গানধারী গোরা পর্তুগীজ সৈন্য। তাহারা এক একবার মহা গম্ভীরভাবে কটমট করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে, আর আমি তাহাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—এইভাবে খানিকক্ষণ চলিল। কিছুক্ষণ বাদে বোধহয় খানিকটা কৌতূহল আর খানিকটা থমথমে 'পরিস্থিতি'টা কাটানোর চেষ্টায় গোরা সিপাহীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পর্তুগীজ ভাষায় প্রশ্ন করিল—"Chef! tu Hindou ou Cristao? Fala Concani? Fala Engles?" ("এই লীডার! তুই হিন্দু না খৃষ্টান? কোঙ্কনী বলিস্, ইংরেজী বলিস্")। বলা বাহুল্য, তখন আমি পর্তুগীজ এক অক্ষরও জানি না বা বুঝি না। কিন্তু এই কয়েকটি কথা বোঝা বা তাহার অর্থ আন্দাজ করা এমন কিছু কঠিন ছিল না। বুঝিলাম, আমি

জাতে খৃষ্টান না হিন্দু, কোঙ্কনী বলি না ইংরাজী বলি তাহা জানিতে চাহিতেছে। আমি উত্তর দিলাম—"হিন্দু......ইংলিশ......হিন্দুস্তানী......নো কোঙ্কনী"। আমার উত্তর শুনিয়া সে খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ইংরাজী সে যে জানে না সেটুকু আন্দাজ করিতে পারিতেছিলাম। কারণ তাহা না হইলে সে সরাসরি আমাকে ইংরাজীতেই কথা জিজ্ঞাসা করিত। কারণ তাহার সম্মুখে গোয়ান যুবকটি এবং আমি দুজনেই ইংরাজীতে কথা বলিতেছিলাম। পর্তুগীজ সৈন্যদের অধিকাংশই প্রায় নিরক্ষর বলিলেও চলে; তাহাদের অনেকেরই পর্তুগীজ ভাষার অক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত নাই। পরে আগুয়াদা দুর্গে থাকার সময় যখন পর্তুগীজ সৈন্যদের সঙ্গে আর একটু কাছাকাছি আসার সুযোগ হইয়াছে তখন তাহাদের অনেককে আমাদের নিজেদের জন্য কেনা পর্তুগীজ ভাষার প্রাইমার (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ) ধার দিয়া পর্তুগীজ অক্ষর জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টায় সাহায্য করিতে হইয়াছে।* অবশ্য পর্তুগীজ রাজ্যে সেই প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় এতটা জানার সুযোগ যে আমার হয় নাই সেকথা বলার দরকার করে না; ক্রমে ক্রমে জানিয়াছি। যা হোক, পর্তুগীজ সৈন্যটির আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা উপক্রমেই থামিয়া গেল। কারণ উভয় পক্ষেই এটা সহজেই বোঝাবুঝি হইয়া গেল, আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চালানো যাইবে না। সে কোঙ্কনী বোঝে বা জানে কি না, তাহা জানার সুযোগ হয় নাই। বলা বাহুল্য, মারাঠী ভাষা কিছু কিছু বুঝিলেও কোঙ্কনী তখন আদৌ আমি বুঝি না। পর্তুগীজ গোরার মুখে কোঙ্কনী শুনিলে তাহা যে আমার আদৌ বোধগম্য হইবে না সেটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। সেও ইংরেজী বা হিন্দুস্তানী জানে না। সুতরাং চুপ করিয়া একে অন্যকে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

সৈন্যদের পরনে মোটা সুতীর ছিটের সস্তা অথচ মজবুত গ্রে রংয়ের (বা কালচে ছাই রংয়ের) মিলিটারী শার্ট আর ট্রাউজার; পায়ে শক্ত চামড়ার মিলিটারী বুট। তাহাদের মাথায় ঐ রকম গ্রে রংয়ের কাপড় মোড়া শক্ত পিচ্‌বোর্ডের গাম্‌লা হেল্‌মেট; কারো কারো মাথায় সবুজে খাকী বার্নিশের স্টীল হেল্‌মেট। ইহার অনেক পরে বিভিন্ন পুলিস হাজতে ও জেলে থাকিয়া পর্তুগীজ মিলিটারী সৈন্যদলের থাকা-খাওয়া বেশভূষার ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রমশ যখন আমাদের আরো বেশি জ্ঞান হইল, তখন অবশ্য জানিতে পারি যে, সালাজারী ব্যবস্থায় সাধারণ সৈন্যদলের অবস্থা তত ভালো নয়। পুলিসের থাকা-খাওয়া, বেশভূষার বন্দোবস্ত সাধারণ সৈন্যদের যাহা দেওয়া হয় তাহার চেয়ে অনেক ভালো। ১৯৫৪ সালে গোয়ায় সত্যাগ্রহ ও রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গোয়াতে পর্তুগীজ সৈন্যদলের সংখ্যা যে রকম বাড়ানো হইয়াছে; তেমনি বাড়ানো হইয়াছে খাস পর্তুগীল ও লিস্‌বন হইতে আমদানী গোরা পুলিস।† কিন্তু গোরা পুলিসের বেশভূষা গোরা সৈন্যদলের বেশভূষার সঙ্গে তুলনায় সকল সময় বেশি দামী ও বেশি জাঁকজমকসম্পন্ন বলিয়া মনে হইয়াছে।

---

* সরকারী হিসাব মতে পর্তুগালের অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ৫০-৫১ জনের মতো। কিন্তু সৈন্যদলের ভিতর চাষী শ্রেণীর লোক একটু বেশি বলিয়া নিরক্ষরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।

† খাস পর্তুগাল হইতে গোয়াতে এই সময় তিন শ্রেণীর গোরা পুলিস আমদানী করা হয়। প্রথম, সাধারণ পুলিস বাহিনীর পুলিস কনস্টেবল ও সার্জেণ্ট। ইহাদের সংখ্যা আনুমানিক

বসিয়া বসিয়া এইসব দেখিতেছি ও সাত-পাঁচ নানারকম ভাবনা ভাবিতেছি এমন সময় হুকুম হইল—"আসামীকে নিয়া এসো।" অর্থাৎ সকলে ওপারে পেঁাছিয়াছে এবার আমার যাওয়ার পালা। অন্যান্য সকলের মতই ডিঙ্গি নৌকা করিয়া মিলিটারী পাহারায় আমাকেও পার করা হইল। ঘন বর্ষার দিনের ঘোলা লাল জলের খর স্রোতস্বতী পাহাড়ী নদী; বেশি চওড়া নয়। পার হইতে বেশি সময় লাগিল না। বিরোন্দে' পুলিস চৌকীর পারে ডিঙ্গী আসিয়া লাগিতে দেখি, আমাদের ভলাণ্টিয়ারদের সকলকে উপরে নিয়া গিয়া মাঠে সারবন্দী করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। কিছু পুলিস ও সৈন্যদল তাহাদের পাহারা দিতেছে; কিছু পুলিসের লোক এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করিতেছে। আমাকে পিটানোর জন্য ঘাটের উপর কেহ খাড়া হইয়া নাই। তখন অফিসারটির কথা মনে পড়িল যে, আমার গায়ে হাত দেওয়ার হুকুম নাই। কথাটার পিছনে হয়ত সত্যতা আছে এবার তাহা খানিকটা বিশ্বাস হইল। খালি গ্রেপ্তার হওয়ার সময়েই নয়; গোয়ায় আমার উনিশ মাসকালের বন্দীদশার ভিতর আমার গায়ে কখনো হাত পড়ে নাই। অবশ্য 'পিদে'-র লোকেরা অন্যভাবে দুর্ব্যবহার করিয়া তাহার শোধ তুলিয়া নিয়াছে। আমার চোখের সম্মুখে অন্যকে ধরিয়া অমানুষিক প্রহার করিয়াছে, কিন্তু আমাকে মারে নাই।

আমি ভারত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য ইহা তাহার একটি পরোক্ষ কারণ বটে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণ, আমার পূর্বে গোয়াতে ভারত পার্লিয়ামেণ্টের অপর যে সদস্য গিয়াছিলেন, অধ্যাপক বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডে, তাঁহাকে পুলিস হাজতে ভরিয়া পিটানোর পর পুলিস কর্তৃপক্ষ কিছুটা বেকুব বনিয়া যায়। অধ্যাপক দেশপাণ্ডেকেও প্রথমে তাহারা প্রহার করিতে চায় নাই। তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক দল গোয়ার ভিতরে বড় রাস্তায় আসিয়া পেঁাছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জীপে বসাইয়া সোজা পঞ্জিমে আনিয়া ফেলে। তাঁহার সঙ্গী স্বেচ্ছাসেবকদের সেখানেই মারধোর করিয়া ট্রাকে করিয়া বর্ডারে পাঠাইয়া দেয়; কিছু লোককে দু' এক দিনের হাজতেও রাখিয়াছিল। পঞ্জিমে তাঁহাকে প্রথম

শ' দুই তিন হইবে। এখন ইহাদের সঙ্গে পর্তুগালের পুলিস বাহিনীর নিম্ন ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীও যথেষ্ট সংখ্যায় আমদানী করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক থানায় এবং পুলিস চৌকীতে গোয়ান পুলিস ছাড়াও একজন দু'জন করিয়া পর্তুগীজ পুলিস অফিসার এবং গোরা পর্তুগীজ কনস্টেবল রাখা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আছে পর্তুগাল হইতে আগত PS = Policia Seguranca সোজা কথায় সিকিউরিটি পুলিস। ইহাদের কাজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

সবার উপরে PIDE = Policia International da defesa de Estado; ইংরাজীতে "ইণ্টারনাশন্যাল পুলিস অফ্ স্টেট্ ডিফেন্স"। এই গালভরা নাম দেওয়ার তাৎপর্য কি, কেনই বা ইহাদের 'ইণ্টারন্যাশনাল' আখ্যা দেওয়া হয় তাহা আমি আজও অনেক পর্তুগীজ অফিসারকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে বা বুঝিতে পারি নাই। তবে মোটামুটি ইহাদের ডাঃ সালাজারের নিজস্ব গেস্টাপো পুলিস বলা যাইতে পারে। বেশভূষায় মাহিনায়, সম্মান-সম্ভ্রমে এবং জনসাধারণের মনে ভীতি উদ্রেক করানোর ব্যাপারে ইহাদের উপরে কেহ নয়। মিলিটারী অফিসার ও সাধারণ পুলিস অফিসারদেরও ইহাদের ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

বেতন, বেশভূষা বা সাজসজ্জায় সাধারণ পুলিস কনস্টেবলদের সঙ্গে সৈন্যদের কোন তুলনা হয় না। বেচারা (সৈন্যেরা) মরমে মরিয়া থাকে। সাধারণ সৈন্যদের তিনপ্রস্থ কাপড় দেওয়া হয়।

দিনের পরেই পুলিস হেড কোয়ার্টার হইতে মানিকোমের আল্‌তিন্যো (Altinho) জেলে নিয়া যাওয়া হয়। আমিও এই জেলে মাস ছয়েক ছিলাম। এই জেলের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল যে, এখানে কোনো পদস্থ পুলিস কর্মচারী থাকিত না; মিলিটারী পাহারায় একজন পর্তুগীজ সার্জেণ্ট এবং একজন পর্তুগীজ ও একজন গোয়ান কনস্টেবলের দায়িত্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে রাখা হইত। ফলে এই সার্জেণ্ট এবং কনস্টেবলটির খেয়াল-খুশীর উপর রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে কোনো রকম নির্যাতন বিনা বাধায় চলিতে পারিত। দেশপাণ্ডের সঙ্গে সেখানকার এই সার্জেণ্টের সঙ্গে তাঁহার পাশের ঘরের একজন রাজনৈতিক বন্দীর উপর মারধোর করা নিয়া কথা কাটাকাটি হয়। সার্জেণ্টটি তাহাতে রাগান্বিত হইয়া বাহির হইতে দুইজন নিগ্রো সৈন্যকে ভিতরে আনিয়া, তিনজনে মিলিয়া তাঁহাকে সেলের মধ্যে অমানুষিক প্রহার করে। দেশপাণ্ডের তখনো পর্যন্ত ভারতের কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। পর্তুগালের সঙ্গে তখনো ভারত গভর্নমেণ্টের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। কাজে কাজেই আইনত গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতের কন্সালের সঙ্গে দেশপাণ্ডের দেখা করিতে দিতে বাধ্য ছিলেন। তাহা ছাড়া দেশপাণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার: আমাদের কন্সাল মিঃ মনি তাঁহার নিজের দিক দিয়াও দেশপাণ্ডের সহিত দেখা করার চেষ্টা করিতেছিলেন। গোয়া পুলিসও দেশপাণ্ডের গ্রেপ্তারের পর হইতে তখনো পর্যন্ত দেশপাণ্ডের নিকট হইতে কোনো জবানবন্দী লিখিয়া লয় নাই। মারধোর করার পরের দিন ছিল পুলিস হেড কোয়ার্টারে তাঁহাকে নিয়া গিয়া তাঁহার জবানবন্দী রেকর্ড করার দিন। মার খাওয়ার পর হইতে দেশপাণ্ডে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন—পরের দিন তাঁহাকে পুলিস হেড-কোয়ার্টারে নেওয়ার পর সকল কথা যখন জানাজানি হইল তখন পুলিস কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুটা বিব্রত হইয়া পড়ে।

ভারত পার্লিয়ামেণ্টের একজন সদস্যকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস-হাজতের মধ্যে তাঁহাকে আটক করার পর, তাঁহার উপর শারীরিক অত্যাচার চালানো হইয়াছে, ভারতের কন্সাল জেনারেল সেকথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই গুরুতর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে—পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের মনে এই ভয় দেখা দেয়। এ গুজবও

দুইটি গ্রে রংয়ের ইউনিফর্ম আর একটি একটু ভালো খাকী হাফ প্যাণ্টওয়ালা ইউনিফর্ম। ডাঃ সালাজার নিজে এককালে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া এসব বিষয়ে তাঁহার হিসাব খুব ভালো। পর্তুগালের স্ট্যাণ্ডিং আর্মি বা স্থায়ী সৈন্যদলের সংখ্যা খুব কম। বেশির ভাগ সৈন্য দুই বছরের ন্যাশনাল সার্ভিস কনস্‌ক্রিপট; পর্তুগালে প্রত্যেক লোককে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দুই বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে কাজ করিতে হয়। গোয়ায় আগত পর্তুগীজ সৈনেরা সাধারণত এই শ্রেণীর। ইহাদের উপর সালাজার খুব বেশি খরচপত্র করেন না। পর্তুগাল প্রথম যুদ্ধের শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর আর কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই; সালাজার আমলে তো নয়ই। সালাজার দেশ শাসন করেন পুলিসের সাহায্যে। 'পিদে' বাহিনী, 'সেগুরাণ্ডা' বাহিনীর আদর তাই সবার উপরে; স্থায়ী স্ট্যাণ্ডিং আর্মির-ও কতকটা আদর আছে। কিন্তু "Guarda National Republicana" বা জাতীয় সেনা বাহিনীর তত আদর নাই। তাহারা দুই বছরের জন্য বেগার খাটিয়া দিয়া যায়, কাজে কাজেই তাহাদের জন্য সালাজার অযথা অর্থ ব্যয় করিতে চান না।

কাহারো কাহারো মুখে শুনিয়াছি যে, এই সময় গভর্নর-জেনারেল, জেনারেল পাউলো বের্নার্দ গেদীস্-এর সঙ্গে পুলিস কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না; সুতরাং দেশপাণ্ডের ব্যাপার ভারতীয় কন্সাল জেনারেল যদি জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই গভর্নর জেনারেলের কাছে পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন এবং সেক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল তাহার জন্য পুলিস কর্তৃপক্ষকে দায়ী করিবেন। সুতরাং এত হাঙ্গামায় দরকার কি? বরং দেশপাণ্ডেকে ছাড়িয়া দেওয়া ভালো—এই মনে করিয়া পর্তুগীজ পুলিস কন্সালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়ার আগেই দেশপাণ্ডেকে ছাড়িয়া দেয়। শুধু তাই নয়। দেশপাণ্ডে যখন পুলিস হেড কোয়ার্টারে আসিয়া সার্জেন্টটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাঁহার সামনেই সার্জেন্টদের মেস হইতে তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিচার করিয়া তাহাকেও দশ দিনের সলিটারী সেল বাসের সাজাও দেওয়া হয়। দেশপাণ্ডে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তাহা আমি পড়িয়াছি। আমি তখনো গোয়ায় প্রবেশ করি নাই (দেশপাণ্ডে ১৮ই জুন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করেন; আমি করি ৯ই-১০ই জুলাই)। দেশপাণ্ডের ধারণা ছিল যে, তাঁহাকে মারধোর করার পিছনে হয়ত পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষের প্ররোচনা ছিল এবং তাঁহার সামনে সার্জেন্টটির যে বিচার হয় তাহা নিতান্ত লোক-দেখানো বিচার। কিন্তু আমি তাঁহার পরে গোয়ায় গিয়া নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারি তাহা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, তাহা মোটেই লোক-দেখানো বিচার ছিল না। পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষ সে সময় এ ব্যাপারে সত্য সত্যই কিছুটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং যদি দেশপাণ্ডের ব্যাপার নিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে কোনো অভিযোগ হয় বা কোনোরকম আন্তর্জাতিক শোরগোল শুরু হয় তাহা হইলে যাহাতে তাহাদের দিক দিয়া এ সম্পর্কে ঠিক ঠিক মতন জবাবদিহি করিতে পারা যায় তাহার যোগাড়যন্ত্র করিয়া রাখিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। অবশ্য দেশপাণ্ডেকে মুক্তি দিবার পর (ভারতীয় কন্সালের সঙ্গে তাঁহাকে দেখাই করিতে দেওয়া হয় নাই) পুলিস পক্ষ হইতে সরকারীভাবে বলা হয় দেশপাণ্ডের ডায়েবেটিস রোগের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আমরা পরবর্তীকালে দু'একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলে পর এই উত্তরই পাইয়াছি। সে যাহাই হোক, আমার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে দেশপাণ্ডের ব্যাপারের পর পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ কিছুটা সাবধান হইয়া যান এবং গোয়া-অভিযানকারী দ্বিতীয় পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য আমার বেলায় যাহাতে আবার এরূপ কোনো অবস্থার সৃষ্টি না হয়, তাহার জন্য সর্বরকমে সাবধানতা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ সোজা কথায়, আমার উপর যে মার পড়িতে পারিত তাহা দেশপাণ্ডের উপর আসিয়া পড়ায় আমাকে আর পর্তুগীজ পুলিসের হাতে মার খাইতে হয় নাই। আমি এবং মহারাষ্ট্রের মোদক গুরুজী, ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের ভিতর একমাত্র এই দুই জনকেই পর্তুগীজ পুলিসের হাতে কোনো শারীরিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। মোদক গুরুজীকে অবশ্য তাহারা গ্রেপ্তারই করে নাই। বর্ডারের নিকট হইতেই ফিরাইয়া দেয়। আমার অব্যাহতি পাওয়ার কারণ কি তাহা উপরেই বলিয়াছি।

ডিঙ্গি নৌকা হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বন্দী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে প্রথম একজন পুলিস কর্মচারী পর্তুগীজ সৈন্য-বাহিনী সহ আমাদের সকলের একটি ফটো তুলিয়া নিল। আমাদের সম্মুখে আমাদের

যাহারা গ্রেপ্তার করিয়াছিল সেই তিনজন পুলিস ও মিলিটারী অফিসারকে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতের মুঠিতে নিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ফোটোটি তোলা হয়। ফোটো তোলা পর্ব শেষ হইলে আমাদের সম্মুখের পুলিস চৌকীর ঘরের বারান্দায় নিয়া সারি বাঁধিয়া বসানো হইল। এবার আরম্ভ হইবে পুলিসের জেরা ও জবানবন্দীর পালা। আমরা বারান্দায় গিয়া বসিতে না বসিতেই কয়েকটি জীপে করিয়া কোথা হইতে কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীর মতো সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যান্য পুলিস কর্মচারীদের তাহাদেরকে দেখিয়া সেলাম ঠোকার বহর হইতে বুঝিতে পারিলাম তাহারা নিশ্চয়ই বড়গোছের অফিসার। আন্দাজ করিলাম এবার ইহারা আমাদের চার্জ নিবে। আসামী হিসাবে কি ধরনের জীব আসিয়াছে তাহা দেখাও তাহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে। যাই হোক, আমাদের পক্ষে তখন ধৈর্য ধরিয়া নাটকের দৃশ্যান্তরে আমাদের ভাগ্যে কি আছে তাহার অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছুই করার ছিল না।

॥ ১৩ ॥

বিরোন্দে' হইতে ওয়ালপই

এবারকার এই অফিসার কয়জন সকলেই মাপ্সার পুলিস হেড কোয়ার্টার হইতে আসিয়াছে। বিরোন্দে' ওয়ালপই থানার অধীন বলিয়া মাপ্সা হেড কোয়ার্টারের জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে। কাজে কাজেই সেখানে কর্তৃপক্ষ সশরীরে হাজির হইয়াছেন। ইহাদের দলের ভিতর যাহাকে সবচেয়ে হোমরাচোমরা গোছের বলিয়া মনে হইল, সে ব্যক্তির সঙ্গে ঐদিন রাত্রিতেই আবার মাপ্সা থানার হাজতে দেখা হয়। খানিকক্ষণের মধ্যেই তাহাদের আসার উদ্দেশ্য বোঝা গেল—পুলিসের প্রাথমিক জেরা, সরকারী পর্তুগীজ বয়ানে 'Perguntas Premeiras'। মিলিটারী এবং সিকিউরিটি পুলিস তাহাদের এলাকায় ভারতীয় ডাকাতদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। বলাই বাহুল্য, পর্তুগীজ সরকারের দৃষ্টিতে আমরা অহিংস সত্যাগ্রহী নই; আমরা "Bandidos Indianos"—Indian Bandit বা ভারতীয় ডাকাত। "সত্যাগ্রহী" বলিয়া কোনো কিছু তাহাদের অভিধানে নাই। কাজে কাজেই মিলিটারী এবং দেশরক্ষা পুলিসের হাতে ধরা পড়িলেও সাধারণ থানা-পুলিস আমাদের উপর তাহাদের দখল ছাড়িবে কেন? এখন মিলিটারী বা সিকিউরিটি পুলিসের হাত হইতে ক্রমশ এই এলাকার সাধারণ পুলিস আমাদের চার্জ নিবে। সেইজন্য এই অঞ্চলের জেলা হেড কোয়ার্টার মাপ্সা হইতে স্বয়ং এ্যাডজুটান্ট কমান্ডান্ট সাহেব নিজে সরেজমিনে তদন্ত করিতে আসিয়াছেন, এ্যাডজুটান্ট কমান্ডান্ট নাম শুনিতে খুব গালভরা হইলেও ভদ্রলোকের পদমর্যাদা আমাদের পুলিসের ডি-এস-পি র‍্যাঙ্কের কাছাকাছি। জাতে তিনি যে গোরা পর্তুগীজ, তাহা না বলিয়া দিলেও চলিবে।

এ ভদ্রলোক অবশ্য একটু উচ্চপদস্থ। কিন্তু গোয়াতে "Sub-Chefe" বা সাব্-ইন্সপেক্টর গ্রেডের উপরে কালা আদমী গোয়াবাসী দেশীয় লোক এক আধজন ছাড়া বড় বেশি নাই বলিলেও চলে।

উপরে "Chefe" বা ইন্সপেক্টর গ্রেড হইতে সকলেই প্রায় ইউরোপীয় পর্তুগীজ। এ্যাডজুটাণ্ট কমাণ্ডাণ্ট হইলে তো কথাই নাই। অবশ্য পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী, গোয়াতেও প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া যাঁহারা গণ্য, তাঁহারা সকলেই খাস পর্তুগীজ নাগরিক। ইহাদের ভিতর কে দেশী ক্রিশ্চিয়ান বা দো-আঁসলা ফিরিঙ্গী লুসো-ইণ্ডিয়ান (যাহাদের পর্তুগীজ ভাষায় "misto", মিস্তো বা কোঙ্কনীতে মিস্তী বলে; আমাদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ট্যাঁশ ফিরিঙ্গী ধরনের), কিংবা পুরাতন বাসিন্দা ইউরোপীয় পর্তুগীজ তাহা সব সময় চেহারা দেখিয়া তফাৎ করা যায় না। তবু যতটা দেখিয়াছি, "সুব্ শেফ্" গ্রেডের উপর গোয়াবাসী দেশী ক্রিশ্চিয়ান বা হিন্দু সরকারী কর্মচারী আমাদের চোখে প্রায় পড়ে নাই। একথার অর্থ এ নয় যে পর্তুগীজরা খাস গোরা পর্তুগীজ ছাড়া অন্য কাহাকেও বড় বড় চাকুরী দেয় না। গোয়াতে ঠিক সে হিসাবে ইউরোপীয় প্রাধান্য নাই। পর্তুগীজরা জাতিগত বা বর্ণগত আভিজাত্যবোধের তত বেশি মর্যাদা দেয় না। ইউরোপীয় বা ভারতীয় গোয়ানীজ—এই হিসাবে জাতিগত বৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে প্রায় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু পর্তুগাল অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনগ্রসর বলিয়া সেখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোকেদের ভিতর সরকারী চাকুরীতে ঢোকার ঝোঁক বেশি থাকে। তাহা ছাড়া চাকুরীর পথ বেশি খোলা নাই। কাজে কাজেই পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজের সর্বত্র সরকারী কর্মচারীরা পর্তুগাল হইতে আসে একটু বেশি। খাস পর্তুগাল বা লিসবনের ঔপনিবেশিক দপ্তর হইতে, আফ্রিকা হোক, এশিয়া হোক, যেখানে ছোট বড় যেটুকু জমিদারী তাহাদের আছে, সবটা এক জায়গা হইতে শাসন করা হয় বলিয়া খাস পর্তুগালের গোরা পর্তুগীজরা অফিসাররা স্বভাবতই সেখানকার চাকুরী-বাকরীর ভাগ বেশি পায়। তার উপরে, জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গোয়াবাসী দেশী লোকদের উপর পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট ততটা ভরসাও করিতে পারিতেছিলেন না। দলে দলে সাধারণ পুলিস কনস্টেবল পর্যন্ত লিসবন হইতে গোয়াতে আনিয়া জড়ো করা হইয়াছে। এইসব কনস্টেবলদের বেতনের হার গোয়ার দেশী "সুব্ শেফ্"দের বেতনের চেয়ে বেশি। এই সমস্ত কারণে পর্তুগীজ গোরা কর্মচারীদের সংখ্যা গোয়াতে একটু বেশিই; কিন্তু তাহাতে খুব আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আমাদের গোরা কমাণ্ডাণ্ট সাহেব অবশ্য জীপ হইতে নামিয়াই আমাদের গ্রেপ্তারকারী অফিসারদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়া, দু'একটা কথাবার্তা বলিয়া গটগট করিয়া সটান পুলিস চৌকীর ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। আমাদের ততক্ষণে, ফোটো তোলার পরে বারান্দায় আনিয়া সারি বাঁধিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি অবশ্য সেখানেও "লীডার" সুলভ মর্যাদা ও "মনোযোগ" পাইতেছি; অর্থাৎ আমাকে সেই বারান্দাতেই একটু দূরে আমার সেই চারজন স্টেনগানধারীর জিম্মায় আলাদা বসাইয়া রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদের সকলের অবস্থাই তখন বেশ কাহিল। আমি তো তবু মার খাই নাই; কিন্তু আমাদের দলের আর প্রত্যেকে, বৃদ্ধ ভগৎ তুলসীরাম পর্যন্ত, চোরের মার খাইয়া ধুঁকিতেছেন বলিলে চলে। তাহার উপর দু'দিন ধরিয়া খাবার বলিতে গত রাত্রির একমুঠা খিচুড়ি ছাড়া কিছু ভাগ্যে জোটে নাই। কাহারও মাথা কি কপাল কাটিয়া গিয়াছে; গায়ে হাতে-পায়ে সকলেরই দগদগে কালশিরা বা কাটার দাগ; কাহারও কাহারও জামায় কাপড়ে রক্ত। এর পরে অদৃষ্টে আরো কি আছে, কে জানে? আমি আমার জায়গা হইতেই কুমার

পিল্লাইয়ের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিতেই আমার এক গোরা প্রহরী ধমক দিয়া উঠিল—"Chefe! Nao Falar!"......"লীডার! কথা বলা বারণ!" ভাষাগত অর্থবোধ না হোক, পুলিসের ধমক এবং হুমকীর একটা ভাষার অতীত সার্বজনীন 'আবেদন' আছে। সহজেই বুঝিলাম এখানে এভাবে কথা কওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। এই "Nao Falar" ধমকানি এই দিনের পর হইতে উনিশ মাস ধরিয়া আমাদের নিত্যকার সাথী। ধমক খাইয়াই তখনকারমতো চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু ভলান্টিয়ারদের মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। বেচারীরা সকলেই চোরের মার খাইয়াছে। দু'দিন ধরিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া সকলেই নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিতাই গুপ্তের হাত একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় বেচারা সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছেন না পর্যন্ত। ইশারায় জানাইলেন একটু জল খাইতে চান। আমার মনে হইল এবার সত্যাগ্রহীদের 'শেফ' বা লীডার হিসাবে এখন আমার 'পদ-মর্যাদা'কে কাজে লাগাইলে বোধহয় দোষ হইবে না। পুলিসের কনস্টেবল সিপাহীদের মধ্যেও আমি "শেফ" বলিয়া ততক্ষণে কিছুটা মার্কা-মারা হইয়া গিয়াছি। একজন দেশী সিপাহীকে কাছাকাছি আসিতে দেখিয়া ইশারা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া হিন্দীতে বলিলাম—'সাব্-ইন্সপেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাই, একটু ডাকিয়া দিতে পারো।' গোয়া পুলিসের লোকেরা অনেকেই পুণা-বোম্বাই আসা যাওয়া করিয়াছে, একটু একটু হিন্দী সকলেই প্রায় বোঝে। সে ঘরের ভিতরে গিয়া আমাদের পুরানো পরিচিত সেই মোটা বেঁটে সাব্-ইন্সপেক্টর সাহেব ও তাহার গোয়ান যুবক সহকারীকে ডাকিয়া আনিল। তাহাদের বলিলাম—'আমার লোকেরা খুবই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, দুদিন তাহাদের কিছু খাওয়া-দাওয়া হয় নাই, আমি যদি পয়সা দিই তাহা হইলে তাহাদের জন্য কিছু চা রুটি বা কমপক্ষে শুধু জল পাওয়া যাইবে?' ভলান্টিয়ারদের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বোধহয় ভদ্রলোকের মনে একটু দয়া হইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—"...কিন্তু পয়সা? 'শা' এবং 'পাঁও' ('Paon' = ব্রেড বা পাঁওরুটি, মারাঠী এবং কোঙ্কনীতেও 'পাঁও' কথার মানে পাঁউরুটি) কিনিতে তো পয়সা 'লাগিবে'। আমার পকেটে তখনও কয়েকটা টাকা ছিল, সেই ভরসাতেই টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম। বলিলাম, 'টাকা আমি দিতেছি'; পকেট হইতে যে কয়েকটা টাকা ছিল বাহির করিয়া দিলাম, বোধহয় পাঁচ-ছয়টা এক টাকার নোট হইবে। গোয়াতে ভারতীয় টাকা তখন আইনত বাজারে চলিত। পরে বন্ধ হইলেও বে-আইনীভাবে চলে। ভদ্রলোক টাকা কয়টা একজন সিপাহীর হাতে দিয়া কাছে কোনো হোটেলে বা দোকানে চা রুটি পাওয়া যায় কিনা দেখিতে বলিলেন। চা অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমাদের কপালে জোটে নাই। কারণ তখন বেলা প্রায় আড়াইটা তিনটা। চায়ের দোকানে দুধ ছিল না। সাব্-ইন্সপেক্টর সাহেব টাকা কয়টা ফেরৎ দিয়া বলিলেন—'চা পাওয়া গেল না, তবে তোমরা যদি খাওয়ার জল চাও তো বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।' পুলিসের হুকুমে এক দোকান হইতে দু'তিন বালতি খাওয়ার জল আসিল। সেই জলও হয়ত এই ভদ্রলোকের মনে দয়ার উদ্রেক না হইলে পাওয়া যাইত না।

ইতিমধ্যে মাপ্সার এ্যাডজুটান্ট সাহেব একজন একজন করিয়া ভলান্টিয়াদের ঘরের ভিতর ডাকিয়া নিয়া জেরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। জেরার ধরন অবশ্য সাধারণ রকম ধমক-চমকের সঙ্গে নিম্নলিখিত রূপঃ

—"তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? গোয়া আসার টাকা-পয়সা কে দিয়াছে? দৈনিক কত করিয়া তোমাদের বেতন দেয়? ছাড়িয়া দিলে হিন্দুস্থানে চলিয়া যাইবে না আবার ফিরিয়া আসিবে?"—ইত্যাদি। অফিসার ভেদে জেরার রকম ফের হয়, জেরার সঙ্গে ধমকের মাত্রা কমে বাড়ে; চড়-চাপড়, লাথি-কিল-গুঁতা সবই জোটে। আমাদের দলের লোকেদের কপালে এই সব ফাউ তত জোটে নাই; অল্প সল্প চড়-চাপড়ের উপর দিয়াই যায়। এ্যাডজুটাণ্ট পরে মাপ্‌সা হাজতে আমায় বলিয়াছিলেন—'আজ নিতান্ত রবিবার, তাই আমার হাত হইতে তোমার লোকেরা সহজে অব্যাহতি পাইয়াছে, নহিলে—!' জানি না ভদ্রলোকের মনে আফশোষ ছিল কি না। কিন্তু একথাও সত্য ক্যাথলিক ও ধর্মভীরু রক্ষণশীল জাত বলিয়া নানান রকম পেণ্ডেণ্ট ক্রস, তাগা-তাবিজ মাদুলী ধারণ করার সাথে সাথে, আনুষ্ঠানিকভাবে রবিবার বা সাবাথ পালন করাটা পর্তুগীজদের সাধারণ রীতি। রবিবারের দিন বা ঐ রকমের ধর্মকর্মের দিন পর্তুগীজরা পারতপক্ষে কোনো খারাপ কাজ করিতে চায় না। পুলিশের লোকেরাও রবিবারের দিনে হইলে পরে লক্ষ্য করিয়াছি মারধোর একটু কম করিত।

যাহা হউক ক্রমে জেরায় আমারো ডাক পড়িল। আমি ঘরে ঢুকিতেই এ্যাডজুটাণ্ট চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেনঃ

"তোমরা গোয়া নিতে চাও? গোয়া নেওয়ার দাম কি দিতে হইবে জানো?"

আমার উত্তর ঃ "তোমরা গোয়ায় থাকিতে চাও? গোয়ায় থাকিতে চাহিলে কি দাম দিতে হইবে জানো?"

"আমি ওসব কথা শুনিতে চাহি না; কে তোমাকে পাঠাইয়াছে? তোমাকে দেখিয়া শিক্ষিত লোক মনে হয়। জানো, তোমার এ কাজের শাস্তি কি? জানো, তোমাকে আমরা গুলী করিয়া মারিতে পারি?"

"মারো না কেন? একটি বুলেটের বেশি খরচ হইবে না!"

"তোমাকে আমি সাফ বলিয়া দিতেছি গোয়া পর্তুগালের. গোয়া চিরকাল পর্তুগালেরই থাকিবে! তোমরা জোর করিয়া গোয়া নিতে পারিবে না!"

"ইংরেজরাও তাই মনে করিয়াছিল।"

"বটে? বটে?"

"তোমার দোভাষীকে জিজ্ঞাসা কর।"

"তোমার অত লেকচার আমি শুনিতে চাই না। আমরা পাঁচশ বছর ধরিয়া এখানে আছি আমরা চিরকাল এখানে থাকিব।"

"লেকচার আমি দিতেছি না, তুমি দিতেছো। পারো তো থাকো না কেন? আমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে আসি নাই। এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে?"

"তোমাকে কে পাঠাইয়াছে? পিটার আল্‌ভারিস্‌কে চেনো? সে কোথায়? সে ব্যাটা নিজে আসে না কেন? অন্য লোক পাঠায় কেন?"

গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা বলিয়া পিটারের উপর তখন পর্তুগীজদের খুব রাগ। তাহাদের ধারণা, পিটার নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এখন গোয়ায় সত্যাগ্রহীদের পাঠাইতেছেন। ইহার পরেই দাদ্‌রা এবং নগর-হাভেলীর মত জোর করিয়া গোয়া দখল করা হইবে। আমাদের সত্যাগ্রহ তাহার জন্য একটা ছল ছুতা তৈরি করার ফন্দী মাত্র।

এ্যাডজুটাণ্ট পর্তুগীজ ভাষায় প্রশ্ন করিতেছেন, আর সেই পূর্বোক্ত গোয়ান ভদ্রযুবকটি আমাদের দুজনের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিতেছে। আমি এ্যাডজুটাণ্টের এই শেষ কথার উত্তরে সত্যাগ্রহী হিসাবে প্রথম একটু সত্য গোপন করিলামঃ

"পিটার আল্ভারিসের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি আমার নিজের দায়িত্বে আসিয়াছি" (এটা সত্য) "আমাকে তোমরা যে কোন শাস্তি দিতে পারো। আমি কেন আসিয়াছি তাহা তোমাদের গভর্নর জেনারেল সাহেবকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছি। আমরা মনে করি, গোয়ায় থাকার তোমাদের কোনো অধিকার নাই।"

"বটে! বটে! বটে অধিকার নাই? অধিকার নাই? এ্যাই কৌন্ হ্যায়! একে বাহিরে নিয়া যাও! এখনই মন্তেইরোর কাছে হাজির কর!"

মন্তেইরো কে, সে পরিচয় এখনি দিতেছি। আমার চার প্রহরী পিঠে প্রায় স্টেন্ ঠেকাইয়া ঠেলা দিয়া আমায় ঘরের বাহিরে নিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখি, একটি প্রকাণ্ড বড় মোটর ট্রাক্ এবং আর একটি সাঁজোয়া ওয়েপন কেরিয়ার জাতীয় মোটর গাড়ি। ট্রাক দেখিয়া আন্দাজ করিলাম, আমাদের ভলাণ্টিয়ারদের বোধহয় আজ রাত্রেই বর্ডারে ফেরৎ নিয়া গিয়া মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তখনো পর্যন্ত সাধারণ সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তারের পর মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই ছিল পর্তুগীজ পুলিসের নীতি। ১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে যাহারা গোয়া প্রবেশ করিয়াছিল সেই একটি দল ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় স্বেচ্ছা-সেবকদের তাহারা আটক রাখে নাই। উত্তম-মধ্যম পিটাইয়া সত্যাগ্রহী নেতাদের মধ্যে গোরে প্রমুখ আমাদের আটজনকে ছাড়া আর কাহাকেও ধরিয়া রাখে নাই। অবশ্য ভারতবর্ষ হইতে গোয়ান সত্যাগ্রহী গেলে তাহার কথা আলদা। আমাদের দলের ভলাণ্টিয়ারদের ৯ই-১০ই জুলাইয়ের রাত্রে হাজতে রাখিয়া পরের দিন ডোডামার্গের দিক দিয়া তাহাদের আর এক দফা পিটাইয়া ছাড়িয়া দেয়। বেচারী নিতাই গুপ্তের ভাঙ্গা হাত বেলগাঁও হাসপাতালে আসিয়া প্রায় দিন পনেরো চিকিৎসার পর জোড়া লাগে। নাসিক হইতে আগত একটি মুসলমান যুবকও এই সঙ্গে ভীষণভাবে আহত হয়। আমি মানিকোম্ পাগলা গারদে বসিয়া প্রায় দেড় মাস দু' মাস বাদে চোরাই পদ্ধতিতে লুকাইয়া জেলে আনা মাদ্রাজের সাপ্তাহিক 'হিন্দু' কাগজে তাহাদের খবর পাই।

জেরা শেষ হওয়ার পর, বারান্দায় আমার নিজের জায়গায় আবার ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, আমাদের উপর হুকুম হইল—'গাড়িতে চলো'। প্রথমে ভলাণ্টিয়ারদের এক এক করিয়া ট্রাক্টিতে উঠানো হইল। তাহাদের মধ্যে বাদ থাকিলেন নিতাই গুপ্ত, ভগৎ তুলসী রামজী এবং নাসিকের একটি খুব অল্পবয়সী ছেলে—তাহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু চেহারাটি আজো মনে আছে। খুবই প্রিয়দর্শন, ১৭-১৮ বছর বয়সের ছেলে। মাপ্সার এ্যাডজুটাণ্ট সাহেবের কি করিয়া ধারণা হয়, বাচ্চা ছেলে; বোধহয় একটু মারধোর করিলে কিংবা লোভ দেখাইলে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের সম্পর্কে অনেক খবর উহার কাছ হইতে পাওয়া যাইবে! ছেলেটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দলভুক্ত; বলা বাহুল্য, পর্তুগীজ পুলিস তাহার মুখ হইতে কোনো খবরই বাহির করিতে পারে নাই। তিনদিন বাদে পঞ্জিমের পুলিস হাজত হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ভগৎজীকে আলাদা রাখার কারণ, তিনি বয়স্ক লোক এবং হয়ত কোনো 'chefe' বা 'politico' (লীডার বা রাজনৈতিক নেতা) হইতেও পারেন। তাই তিনি আটক পড়িলেন এবং নিতাই গুপ্ত,

তাঁহার অপরাধ তিনি আমাদের দলের পতাকাবাহী ছিলেন। এ্যাডজ্যুটাণ্ট এই তিনজনকে বাছাই করিয়া মন্তেইরো-র কাছে হাজির করার হুকুম দিয়া তাঁহার নিজের ল্যাণ্ড-রোভারে করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবৃত হইয়া আবার মাপ্সা ফিরিয়া গেলেন। আমরাও গিয়া আমাদের ওয়েপন কেরিয়ারে উঠিলাম। গাড়িতে আমাদের প্রত্যেকের পাশে একজন করিয়া বা দুজনের মধ্যে একজন এই হিসাবে কাঁধে স্টেন্ গান ঝুলাইয়া এক একজন পর্তুগীজ সৈন্য বসিল। গাড়ি এবার রওনা হইল ওয়াল্‌পইয়ের দিকে, সেখানে গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বড়কর্তা স্বনামধন্য কাসিমির মন্তেইরো আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন— সেই কাসিমির মন্তেইরো যাঁহার নামে গোয়ায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়! আমি অবশ্য তখনো জানিতাম না কে এই মন্তেইরো।

॥ ১৪ ॥

মন্তেইরো সংবাদ

গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর কাসিমির মন্তেইরো-র (Casimir Monteiro) সঙ্গে ওয়ালপই থানায় যখন আমার প্রথম দেখা হয়, এবং তাহার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত, মন্তেইরোকে আমি মন্তেইরো বলিয়া জানিতাম না। পঞ্জিমে পুলিস হেড কোয়ার্টারের হাজতে থাকার সময় আরো কয়েকবারই মন্তেইরোর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ আমার হয়। তখনো মন্তেইরোকে চিনি না। গ্রেপ্তারের প্রায় ৩ মাস বাদে মানিকোমের পাগলা গারদের সেলে থাকার সময় একদিন গোয়াবাসী একজন সহবন্দী আমায় তাহাকে দেখাইয়া চিনাইয়া দেয়—'এই লোকটিই স্বনামধন্য আজেন্ত (ইন্সপেক্টর) মন্তেইরো'। ততদিনে অবশ্য মন্তেইরো সম্পর্কে এত কথা শুনিয়াছি যে নূতন করিয়া তাহাকে চিনিয়া বেশ খানিকটা 'থ্রিল্' অনুভব করিলাম বলিলেও চলে।

মন্তেইরো একই সঙ্গে গোয়া পুলিসের 'লোমান্' ও 'চার্লস টেগার্ট'। লোমান্ ও টেগার্ট সাহেবের কথা বাংলা দেশের লোক আজো ভুলিয়া যায় নাই বোধ হয়। সাধারণ লোকে ভুলিয়া গেলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ইংরেজী ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের স্মৃতি হইতে মিঃ লোমান্ ও সার চার্লস টেগার্টের কথা সহজে মুছিয়া যাইবার মতো নয়। তবু কাসিমির মন্তেইরোর সঙ্গে এই দুইজন ইংরেজ পুলিস কর্মচারীর তুলনা করিয়া বোধহয় তাঁহাদের প্রতি একটু অবিচার করিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ আমাদের সঙ্গে এককালে এই দুইজনের যত বিবাদই থাকিয়া থাকুক, দুজনেই শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন। পুলিসের চাকুরী নিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া নিজেদের দায়িত্বজ্ঞান এবং ইংরেজ-সুলভ দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ অনুযায়ী নিজের নিজের কাজ করিয়া গিয়াছেন। সেই কর্তব্য প্রতিপালন করিতে গিয়া বাংলা দেশের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে বহুবার তাঁহাদের সংঘর্ষ হইয়াছে। ১৯১৬ সালে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় 'বীরেন দা' (অনুশীলন সমিতির খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মী শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) জিজিউৎসু-র প্যাঁচ কষিয়া লোমানের ডান হাতটি

ভাঙিগয়া দিয়াছিলেন। টেগার্ট যখন পুলিসের ইন্সপেক্টর মাত্র ছিলেন তখন বুড়ীবালাম নদীর ধারে জংগলের ভিতর বাঘা যতীনের সংগে তিনি পুলিসের তরফে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন। পুলিসের গুলীতে আহত যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে পিপাসার্ত হইয়া একটু জল চাহেন। টেগার্টই ছুটিয়া গিয়া পুকুর হইতে টুপিতে করিয়া জল নিয়া আসিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর বীর শত্রুর প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত-ভাবে সামরিক কায়দায় সম্মান দেখাইতে এই ভদ্র ইংরেজ যুবকের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। ১৯৩০ সালে পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোমান্ সাহেব 'বেঙগল ভলাণ্টিয়ার্স'-এর বিনয়-বাদলের গুলীতে ঢাকায় নিহত হন। টেগার্টের উপরেও এই সময়ে বোমা পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও মিঃ লোমান্ ও সার চার্লসের সংগে যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ কখনো হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন যে, জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের কাজে 'ডাণ্ডা' প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত এই দুইজন দুঁদে ইংরেজ অফিসার কোনো সময়েই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে বিপ্লবীদের বা জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে বা তাঁহাদের সংগে কথাবার্তা বলার সময় সাধারণ ভদ্রতা করিতে কোনো সময় কার্পণ্য করেন নাই। মন্তেইরোকে ঠিক তাঁহাদের পাশাপাশি তুলনা করিতে গিয়া তাই মনে মনে একটু দ্বিধা বোধ করিতেছি। মন্তেইরো পদমর্যাদায় নিশ্চয়ই তাঁহাদের চেয়ে অনেক নীচে কিন্তু গোয়ার ভিতরে নিছক ফ্যাসিস্ট ধরনের সাডিস্ট (Sadist) অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে বাংলা দেশে লোমান্-টেগার্ট-এণ্ডারসনদের অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। গোয়াতে মন্তেইরো কেন, পুলিসের অন্য কেহ আমার উপর কখনো মারধোর করে নাই। তবু আমি দিনের পর দিন চোখের সামনে যাহা দেখিয়াছি এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা শুনিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। গোয়াতে এই সময় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বন্দী ও সত্যাগ্রহীদের উপর যে অমানুষিক ও নৃশংস অত্যাচার হইতেছিল তাহার জন্য প্রধানত দায়ী ছিল গোয়ার গোয়েন্দা পুলিসের আজেন্ত কাসিমির মন্তেইরো এবং লিস্‌বন হইতে আগত 'পিদে'-র (Pide) ইন্সপেক্টর অলিভেইরা। অলিভেইরার সম্পর্কে তাহার অত্যাচারের কীর্তি কাহিনী ছাড়া আর কিছু জানি না। কিন্তু মন্তেইরো সম্পর্কে কিছু কিছু জানি। সে কথা এখানে বলার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি এইজন্য যে, তাহা না জানিলে গোয়াতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মুক্তিযোদ্ধারা কি ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে তাহা ঠিক ঠিক বোঝা যাইবে না। আর তাহা না জানিলে ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ কি এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে ডাঃ সালাজারের Estado Novo বা Corporative State-এর স্বরূপ কি সে সম্পর্কে যথাযথ ধারণা হইবে না। মন্তেইরো গোয়া পুলিসের লোক, খাস পর্তুগালের পুলিস বাহিনীর, কিংবা 'পিদে' বা সিকিউরিটি ফোর্সের লোক নয়। এখানে গোয়ার ভিতরে তাহার ক্ষমতার পরিমাণ কি তাহার আন্দাজ দিবার জন্য তাহাকে গোয়া পুলিসের টেগার্ট-লোমান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তাহার চেয়ে 'পিদে'র লোকেদের ক্ষমতা বেশি ছিল নিশ্চয়ই—কিন্তু সে নিজে মিস্তী বা ফিরিংগী ইন্দো-পর্তুগীজ বলিয়া, এবং বহুদিন ধরিয়া গোয়াতে ছিল বলিয়া, 'পিদে' এবং সিকিউরিটি পুলিসের কর্তারা পর্তুগীজ গোয়া সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী, পুলিস কম্যাণ্ডাণ্ট এবং স্বয়ং গভর্নর জেনারেল বের্নার্দ গেদীস্ সাহেব নিজে, মন্তেইরোর উপরেই নির্ভর করিতেন বেশি। এক কথায় গোয়াতে

সালাজারী শাসনের যোগ্য প্রতিনিধি বা প্রতীক কাসিমির মন্তেইরো; গোয়াতে সালাজারী রাজ মানে মন্তেইরো রাজ।

বিরোন্দে' ফাঁড়িতে সেদিন মাপ্সা পুলিসের কম্যাণ্ড্যাণ্টের মুখ হইতে মন্তেইরো-র নাম একবার শুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু শুনিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কারণ, মন্তেইরো কে এবং কি, কিছুই তখনো পর্যন্ত জানিতাম না। বিরোন্দে' আউট পোস্ট হইতে ওয়েপন কেরিয়ারে করিয়া আমাদের ওয়াল্পই আনিয়া ফেলিতে পুলিসের বেশি সময় লাগে নাই; আধঘণ্টাখানেক হইবে। ওয়াল্পই আনিয়া আমাদের থানার বারান্দায় পুলিস পাহারায় বসাইয়া রাখা হইল। আমরা চারজন ছাড়া—অর্থাৎ আমি নিজে, ভগৎ তুলসী রামজী, নিতাই গুপ্ত এবং নাসিকের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছেলেটি ছাড়া—অন্য সকলে দেখিলাম ট্রাকে করিয়া আমাদের আগেই আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদেরকে আর নামিতে দেওয়া হয় নাই; তাহাদের সাতচল্লিশজনকেই ট্রাকের উপর বসাইয়া রাখিয়া চারিদিক হইতে সংগীন-উঁচানো রাইফেলধারী সৈনিক পাহারা দিতেছে। সেইখানে বারান্দায় আমরা বসিয়া থাকিতে থাকিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। মনে মনে অধৈর্য হইয়া উঠিতেছি, যদিও সত্যাগ্রহীদের অধৈর্য হইতে নাই। দুদিন শরীরের উপর দিয়া যা ধকল গিয়াছে, তাহাতে হাত পা টান করিয়া কোথাও শুইয়া পড়ার ইচ্ছা হইতেছে। অথচ রকম সকম দেখিয়া মনে হইতেছে এ জায়গাটা আমাদের রাতের আস্তানা হইবে না—এটা পথের মধ্যে একটা ওয়েটিং স্টেশনের মতো। আমাদের ভলাণ্টিয়ার ভর্তি ট্রাক, যে ওয়েপন কেরিয়ারে করিয়া আমাদের আনা হইয়াছিল, সেটি, আমাদের প্রহরী সৈন্য ও পুলিসের দল সবাই যেন আবার কোথাও রওনা হইয়া যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অথচ যেন একজন কাহারো নিকট হইতে একটা হুকুম পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু হয় লোকটি নাই কিংবা হুকুম দিতেছে না। বিরোন্দে'র নদীর ওপারে সেই যে মোটা বেঁটে ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক আমাদের গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন তিনি এবং তাঁহার গোয়ান যুবক সংগী, তার দোনলা বন্দুকটি লইয়া, এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছেন। কেহই যেন কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় থানার ভিতর ঘর হইতে গম্ভীর জোরালো গলায় কে যেন পর্তুগীজ ভাষায় কি হুকুম করিল। একজন ইন্ডো-পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী জাতীয় লোক ভিতর হইতে আসিয়া প্রথমে নাসিকের ছেলেটিকে ইশারায় তাহার সঙ্গে আসার জন্য বলিল। কিছুক্ষণ পরে, বোধহয় মিনিট দশেক হইবে তাহাকে আবার ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছুটা দূরে বসাইয়া রাখিল। তাহার পর তুলসী রামজীর ও নিতাই গুপ্তের ডাক পড়িল। বুঝিলাম এবার দ্বিতীয় দফা জেরার পালা চলিবে—ভিতরে বোধহয় 'রক্ত করবী'-র রাজার মতো রহস্যময় কেহ বসিয়া আছে; এবারকার জেরার মালিক সে। তুলসী রামজীকে ফিরাইয়া আনিয়া নাসিকের ছেলেটির পাশে বসাইয়া রাখা হইল; নিতাইয়ের বেলাতেও তাহাই ঘটিল। সবার শেষে ডাক পড়িল আমার। ঘরের ভিতর যাইতে দেখি একজন লম্বা শক্ত চেহারার জোয়ান গুণ্ডা গোছের লোক একটি টেবিলের ধারে পায়চারি করিতেছে; হাতে পাইপ টেবিলের উপর একটি মদের গেলাস। অবশ্য এ কথা শুনিয়া কেহ ভুল ধারণা করিবেন না। পর্তুগীজরা জাত হিসাবে খুব ইন্ফর্মাল; ইংরেজদের মত নয়; আর মদ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব আমাদের চা খাওয়ার মতো। যখন তখন, যেখানে সেখানে অন্তত এক কাপ চা খাওয়া যায়। পর্তুগীজদের মধ্যেও কেহ কাহারো বাড়িতে গেলে এক গেলাস

মদ খাইতে বলা, পথে ঘাটে তৃষ্ণা বোধ করিলে পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া একটু বিয়ার বা জিন্ দিয়া গলা ভিজাইয়া নেওয়া মোটেই দোষের নয়। গোয়াতে পুলিস হেড-কোয়ার্টারে যেখানে সেখানে, যখন তখন পুলিসের বা পুলিস কর্মচারীদের মদ খাইতে দেখিয়াছি। হাজতের সামনে টুলে বসিয়া সিপাহী পাহারা দিতে দিতে, হয়ত তাহার ভাল লাগিতেছে না, একঘেয়েমি কাটানোর জন্য ক্যানটিন (পাঞ্জিমের পুলিস হেড-কোয়ার্টারে একটি ক্যানটিন ও স্টোর আছে) হইতে কাহাকেও দিয়া বিয়ার আনাইয়া নিল; তার পর যতক্ষণ সে সেখানে থাকিবে মধ্যে মধ্যে এক আধ ঢোক খাইবে। তাহাতে পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষ বা গোয়াতে কেহই খুব দোষের কিছু দেখেন না। গোয়াতে মদ 'সুলভ' ও সস্তাও বটে। বিরোন্দে'তেও দেখিয়াছিলাম মাপ্সার ডেপুটি কম্যান্ডান্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অফিসারেরা দৌড়াইয়া নিজেদের গাড়ি হইতে মদ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। পোর্ট মদের জন্য পর্তুগাল প্রসিদ্ধ; তাহার খাস কলোনী গোয়াতে পর্তুগীজ অফিসারদের মধ্যে মদের চলন একটু বেশি থাকিলে, তাহাদের নিজস্ব মাপকাঠি দিয়া বিচার করিয়া তাহাদের খুব দোষারোপ করা চলে না। এই লোকটিও—অর্থাৎ ভিতরে যাহার সামনে আমায় আনা হইল—মধ্যে মধ্যে গেলাস হইতে মদ খাইয়া নিতেছিল বটে; কিন্তু মোটেই মাতাল বা পানোন্মত্ত অবস্থায় ছিল না। পাইপ-ই টানিতেছিল বেশি। পরনে একটা ঢোলা ধরনের খাকী ট্রাউজার যাকে ট্রাউজার বলা যায়; গায়ে একটা আধ-ময়লা খাকী হাফ শার্ট। পায়ে একটা স্যান্ডাল জাতীয় কিছু; তাহাকে দেখিয়া কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া মনে করা কঠিন। অথচ তাহার চাল-চলনে, কথাবার্তায় বেশ একটু কর্তৃত্ব-সুলভ আত্মবিশ্বাস এবং রাসভারি ভাব আছে। তাহা হইতে তাহাকে একেবারে নগণ্য বলিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না। আমি ঘরে ঢুকিতেই হঠাৎ পায়চারি থামাইয়া দু' হাত দুদিকে মাজার উপরে রাখিয়া—যাহাকে ইংরাজীতে বলে 'আর্মস্ এ্যাকিম্বো' সেইভাবে হাত রাখিয়া—একটু সম্মুখে ঝুঁকিয়া 'বাও' করার অভিনয় করিয়া উপহাসের সুরে বলিল—

"So Mr. Chaudhuri, the great heroic M.P. from India, you have come at last? Welcome!"
("অবশেষে, ভারত পার্লামেন্টের বীর সদস্য মিঃ চৌধুরী আপনি আমাদের দেশে আসিতে পারিয়াছেন? স্বাগতম্!")।

"Say Mr. Chaudhuri! Why did you prove so troublesome! We have been anxiously waiting to accord you a hearty welcome for the last two days! Why did you not turn up yesterday? Anmode is not so for off?"
("মিঃ চৌধুরী আমাদের মিছামিছি এত কষ্ট দিলেন কেন আপনি? আমরা আপনার অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দু'দিন ধরিয়া এখানে অপেক্ষা করিতেছি! কাল দেখা দিলেন না কেন? অন্মড্-তো এখান হইতে এত দূরে নয়?")।

গড় গড় করিয়া লোকটি অনর্গল ইংরাজী বলিয়া যাইতেছে, বোম্বে অঞ্চলের ফিরিঙ্গীদের মতো ইংরাজী কথার উচ্চারণ। তাহার 'ডোন্ট কেয়ার' বা 'ডেয়ার ডেভিল' ধরনের ভাবসাব দেখিয়া কতকটা তাহার আমাকে ব্যঙ্গ করার চেষ্টার ফলে অপেক্ষাকৃত লঘু আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়াতে আমিও তাহারই মতন সুরে উত্তর দিলামঃ

—"হাঁ আসিয়াছি। তবে আমি তো আশা করিতেছিলাম যে আপনারা বর্ডারের উপরেই আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য হাজির থাকিবেন। কিন্তু সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া হতাশ হইয়া দু'দিন ধরিয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে আসিতেছি। কাজে কাজেই একটু দেরী হইয়া গেল।"

"ওহ্! তাই নাকি? তবে তো আপনাদের বড় কষ্ট হইয়াছে! আহা হা! যাই হোক, বিরোন্দে'তে আমার লোকেরা নিশ্চয়ই আপনাদের যথাযোগ্য সমাদর করিতে কোনো ত্রুটি করে নাই?"

—"না, না, সকলেরই অভ্যর্থনা ভালোভাবে হইয়াছে। অবশ্য আমাদের দলে মেলা লোক ছিল বলিয়া ঠিক আমার দিকে ততো নজর দিতে পারে নাই। তবে অন্যদের যা যা পাওনা ছিল ঠিকই পাইয়াছে; ক'জনের মাথা, হাত-পা ভাঙিয়াছে। আমি তো ভাবিয়াছিলাম আপনারা বুলেট দিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিবেন।"

—"ওহ্, বড় বাড়াইয়া বলিতেছেন। আপনাদের জন্য এত কিছু করিতে পারি নাই আমরা? বলুন তো ইংরেজরা আপনাদের সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে আমরা যেভাবে ব্যবহার করিতেছি, তাহা হইতে অন্য কোনরকম কিছু করিত?"

পর্তুগীজদের মনের এইটা একটা দুর্বল বিন্দু। বিশেষ করিয়া গোয়ার পুলিস ও সরকারী কর্মচারীদের সকলের বিশ্বাস বৃটিশ আমলে ইংরেজরা ভারতবর্ষের লোকেদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিত, পর্তুগীজদের ব্যবহার তাহার চেয়ে অনেক ভালো। ইংরেজরা সত্যাগ্রহী ও রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের দমননীতির প্রয়োগ করিত বা মারধোর করিত গোয়াতে সেই তুলনায় তাহারা কিছুই করিতেছে না। এটা খালি প্রচারের জন্য নয়। পর্তুগীজরা কতকটা ইহা বিশ্বাসও করে। নানান ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজদের প্রভাব পর্তুগীজদের উপর বেশি। মধ্যযুগ হইতে স্পেইনের বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেন এবং স্পেইনের প্রতিবেশী পর্তুগালের মধ্যে মিতালী গড়িয়া ওঠে এবং তখন হইতে ইংলণ্ড ও পর্তুগালের মধ্যে নানারকমের আদানপ্রদানের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজদের সঙ্গে তাহারা নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচি, ফ্যাশন সব কিছুর তুলনা করিতে ভালবাসে। খালি বৃটিশ পদ্ধতির পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের কথা উঠিলেই তাহারা একটু বিরত বোধ করে। পর্তুগীজদের মধ্যে যাহারা একটু খোলাখুলিভাবে কথা বলে, তাহারা বলে—"ডেমোক্রেসী আমাদের দেশের (অর্থাৎ পর্তুগালের) অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না।" এই সব লোক অন্তত পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে। অন্যেরা বলে আমাদের 'ইস্তাদু নুভো' (সালাজারী শাসনব্যবস্থার সরকারী নাম) পার্লামেণ্টারী প্রথার চেয়ে অনেক ভালো।* পর্তুগীজদের সাম্রাজ্য শাসনের আদর্শ ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ

---

* ডাঃ সালাজার ১৯২৭ সালে পর্তুগালের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৩২ সালে পর্তুগালের সর্বময় কর্তা হন। এই সময় হইতে পর্তুগালে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙিয়া দেওয়া হয়, খালি সালাজারের 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' ছাড়া। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প ও কৃষি উৎপাদনকে মালিক ও সরকার-নিযুক্ত শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়া (ইতালীতে মুসোলিনী আমলের ফ্যাসিস্ট কর্পোরেটিভ ব্যবস্থার অনুকরণে) এক একটি 'করপোরেশনে'র অধীনে সংগঠিত করা হইয়াছে। এই 'করপোরেশন'গুলি শ্রমিক মালিক বিরোধের মীমাংসা করে, মজুরীর ও বেতনের হার ঠিক করিয়া দেয়। 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' ভিন্ন অন্য কোন দল পার্লিয়ামেণ্টের

সাম্রাজ্যবাদ। সালাজার নিজে অবশ্য মনে করেন, এখন ইংরেজদের 'পতন' হইয়াছে, 'চারিত্রিক' অবনতি ঘটিয়াছে। পৃথিবীতে ইউরোপীয় খৃষ্টীয় সভ্যতার 'মিশন' ভুলিয়া ইংরেজরা নিজের সাম্রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে পিছু হটিয়া আসিতেছে এই চারিত্রিক অবনতির দরুণ। কিন্তু তবু সাধারণ পর্তুগীজ শিক্ষিত ভদ্রলোকরা সকল বিষয়ে ইংরেজরা কি করে বা না করে, অথবা অতীতে কি করিয়াছে বা না করিয়াছে সকল সময় তাহার তুলনা দেয়। গোয়ার পর্তুগীজরা তো পদে পদে এই ধরনের তুলনা করিয়া নিজেদের কাজের পিছনে নৈতিক সমর্থন খুঁজিতে বিশেষ অভ্যস্ত। পর্তুগীজ উপনিবেশ হইলেও গোয়া এতদিন ভারতের বুকে বৃটিশ রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় ছিল বলিয়া এটা হইয়া থাকিবে।

আমার কাছে লোকটি হঠাৎ এ প্রশ্ন করিয়া বসিবে, তাহার জন্য তৈরী ছিলাম না। পর্তুগীজদের তুলনায় ইংরেজ আমলের পুলিস ভালো ছিল তাহা ইহার কাছে বলা সংগত হইবে কিনা জানি না। আমি কথা এড়াইয়া উত্তর দিলাম—"Comparisons are odious" ("তুলনা করা ভালো নয়")।

কিন্তু সে ছাড়িবে কেন? আমার কাছে আসিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলঃ

"তুমি বোধহয় মনে করিতেছ, আমি কিছু জানি না! আমি সব কিছু জানি। বোম্বাই. দিল্লী সব কিছু আমার দেখা আছে।" হঠাৎ বেশ ভালো হিন্দীতে দু'বার জোরে জোরে বলিল—"ম্যয় বম্বই থা! জান্‌তে হো, ম্যয় বম্বই থা! ম্যয় সব কুছ দেখা, সব্ কুছ দেখা।" তারপর আবার ইংরাজীতে—"বিয়াল্লিশে (১৯৪২) কি হইয়াছে আমি সব জানি। ইংরেজদের রাজত্বে তোমরা এইভাবে বাহির হইতে আসিয়া গণ্ডগোল বাধাইতে চাহিলে ইংরেজরা তোমাদের 'লিঞ্চ' করিত। জানো 'লিঞ্চ' করিত (পোড়াইয়া মারিত; ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিত)। পণ্ডিত নেহরু খুব চালাক! তোমাদের উপর আমরা গুলী চালাই, আর তখন তিনি সেই অজুহাতে গোয়া কাড়িয়া লইবেন! আমি থাকিতে তাহা হইবে না!"

আমি উত্তরে বলিলাম—"আপনি ভুল করিতেছেন, পণ্ডিত নেহরু আমাদের পাঠান নাই। আমি পার্লিয়ামেণ্টে পণ্ডিত নেহরুর বিরোধী দলের লোক"।

—"আমি ওসব চালাকি বুঝি। তোমাদের দেশে এত সমস্যা আছে, তোমাদের দেশে এত বেকারী, এত খাদ্যসংকট, এত গণ্ডগোল সেসব ফেলিয়া তোমরা গোয়াতে আসিতেছ কেন, আমি তাহা বুঝি না?"

ততক্ষণে লোকটি খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, পায়চারী থামাইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর কর্কশ গলায় চীৎকার করিয়া কথা বলিতেছে, টেবিল চাপড়াইতেছে। কিন্তু আমাকে মারধোর করিতে চায় বলিয়া বোধ হইতেছে না। অথচ মারধোর যদি করিতে চায়, তাহার আকার-প্রকার সাইজ দেখিয়া উপযুক্ত লোক বলিয়াই মনে হইতেছে। ফিরিংগীদের মতো ফর্সা-হলদে গোছের রং, কানের কাছে নামানো ল্যাটিন ধরনের জুল্‌ফি। মনে মনে চিন্তা করিতেছি লোকটা কে? ওয়াল্‌পই থানার অফিসার ইন্‌চার্জ কি? অথচ কথাবার্তার ধরনে মনে হইতেছে একটু উঁচুদরের দায়িত্ব ও পদমর্যাদায়

নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারে না। সংক্ষেপে ইহাই হইল সালাজারের 'ইস্তাদু নুভো'—Estado Novo বা New State—নবীন বা নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, নয়া রাষ্ট্র।

প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাশালী লোক। কিন্তু বেশভূষা একেবারে গরীব লোকের ধরনের। আমি তখনো পর্যন্ত জানিতাম না, এই ব্যক্তিই কাসিমির মন্তেইরো; কাসিমির মন্তেইরো কে, তাহাও জানিতাম না।

গোয়ায় সালাজারী সাম্রাজ্য শাসনের নীতির স্বরূপ এবং কতকটা সালাজারী রাজনীতির আসল স্বরূপ বুঝিতে হইলে মন্তেইরোর পরিচয় কিছুটা দরকার। মন্তেইরোর কথা উপরে দু'একবার বলিয়া আসিয়াছি। লঞ্চে করিয়া টেরেখোল দুর্গের সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করার কাহিনী প্রসঙ্গে এবং ১৯৫৪ সালে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্বিকার দমননীতি প্রয়োগের অন্যতম নায়ক হিসাবে মন্তেইরোর নাম পাঠকদের কাছে করিয়াছি। মন্তেইরো তখন ছিল গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা; 'Agente' (আজেন্ত) পদে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টরদের উপাধি 'Chefe' (শেফ); 'আজেন্ত' পদের মর্যাদা বা দায়িত্ব আইনত 'শেফ'দের চেয়ে বেশি কিনা জানি না। গোয়ার পর্তুগীজ সরকারের ইংরেজী 'ইন্‌ফরমেশন বুলেটিনে' মন্তেইরোর নাম ইন্সপেক্টর মন্তেইরো নামে উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু পদমর্যাদা যাহাই হোক পুলিস হেড-কোয়ার্টারে 'পিদে'র আলিভেইরা ছাড়া তাহার চেয়ে প্রতাপান্বিত কাহাকেও দেখি নাই। মন্তেইরো সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে যখন জানিতে পারিলাম, তাহার ব্যক্তিগত ইতিহাস জানার একটা আগ্রহ আমার মনে জাগে। মন্তেইরো ১৯৫৪ সালের গোড়াতেও পুলিস বিভাগের কর্মচারী ছিল না। তখন সে কয়েকটা ম্যাঙ্গানিজ খনি (গোয়াতে কিছু ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার খনি আছে) লীজ নিয়া ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির ব্যবসা করিত এবং ম্যাঙ্গানিজের বাজার দরে মন্দা পড়ায় আর্থিক দিক দিয়া কিছুটা দুরবস্থার মধ্যে ছিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিত 'mineiro' (খনির মালিক, খনির কাজ-কর্মে লিপ্ত লোক)। তাহার নিজের কয়েকটি ট্রাক ছিল; খনির ব্যবসা মন্দা হইয়া যাওয়ায় ট্রাক ভাড়া খাটাইয়া মাল বহার কাজ করিয়া কোনমতে দিন চালাইতেছিল। আগেই বলিয়া আসিয়াছি, পুলিস ইন্সপেক্টরের চাকুরি কেন, সাধারণ পুলিস সার্জেন্টের চাকুরি পর্যন্ত পর্তুগালের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কাছে লোভনীয় চাকুরি। কিন্তু তাহাদের মতো সামাজিক মর্যাদা কিংবা শিক্ষাদীক্ষা মন্তেইরোর ছিল না। মন্তেইরো খাস পর্তুগীজ নয়, 'মিস্তো' বা ফিরিঙ্গী পর্তুগীজ গোয়ানীয়। তাহার পিতামাতা কি করিতেন কেহ বলিতে পারে না। তাহার মা গোয়াতেই থাকিতেন; কয়েক বছর আগে মারা গিয়াছেন।

১৯৫৩-৫৪ সালে গোয়াতে যখন নূতন করিয়া রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন দেখা দিল, তাহাতেই মন্তেইরোর ভাগ্যের মোড় ফেরে। তখন গোয়ার ও পর্তুগীজ ভারতের পুলিস কমান্ডান্ট ক্যাপ্টেন রুশা নামে একজন লোক। জেনারেল পাউলো বের্নার্দ গেদীস গভর্নর-জেনারেল হইয়া গোয়ায় আসার পূর্বে রুশা গোয়ার হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল, একথা বলা যায়। রুশাও আর এক ভাগ্যানুসন্ধানী এডভেঞ্চারার। স্পেনে যখন পর্তুগাল হইতে ফ্রাঙ্কোর জন্য লড়াই করিতে যাহারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে স্পেনে গিয়াছিল, রুশা তাহাদের মধ্যে একজন ছিল। মন্তেইরো কি করিয়া রুশার নজরে আসে বলা শক্ত। কিন্তু রুশাই যে তাহাকে প্রথমে পুলিসের গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডঃ সালাজার খাস পর্তুগালে এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ('Union Nacionale' ('জাতীয় ঐক্য সমিতি') নামে যে দল চালান—পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে এই একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্য সমস্ত দল বে-আইনী—রুশার পরামর্শে সে তাহাকেও

দেখা দেয়। মোগলেরাও এই সময়ের পাশে আছেন; আর্মেনীয়রা বরাবর দূতের হিসাবে দেখা দেয়। এর সম্ভাবিত পাইওনিয়ারের মধ্যে দিল্লীর হইতে আসিয়া দাঁড়ায় দাঁড়ায় জাহাঙ্গীরের আমলে আগ্রায় সুবাদারীর কথা চিন্তা করিতে পারেন, তখন সুদ্দা আর্মেনীয়দের দূতের হিসাবে পাইওনিয়ারের পিছনে লাগে। ইহার আগের ইতিহাসও বিস্তৃত আছে। সুরাটের মধ্য—কোম্পানির ১৬৮৮ সালের আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে—সে বিস্তৃত কোম্পানী শহরে পর্তুগীজদের ব্যবসায়ের কাজ করে। তবে আর্মেনীয়রা সবাই ছিল তাহা বলা যায় না। আর্মেনীয়রা নিজে দাবী করে যে খ্রীষ্টান হইয়া আর্মেনিয়ানদের উপর হিসাবে দিয়াছিল এবং সেখানে লড়াই করিয়াছে। কিন্তু তাহা কেমন সময় বা কি প্রকৃতি নিয়া তাহা বলা কঠিন। সাধারণ অর্থেরও কোম্পানী জাহাঙ্গীরের নামে, আর্মেনীয়রা বিস্তৃত সম্বন্ধে একটি ছোট বসতিস্থানের পোত্তন করিয়াছিল। কোথায় সেটা হইতে সুরাটের কোম্পানী বিভাগ এবং বোম্বাই পর্তুগীজ "ইন্ডিয়ান এম্পিরিয়াল"-এর দূতের হিসাবে যে উপাধি লোক হাজারী করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্মেনীয়রা যে বিভিন্ন সময়ে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সে অঞ্চলে হিন্দী-হিন্দুস্থানী, ইংরেজী, মারাঠী ও কোঙ্কণী ভাষায় কথা বলিতে পারিত দেখিয়াছি।

। ১৫ ।

আরো আর্মেনীয়া সংবাদ

এ দেশ আর্মেনীয়রা কিভাবে ক্রমে ক্রমে গোয়া পর্তুগীজদের গোয়েন্দা বিভাগের সর্দার কর্তা হইয়া দেখা দিল, সে কাহিনী বিস্তৃত বিভিন্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু গোয়াতে আপাতকারী শাসনের সম্বন্ধে জানিলে তাহা খুব বিভিন্ন বলিয়া মনে হইবে না। তার শাসনকালের শাসনকে আমরাপক্ষরে কাহিনী আমরা বলিয়া উল্লেখ করা হয় বটে; আমিও তাহা করিয়াছি। কিন্তু খাঁটি 'কাহিনী' হিসাবে দিয়া ইহার সম্বন্ধে সম্যক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যায় না। পর্তুগাল বা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের যে কোনো অংশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মনে রাখা দরকার যে, পর্তুগাল জার্মানী, ফ্রান্স বা ইতালীর মত অতখানি বিশেষভাবে দেশ নয়। তাহার কাল্পনিক সংখ্যায় ও স্বাধীনতাকে প্রাধান্যের ভূমিকাটি ও তাহা সাম্রাজ্যবাদিতার শাসিত দেশ। এদিক দিয়া পর্তুগাল দেশকের তেমনও অন্যান্য বলা যায়। ফ্রান্সের দেশের অপেক্ষাকৃত অন্যান্য জাতির প্রাধান্যগুলির মধ্যে ছিলেন বলিয়া আমেরিকার শাসন, নিকারাগুয়া ইত্যাদিরাজ, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যে পর্তুগালের ছিল শ্রেণী। এমন কি যে ব্রাজিল একসময়ে পর্তুগীজ উপনিবেশ হিসাবে ছিল, তাহার মধ্যে তুলনাতেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া পর্তুগালকে অন্যতম দেশ বলা চলে। যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে পর্তুগাল দুনিয়া ইউরোপের আগেও ছোট ছোট শক্তি ছিল, একসময় পর্তুগাল যে এক পর্তুগাল নয়, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। ১৬৬১ সালে পর্তুগালের রাজকন্যা উদ্ধার হইয়া গোয়াও আন্তর্জাতিক সমাজক বাঁচাতে আমরা যা বুঝি, তাহা পর্তুগালের কোম্পানিদেরই আমলাতন্ত্রের

গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ১৯১১ সাল হইতে ১৯২৬-২৭ সাল পর্যন্ত সেখানে সাধারণতন্ত্রের নামে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই তিনটি অভিজাত রাজনৈতিক চক্র এবং মিলিটারী জেনারেলদের যৌথ আধিপত্য চলে। মিলিটারী জেনারেল বা সামরিক বাহিনীর নেতাদের আধিপত্য ও প্রভাব প্রায় পূর্বের মতই অব্যাহত আছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে দুই তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাত চক্রের বদলে ডাঃ সালাজারের হাতে। অভিজাত জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর সমর্থনে সালাজারের 'ইউনিয়ন নাসিওয়াল' এবং মিলিটারী বিভাগের সেনাপতিদল এই দুই প্রধান শক্তি এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সালাজার নিজেও রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যে বিশ্বাস করেন; যদিও বর্তমানে পর্তুগীজ রাজবংশের কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকায় রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া পর্তুগালে রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র চলিতেছে, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। গণতন্ত্রের সহজ বিকাশের কোনো পথ সালাজার খোলা রাখেন নাই। একদিকে মিলিটারী বা সৈন্যদলের জোরে আর অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট কায়দায় সমস্ত রকমের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমাইয়া রাখিয়া, আজ সাতাশ আঠাশ বছর ধরিয়া সালাজারের একচ্ছত্র শাসন চলিতেছে। কিন্তু সালাজারী ইস্তাদু নুভোর এই গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিস্ট স্বরূপের সঙ্গে, সামন্ততান্ত্রিক ধরনের ঢিলা ঢালা-পনা, দক্ষিণ আমেরিকা-সুলভ ল্যাটিন-আমেরিকান ধরনের রাজনৈতিক গুণ্ডাবাজী বা 'club-rule'-ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া আছে। আর এসবের সঙ্গে জড়াইয়া আছে মন্ত্রীদের, সালাজারের অনুগ্রহভাজনদের, বড় বড় সরকারী কর্মচারী এবং পুলিসের বড়কর্তাদের ভিতর অনুগত ও আত্মীয় পোষণের ঐতিহ্য। যে যেভাবে পারে, পাঞ্জিম হইতে লিসবন পর্যন্ত সরকারী মুরুব্বিদের ধরিয়া তাহাদের সাহায্যে চাকুরী-বাকুরী বা অন্য ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাকড়াও করার চেষ্টা করে। এ রেওয়াজ খাস পর্তুগালে, আফ্রিকায় আংগোলা এবং লোরেঞ্জো মার্কয়েস-এ এবং গোয়ায় সর্বত্র একইভাবে প্রচলিত আছে।

বলা বাহুল্য, অজ্ঞাতকুলশীল মন্তেইরোর পক্ষে প্রথম গোয়াতে আসিয়াই চট করিয়া এইরকম কোনো সরকারী মুরুব্বী পাকড়াও করা খুবই মুশকিল ছিল। অথচ তখন তাহার ম্যাঙ্গানিজ খনির ব্যবসার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। যে কোনো মতে হোক একজন 'পাদ্রোঁ' (Padron, Parton, বা boso; মুরুব্বি boss) খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিজের জন্য একটা ধান্দা না করিয়া নিতে পারিলে খুবই মুশকিল হইবে। ভাগ্যান্বেষী মন্তেইরো উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে পলিটিকসের পথ নিল। অবশ্য সালাজারী রাজত্বে পলিটিকসের রাজপথ একটাই—'ইউনিয়ন নাসিওনাল'। 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' ছাড়া পর্তুগালে বা সারা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নাই, কোনো দলকে থাকিতে দেওয়াও হয় না। গোয়াতেও অনেক দিন ধরিয়া 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র একটা শাখা অফিস ছিল। কিন্তু সেটা নিতান্তই নিয়মরক্ষা গোছের ব্যাপার ছিল। তাহার কোনো সত্যকার তোড়জোড় বা 'ধার' বলিতে কিছু ছিল না।

গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে 'রানে'দের শেষ বিদ্রোহ হয় ১৯১৩ সালে। তাহার পর ধীরে ধীরে গোয়া ঝিমাইয়া পড়ে। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে পর্তুগালী রাজনীতির দ্রুত পট পরিবর্তন, ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত জেনারেল কারমোনা আর সালাজারের যৌথ ডিক্টেটরশিপ, এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল কিছুতেই গোয়ার অলস মন্থরপ্রবাহ জীবনে বিংশ শতাব্দীর গতিবেগ সঞ্চারিত হয় নাই। কোঙ্কন উপকূলের

জোলো আবহাওয়ার ভিতর নারিকেল আর আমের বাগান ঘেরা ভিলায় দুপুরের খানা সারিয়া নিরুদ্বেগে একটু 'সিয়েস্তা' উপভোগ করা; তারপর ঘুম হইতে উঠিয়া বিকাল ক্রমে ক্রমে যখন সন্ধ্যার মধ্যে স্তিমিত হইয়া আসিবে, তখন সমুদ্রের ধারে একটুখানি পায়চারি করিয়া ক্লাবের পথে পা বাড়ানো—এই ছিল গোয়ার রাজকর্মচারীদের জীবনের সাধারণ রুটিন। ১৯৪৫-৪৬ সালে সেই রুটিনে আবার ঝাঁকুনি লাগে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে। গোয়ার বাহিরের পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু হোক না কেন, গোয়াতে কিছু হইবে না; গোয়ার জীবনের ধীর মন্থর গতি কিছুতেই ব্যাহত হইবে না—এই স্থির বিশ্বাসে ধাক্কা লাগিতেই পঞ্জিম হইতে লিসবন ও লিসবন হইতে পঞ্জিম পর্যন্ত পর্তুগীজ সরকারী মহলে আতঙ্কের মহা হৈচৈ শুরু হইয়া গেল—'সামাল! সামাল! পর্তুগীজ সাম্রাজ্য বিপন্ন! সাম্রাজ্য বাঁচাও।' সেই 'সাম্রাজ্য বাঁচাও' জিগীরের ফলেই গোয়াতে 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'কে শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার আয়োজন হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৯৫১-৫২ সালের পর্তুগীজ পার্লিয়ামেন্টের সাধারণ নির্বাচনে গোয়ার দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে, কি করিয়া 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র বাহিরের একজন নির্বাচিত হইয়া যান। অবশ্য সেই ভদ্রলোককে যে শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ পার্লিয়ামেন্টে আসন গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহা বোধ হয় না বলিয়া দিলেও চলিবে। 'কমিউনিস্ট'* অভিযোগে তাঁহার নির্বাচন নাকচ হইয়া যায় এবং গোয়ার দুইজন প্রতিনিধিই যথারীতি 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' হইতে 'নির্বাচিত' হন। এই রাজনৈতিক অবস্থার ভিতর ১৯৫৩-৫৪ সালে আবার যখন নূতন করিয়া গোয়াতে জাতীয় আন্দোলনের নূতন ঢেউ উঠিল, ভাগ্যান্বেষী মন্তেইরোর সামনে বহু প্রত্যাশিত সুযোগের মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। আর খনির ব্যবসার দরকার নাই; সাম্রাজ্যরক্ষী স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'কে মই হিসাবে ব্যবহার করিয়া এবার নিজের অবস্থা ফেরানো চলিবে!

এই সময় পর্তুগীজ ভারতের পুলিস কমাণ্ডাণ্ট ছিল কাপ্তেন রুম্বা। রুম্বা সাধারণ পর্তুগীজ সৈন্য বাহিনীর 'কাপতেন' পদের লোক ছিল কিনা বলা কঠিন। অনেকে বলে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় পর্তুগাল হইতে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে স্পেনে লড়বার জন্য যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যায়, রুম্বা তাহারই 'কাপতেন' ছিল। অনেকের বিশ্বাস, মন্তেইরোও সেই সময় রুম্বার স্বেচ্ছাসেবক দলে ছিল। কিন্তু যে পন্থায়ই হোক মন্তেইরো গোয়ায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই রুম্বার নজরে পড়ে। অবশ্য দু'জনের মধ্যে কে কাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু টেরেখোল সত্যাগ্রহ এবং দাদরা ও নগর হাভেলীর ঘটনার পর দেখা গেল যে, বোম্বে পুলিসের ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট, আফগানিস্থান সীমান্তে

---

* এ কথাও বোধহয় এখানে বলার দরকার করে না যে, 'কমিউনিজ্‌ম' বা 'কমিউনিস্ট পার্টি'র সঙ্গে এই ভদ্রলোকের ক্ষীণতম কোনো সম্পর্ক ছিল না। গোয়ার ভিতরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কাজ নাই, কোন দিন ছিল না। বোম্বাইয়ের গোয়াবাসীদের মধ্যে অবশ্য দু' একজন কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত লোক যে নাই তাহা নয়। কিন্তু গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা গোয়ার ভিতরে চলতি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই বলিলেও চলে। তবে পর্তুগাল উত্তর আটলাণ্টিক জোট Nato-র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া খুবই 'কমিউনিজ্‌ম' সচেতন। সালাজারের সরকারী মতে যাঁহারা মত দেন না, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সহজ হিসাবে তাঁহারা সকলেই 'কমিউনিস্ট'।

বৃটিশ সৈন্যদলের ট্রাক ড্রাইভার, লণ্ডনের কসাই এবং শেষ অধ্যায়ে গোয়ার ম্যাঙ্গানিজ খনির ইজারাদার কাসিমির মন্তেইরো রুম্বার পৃষ্ঠপোষকতায় ডাঃ সালাজারের 'ইস্তাদু নুভোর' প্রতিভূ হিসাবে হঠাৎ একদিন গোয়ার গোয়েন্দা পুলিসের বড়কর্তা হিসাবে আবির্ভূত হইতেছে; যদিও সে কোনো সময়েই গোয়াতে বা পর্তুগালে কোথাও পুলিস-বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল না। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাহার শিক্ষানবিশী চলিতেছিল, রুম্বার নির্দেশে 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র গুপ্ত রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান সংগঠক হিসাবে। সালাজার রাজত্বে পুলিস বাহিনী এবং সালাজারের দল 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র মধ্যে গণ্ডীর সীমারেখা স্পষ্ট করিয়া টানা সম্ভব নয়।

১৯৫৪ সালের গোড়াতেও মন্তেইরো সরাসরি পুলিস বাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগ দেয় নাই। গোয়ার অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ পুণ্ডলিক গাইটোণ্ডের উপর পুলিস ও 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র তরফ হইতে যাহারা 'স্পাই' বা 'ওয়াচার' হিসাবে নজর রাখার কাজে নিযুক্ত ছিল, মন্তেইরো এবং মন্তেইরোর কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ তাহাদের মধ্যে প্রধান। ইহারা সকলেই এখন গোয়ার গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। ডাঃ গাইটোণ্ডে ইহার কিছুদিন আগে গোয়াতে মুক্তিকামী জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে লিসবন হইতে পাঞ্জিম ফিরিয়া আসেন। ডাঃ গাইটোণ্ডে ডাক্তারী ছাত্র হিসাবে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লিসবনে যান এবং ক্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর সেইখানেই বিবাহ করিয়া প্রাকটিস করিতে আরম্ভ করেন। লিসবনেও দক্ষ সার্জন হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে সস্ত্রীক পাঞ্জিমে আসিয়া সার্জন হিসাবেই প্রাকটিস করিতে থাকেন। যদিও তিনি প্রথমেই কোনো প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভা-সমিতি, আন্দোলন—এসব আরম্ভ করেন নাই। তাহা হইলেও তাঁহার রাজনৈতিক মতামত এবং চলাফেরার ধরনে পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষের সন্দেহ উদ্রেক হয়। কিন্তু তিনি তখন স্বয়ং পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেলের সার্জন ও চিকিৎসক পদে নিযুক্ত। কানাকোনের অতি সম্ভ্রান্ত অভিজাত সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক তিনি। তাঁহার স্ত্রী পর্তুগীজ মহিলা। লিসবনে তাঁহার শ্বশুরও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। সালাজারের লিসবনে এবং লিসবনের চেয়ে বেশি করিয়া গোয়াতে এই সব সম্পর্কের সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত বেশি। পুলিস কম্যাণ্ডাণ্ট ক্যাপ্টেন রুম্বা গাইটোণ্ডেকে নিয়া তাই প্রথম প্রথম একটু মুশকিলেই পড়িয়াছিলেন। সাধারণ লোক হইলে বহু আগেই গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে জেলে পোরা হইত কিংবা আফ্রিকায় নির্বাসনে পাঠানো যাইত। কিন্তু গাইটোণ্ডের মত লোকের বেলায় তাহা করা সম্ভব নয়। কাজে কাজেই তাঁহার উপর নজর রাখার ভার পড়িল মন্তেইরোর এবং 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র গুপ্ত বিভাগের উপর। ডাঃ গাইটোণ্ডে ইতিমধ্যে একবার আসিয়া ভারতবর্ষে ঘুরিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়াও রিপোর্ট আসিয়াছে। কাজে কাজেই রুম্বার নির্দেশে মন্তেইরোর তৎপরতা আরো বাড়িয়া গেল।

অথচ মন্তেইরো তখনো পর্যন্ত পুলিসের লোক নয়। তাহার ম্যাঙ্গানিজের খনির ব্যবসা তখন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ট্রাক চালানোর ব্যবসাও ভালো চলিতেছে না। করিৎকর্মা মন্তেইরো সুযোগ বুঝিয়া 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র অর্থাৎ গোয়ায় ডাঃ সালাজারের দলের কর্মী ও গুপ্ত বিভাগের in-charge হিসাবে তৎপর হইয়া উঠিল। ডাঃ গাইটোণ্ডের গ্রেপ্তারের সময়েও সে পুলিসের আজেন্ত বা গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর পদে

নিযুক্ত হয় নাই। ডাঃ গাইটোণ্ডের গ্রেপ্তারের পর যখন তাঁহাকে পুলিস পাহারায় তাঁহার বাড়িতে আনা হয় (তাঁহার গ্রেপ্তারের কাহিনী আগেই বলা হইয়াছে।) মন্তেইরোও একটি গাড়িতে করিয়া পিছন পিছন আসে। ভারতীয় কন্সাল জেনারেল মিঃ কোএলহো'র স্ত্রী, মিসেস গাইটোণ্ডের বন্ধু। তিনি খবর পাইয়া দেখা করিতে গাইটোণ্ডের বাড়িতে আসেন। তাঁহার অপরাধের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে ফিল্‌ম তোলার ছোট একটি মুভি ক্যামেরা ছিল। মিসেস কোএলহো গাড়ি হইতে নামিয়া গাইটোণ্ডেদের বাংলোর কম্পাউণ্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মন্তেইরো ছুটিয়া গিয়া ভদ্রমহিলার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া ক্যামেরাটি কাড়িয়া লয়। ডাঃ গাইটোণ্ডেকে পুলিস হেড কোয়ার্টারে আনা হইলে পর তিনি তাঁহার স্ত্রীর বন্ধু ও অতিথি মিসেস কোএলহোর উপর অজ্ঞাতকুলশীল এই লোকটির আক্রমণের বিষয় জানান ও অভিযোগ করেন। বলা বাহুল্য, রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত বলিয়া ডাঃ গাইটোণ্ডের অভিযোগের কোনো প্রতিকার হয় নাই। ভারত রাষ্ট্রদূত পত্নীর উপর এই আক্রমণ এবং তাঁহার প্রতি অপমানজনক এই ব্যবহারের কোনো প্রতিকার সরকারীভাবে আমাদের ভারত সরকারের তরফ হইতে চাওয়া হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলেও তাহার প্রতিকার কতদূর কি হইয়াছিল, আমার জানা নাই। কিন্তু এই ঘটনার ফলে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের কাছে মন্তেইরোর কদর যে খুব বাড়িয়া যায়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং বন্ধু রুম্বার সুপারিশে কয়েক মাসের ভিতরেই গোয়া পুলিসের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়। মন্তেইরো যে সুযোগের জন্য এতকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, এখন তাহার সেই সুযোগ আসিল। ইহার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই দাদরা ও নগর হাভেলীতে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে পর্তুগীজরা তাহাদের এই দুই ছিটমহল হইতে বিতাড়িত হয়। তাহার পরেই টেরেখোল সত্যাগ্রহ ও গোয়ার ভিতর জাতীয় আন্দোলনের নূতন পর্যায়ের সূত্রপাত হয়। মন্তেইরোর খনির ব্যবসা শেষ হইয়া গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বড়কর্তার নূতন ভূমিকাও আরম্ভ হয় এই সময় হইতেই।

দাদরা ও নগর হাভেলীর পর পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের মনে আশঙ্কা জাগে যে, গোয়াতে দাদরা-নগর হাভেলীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। টেরেখোল সত্যাগ্রহের ফলে তাহাদের সে আশঙ্কা আরো দৃঢ়মূল হয়। টেরেখোল সত্যাগ্রহের পর মন্তেইরো, ভারত গভর্নমেণ্টের মতলব কি এবং ভারত হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার উদ্যোগ আয়োজনের পিছনে কাহারা আছে, এসব ব্যাপারে ভালো করিয়া খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য গোয়া হইতে বোম্বাই আসে। তখনো পর্তুগীজদের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই বা গোয়া হইতে ভারতে আসার ব্যাপারে কোনো প্রকার কড়াকড়ি হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে বোম্বাই আসা এবং বোম্বাইয়ে অবস্থিত পর্তুগীজ দূতাবাস মারফৎ বোম্বাই অধিবাসী গোয়ানীজদের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা মোটেই কঠিন হয় নাই। তাছাড়া বোম্বাইয়ে পুলিসের সার্জেণ্ট হিসাবে সে বহুদিন ছিল। কাজে কাজেই বোম্বাইয়ে আসিয়া এসব কাজ করার পক্ষে মন্তেইরোই সবচেয়ে বেশি যোগ্য লোক বলিয়া বিবেচিত হয়। বোম্বাই হইতে গোয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার পর পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাছে মন্তেইরোর কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি স্বভাবতই আরো বাড়িয়া যায়। লিসবন হইতে সালাজারের 'ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস'—'পিদে'র একদল অফিসারকেও এই সময়ে গোয়ায় পাঠানো হয়, গোয়ার ভিতরে রাজদ্রোহমূলক সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্য। তাহারা

না জানে কোঙ্কনী-মারাঠী-হিন্দী, না জানে ইংরাজী। কাজে কাজেই গোয়াতে মন্তেইরোর উপর তাহাদের নির্ভর না করিয়া উপায় ছিল না। ফলে এই সময় হইতে তাই গোয়া পুলিসের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগে 'পিদে'র অলিভেইরা এবং কাসিমির মন্তেইরো এই দুজনের একচ্ছত্র রাজত্ব আরম্ভ হয়। গোয়াতে রাজনৈতিক বন্দীদের ও সন্দেহভাজন লোকদের উপর যেসব ভয়াবহ ধরনের অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনের কথা শুনিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের লোক শিহরিয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য প্রধানত দায়ী এই দুজন—মন্তেইরো ও অলিভেইরা।

অলিভেইরা-র পদমর্যাদা অবশ্য মন্তেইরোর অনেক উপরে; কারণ সে 'পিদে'র লোক। অলিভেইরাকে কোন সময় কাহাকেও নিজ হাতে মারধোর করিতে শোনা যায় নাই। অলিভেইরা কারু গায়ে হাত দেওয়ার মতো 'ছোটো' কাজ করিত না। সেসব কাজ ছোট-খাটো অফিসাররা করিবে, অবশ্য তাহার হুকুমে। কিন্তু মন্তেইরোর সে আত্মমর্যাদার বালাই ছিল না। মন্তেইরোর প্রকৃতি পাক্কা অ্যাডভেঞ্চারার-এর প্রকৃতি। 'সোলজার অফ ফরচুন' বা ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবে নানা দেশে নানা জায়গায় ঘুরিয়াছে। নানা ঘাটে জল খাইয়াছে। দুর্ধর্ষ গুণ্ডাগিরি ও পিটুনীবাজিতে চট করিয়া তাহার সমকক্ষ কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ইহার ফলেই সে খুব তাড়াতাড়ি পিটুনী পুলিসেরও বড়কর্তা পদে নিযুক্ত হইয়া যায়। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ এই সময় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া গোয়াতে পুলিসের জন্য দু' হাতে পয়সা খরচ করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র গোয়ায় গোয়েন্দা এবং গুপ্তচর নিযুক্ত করার ভার ছিল মন্তেইরোর হাতে। যত বেকার 'মিস্তী' এবং 'মিস্তী'-ঘেঁষা ফিরিঙ্গী স্বভাবের গোয়ানীজ যুবক ছিল, মন্তেইরো তাহাদের কাহাকেও গোয়েন্দা হিসাবে, কাহাকেও পঞ্জিমের জীপ-ল্যান্ডরোভার চালানোর কাজে, কাহাকেও সোজাসুজি পুলিস কনস্টেবল হিসাবে রিক্রুট করিতে আরম্ভ করে। গোয়ার মত জায়গায় এইভাবে চাকুরি দিবার ক্ষমতার জোরে মন্তেইরোর প্রতিপত্তি ও দাপট বহু গুণে বাড়িয়া যায়। আমরা গোয়াতে গিয়া, ততদিনে তাকে খালি গোয়েন্দা পুলিসের বড়কর্তা হিসাবেই দেখি নাই। সে তখন গোয়ার সালাজারী রাজত্বে রীতিমত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র সঙ্গে যুক্ত বলিয়া পর্তুগীজ রাজত্বের স্বপক্ষে সমারোহের সঙ্গে সভা-সমিতির আয়োজন করা; পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সরকারী জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে হৈচৈ করা; দাদরা-নগর হাভেলীর 'শহীদ'দের জন্য প্রতি বছর ২১শে জুলাই স্মৃতিসভার আয়োজন করা; সালাজার ও পর্তুগালের প্রশস্তি গাওয়ার যুব উৎসব ইত্যাদি সংগঠন করা—এইসব কাজও তাহার নির্দেশে তাহার চেলা-চামুণ্ডার দলই করিত। ফলে তাহাকে গোয়ার 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র সূত্রধরদের মধ্যে অন্যতম এবং একজন প্রধান 'পলিটিশিয়ান' (পর্তুগীজ ভাষায়, একজন 'politico') বলিলেও খুব ভুল হইবে না। এক কথায়, যে কোনো আধা-সামন্ততান্ত্রিক অনগ্রসর দেশের ফ্যাসিস্ট শাসন ও তাহার আনুষঙ্গিক পুলিসী ব্যবস্থা যে ধরনের লোক নিয়া গড়িয়া ওঠে, গোয়াতে সালাজারী ব্যবস্থা যে তাহা হইতে অন্য ধরনের নয়, মন্তেইরো এবং গোয়ার ভাগ্যাকাশে মন্তেইরোর অভ্যুদয় তাহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

মন্তেইরোর প্রভাব প্রতিপত্তির কথা এই সময় গোয়াতে লোকের মুখে মুখে। আমি গোয়াতে খালি রাজনৈতিক বন্দীদের মুখ হইতে শুনিয়া এই মন্তেইরো বৃত্তান্ত বলিতেছি না। নানান্‌ভাবে, কখনো নতুন রিক্রুট গোয়ান পুলিসদের কাছে (তাহাদের মধ্যে অনেকেই

জাতীয় আন্দোলনের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিসম্পন্ন) তাহার সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়াছি। কখনো মন্তেইরোর প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া কোনো কোনো পুলিস অফিসার তাহার সম্পর্কে অনেক কথা জানাইয়াছে। মিলিটারী জেলে দু' একজন ভদ্র পর্তুগীজ মিলিটারী অফিসারের নিকট তাহার সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানার সুযোগ আমার হইয়াছে। তা ছাড়া, নিতান্ত সংগোপনে জেল হইতে বাহিরের দায়িত্বশীল লোকেদের সংগে যোগাযোগ করিয়াও কিছু কিছু জানিতে হইয়াছে। আকস্মিকভাবে একবার অনেকটা লম্বা সময় আমাদের সহবন্দী এবং গোয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত ফাবিয়ান দাকস্তা ও ডাঃ জে এফ মার্তিন্সের সংগে থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল—তাঁহারাও কিছু কিছু খবর দেন। কিছু খবর ভারতে ফিরিয়া আসার পর ডাঃ গাইটোণ্ডের কাছ হইতে শুনিয়াছি, রাজনৈতিক বন্দীদের ভয় দেখানোর দরকার হইলে সাধারণ পুলিস কর্মচারীরা শুধু নয়, খাস গোরা পর্তুগীজ অফিসারেরাও হুমকি দিয়া বলিতেন—"দাও উহাকে মন্তেইরোর কাছে পাঠাইয়া"। বলা বাহুল্য, এই খ্যাতি সে সহজে বা অযথাই অর্জন করে নাই।

১৯৫৫ সাল হইতে গোয়াতে জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হওয়ার পরে গুপ্ত বিপ্লবী দলের তরফ হইতে কয়েকবারই তাহার উপর আক্রমণ হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই মন্তেইরো অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে জীপে করিয়া কোথাও যাওয়ার সময় বিপ্লবীরা রাইফেল, স্টেন্‌গান ইত্যাদি নিয়া তাহার জীপকে আক্রমণ করে এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া বিপ্লবীদের সংগে তাহার ও তাহার সংগের লোকেদের গুলী বিনিময় হয়। মন্তেইরো যে এই জীপে ছিল বিপ্লবীরা তাহা জানিত না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মন্তেইরো এই আক্রমণের ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তাহাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকিতে হয়। সারিয়া ওঠার পরে আবার সে কাজে জয়েন করে।

॥ ১৬ ॥

ডাক্তারের বদলে চা

ওয়াল্‌পই-তে মন্তেইরো-র সংগে আমার কথা-কাটাকাটি হইতে হইতে মাঝখানে সে হঠাৎ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। একজন গোয়ান পুলিস তখন আমাকে সংগে করিয়া বাহিরে আনিয়া বারান্দায় আমার পূর্বের জায়গায় বসাইয়া রাখিল। আমি বারান্দা হইতে দেখিতে লাগিলাম, সে ট্রাকের কাছে গিয়া আমাদের ভলান্টিয়ারদের কাহাকেও হিন্দীতে, কাহাকেও মারাঠীতে জেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক আধবার ইংরেজী-হিন্দীতে মিশাইয়া চীৎকার করিয়া গালাগালি করিতেও শুনিলাম। এইভাবে তাহাদের জেরা পর্ব শেষ হইলে যখন সে আবার বারান্দা দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে, আমি তাহাকে ডাকিয়া নিতাইয়ের হাত ভাংগার কথা জানাইলাম এবং বলিলাম—"মারধোর যা করিবার তাহাতো করিয়াছেন, এখন কিছুটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন!" মন্তেইরো উত্তর

দিল—"চিকিৎসা? চিকিৎসা এখানে কি করিয়া হইবে? এখানে কোনো ডাক্তার নাই।" আমি বলিলাম—"ডাক্তার যেখানে আছে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। অন্তত যে কোনো সভ্য দেশের পুলিস হইলে তাহাই করিত। ইংরেজদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিতেছিলেন, ইংরেজ হইলে প্রথমে আহত বন্দীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া তারপর তাহাদের সম্পর্কে যা করার করিত"। এই কথা শুনিয়া প্রথমে সে ভ্রূকুটি করিয়া একবার আমার দিকে তাকাইল; পরে কি মনে হইল, নিতাইয়ের কাছে আসিয়া তাঁহার চোট-লাগা হাতটি টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া আমায় শান্তভাবে উত্তর দিল—"না হাত ভাঙ্গে নাই; "It is not broken, but badly bruised"—"ভাঙ্গে নাই, একটু খারাপ রকমে থ্যাঁতলাইয়া গিয়াছে মাত্র"। তারপর মুখ বেঁকাইয়া বলিল—"কিন্তু কি করা যাইবে, কাছেপিঠে কোথাও হাসপাতাল বা ডাক্তার নাই। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যবস্থা হইবে।" এই কথা বলিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় তাহার কি মনে হইল, হঠাৎ একজন গোয়ানীজ পুলিসকে ডাকিয়া কোঙ্কনীতে আমাদের চারজনের জন্য চার গ্লাস চা আনিয়া দিতে বলিল। আগেই বলিয়াছি, মন্তেইরোকে মন্তেইরো বলিয়া তখনো আমি চিনি না। পরবর্তীকালে তাহাকে চেনার পরে, আমি তাহার নিতাই গুপ্তের ভাঙ্গা হাত পরীক্ষা করার এবং আমাদের চা দেওয়ার কথাটা অনেকবার ভাবিয়া দেখিয়াছি। আগেই বলিয়াছি, পর্তুগীজদের মনে মনে ইংরেজদের সঙ্গে নিজেদেরকে সকল বিষয়ে তুলনায় শ্রেষ্ঠ, অন্ততপক্ষে সমান সমান বলিয়া প্রমাণ করার একটা কম্‌প্লেক্‌স আছে; আমি গুপ্তের হাত ভাঙ্গার কথায় তাহার কাছে ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা দেওয়াতে, তাহার পর্তুগীজ মানসিকতার সেই দুর্বল কেন্দ্রে আঘাত পড়ে। ইংরেজরা আহত বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বা করিত, পর্তুগীজরা তাহা করিবে না বা করিতে পারিতেছে না—একথা শুনিতে সে রাজী নয়। ইংরেজরা যদি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তো পর্তুগীজরাও তাহা নিশ্চয়ই করিতে পারিবে। অথচ কাছেপিঠে হাসপাতাল নাই বলিলেই চলে। সে অবস্থায় অন্য কিছু করা বা ডাক্তার ডাকা সম্ভব নয় বলিয়া তাহার বদলে আমাদের জন্য এক গ্লাস করিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিয়া মন্তেইরো সেই ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিয়াছিল।

॥ ১৭ ॥

মাপ্‌সা হাজতে

চা খাওয়ার পর আমাদের বেশিক্ষণ ওয়ালপই থাকিতে হয় নাই। বেচারা নিতাই গুপ্ত চা খাইতেন না; কট্টর ব্রহ্মচারী লোক। সুতরাং চা দেখিয়া খুব খুশি হইতে পারিলেন না। আমি জাত চা-খোর মানুষ। যে কোনো অবস্থাতেই চা পাইলে বেশ কিছুটা খুশি না হইয়া পারি না। আর তাছাড়া দুদিন ধরিয়া শরীরের উপরে যে ধকল গিয়াছে, তাহাতে চা পাইলে কে না খুশি হইবে? ভগৎ তুলসী রামজীও আমার সমধর্মী। আমরা দুজনে ইতস্তত না করিয়া চায়ের গ্লাসে চুমুক দিলাম। স্টেনগান হাতে শান্ত্রী

সম্মুখে খাড়া; কথা বলিবার উপায় নাই। তবু ইশারায় নিতাইকে জানাইলাম, হাত ভাঙ্গার ব্যথায় চা খাইলে উপকার হইবে। আমার উপরোধে নিতাই গুপ্ত একবার চায়ের গ্লাসে মুখ লাগাইলেন বটে; কিন্তু এক চুমুক চা খাওয়ার পর বেচারী আর খাইতে চাহিলেন না। নাসিকের ছেলেটি বুদ্ধিমান। সে চা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢক্ ঢক্ করিয়া সবটুকু চা খাইয়া ফেলিল। বোধহয় বেচারীর সাংঘাতিক ক্ষুধাও পাইয়া থাকিবে; পরে সে আমায় বলিয়াছিল, সেও চা খাইতে তত অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন ক্ষুধার চোটে—চা তো চা-ই সই—মনে করিয়া চা খাইতে দ্বিধা করে নাই।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে আবার মন্তেইরোর ঘরে আমাদের এক-এক করিয়া ডাক পড়িল। উদ্দেশ্য নিছক গালাগালি ও শাসানি। আমি আবার তাঁহার ঘরে পা দিতেই বিকট চীৎকার করিয়া সে বলিতে লাগিল—"তোমাদের পণ্ডিত জওহরলাল নিজেকে খুব চালাক লোক মনে করেন না? তাঁহাকে বলিও, এভাবে গোয়া নেওয়া যাইবে না। গোয়া নিতে হইলে লড়িতে হইবে। তাঁহাকে বলিও, লড়িতে হইবে! লড়িতে হইবে!" আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া "Tell Nehru, Tell Nehru" বলিতে থাকায় বোধহয় আমার মনে কিছু কৌতুকবোধ জাগিয়া থাকিবে, যদিও আমার নিজের মানসিক অবস্থা বা ওয়ালপই থানার পরিবেশ খুব কৌতুকজনক ছিল না। আমি প্রশ্নের ভঙ্গীতে ভালো মানুষের মত জবাব দিলাম—How can I tell him now? He is not here. ("এখন তোমার এসব কথা আমি কি করিয়া পণ্ডিত নেহরুকে জানাইব? তিনি তো এখানে নাই"।) আর যায় কোথায়? বারুদের স্তূপে যেন জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি পড়িল। দ্বিগুণ জোরে হুঙ্কার করিয়া ক্ষিপ্তভাবে ইংরেজী, হিন্দী, পর্তুগীজ মিশাইয়া গালাগালি করিতে করিতে সে যাহা বলিল, সকল কথা আমার মনে নাই। সার মর্মটা এই রকম—"ওরে ভণ্ড তপস্বী, শা..." ইত্যাদি, ইত্যাদি... "তুই বুঝি মনে করিয়াছিস এসব হাসি-তামাশার জিনিস, আমি তোর সঙ্গে হাসি-তামাশা করিতেছি? তোর এখনই হইয়াছে কি? নেহরুর কাছে রিপোর্ট দিবার জন্য তোকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। গোয়া নিতে আসিয়াছিলি, এখন তোকে আমরা গোয়ার জেলে পচাইয়া পচাইয়া মারিব। দেখি কোন্ তোর নেহরু বাপ আছে, তোকে বাঁচায়।..." ইত্যাদি। এইভাবে মিনিট কয়েক ধরিয়া একতোড়ে গালাগালি করার পর যখন দম ধরিল, ইশারা করিয়া আমার প্রহরীকে বলিল—একে নিয়া গিয়া গাড়িতে বসাও। তখন আবার সেই ওয়েপন কেরিয়ার গাড়িতে আমাদের নিয়া গিয়া বসানো হইল। বুঝিলাম, এবার কোনো জেল বা হাজতে আমাদের পাঠানো হইবে। কোথায় তাহা অবশ্য তখন বুঝি নাই।

গাড়ির ভিতরে আসিয়া দেখি নিতাই গুপ্ত গাড়িতে নাই। একটু চিন্তা হইল; কিন্তু নাসিকের ছেলেটি খুব আস্তে আস্তে ফিস ফিস করিয়া জানাইল—"গুপ্তা ট্রাক্‌লা গেলা"; অর্থাৎ গুপ্ত ট্রাকে গিয়াছে। বুঝিলাম নিতাই গুপ্তকে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সেই রাত্রেই বর্ডার পার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এযাত্রা ওয়েপন কেরিয়ারে করিয়া আমরা তিনজনই চলিলাম। আগের মতই প্রত্যেকের দু' পাশে একজন করিয়া স্টেনগানধারী গোরা পর্তুগীজ সৈন্য। সামনে ড্রাইভার ছাড়া কয়েকজন পর্তুগীজ অফিসার বসা বলিয়া মনে হইল। পরে অবশ্য বুঝিয়াছিলাম, তাহারা অফিসার নয়, গোরা পর্তুগীজ কনস্টেবল। সৈন্যদের সঙ্গে তুলনায়, বেশভূষার জাঁকজমক দেখিয়া পর্তুগীজ পুলিস কনস্টেবলদের যে প্রায় অফিসার বলিয়া মনে হয়, সেকথা আগেই

বলিয়াছি। আমরা রওনা হওয়ার আগে আমাদের ভলাণ্টিয়ার বোঝাই ট্রাকটা অন্য পথে রওনা হইয়া গেল। আমাদের ওয়েপন কেরিয়ার ঘুরিয়া বিপরীত দিকে মোড় নিল। নিতাই গুপ্তকে পর্তুগীজরা ছাড়িয়া দিলে অন্তত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বাংলা দেশের বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহার নিকট হইতে আমার শেষ খবর জানিতে পারিবেন, একথা মনে করিয়া কিছুটা আশ্বস্তও বোধ করিলাম। যদিও আমাকে যে খুব বেশিদিন গোয়াতে থাকিতে হইবে, সে আশঙ্কা সে সময় করি নাই। তবু কয়েকদিন আটকাইয়া না রাখিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যে আমায় অব্যাহতি দিবেন না, তাহা পূর্ব হইতেই প্রত্যাশিত ছিল। সেটা এক সপ্তাহও হইতে পারে, পনরো দিনও হইতে পারে। সুতরাং বাংলা দেশ হইতে যাঁহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত নিতাই গুপ্তের মতো অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী, একজন কিছুটা আগে ফিরিলে, বন্ধুবান্ধবেরা ও দেশবাসী, আমি অন্তত প্রাণে বাঁচিয়া আছি এবং বিশেষ কোনো শারীরিক নির্যাতন আমার উপর হয় নাই, এটুকু খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। তারপর তো আমি নিজেই গিয়া সশরীরে হাজির হইব। অন্তর্যামী অদৃষ্ট দেবতা তখন বোধহয় নীরবে হাসিতেছিলেন—গোয়াতে আমার ভবিষ্যৎ যে আমার হিসাব মাফিক চলিবে না, তাহা তখনো বুঝি নাই। অবশ্য তাহা যে চলে নাই, তাহাতে আজ আমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই। উনিশ মাসকাল ধরিয়া পর্তুগীজ-ভারত সম্পর্কের বাস্তব দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের সুযোগ মিলিয়াছে। আর তাহার চেয়েও আমার কাছে যাহা মূল্যবান, গোয়ার ভিতরে গোয়ার মুক্তি-যোদ্ধাদের দুঃসাহস, স্বার্থত্যাগ ও কঠোর সংগ্রামশীলতার কিছুটা পরিচয় নিয়া ফিরিতে পারিয়াছি। এ-লাভ আমার পক্ষে কম নয়।

ওয়ালপই হইতে রওনা হওয়ার বোধহয় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা মাপ্সা আসিয়া পৌঁছাই। সন্ধ্যা তখন অনুমান আটটার মতো। আমার হাতের ঘড়িটা তখনো হাতেই আছে বটে। কিন্তু সে বেচারী অনমুড় সীমান্তের পাহাড়ী নদীতে নাকানি-চোবানি খাইয়া এবং পরে দুদিন ধরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া বহু জল গিলিয়াছে, তাহার তখন আর কাঁটা ঘুরাইয়া সময়ের গতি নির্দেশ করার ক্ষমতা নাই। গাড়ি যখন মাপ্সা শহরের ভিতরে ঢোকে, সন্ধ্যার ইলেকট্রিক আলোতে রাস্তার এদিক ওদিক গাড়ির ভিতর হইতে যতটা দেখা যায়, দেখিয়া বুঝিলাম, কোনো একটা বড় জায়গায় আসিয়াছি। অবশ্য বড় জায়গা মানে, গোয়ার অনুপাতে বড় জায়গা। থানার কাছে ফুটপাথওয়ালা পীচের রাস্তা, দুপাশে ম্যাঙ্গালোর টালীর (আমাদের রাণীগঞ্জের টালীর মতো) ছাদ দেওয়া একতলা, দোতলা ঘরবাড়ি, দোকানপাট ইত্যাদি। চায়ের দোকানে তারস্বরে রেডিওর গানের চীৎকার চলিতেছে। এক জায়গায় কানে গেল গানের কলি—"দিল্ মে ছুপাকে ছুপাকে"; জনপ্রিয় সস্তা সিনেমার গান। হঠাৎ সাঁ করিয়া একটি আলো সাজানো সিনেমা হলের পাশ দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল; গাড়ি অনবরত ইলেকট্রিক হর্ন বাজাইতে বাজাইতে মোড় নিতেছে। রাস্তায় লোকজন যা দেখিতেছি, মারাঠী-কোঙ্কনী ধরনের পাগড়ি টুপীর সঙ্গে ধুতি পরা; মেয়েদের কাছা দেওয়া শাড়ি পরা বা সাধারণভাবে আঁচলা দেওয়া শাড়ি পরা। যোয়ান বয়েসী ছেলেদের পরনে লং প্যাণ্ট, ট্রাউজার, হাওয়াই শার্ট ইত্যাদি। অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমী উপকূলে যে কোনো কোঙ্কনী-মারাঠী শহরে বা কানাড়ী শহরে যে ধরনের পাঁচমিশেলী বেশভূষা দেখা যায়, তেমনি সব লোক রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে। ভারতের যে কোনো অঞ্চলের ছোটো বা মাঝারি আকারের নিম্নবিত্ত মফঃস্বল শহরের

নিম্নবিত্ত দীন চেহারাকে ঘষিয়া মাজিয়া যেভাবে আধুনিক সাজার ট্রাজিক-কমিক চেষ্টার প্রতীক চোখে পড়ে, তাহার কোনটির অপ্রতুল এ শহরে আছে বলিয়া বোধ হইল না। যেখানেই ইহারা আমাকে আনিয়া থাকুক, ভারতীয় পরিবেশেই আছি। য়ুরোপীয়, পর্তুগীজ বা লাতিন ক্যাথলিক সভ্যতার আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িতেছে না। অবশ্য সেদিনকার সন্ধ্যারাতের আবছা ইলেকট্রিক আলোয় পুলিস পাহারায় গাড়িতে বসিয়া শহরের কতটুকুই বা দেখিব বা দেখা সম্ভব ছিল? কিন্তু পরে যতটুকু দেখার সুযোগ আমার হইয়াছে, তাহাতে ক্যাথলিক গীর্জা ধর্মমন্দিরের সংখ্যাও কানাড়া-মালাবার উপকূলের ম্যাঙ্গালোর, ক্যানানোর, কালিকট, কোচিন-এর্নাকুলম প্রভৃতি শহরের চেয়ে বা কেরলে এর্নাকুলম-কোচিন, কুইলন-ত্রিবেন্দ্রামের চেয়ে কম ছাড়া বেশি মনে হয় নাই। গোয়াতে হিন্দু ধর্মমন্দির বা মঠ ও তীর্থস্থানের সংখ্যাও কম নয়। মোটের উপর মাপ্সার সঙ্গে সেদিনকার সন্ধ্যার আবছা পরিচয়েও কোন বিদেশী রাজ্যে আসিয়াছি, এরকম অনুভব করার মতো কোন কারণ দেখি নাই।

এইভাবে গাড়িতে বসিয়া যতটা পারি দেখিতে দেখিতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ একটা বাঁকে মোড় নিয়া গাড়ি মাপ্সা থানার দেউড়ীর গেটের ভিতর দিয়া থানার ভিতরে ঢুকিয়া গেল। গাড়ি থামিলে আমাদের গাড়ি হইতে নামাইয়া প্রথমে একটি ঘরের মধ্যে নিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইল। ঘরের চেহারা দেখিয়া মনে হইল সেটি থানার অফিস ঘর। আমরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গী চেহারার একজন সুব্ শেফ্ বা জমাদারবাবু গোছের লোক—তাহার হাতে মস্ত বড় একগোছা চাবি—প্রহরীদের বলিল আসামীদের নিয়া আমার সঙ্গে এস। থানার বারান্দা দিয়া চলিতে চলিতে সুব্ শেফ্ ভদ্রলোক একটু আগাইয়া গিয়া একটি হাজতের সেলের দরজা খুলিয়া দিলেন। সেখানে কয়েকজন গোয়াবাসী বন্দী ছিল, তাহাদের সেল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, আমাদের সেই খালি সেলটির ভিতরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। বিরাট আওয়াজ করিয়া লোহার দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ডাঃ সালাজারের জেলের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। অবশ্য মাপ্সার সেই পুলিস হাজতে আমাকে ঐদিন এক রাত্রির বেশি আর থাকিতে হয় নাই। কিন্তু তখনো বুঝি নাই যে, এখানে আমাদের ঐদিন রাত্রিবাসের পর আর থাকিতে হইবে না। জায়গাটা যে মাপ্সা, তাহাও তখনো টের পাই নাই। আমাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের খুব সম্ভব পঞ্জিম আনা হইয়াছে এবং আমাদের যে কয়দিন থাকিতে হয় এখানেই থাকিতে হইবে। সুতরাং সমস্ত ঘরটার উপরে নীচে চারিদিকে তাকাইয়া ডাঃ সালাজারের অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাটা কি রকম তাহা বোঝার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

মাপ্সা, মাড়গাঁও এবং পঞ্জিমের পরেই গোয়ার সবচেয়ে বড় শহর বা তৃতীয় শহর। পর্তুগীজ ভাষায় নাম মাপুসা বলিয়া লেখা হয়; মাপ্সা বা মাহ্প্সা বলিয়া সকলে জানে। লোকসংখ্যা আট হাজারের মত। মাড়গাঁও এবং পঞ্জিমের মত এখানেও পুলিসের একটা বড় ঘাঁটি আছে; পর্তুগীজ ভাষায় তাহাদের সরকারী আখ্যা—'Quartel Geral da Policia' (কুয়ার্তেল জেরাল দ্য পোলিসিয়া); চল্তি কোঙ্কনীতে 'থানা' বা 'কার্তেল'। পঞ্জিমের কুয়ার্তেল জেরাল সবচেয়ে বড় বা জাঁকজমকসম্পন্ন; কিন্তু মোটের উপর মাড়গাঁও এবং মাপ্সার পুলিসের কুয়ার্তেলও বেশ বড়। মাড়গাঁও শহর হিসাবে পঞ্জিম এবং মাপ্সার চেয়ে বড় হইলেও সেখানকার কুয়ার্তেল পঞ্জিমের চেয়ে তো বটেই, মাপ্সার চেয়েও আকারে ছোট। কিন্তু এই তিন জায়গার কুয়ার্তেলের হাজত বা পুলিস

লক্ আপের জেল (পর্তুগীজ Prisao; প্রিঝাঁও, প্রিজ্ন) এক কায়দায় তৈরি। সমস্ত ঘরের চারিদিকে একটি ছাড়া দরজা-জানালা বা স্কাইলাইট বলিতে কিছু নাই। সম্মুখের দরজায় মজবুত লোহার গরাদের উপর মোটা লোহার চাদর দিয়া সবটা ঢাকা। দরজার দুই পাল্লার দুইটি বন্ধ; একটিতে ১০ × ১২ ইঞ্চি পরিমাণ একটি ফুটা। তাহার উপরেও আড়াআড়ি লোহার পাত দিয়া জাফ্‌রির মত করা। বহির্জগতের সংগে যোগাযোগের পথ, আলো হাওয়া যাতায়াতের পথ সব ঐ একটি। ছাদের উপরে, টালির ছাদ বলিয়া দু'-একটি ঘরে একটি করিয়া টালীর বদলে মোটা কাঁচ বসানো। সেখান দিয়াও আবছা একটু আলো আসে; তবে সাধারণ এইসব কাঁচের স্কাইলাইটের উপর ধুলা-বালি এবং শেওলা জমিয়া অপরিষ্কার হইয়া এগুলিও প্রায় টালীর মতই হইয়া গিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া একটুও আলো গলে না। ঘরগুলির ছাদ খুব উঁচুতে বলিয়া অন্ধকূপ-হত্যা এসব হাজতে হইতে পায় না। অন্ধকারের ভিতর দিয়া যতটুকু হোক ভ্যাপ্‌সা বন্ধ হাওয়া একরকম চলিতে থাকে। কয়েদীদের একেবারে পুরাপুরি দম বন্ধ হইতে পায় না। কিন্তু 'অন্ধকূপ' ছাড়া এইসব হাজতকে প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছু বলা যায় না। পনরো দিন বা এক মাস থাকিতে থাকিতেই এইসব হাজতে দেখিয়াছি, বন্দীদের মুখের চেহারা ক্রমশ ফ্যাকাসে এবং রক্তশূন্য হইয়া পড়ে এবং শরীর ক্রমশ দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া আসে। এছাড়া আর এক রকমের হাজত আছে কোংকনী চল্‌তি ভাষায় সেগুলিকে 'পিঁজ্‌রা' বা খাঁচা বলা হয়। দুদিকে দেয়াল ঘেরা জায়গার ভিতর দু-সার করিয়া লোহার গরাদ বসাইয়া খাঁচার মতো সব কুঠরী তৈরি করা আছে। মধ্যখান দিয়া পাহারাওলা আসিয়া যাহাতে তালা খুলিয়া কিংবা বন্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহার জন্য গ্যাংওয়ের মতো পথ। দু'পাশের পিছনের দেওয়ালে প্রত্যেক কুঠরীর জন্য অনেক উঁচুতে একটি করিয়া গোল ঘুলঘুলি আছে। এই সব 'পিঁজরা'র সারিতে ঢোকার পথ একটিই। সম্মুখের দিকে একটি বড় গেট আছে—পিঁজরাতে যা কিছু আলো হাওয়া যায়. সেই এক দিক দিয়া। তাহা না হইলে পিঁজরাগুলিও অন্ধকূপ হাজতের মতই অন্ধকার। দিনের বেলাতেও ইলেকট্রিকের আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। তবে অন্ধকূপ হাজতের মত বন্ধ ভ্যাপ্‌সা হাওয়া এসব কুঠরীতে নাই. সে হিসাবে এগুলি কিছুটা ভালো।

মাপ্‌সার হাজতে আমাদের যখন ঢোকানো হয়, তখন রাত্রিবেলা এবং তাহার উপর ঘরের ভিতর ইলেকট্রিক আলো জ্বালানোই ছিল। তাই হাজত ঘরের অন্ধকার চেহারাটা পুরাপুরি প্রথমটা ঠাহর হয় নাই। কিন্তু বাহির হইতে আসিয়া হঠাৎ এই হাজতে বন্ধ হওয়ায় একটা ভ্যাপ্‌সা গুমট ভাব যেন শ্বাস চাপিয়া ধরিতে চাহিল। কিন্তু সেটা সাময়িক। দু-এক মিনিটের ভিতর সেই অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়া গেলে পর ঘরের এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখি তিনদিকে দেওয়ালের সংগে তিনটি কাঠের বেঞ্চি আছে এবং এক পাশে একটি ভাঙ্গা কমোড পায়খানা। কমোডটি ময়লা ভর্তি বলিয়া ঘরের ভ্যাপ্‌সা গুমট ভাব একটু বাড়িয়া গিয়াছে; তবু তাহার উপর ঢাক্‌না ফেলা আছে বলিয়া রক্ষা। বর্ষাকালে বলিয়াও বটে, আর পুরানো নীচু ভিতের দালান বলিয়াও ঘরের মেজে স্যাঁৎসেতে। আমাদের তিনজনের জন্য তিনটি বেঞ্চি অন্ততপক্ষে শোওয়ার জন্য পাওয়া যাইবে তাহার জন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম। বেশি ভাবনা চিন্তা করার মতো শরীরের বা মনের অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। ভগৎ তুলসীরামজীর শরীরে তখন জ্বর আসিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দু'দিন সমানে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছেন, তার উপর বিরোন্দে'

চৌকীতে গ্রেপ্তার হইয়া পুলিসের হাতে মারধোর খাইয়াছেনও যথেষ্ট। আমি দু'দিন পাহাড়ে জঙ্গলে হাঁটার ফলে সমস্ত গায়ে এবং বিশেষ করিয়া পায়ের গোছায় কামড়ানি ধরনের ব্যথার ভাব অনুভব করিতেছি। সুতরাং আর দেরি না করিয়া বেঞ্চিগুলি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া আমরা শুইয়া পড়ার উপক্রম করিতে লাগিলাম। রাত্রির মতো যখন আমাদের এই হাজতে ঢুকাইয়া দিয়াছে, তখন আর বোধহয় আমাদেরকে নিয়া কেউ নাড়াচাড়া করিবে না, এই ভাবিয়া আমরা যখন নিজের নিজের বেঞ্চে শুইয়া পড়িতে যাইব, এমন সময় হঠাৎ আমাদের হাজতের দরজা খুলিয়া গেল।

দেখি একজন গোয়ানীজ পুলিস কনস্টেবল সঙ্গে করিয়া সেই ফিরিঙ্গী সুব্ শেফ্ ভদ্রলোক ও তাঁহার পিছনে পিছনে দুজন য়ুরোপীয় পর্তুগীজ অফিসার। তাহাদের একজনের পরনে একটি স্লিপিং সুট, পায়ে রবারের স্লিপার আর অন্যজন, বিরোন্দে' ফাঁড়িতে যে অফিসার আমাদের জেরা করিতে গিয়াছিল এবং যাহার সঙ্গে আমার চড়া চড়া রকমের কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল সেই ব্যক্তি। তার পরনে বিকালের মতই ইউনিফর্ম এবং ক্রস বেল্ট হাতে একটি রবার ট্রাঞ্চিয়ন। মনে মনে এবার ঠিকই প্রমাদ গণিলাম... 'দেশপাণ্ডেকে হাজতে ভরিয়া মারিয়াছিল...আমাকেই বা ছাড়িবে কেন?' 'বেটারা আমাদের রাতে শান্তিতে ঘুমাইতেও দিবে না'! এই ভাবিতে ভাবিতে বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই কিছুটা আশ্চর্য হইয়া শুনিলাম স্লিপিং সুট-পরা ভদ্রলোক বলিতেছেন— "ব' তার্দ, ব' তার্দ সিনর শাউদ্যুরি, গুড্ ইভ্নিং, গুড্ ইভ্নিং মিস্টার শাউদ্যুরি ("শাউদ্যুরি" চৌধুরী শব্দের পর্তুগীজ উচ্চারণ, Chaudhuri-র Cha = শা; h অক্ষরের কোন উচ্চারণ নাই বলিলেও চলে, ব্যঞ্জন বর্ণের পর আসিলে য-ফলার মত উচ্চারণ; Bon Tarde কথার অর্থ—'গুড্ আফটারনুন' বা গুড্ ইভ্নিং)।

নিজের কানকেও বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল। ভদ্রলোক আর একটু কাছে আসিতে দেখি বেশ মার্জিত, প্রিয়দর্শন চেহারা। নিজেই পরিচয় দিলেন—"আমি এই পুলিস কুয়ার্তেলের কমান্ডান্ট, সন্ধ্যাবেলায় অনেকক্ষণ আপনার আসার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া আমি শুইতে চলিয়া গিয়াছিলাম।" এই বলিয়া নিজের সঙ্গীর দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইনি আমার এ্যাডজুটান্ট; ইঁহার সঙ্গে তো আপনার আগেই পরিচয় হইয়াছে।" তারপর নিজে হাজত ঘরের একটি বেঞ্চির উপর বসিয়া আমাদেরও বসিতে বলিলেন। কমান্ডান্টের সামনে ডেপুটি তখন অবশ্য কিছুটা নরম ও ভদ্রগোছের হইয়া আসিয়াছেন। তবে তিনি আর বসিলেন না; কাছে দাঁড়াইয়া মিলিটারী অফিসারদের কায়দায় ট্রাঞ্চিনটা দু' হাতে আড়াআড়িভাবে ধরিয়া আমাদের কথা শুনিতে লাগিলেন।

বুঝিলাম মারটা বোধহয় আর খাইতে হইবে না। আমরা মাপ্‌সা এলাকায় বড় আসামী ধরা পড়িয়াছি, তার উপরে আমি ভারত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য। সেই জন্য ভদ্রলোক কতকটা কৌতূহল প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন। বেঞ্চিতে উবু হইয়া বসিয়া (বেঞ্চিটা এত অপরিষ্কার ছিল যে, ভদ্রলোক তাহার পরে চাপিয়া বসিয়া নিজের স্লিপিং স্যুটটিকে বোধহয় ময়লা করিতে চাহেন নাই) তিনি প্রশ্ন করিলেন— "আপনারা খুব শ্রান্ত বোধ করিতেছেন না? আমি শুনিয়াছি আপনারা দু' দিন জঙ্গলে জঙ্গলে খুব ঘুরিয়াছেন। আমাদের লোকেরাও আপনাদের জন্য খুব হয়রান হইয়াছে। এই আপনারা এদিক দিয়া আসিতেছেন বলিয়া খবর পাওয়া গেল, আবার শোনা গেল যে,

না আপনারা অন্যদিক দিয়া আসিতেছেন। আমাদের লোকেদের আপনাদের ধরিবার জন্য খুবই ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে, প্রায় লুকোচুরি খেলার মত।”

আমি বলিলাম, “তাহার কারণ আমরা অনমুড় হইতে রওনা হওয়ার সময় ওয়ালপই আসার সোজা পথ ঠিক খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা আপনাদের সঙ্গে ঠিক লুকোচুরি খেলিতে চাই নাই। কিন্তু আমরা পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ ঠিকই আমরা কিছুটা শ্রান্ত। এখন শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।”

—“আপনাদের তো নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নাই?”

—“না, জঙ্গলে আর খাবার কোথায় মিলিবে?”

—“তাহা হইলে তো প্রথমে আপনাদের কিছু খাওয়ানো দরকার।”

এই বলিয়া ভদ্রলোক “কে আছে?” বলিয়া বাহিরের দিকে হাঁক দিতেই একজন গোয়ানীজ কনস্টেবল হাজত ঘরের ভিতর আসিল। তাহার সঙ্গে পর্তুগীজ ও কোঙ্কনীতে মিশাইয়া ভদ্রলোক দু' একটি কথা বলিলেন, তাহার পরে আমাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা কি খান, ভাত না রুটি, রুটি খাইতে হইলে ‘পাঁও’ (অর্থাৎ পাঁউরুটি) খাইতে হইবে।” আমরা জানাইলাম, আমরা ভাত খাইতে অভ্যস্ত; ভাতেই আমাদের চলিবে। ভগৎ তুলসীরামজী আমাকে তাঁহার হইয়া কমাণ্ডাণ্ট সাহেবকে জানাইতে বলিলেন, তিনি জ্বর জ্বর বোধ করিতেছেন, রাতে কিছু খাইবেন না। কমাণ্ডাণ্ট সাহেব সেই হিসাবে থানার কাছের কোনো হোটেল হইতে দুই জনের জন্য খাবার আনার কথা কনস্টেবলটিকে আদেশ দিলেন। তারপর আবার আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“এখুনি আপনাদের খাবার আসিবে। আপনারা খাইয়া দাইয়া সারা রাত নিশ্চিন্তে ঘুম দিন, কেহ আপনাদের বিরক্ত করিবে না। তবে আপনাদের খাবার না আসা পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে দু একটি কথা বলিতে চাই। বুঝিতেছি আপনারা খুবই শ্রান্ত, তবে আমি বেশি সময় নিব না।”

আমরা কেহই মনে মনে ঠিক এতখানি ভদ্রতার জন্য তৈয়ারী ছিলাম না, ইহা কোন সময় প্রত্যাশাও করি নাই। বিরোন্দে'র সেই গোয়ানীজ যুবকটির কথা মনে পড়িল, বোধহয় আমি পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য বলিয়া আমার সঙ্গে একটু লোক দেখানোভাবে ভদ্রতা করা হইতেছে। অথচ এই ভদ্রলোকের কথাবার্তায় সবটুকু লোক দেখানো বলিয়া মনেও হইতেছে না। মনের ভিতর একটু দ্বিধা ও সংশয় নিয়াই আমি বলিলাম—“নিশ্চয়ই, আমি আপনাদের হাতে বন্দী। আপনি যাহা কিছু আমাদের সম্পর্কে জানিতে চান আমার সাধ্যমত তাহার উত্তর দিব এবং সত্যাগ্রহী হিসাবে আমাদের কাহারও কাছে গোপন করার কিছু নাই।”

বলা বাহুল্য, আমাদের কথাবার্তা ইংরাজীতেই চলিতেছিল। কমাণ্ডাণ্ট ভদ্রলোকের ইংরাজী ভাষার উপর তত দখল ছিল না; একটু থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে কথা বলিতেছিলেন। ইংরাজী কোথাও আটকাইয়া গেলে দু একটি পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করিয়া ফেলিতেছিলেন, ব্যাকরণ শুদ্ধ রাখার জন্য তাঁহাকে বেশ কিছুটা বেগ পাইতে হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে আমাদের কথাবার্তা চালাইতে মোটের উপর খুব বেশি কোনো অসুবিধা হয় নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল দেশে থাকিতে ভদ্রলোক হয়ত কোনো সময় ইংরাজী ভাষার চর্চা করিয়া থাকিবেন (পর্তুগালে ইংরাজী ভাষা ও গ্রেট বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এসবের খুব খাতির; গোয়াতেও ইংরাজীর খাতির মন্দ নয়)। কিন্তু

গোয়াতে আসিয়া পুলিসের চাকুরিতে সে চর্চা চালাইয়া যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন হয় নাই; অনভ্যাসে তাঁহার ইংরাজী বাচন-কুশলতাও বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই। যাহা হোক, একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আলাপ চলিতে থাকিল।

তাঁহার প্রথম প্রশ্ন—"মিঃ চৌধুরী, আমরা এতদিন তো বেশ শান্তিতে আপনাদের পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছি। পর্তুগীজ গোয়ার সঙ্গে ভারতের কোনো রকম গণ্ডগোল হয় নাই বা আমরা গোয়া হইতে আপনাদের কোনোরূপ অনিষ্ট করার চেষ্টা করি নাই। আপনারা বাহির হইতে আসিয়া আমাদের এখানে লোকজনের ভিতর গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করিতেছেন কেন?"

আমি উত্তর দিলাম—"আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, পর্তুগালের সঙ্গে বা পর্তুগীজ জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়াঝাঁটি নাই বা কোনো গণ্ডগোল বাধে নাই। আমাদের আসল ঝগড়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে। ভারতবাসী হিসাবে আমরা চাই না, আমাদের দেশের কোনো অংশে কোনো বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের ছিটাফোঁটাও থাকে। আপনাদের দেশ পর্তুগাল; আপনারা ভারতবর্ষে থাকিবেন কেন?"

—"আমরা কি পাঁচশ বছর ধরিয়া এখানে নাই? ভারতবর্ষ, ভারত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু বহু পূর্ব হইতে কি গোয়ায় পর্তুগীজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই?"

—"হইয়াছে সে কথা সত্য, আমরা সে কথা অস্বীকার করিতেছি না, বা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহা কি আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, পাঁচশ বছর আগে ইউরোপীয়দের সঙ্গে এশিয়ার ও ভারতবর্ষের যে ধরনের সম্পর্কের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছিল, আজ সে ইতিহাস বদলাইয়া যাইতেছে? ভারতবর্ষে ইংরেজদের যে বিরাট সাম্রাজ্য ছিল, আজ তাহা তাহারা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফরাসীরা পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে হইতে চলিয়া গেল। খালি ভারতেই নয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে ইউরোপ পাততাড়ি গুটাইতেছে। আপনারা কি ইহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না?"

—"আমরা ইংরেজ কিংবা ফরাসীদের বহু আগে এখানে আসিয়াছি। আপনারা পাকিস্থানে যান না কেন, পাকিস্থান তো মাত্র আট বছর আগে ভারতের ভিতর ছিল? আপনারা পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন না কেন? আপনাদের সঙ্গে লড়িয়া তাহারা তো কাশ্মীর নিতে চায়? কই পর্তুগাল তো ভারতের কোনো অংশ জোর করিয়া দখল করিতে চায় নাই? কিন্তু আপনারা সেখানে যাইতে সাহস করেন না। আপনাদের ধারণা যে, পর্তুগাল ছোট দেশ, গোয়া হইতে ৪০০০ মাইল দূরে। সুতরাং আপনারা গোয়ায় আসিয়া একটু হৈ চৈ করিলেই আমরা ভয় পাইয়া গোয়া ছাড়িয়া দিব?"

—"আমরা তাহা আদৌ মনে করি না। পর্তুগাল ছোট দেশ, কি বড় দেশ ইহার সঙ্গে আমাদের সত্যাগ্রহের কোনো সম্পর্ক নাই। গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স পর্তুগাল কেন, পাকিস্থানের চেয়েও বড় সাম্রাজ্য এবং অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে আমরা পিছপাও হই নাই। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আমাদের সত্যাগ্রহ করার কোনো কথা ওঠে না, কেননা পাকিস্থানী মুসলমানেরা ইউরোপের লোক নয়; তাহারা এ দেশেরই লোক। তাহাদের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়া আমাদের ঝগড়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা একই পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মতো। পাকিস্থানের কোনো অংশ ইউরোপীয় কেহ আসিয়া বা অন্য দেশের কেহ আসিয়া দখল করিতে চাহিলে আমরা

পাকিস্থানীদের সঙ্গে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এইভাবেই লড়িব। যেমন আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলাম. ফরাসীদের বিরুদ্ধে আমরা যেমন লড়িয়াছি এবং আজ আপনাদের বিরুদ্ধে যেমন লড়িতেছি।"

আমার এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়া গেলেন; হয়ত আমার কথার উত্তরে কিছু বলা যায় কিনা মনে মনে তাহার চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় পূর্বোক্ত গোয়ানীজ সিপাহীটির পিছন পিছন একজন হোটেলের চাকর গোছের লোক দুই থালা ভাত, তরকারি, জল ইত্যাদি নিয়া হাজতঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহাদের আসিতে দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। আপনারা খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া পড়ুন;" এবং তাহার পর ভগৎ তুলসীরামজীর কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া তাঁহার জ্বর কতটা হইয়াছে, আন্দাজ করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আধ মিনিটকাল সেইভাবে তুলসীরামজীর জ্বর দেখিয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন এবং মিনিট ৩।৪ বাদে একটি ট্যাবলেটের শিশি হাতে করিয়া আবার হাজতে ফিরিয়া আসিলেন। শিশি হইতে দুইটি ট্যাবলেট বাহির করিয়া তুলসীরামজীকে তাহা দিয়া ইশারায় তাহা জল দিয়া খাওয়ার কথা জানাইয়া "Bon Noite" (বঁ নোইত বা গুড নাইট) বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার এ্যাডজুটাণ্ট এবার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন—সে ভদ্রলোক যাওয়ার সময় আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া গেলেন--"জানো, আমি তোমার উপর খুব রাগিয়া গিয়াছি?" ("I am very angry with you") "তুমি আমার রবিবারের ছুটিটা মাটি করিয়া দিয়াছ। তোমার গতকাল কিংবা আগামীকাল সোমবার আসা উচিত ছিল।" এ ভদ্রলোক বিকালে বিরোন্দে চৌকিতে আমাকে জেরা করার সময় দো-ভাষীর সাহায্য নিয়াছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে হঠাৎ ইংরাজী বলিতে শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া "আই য়্যাম সরি" বলিতে না বলিতেই কমাণ্ডাণ্টের পিছন পিছন তিনিও গট গট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মাপ্সার এই কমাণ্ডাণ্টের কথা আমার আজো এই জন্য বেশি করিয়া মনে আছে যে, গোয়াতে আমার উনিশ মাস বন্দী জীবনের মধ্যে এত ভদ্র ও শালীনতাসম্পন্ন পর্তুগীজ পুলিস কর্মচারী খুব বেশি আর চোখে পড়ে নাই। ১৯৫৭ সালে গোয়া হইতে ছাড়া পাওয়ার সময় আমাদের পুলিস পাহারায় মাপ্সার পথে কারওয়ার সীমান্তে আনা হয়। সেই সময় আর একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখনও তাঁহার নিকট হইতে একই রকমের ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছিলাম। অবশ্য ছাড়া পাওয়ার সময় কেহই আমাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে নাই। সে সময় খাস পর্তুগাল হইতে ঢালাও ভাবে সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের মুক্তির আদেশ আসায়, পুলিস ও সরকারী কর্মচারীদের মনে একটা ধারণা হয় যে, শীঘ্রই হয়ত ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে গোয়ার ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক আপোষ-মীমাংসা হইতে যাইতেছে। সুতরাং সে সময় একটু লোক-দেখানো রকমের অতিরিক্ত ভদ্রতাই আমাদের কপালে জুটিয়া গিয়াছিল। সে সম্পর্কে খুব ভুল বোঝার কোনো অবকাশ আমাদের ছিল না। কিন্তু মাপ্সার পুলিস কমাণ্ডাণ্টের কাছে গোয়াবাসের প্রথম রাত্রিতে যে ভদ্র ব্যবহার পাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে "লোক-দেখানো"র ভেজাল ছিল না বলিয়াই আমার ধারণা। পরে মাপ্সা অঞ্চলের অনেক গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীর কাছেও এই ভদ্রলোক সম্পর্কে প্রশংসাই শুনিয়াছি।

ইহার অর্থ নয় যে মাপ্সার রাজনৈতিক বন্দীদের উপর কোনো অত্যাচার হয়

নাই। গোয়ার অন্যান্য পুলিস কুয়ার্তেলের মতো মাপ্‌সাতেও তাহার কোনো অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে সৌজন্যসম্পন্ন ও ভদ্র পর্তুগীজ পুলিস অফিসার কেহই থাকিতে পারিবেন না বা গোয়াতে পর্তুগীজদের মধ্যে সেরূপ কেহই নাই এরূপ মনে করিলেও ভুল হইবে। কতকটা সালাজার শাসনের ফ্যাসিস্ট এবং সামন্তশাহী স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক বিরাগ থাকার দরুণ, এবং কতকটা বিগত কয়েক বৎসরে গোয়াতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর "পিদে"-র পরিচালনায় যে ধরনের নৃশংস অত্যাচার চলিয়াছে তাহার দরুণ, পর্তুগীজ জাতি সম্পর্কে আমাদের অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে যে পর্তুগীজরা অত্যন্ত নৃশংস প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতি। বলা বাহুল্য যে, একটা দেশের শাসক শ্রেণী বা শাসক গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিয়া দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে, কিংবা সেখানকার জনসাধারণ সম্পর্কে, সমগ্রভাবে কোনো ধারণা করা চলে না। হিটলার বা গোয়েরিংকে দিয়া যেমন সমগ্র জার্মান জাতি সম্পর্কে, কিংবা মুসোলিনীকে দিয়া সমগ্র ইতালিয়ান জাতি সম্পর্কে বিচার করিতে চাহিলে যেমন ভুল ও অবিচার করা হইবে; রুম্বা মন্তেইরো, বা "পিদে"-র অলিভেইরাকে দিয়া পর্তুগীজ জাতির বিচার করিতে চাহিলে তেমনিই ভুল এবং অবিচার করা হইবে। উনিশ মাস কাল ধরিয়া আমার পুলিসের লোক ছাড়াও একাধিক পর্তুগীজ সাধারণ শ্রেণীর লোক এবং ভদ্র ও উচ্চশিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আসার অল্প বিস্তর সুযোগ হইয়াছে। মোটের উপর আমার ধারণা, "পিদে" (Policia International) ও সিকিউরিটি পুলিস (Policia Seguranca) ছাড়া, এবং গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বাহিনী ছাড়া, পর্তুগীজরা অত্যন্ত সৌজন্য ও শালীনতাবোধসম্পন্ন জাতি। লাতিন-জাতি-সুলভ একটা দিল্‌খোলা— "hail-fellow-well-met" গোছের হৃদ্যতাপূর্ণ—বন্ধুভাব তাহাদের মজ্জাগত। বৃটিশ, ডাচ্‌ বা উত্তর ইউরোপীয় দেশের লোকেদের মত তাহাদের কোনো বর্ণবিদ্বেষ, জাতিগত ঔদ্ধত্য বা অহমিকার ভাব নাই, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। গোয়াতে আমাদের বন্ধু পাদ্রী কারিনোর কথা পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে। পাদ্রী কারিনো নিজে জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ও স্পানিশ। তিনি অনেকদিন নিজের দেশ স্পেনের লোকেদের সঙ্গে পর্তুগীজদের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, পর্তুগীজরা জাতি হিসাবে খুবই ভদ্র ও বন্ধুভাবাপন্ন জাতি। গোয়াতে আমার উনিশ মাসের পর্তুগীজ কারাবাসের অভিজ্ঞতা হইতে আমিও সেই একই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি। গোয়াতে সালাজারী পুলিসের নৃশংসতার কথাও যেমন সত্য; পর্তুগালবাসী সাধারণ মানুষের সহজ হৃদ্যতা ও সৌজন্যবোধের কথাও তেমনি সত্য। পর্তুগীজদের দুর্ভাগ্য, নানান কারণে তাহাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য তত প্রশস্ত ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; এবং তাহা পারে নাই বলিয়াই আজো সালাজারের ফ্যাসিস্ট শাসনের কবলমুক্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সালাজার গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক বিরোধের দরুণ, বা সালাজারের গোয়েন্দা পুলিসের গুণ্ডামী ও নৃশংসতার দরুণ গোটা পর্তুগীজ জাতিকে ভুল বুঝিলে অবিচার করা হইবে।

আমাদের খাইতে বসাইয়া দিয়া কমাণ্ডাণ্ট সাহেব ও তাঁহার ডেপুটি সে রাত্রের মতো হাজতঘর হইতে চলিয়া যাওয়ার পর আর কেহ আমাদের সেদিন বিরক্ত করে নাই— এক হাজত বন্ধ করিয়া যাওয়ার সময় সেই ফিরিঙ্গি "সুব্‌ শেফ্‌"-টি ছাড়া, যে লোকটি সেই রাত্রে প্রথম আমাদের এই হাজতে আনিয়া ঢুকায়, কমাণ্ডাণ্ট চলিয়া যাওয়ার পর বড়

সাহেবের দেখাদেখি সেও ভাবিল "আমিও কিছুটা ইহাদের বক্তৃতা শুনাইতে ছাড়ি কেন"। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সেও খানিকক্ষণ আমাদের বুঝাইতে চাহিল গোয়ার লোকেরা ইণ্ডিয়াকে চায় না। ইণ্ডিয়ার কোনো "কালচার" নাই, বোম্বাইয়ের পথে পথে খালি ভিখারী এবং পকেটমারে খুব ভর্তি, "ইণ্ডিয়া"-র ট্রেনগুলিতে ভীষণ ভীড়—ইত্যাদি। তাহার শেষ কথা—"Nehru bad Salazar very good. Our Salazar beat Nehru" (ভাষা ও ভাবের অনুবাদ ঃ নেহরুটা বড় পাজি, আমাদের সালাজারের তুলনা নাই। আমাদের সালাজার তোমাদের নেহরুকে পিটাইয়া ঢিট্ করিয়া দিবেন)। তখন তাহার সঙ্গে কথার প্রতিবাদ করার মত শরীরের ও মনের অবস্থা আমাদের ছিল না। ভগৎ তুলসীরাম কমাণ্ডাণ্টের দেওয়া ট্যাবলেট খাইয়া আগেই শুইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদেরও তখন ঘুমে ও শ্রান্তিতে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। কমাণ্ডাণ্ট সাহেবের কৃপায় ভাত খাইতে পাইয়া একটু সুস্থও বোধ করিতেছি; কিন্তু শ্রান্ত শরীর ভাতের নেশায় বেশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। আমি বেগতিক দেখিয়া সুব্ শেফ্ সাহেবের বক্তৃতা থামানোর জন্য মরিয়া হইয়া বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—"Yes! India very bad, Salazar very good; good night Mister, good night"—সে বেচারী তখন আর কি করে? তাহার উৎসাহের মুলে ভাঁটা পড়িল। সেও আর কথা না বাড়াইয়া হাজতের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল; আমরা সে রাতের মতো অব্যাহতি পাইলাম।

সে রাত্রে যে যার বেঞ্চিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানিতে পারি নাই। পরের দিন সকালে বোধহয় আমাদের ঘুম ভাঙ্গিত না যদি না পাহারাওলা আসিয়া আমাদের ডাকাডাকি করিয়া না জাগাইত। ঘুম ভাঙ্গিয়া বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে সমস্ত গায়ে টনটনে ব্যথা অনুভব করিলাম। বুঝিলাম দু'দিন পাহাড়ে জঙ্গলে একটানা হাঁটার ফল। যাহা হোক, প্রহরী আমাদের জানাইল, এখনি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া আমাদের তৈরি হইয়া নিতে হইবে, আমাদের অন্যত্র যাইতে হইবে। এবার আর আমরা স্বাধীন মানুষ নই; গত রাত্রি হইতে আমরা জেলের কয়েদী বা আসামী। শুধু আসামীই নই, বড় আসামী। কাজে কাজেই হাজতের সামনে ২৫-৩০ গজ উঠান বা মাঠ পার হইয়া থানার বাথরুমে যাওয়ার সময় আমাদের পিছন পিছন স্টেন গান লইয়া দুইজন শান্ত্রী চলিল। হাজত বা সেলের ভিতর হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টেন গানধারী শান্ত্রী ভিন্ন আমাদের কোথাও এক পা যাইতে দেওয়া হইত না—উনিশ মাসকাল এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি নাই। তবে স্টেন গানধারী শান্ত্রী পাহারার বজ্র-আঁটুনির ভিতরে যে ফস্কা গেরো থাকিতে পারে সালাজার তাহার সন্ধান জানেন না। ডাঃ সালাজারের জীবনে অবশ্য কোনো রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে বা গণ-সংগ্রামে যোগ দিয়া জেলে যাওয়ার বা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে জেলে থাকার কোনো অভিজ্ঞতা হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহে বৃটিশ ভারতের জেলে আমাদের শিক্ষানবিশী খুব পাকাপোক্ত রকমেই হইয়া গিয়াছিল। আর তাহা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া গোয়াতে পর্তুগীজ জেলের ভিতরেও কোথায় সে সব ফস্কা গেরো আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেও আমাদের বেশি দেরি হয় নাই। আমার মনে আজো কিছুটা ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছে যে "সত্যাগ্রহী" হিসাবে গোয়াতে গিয়াছিলাম বলিয়া আমরা সেই "ফস্কা গেরো"র সুযোগ সব সময় নিতে পারি নাই বা নেওয়াটা সঙ্গতও বোধ করি নাই। অবশ্য একেবারে নিই নাই বলিলেও ভুল হইবে; ক্রমে ক্রমে সে কাহিনীতে আসিব। কিন্তু সেদিন এইভাবে বন্দুক ও পুলিস পাহারায় বাথরুমে যাইতে যাইতে

অনেকদিন পর, জেলজীবনের পুরানো সব কথা মনে করিয়া বেশ কিছুটা কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম।

ইহার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, প্রাতঃকৃত্য সারা হইয়া গেলে পর আমরা চা ও 'পাঁও' খাইয়া নিয়া মাপ্‌সা হইতে বিদায় নিলাম। মাপ্‌সা নিতান্তই আমাদের একরাত্রির হল্টিং স্টেশন ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবে আমার গোয়া প্রবেশ মাপ্‌সার পথে, আবার গোয়া হইতে ছাড়া পাওয়ার সময়েও আমি ঘটনাচক্রে মাপ্‌সা দিয়া ভারতে ফিরিয়া আসি। তাই মাপ্‌সার কথাটা বেশ ভালো করিয়া মনে আছে। মুক্তি পাওয়ার দিন প্রায় গোটা মাপ্‌সা শহরের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ি ঘুরিয়া আসে। কাজে কাজেই মাপ্‌সার চেহারাটা আজো খুব স্পষ্ট মনে আছে। তাছাড়া গোয়া মুক্তি আন্দোলনে মাপ্‌সার স্থান বা অবদান কম নয়। ছোট মাপ্‌সা শহর দুইজন বড় গোয়াবাসী মুক্তিযোদ্ধার বাসস্থান—বীরনেত্রী শ্রীমতী সুধাবাঈ যোশীর পিতৃগৃহ মাপ্‌সায়; আর মাপ্‌সা মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম প্রখ্যাত নেতা ও গোয়ার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ গণেশ দামোদর দুবাসী-র বাড়ি।

মাপ্‌সা হইতে একটি ল্যান্ড-রোভারে চড়াইয়া আমাদের বেতিং-র পথে পঞ্জিম আনা হয়। এগারোই জুলাই; সেদিন মেঘলা থাকিলেও বৃষ্টি মোটেই ছিল না। কখনো দু'পাশে ধানের ক্ষেত, কখনো এক আধটা গ্রাম. কখনো দু'একটা উঁচু ক্যাথিড্রাল বা চার্চ দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টার ভিতর বেতিং'র ফেরিঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। বেতিং খুব ছোট একটি গ্রাম বলিলেও চলে। সামনেই মান্ডভী নদী, তাহার ওপারেই নোভা গোয়া বা পঞ্জিম। এক ফেরিঘাট বলিয়া বেতিং'র যা কিছু গুরুত্ব। গোয়ার উত্তর বা পূব দিক হইতে পঞ্জিম আসিতে হইলে বেতিং'তে পেট্রোল লঞ্চে করিয়া মান্ডভী নদী পার হইতে হয়। সমুখেই ডান হাতে দু'মাইলের মধ্যে পঞ্জিমের পশ্চিম দিক হইতে জোয়ারী নদী আসিয়া মান্ডভী ও সাগর সঙ্গমে মিশিয়াছে। দুই নদীর মধ্যে একটি সংকীর্ণ অন্তরীপ; তাহার সমুখের কোণায় পঞ্জিম বা নতুন গোয়া শহর। বেতিং'র ফেরিঘাট হইতে সাগর-সঙ্গম দেখা যায়। গোয়ার সমুখে সমুদ্রের গভীরতা বেশি। সমুদ্র তাই সেখানে খুবই প্রশান্ত, তবু বর্ষার দিনে নদীর জলের তোড় খুব বেশি থাকে এবং বর্ষার একটানা মৌসুমী হাওয়ায় সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। সেইজন্য মান্ডভী ও জোয়ারী যেখানে এক হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে বর্ষাকালে সেখানটায় উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন খুবই বেশি হয়; ঢেউও খুব উত্তাল হইয়া ওঠে। আমাদের ল্যান্ড-রোভার সুদ্ধ লঞ্চের উপর আসিয়া ওঠানোতে একটু উঁচু হইতে সাগর-সঙ্গমের দিকে চাহিয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখার আমাদের সুবিধা হইয়া গেল। ভুলিয়া গেলাম আমরা পুলিস ও মিলিটারী পাহারায় কয়েদী হিসাবে পঞ্জিম কুয়ার্তেলের বড় হাজতে চলিয়াছি। ভুলিয়া গেলাম ১৫।১৬ জন রাইফেল ও স্টেনগানধারী সৈন্য আমাদের ঘিরিয়া আছে। ভুলিয়া গেলাম ফেরিঘাটে সমবেত কয়েক শ' লোক কিছুটা ভয়ে, কিছুটা কৌতুহলে দূর হইতে আমাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। আমার সম্মুখে নদীর ওপারে হোটেল মান্ডভীর ছয়তলা বাড়ি পঞ্জিমের স্কাই লাইন জুড়িয়া খাড়া আছে, তাহার কথা ভুলিয়া গেলাম। মান্ডভী-জোয়ারী-র বর্ষার ঘন লাল জল প্রবল তোড়ে পাক খাইয়া যেখানে আরব সমুদ্রের নীল-সবুজের সঙ্গে আসিয়া মিশিতেছে, আরব সাগরের উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া সমুদ্রে লীন হইয়া যাওয়ার আগে রাগে গর্জন করিয়া এক একবার লাফ দিয়া উঠিতেছে, ফুলিয়া ফুঁসিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছে। সেই শব্দ-চিত্র-বর্ণ-সম্ভার-সমৃদ্ধ দৃশ্যের দিকে চাহিয়া

চাহিয়া তখন আমাদের আশ মিটিতেছে না। মাণ্ডভীর এক পাশে পঞ্জিম শহরের লাল টালির ছাদ দেওয়া সাদা রংয়ের বাড়ির সারি, ঘন সবুজ গাছপালার ভিতর দিয়া অপূর্ব সমারোহ সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যদিকে আগুয়াদার পাহাড় নীচু হইয়া ক্রমে সমুদ্রের কোলের কাছে নামিয়া আসিয়াছে। নারিকেল-শাল-শিশুর জঙ্গল সেদিকেও ঘন সবুজ পাড়ের মত পার্বতী মাণ্ডভীর গেরুয়া জলস্রোতের ধার ঘেঁষিয়া একটানা চলিয়া আসিয়াছে। নদী সমুদ্র অরণ্যানী বর্ষার মেঘ সব কিছু মিলিয়া যত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করিতে পারে তার কোনো কিছুর অপ্রতুলতা সেখানে নাই। সেদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কখন যে আমাদের ফেরি লঞ্চ পঞ্জিমের ছোটো ডকে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহা বুঝি নাই। চট্‌কা ভাঙ্গল নৌকা ঘাটে লাগার ধাক্কায় এবং আমাদের ল্যাণ্ড-রোভারের সেল্‌ফ স্টার্টার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হইয়া ওঠার ঘরর ঘরর শব্দে। এবার পঞ্জিম! পর্তুগীজদের ভারত সাম্রাজ্য—Estado da India-র রাজধানী!

॥ ১৮ ॥

পঞ্জিমে

পূর্বদিক হইতে ফেরিতে মাণ্ডভী নদী পার হইলেই পঞ্জিম বা পনজী[১] শহর: পর্তুগীজদের নোভা গোয়া। এদিক হইতে শহরে ঢোকার মুখে প্রথমেই চোখে পড়ে 'হোটেল মাণ্ডভী'র ছয়তলা বাড়ি। 'হোটেল মাণ্ডভী' ঠিক ফেরিঘাটের সামনে বড় রাস্তার উপর। এই হোটেলের কংক্রীট গাঁথনির ছয়তলা উঁচু এই বাড়িটিকে পঞ্জিমের একমাত্র স্কাই-স্ক্রেপার বলা চলে। ইহার আশেপাশে সাধারণ একতলা দোতলা বাড়ি ছাড়া সেরকম কোন উঁচু বাড়ি বা দালান নাই। নদীর ধারে একেবারে প্রায় ফাঁকা একটা জায়গায় মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া থাকার দরুণ, ফেরিঘাটের ওপার হইতে অথবা পঞ্জিমের বাহিরে উত্তর বা দক্ষিণ কোনদিক হইতে পঞ্জিমের দিকে তাকাইলেই সবার আগে 'হোটেল মাণ্ডভী'র দিকে নজর যায়। বাড়িটির এমন কোনো স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নাই। তবে গোয়ার ভিতরে সবচেয়ে উঁচু ইমারত বলিয়া 'হোটেল মাণ্ডভী'র বাড়ি সকলের কাছে পরিচিত। বোম্বাই, কলিকাতা বা পুনাতে হইলে এই রকম একটি বাড়ির কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখার কোনো দরকার করিত না। কিন্তু আমাদের পঞ্জিমে ঢোকার সময় চোখের সম্মুখে এই খাপছাড়া রকম উঁচু বাড়িটি খাড়া হইয়া থাকায় ইহার কথা আজও বেশ মনে আছে। গোয়াতে এই 'হোটেল মাণ্ডভী'-ই ইউরোপীয় কায়দায় সবচেয়ে বড় হোটেল, যদিও ইহার মালিক জনৈক সরকার-ঘেঁষা ধনী সারস্বত ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী। বড় বড় সরকারী পর্তুগীজ কর্মচারী কিংবা বিদেশাগত ইউরোপীয় বা অন্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেদের পঞ্জিমে ওঠার জায়গা এইটি। ফেরি লঞ্চ হইতে নামিয়া আমাদের ল্যাণ্ড-রোভার 'হোটেল মাণ্ডভী'র পাশ দিয়া পঞ্জিমের কুয়ার্তেলের দিকে চলিল।

ছোট বড় প্রত্যেক শহরেরই একটা সাধারণ রূপ বা চেহারা থাকে। পঞ্জিম শহরও তাহার ব্যতিক্রম নয়। বড় রাস্তার উপরে সরকারী দপ্তর বা অভিজাত অঞ্চলে সেই

চেহারাটার মধ্যে যে একটা ফিরিঙ্গি ছোপ চোখে পড়ে না তাহা নয়। ফেরি লঞ্চে খেয়াঘাট পার হওয়ার সময় ইউরোপীয় ফ্রক পরিহিত দেশীয় গোয়ানীজ মহিলা বেশ কয়েকজন চোখে পড়িয়াছিল। হাওয়াই শার্ট, বা পুরাপুরি কোট-প্যাণ্টের স্যুট পরিহিত অনেক পুরুষ লোকও সে সময় ঘাটে ছিল, আবার মারাঠী ধরনে ধুতি, পাঞ্জাবি, টুপী বা পাগড়ী পরা লোকের অভাবও সেখানে ছিল না। মারাঠী ধরনে কচ্ছি দিয়া শাড়ি পরা মহিলাও যে সেখানে কয়েকজন ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বোম্বাইয়ে বা কলিকাতায় গরীব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ক্রিশ্চিয়ান পাড়ায় যেরকম দেখা যায়, অনেকটা সেইরকম। কিন্তু খুব বড় শহর বলিয়া সে সব জায়গায় লোকের বেশভূষার ফিরিঙ্গিয়ানাটা তত চোখে পড়ে না। কিন্তু গোয়াতে, বিশেষ করিয়া পঞ্জিমের মত ছোট শহরে ইহা চোখে না পড়িয়া পারে না। মাড়গাঁও বা মাপ্সার পথে এটা আমার চোখে অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া মনে হইয়াছে। বিদেশী পর্যটক বা সাংবাদিকেরা অনেকে গোয়াতে আসিয়া পঞ্জিমে ফ্রক পরা মহিলা বা কোট প্যাণ্ট পরা লোকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া এই কারণেই কৃষ্টিগতভাবে গোয়াকে ইউরোপের কাছাকাছি বলিয়া ধরিয়া নেন। বলা বাহুল্য, পঞ্জিমের বাহিরে বা গ্রামাঞ্চলে গিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের সম্বন্ধে খোঁজখবর করা এইসব সাংবাদিকের সচরাচর হইয়া ওঠে না এবং তাঁহাদের সেই ভুল ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ প্রোপাগাণ্ডার রসদ যোগায়। কিন্তু এও ঠিক যে, পঞ্জিম বা মাড়গাঁও-এর সাইজের কোনো ভারতীয় শহরে ইউরোপীয় স্যুট পরিহিত পুরুষ মানুষ বহু দেখা গেলেও ফ্রক পরা বয়স্থা দেশীয় মহিলা বেশি কেন, একজনও হয়ত দেখা যাইবে না। গোয়ায় সেটা দেখা যায়। আজকাল অবশ্য গোয়ানীজ ক্রিশ্চিয়ান মহিলাদের মধ্যেও শাড়ির ফ্যাশনই বেশি চলতি। কিন্তু ফ্রক পরাটাও যথেষ্ট পরিমাণে চলতি আছে। দরিদ্র ক্রিশ্চিয়ানদের ঘরেও মেয়েদের মধ্যে ফ্রক পরার চল আছে—খালি পায়ে শ্যামবর্ণা গরীব ক্রিশ্চিয়ান মেয়েরা ফ্রক পরিয়া মাথায় ঝুড়িতে করিয়া তরি-তরকারি ফল ইত্যাদি নিয়া যাইতেছে—এরকম দৃশ্য গোয়াতে পথেঘাটে প্রায়ই দেখা যাইবে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যত্র দেখা যায় না।

বাড়িঘরের দিক দিয়া অবশ্য চার্চ ক্যাথিড্রাল প্রভৃতির কথা বাদ দিলে খুব ইউরোপীয় ছাঁদের বাড়িঘর যে গোয়াতে আছে তা নয়। গোয়ার রাজধানী হইলেও পঞ্জিমে ইউরোপীয় ধরনে তৈরি উঁচু বড় বাড়ির সংখ্যা খুব বেশি নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য মফঃস্বল শহরের মতো পাকা বাড়িঘরের মধ্যে সাধারণত একতলা দো-তলা বাড়িই বেশি। দু' একটি ইমারত তিনতলা পর্যন্ত আছে। কিন্তু পঞ্জিম শহরে তাহার সংখ্যা ৪।৫টির বেশি হইবে না। পঞ্জিমে হোক, আর মাড়গাঁও মাপ্সাতে হোক, ম্যাঙ্গালোর টালির ছাদ দেওয়া একতলা 'ভিলা' বা 'বাংলো' প্যাটার্নের বাড়ির সংখ্যাই বেশি। দোতলা বাড়িতেও ছাদ সাধারণত টালিরই হয়। তাহার একটা কারণ কোঙ্কনভূমি গোয়াতে বর্ষার সময় বৃষ্টির প্রাবল্য একটু বেশি বলিয়া ঢালু ধরনের টালির ছাদে সুবিধা; জল আপনি ঝরিয়া গড়াইয়া যায়। তাছাড়া টালির ছাদ খরচের দিক দিয়া সস্তাও বটে। বোম্বাইয়ের দক্ষিণে কোঙ্কন উপকূলে সর্বত্রই ঘরবাড়ির ছাদ তৈরিতে টালির চলন বেশি। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা টালির ছাদ দেওয়া ভিলা প্যাটার্নের বাগান ঘেরা বাড়ি তৈরি করেন। গোয়াতেও মোটামুটি সেইটাই নিয়ম। সুতরাং পঞ্জিমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য শহরের তুলনায় এমন কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। গোয়ার পঞ্জিম

মাড়গাঁও মাপ্‌সা সবই ছোট বা মাঝারি আকারের শহর ছাড়া কিছু নয়। শহরতলী এবং আশপাশের সমস্ত বস্তি ধরিয়া পাঞ্জিমের মোট জনসংখ্যা উর্ধ্বপক্ষে পনরো হাজারের বেশি হইবে না; মাপ্‌সার হাজার আট-দশ। গোয়ার সবচেয়ে বড় শহর মাড়গাঁওয়ের জনসংখ্যা ষাট হাজারের মতো। সুতরাং পাঞ্জিম বা গোয়ার অন্য কোনো শহরকে কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে সম্পূর্ণ ভুল হইবে।

পাঞ্জিম বা নোভা গোয়া, গোয়ার রাজধানী। আল্‌বুকার্ক আসিয়া ১৫১০ সালে আদিল শাহী সুলতানদের নিকট হইতে গোয়া জয় করিয়া যে গোয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন পাঞ্জিম বা নোভা গোয়া সে শহর নয়। সেই পুরাতন গোয়া পাঞ্জিম হইতে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরাতন গোয়া শহর দূর-প্রাচ্যে পর্তুগীজ নৌ-শক্তি ও পর্তুগীজ বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র হিসাবে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। য়ুরোপে সে সময় গোয়ার নাম ছিল দূর-প্রাচ্যের রোম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা আসিয়া ভারত মহাসাগরে নিজেদের নৌ-শক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিলে পর পর্তুগীজদের ক্রমে তাহাদের কাছে হঠিয়া যাইতে হয় এবং গোয়ার আর্থিক সমৃদ্ধির বনিয়াদ ক্রমশ নষ্ট হইয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাহির হইতে পর্তুগীজ অবরোধের ফলে ও ভিতরে পর পর কয়বার প্লেগ মহামারীর আক্রমণে পুরাতন গোয়া প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। পর্তুগীজ শাসকেরা তখন পাঞ্জিমে সরিয়া আসিয়া নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৭৫৯ সালে পাঞ্জিম-কেই Nova Goa বা New Goa ও পর্তুগীজ ভারতের রাজধানী বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। পুরাতন গোয়াতে এখন জনমানবশূন্য রাস্তাঘাট, পুরাতন বাড়ির ভগ্নাবশেষ এবং সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহরক্ষার সমাধি ভিন্ন আর কিছু নাই। সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহ এখানে রক্ষিত আছে বলিয়া পুরাতন গোয়া এখনও সারা পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থল বলিয়া পরিগণিত হয়।

নোভা গোয়া বা পাঞ্জিমও যথেষ্ট পুরানো শহর। লোকসংখ্যা শহরের উপকণ্ঠবর্তী দু'একটি গ্রাম নিয়া হাজার পনরোর বেশি নয়। পর্তুগীজ ভারতের রাজধানী হিসাবে এখানে পীচের রাস্তা, ফুটপাথ, ইলেকট্রিক আলো, স্যানিটারী ড্রেন-পায়খানা, কলের জল আধুনিক সবকিছু সুখ-সুবিধা ও তাহার বন্দোবস্ত পাঞ্জিমেও আছে; তবে সেটা শহরের সর্বত্র নয়। আমাদের অন্যান্য শহরেও যেমন, পাঞ্জিমেও তেমনি এসব আধুনিক শহর-জীবনের সরঞ্জাম বিশেষ অঞ্চলের—অর্থাৎ সরকারী এবং অভিজাত অঞ্চলের জন্য সীমাবদ্ধ। এইসব অঞ্চলের বাহিরে গেলে আধুনিকতার এইসব নিদর্শন আর দেখা যায় না। ১৯২৭-২৮ সালে গোয়াতে একজন পর্তুগীজ গভর্নর আসিয়াছিলেন যাঁর আধুনিকতার দিকে ঝোঁকটা একটু বেশি ছিল এবং প্রধানত তাঁহার উদ্যোগেই খুব তোড়জোড় করিয়া গোয়াকে মডার্ন বানানোর চেষ্টা শুরু হয়। পীচের রাস্তা ইত্যাদির সেই সময় পত্তন হয়। তবে গোয়া মোটের উপর এমন কিছু বড় জায়গা নয়; পাঞ্জিম, মাড়গাঁও এসব শহরের মিউনিসিপ্যালিটির আয়ও বেশি নয়। তবুও সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত, অংশত মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া এবং অংশত রাজধানী হওয়ার দাবিতে সরকারী খরচায় পাঞ্জিমের উপর আধুনিকতার প্রলেপ চড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু ফ্যাশনের টানে টানে আধুনিকতার এইসব সাজ-সরঞ্জাম চালু করিলেও, তাঁহাকে চলতি রাখা সহজসাধ্য নয়। আমাদের দেশে ছোট শহর মাত্রেই দেখা যাইবে, হয়ত একটা পার্কের

বন্দোবস্ত হইল; কিন্তু দু' এক বছরের মধ্যে সেখানে জংগল আগাছা গজাইয়া গিয়াছে, ফুলের বাগান ন্যাড়া হইয়া গিয়াছে; পার্ক আর পরিষ্কার পর্যন্ত হয় না—এক কথায় পার্কের 'পার্কত্ব' মধ্যবিত্ত গরীবিয়ানায় সম্পূর্ণ ঢাকিয়া গিয়াছে। পঞ্জিমেও তাহার নিদর্শন প্রতি পদে চোখে পড়িবে। তবু রাজধানী জায়গা; সেজন্য সরকারী সমারোহ বজায় রাখার জন্য শহরকে কিছুটা পরিচ্ছন্ন, কিছুটা জাঁকজমকসম্পন্ন রাখার চেষ্টা সব সময় চলিতেই থাকে। সরকারী এবং অভিজাত অঞ্চলগুলিতে তাই মোটের উপর হতশ্রী ভাবটা একটু কম।

পুলিস পাহারায় ল্যান্ড-রোভার গাড়িতে বসিয়া শহরের যতটা এক ঝলক দেখিয়া নেওয়া যায় দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। আমাদের গন্তব্যস্থান পঞ্জিমের পুলিস হেড কোয়ার্টার বা কুয়ার্তেল জেরাল। পঞ্জিমের কুয়ার্তেল জেরাল সারা পর্তুগীজ ভারতের পুলিস প্রশাসনের কেন্দ্র—Quartel Geral da Policia da Estado da India। পর্তুগীজ শাসন কর্তৃপক্ষের তখন ব্যবস্থা ছিল (আজও সেই ব্যবস্থা বহাল আছে) গোয়ার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে—যে যেখানেই গ্রেপ্তার হইয়া থাকুক না কেন—এক জায়গায় পঞ্জিমে আনিয়া জমায়েত করা এবং মন্তেইরো ও অলিভেইরার তদারকে তাহাদের হাজতে আটক রাখা। আমিও সেখানেই চলিয়াছি। ফেরিঘাট হইতে পুলিস হেড কোয়ার্টার বোধহয় মাইলখানেক পথও নয়। 'হোটেল মান্ডভী' ছাড়াইয়া নদীর ধারের রাস্তায় কিছুদূর গেলেই মোড় ঘুরিয়া পুলিসের কুয়ার্তেল। কিন্তু পুলিস কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য আমাকে সোজা সদর রাস্তা দিয়া সেখানে না নিয়া খানিকটা বেশি ঘোরাপথ দিয়া গাড়ি ঘুরাইয়া নিয়া যাওয়া হইল। অবশ্য তাহাতে আমার বরং সুবিধাই হইয়া গেল; হাজতে বন্ধ হওয়ার আগে শহরটি এক নজর দেখিয়া যাওয়ার সুযোগ পাইয়া গেলাম। এ ছাড়া, পঞ্জিমের বিভিন্ন রাস্তায় ও একাধিক অঞ্চল দিয়া পুলিস পাহারায় আরো কয়েকবার ঘোরাফেরা করার সুযোগ আমার হইয়াছে। ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের সংগে দু'বার দেখা করিতে যাওয়ার সময়, মিলিটারী ট্রাইবুনালে বিচারের জায়গায় আসা-যাওয়ার সময়, এবং ১৯৫৬ সালে একবার আগুয়াদা দুর্গ হইতে পঞ্জিমে চোখের ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাইতে আসার সময়, পঞ্জিম শহরের ভিতর চারিপাশে মোটামুটি ঘুরিয়া যতটা দেখা সম্ভব তাহা দেখিয়াছি। গোরে, শিরুভাই, লিমায়ে এবং দেশপান্ডেকে পুলিস কর্তৃপক্ষ পঞ্জিম, ওল্ড গোয়া এবং মাড়গাঁও পর্যন্ত জীপে করিয়া ঘুরাইয়া দেখায়। গোরে এবং লিমায়ের বেলায় ইহার কারণ ছিল, তাঁহাদেরকে গোয়ায় ঘুরাইয়া এটা তাঁদের কাছে প্রমাণ করা যে, গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো আন্দোলন নাই; তাঁহারা ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া গোয়াতে লোক ক্ষেপাইতে আসিয়া পন্ডশ্রম করিয়াছেন। দেশপান্ডের বেলায় উদ্দেশ্য ছিল, গরু মারিয়া জুতা দানের মতো—হাজতে পুরিয়া তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম পেটার পর ছাড়িয়া দিবার আগে একটু ভদ্রতার প্রলেপ দেওয়া। তাঁহারা তিনজনেই এইভাবে গোয়াতে সবচেয়ে যাহা দর্শনীয়—সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সমাধি ও রক্ষিত দেহ দেখার সুযোগ পান। আমার দুর্ভাগ্যবশত গোয়ায় উনিশ মাস থাকা হইলেও এই জগৎপ্রসিদ্ধ সমাধিস্থল দেখার সুযোগ আমার হয় নাই। যাহা হউক, খাস গোয়ার ভিতরে আমার এই প্রথমদিনে পঞ্জিমের রাস্তায় কিছুটা কৌতূহলের সংগে যতটা পারি এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে চোখে পড়িল দেওয়ালে দেওয়ালে স্লোগান লেখা—"Portugal esta aqui"। তখন ইহার অর্থ বুঝি নাই;

কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, হয়ত ইহার কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। হাজতে ঢোকার পর ক্রমে ক্রমে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার অর্থ জানিয়াছিলাম—"Portugal is here" ('পর্তুগাল এইখানেই')। বলা বাহুল্য, এই স্লোগান দেওয়ালে দেওয়ালে লেখার উদ্যোক্তা ছিল গোয়ার 'ইউনিয়ন নাসিওনাল', ডাঃ সালাজারের দলের গোয়া শাখা। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ জানিতেন যে, গোয়াতে জাতীয় আন্দোলন এবার শুরু হইয়াছে গোয়াকে পর্তুগালের অন্তর্ভুক্ত খাস মহল প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করার বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্লোগান হিসাবে 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র তরফ হইতে আওয়াজ ওঠানো হয়—পর্তুগাল গোয়া হইতে দূরে নয়, গোয়াতেই পর্তুগাল। "পর্তুগাল এইখানেই" স্লোগানের আসল তাৎপর্য বা ইতিহাস ইহাই। আরও দু' একটি স্লোগানও যে এই সঙ্গে দেওয়ালে দেখিলাম না তাহা নয়; "Viva Portugal!" (পর্তুগাল জিন্দাবাদ!) "Viva Salazar!" (সালাজার জিন্দাবাদ!) ইত্যাদি। এইসব দেখিতে দেখিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে (ফেরিঘাট হইতে আমাদের কুয়ার্তেলে আসিতে মিনিট কুড়ি পঁচিশের বেশি লাগে নাই) আমাদের ল্যাণ্ড-রোভার আসিয়া বিরাট দেউড়ীর ভিতর দিয়া সাঁ করিয়া কুয়ার্তেলের মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামাইয়া আমাদের প্রথম যে ঘরে আনা হইল তাহা কুয়ার্তেলের দেউড়ীর পাশের একটি ছোট অফিস। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল কয়েদী ভর্তি করা বা খালাস করার খাতাপত্র এখানে থাকে। অ্যারেস্ট করিয়া কাহাকেও হাজতে আনিয়া ঢুকাইতে হইলে প্রথমে এখানে আনিয়া তাহার নাম ধাম বিবরণ লিখিয়া নেওয়া হয় এবং তারপর তাহাকে হাজতের ভিতরে পাঠানো হয়। কুয়ার্তেলের এই হাজত বিভাগ সাধারণত একজন শেফ্-এর জিম্মায় এবং কয়েদীদের হেফাজত একজন সুব্ শেফ্-এর জিম্মায় থাকে। অর্থাৎ শেফ্ হাজতের খাতাপত্র, কাগজপত্র এসব ঠিক রাখেন আর সুব্ শেফ্ হাজতের চাবি এবং কয়েদী গুনতি ঠিক রাখেন। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় হাজতবাবু সুব্ শেফ্-এর ডিউটি বদল হয়। হাজতের চাবির গোছা তাহার কাছে থাকে, সুব্ শেফ্ কয়েদীদের সঙ্গে সঙ্গে না গেলে কোনো ক্রমেই হাজত হইতে তাহাদেরকে কেহ বাহির করিতে পারে না। কোর্টে বা অন্য কোথও কোনো কয়েদীকে হাজির করার সময় সেদিন যে সুব্ শেফ্-এর ডিউটি, সাধারণ পাহারাওলা ও কনস্টেবল রাইফেল নিয়া সঙ্গে থাকিলেও, তাঁহাকেও একটি স্টেন গান কাঁধে ঝোলাইয়া সঙ্গে যাইতে হয়। হাজত হইতে কয়েদীদের স্নান বা প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্দেশ্যে বাহিরে আনিতে হইলেও সুব্ শেফ্‌কে সামনে থাকিতে হয়। আমরা অফিস ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শেফ্ ভদ্রলোক যথারীতি আমাদের নামধাম বিবরণ এ সব লিখিয়া নিয়া সেদিনের সুব্ শেফ্‌কে ডাকিয়া আমাদেরকে তাঁহার সঙ্গে হাজতে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তাহার আগে আমাদের সমস্ত শরীর তল্লাসী করিয়া পকেটে যা কিছু টাকা পয়সা ছিল তাহা রাখিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, হাজতে কয়েদীদের সঙ্গে টাকা পয়সা রাখিতে দেওয়া হয় না। পর্তুগীজ জেলে সে সম্পর্কে খুব কড়াক্কড়ি নাই। কিন্তু কোনো কয়েদীকে হাজতে প্রথম ঢোকানোর সময় যদি তাহার সঙ্গে কোনো টাকা-পয়সা থাকে তাহা হইলে সেই টাকা তাহার খাই খরচা বাবদ কাটিয়া নেওয়া হয়। আমার সঙ্গে তখন বোধহয় ২৲।৩৲ টাকার মত নোট ছিল। আমার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া নেওয়াতে প্রথমটা আমার মনে হইয়াছিল জেলখানার ভিতরে কাহারও সঙ্গে টাকাকড়ি রাখিতে দেওয়া হয় না বলিয়াই বোধহয় আমার টাকা

উহারা নিয়া নিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার আসল কারণটা কি, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যা হোক এ সব কাজ চুকাইয়া শেফ্ সাহেব সেদিনকার হাজত পাহারার ডিউটি যে সুব্ শেফ্-এর উপর ছিল, তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ডিউটি সুব্ শেফ্ আসিলে পর আমরা তাঁর পিছনে পিছনে হাজতের দিকে পা বাড়াইলাম। শেফ্ সুব্ শেফ্‌কে বলিয়া দিলেন, "numero um" (অর্থাৎ এক নম্বর ঘরে নিয়া যাও)। শেফ্ ভদ্রলোক বোধহয় মিস্তি বা পর্তুগীজ হইতে পারেন। তিনি সুব্ শেফ্ বা কনস্টেবলদের যথাসম্ভব পর্তুগীজ বা 'ক্রিশ্চিয়ান কোঙ্কনী'তে কথা বলিলেও আমাদের নামধাম জিজ্ঞাসাবাদে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষাই ব্যবহার করিলেন। ডিউটি সুব্ শেফ্ উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'nas dois' (দুই নম্বরে নয়)? শেফ্ জবাব দিলেন "nao, nao! um, um!" তাঁহাদের মধ্যে পর্তুগীজ ভাষাতেও কিছু কথাবার্তা হইল। তখন তাহার অর্থ বুঝি নাই। পরে অবশ্য বুঝিয়াছিলাম এক নম্বর হাজত ঘরে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী অনেকে আছেন বলিয়া সুব্ শেফ্ আমাকে সেখানে রাখার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন। ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণত গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে রাখা হইত না। দুই নম্বর ঘরে সে সময় ভারতীয় জনসঙ্ঘের নেতা জগন্নাথ রাও জোশী এবং তাঁহার সঙ্গে আগত কয়েকজন ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে রাখা হইয়াছিল। আমাকে সেই ঘরে রাখা উচিত কি না সেইটাই সুব্ শেফ্-এর জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু আমাকে যে এক নম্বর ঘরে গোয়াবাসী বন্দীদের সঙ্গে রাখা হইবে মন্তেইরোর নির্দেশে তাহা আগেই স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাজে কাজেই সুব্ শেফ্-এর ক্ষীণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে সেই এক নম্বর হাজতেই নিয়া গিয়া ঢোকানো হইল। ভগৎ তুলসীরাম ও নাসিকের ছেলেটিকেও আমার সঙ্গে সেখানে রাখা হইল।

॥ ১৯ ॥

কুয়ার্তেল জেরাল দা পোলিসিয়া

সেদিনকার ডিউটিতে যে সুব্ শেফ্ ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া কুয়ার্তেল হাজতের এক নম্বর ঘরে ঢুকিয়া দেখি সেটা আমার পূর্ব-বর্ণিত লোহার কবাট দেওয়া 'অন্ধকূপ' হাজতও নয় কিংবা তিন দিকে লোহার গরাদ ঘেরা 'পিঁজরা' জাতীয় হাজতও নয়। আসলে সেটা ছিল একটা মোটর সাইকেলের গ্যারাজ। দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠারো ফুট বা হাত বারোর মতো, প্রস্থে তের চৌদ্দ ফুট। ঘরের মেঝের মধ্যখান হইতে ছয় ফুটের মত জায়গাকে ক্রমশ নীচু ও ঢালু করিয়া দরজা বরাবর নামাইয়া আনা হইয়াছে। দরজার জায়গায় খালি একটি লোহার কলাপসিব্‌ল গেট, সাধারণত এইসব গ্যারাজে যে রকম থাকে। পঞ্জিম পুলিসের মোটর সাইকেলগুলিকে এই গ্যারাজে রাখা হইত। স্টার্ট দিয়া তাহার কোনটিকে নামাইয়া বাহিরে আনার দরকার হইলে মধ্যের এই ঢালু জায়গাটা দিয়া একটুখানি পায়ের ধাক্কার সাহায্যে গড়াইয়া নীচে আনিতে আনিতে

আপনা-আপনি সাইকেলের মোটরে স্টার্ট হইয়া যাইত। গোয়াতে রাজনৈতিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আজকাল কুয়ার্তেলের প্রত্যেকটি হাজতে কয়েদীর ভিড় খুব বেশি বলিয়া এই গ্যারাজটিকেও খালি করিয়া একটি অতিরিক্ত হাজত-ঘর বানানো হইয়াছে বলিয়া অন্য হাজত হইতে তাহার আকার-প্রকার কিছুটা ভিন্ন রকমের। এই গ্যারাজ হাজতটিই এখন কুয়ার্তেলের 'Cela numero um' বা এক নম্বর সেল। ইহার পাশাপাশি এক সারিতে অন্য যে সমস্ত সেল আছে—৪।৫টির মতো—সেগুলি সবই অন্ধকূপ সেল। তাহার পরে কতকটা ভিতরের দিকে 'পিঁজরা'। তাহার পরে দু'তিনটি খোলামেলা জানালাওয়ালা একটু ভদ্রগোছের সেল। সেগুলিতে পর্তুগীজ গোরা সৈন্যদের শাস্তি দিবার দরকার হইলে রাখা হয়। এ সবের পিছন দিকে একটি 'ব্যাক ইয়ার্ড'-এর মতো আছে। সেখানে কিছুদিন হইল তাড়াহুড়া করিয়া টালির ছাদ দেওয়া নূতন কয়েকটি ছোট ছোট সেল তৈরি করিয়া নেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাক্ ইয়ার্ডেই কুয়ার্তেলের পায়খানার সারি ও একটি বাথরুম। পর্তুগীজ গোরা পুলিসদের ক্যান্টিন বা মেসের রান্নাঘর এখানেই। তাহার পাশেই সাধারণ রাজনৈতিক কয়েদীদের স্নানের কুয়া ও কাপড় কাচার জায়গা। আমরা পাঞ্জিমের পুলিস কুয়ার্তেল হইতে মানিকোমের পাগলা গারদে চালান হইয়া যাওয়ার পর এই ব্যাক্ ইয়ার্ডটিতে আজকাল নূতন ধরনের 'বক্স সেল', দেখিতে বাক্সের মতো, নূতন হাজত তৈরি করা হইয়াছে। সেগুলি খুব আধুনিক বৈজ্ঞানিক কায়দায় তৈরি করা—তাহার ভিতরে কাহাকেও ঢুকাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে মনে হয় যেন একটা বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহার উপর হইতে কেহ ডালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাহিরের দিকে কোন জানালা দূরের কথা, কোন 'ভেণ্টিলেটর' বা 'স্কাই লাইট' জাতীয় কিছু নাই। অথচ গোটা দালানটা এমনভাব তৈরি, দু'পাশের সারি সারি সেলের করিডরের ভিতর দিয়া খানিকটা আলো হাওয়া চলাচল করার পথ আছে, যাহাতে বাহিরের দিকে তাকানোর কোন পথ খোলা না থাকিলেও দম বন্ধ হয় না—কিন্তু দৃষ্টিপথ বন্ধ হয়। আমি প্রথমে, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে থাকার সময় এগুলি তৈরি হয় নাই। পরের বছর একদিন যখন আমাকে আগুয়াদা দুর্গের জেল হইতে পাঞ্জিমে চোখ দেখানোর জন্য চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে আনা হয়, তখন আরো কয়েকজনের সঙ্গে আসিয়া ঘণ্টা পাঁচ ছয়কের জন্য আমি এই বাক্স-সেলে থাকিয়া গিয়াছি।

সম্মুখে কোলাপ্সিব্ল গেট দেওয়া বলিয়া এক নম্বর সেলের সামনের দিকটা অন্য হাজতের তুলনায় অনেকটা খোলামেলা; অর্থাৎ দরজার গোটা জায়গাটি কোলাপ্সিব্ল লোহার বেড়া দিয়া আটকানো। তাহার ফাঁক দিয়া কিছু আলো-হাওয়া ঘরে ঢোকে বটে। কিন্তু ঘরটি পুলিস কুয়ার্তেলের এক কোণায় বলিয়া এবং সামনে টালির ঢালু ছাদ দেওয়া নীচু বারান্দা থাকার জন্য ঘরের ভিতরটা ঘুপ্‌টি অন্ধকার ধরনের। তার উপরে সে সময়টা ছিল ঘনঘোর বর্ষাকাল। কাজে কাজেই সকালবেলা হইতেই ঘরের ভিতর একটি ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বালাইয়া রাখা দরকার হইত। তাহা না হইলে বাহির হইতে ঘরের আবছা আলো অন্ধকারের ভিতর কয়েদীরা ঘরের ভিতর আছে কি না আছে, কি করিতেছে, পাহারাওয়ালা সান্ত্রীদের পক্ষে তাহা ঠাহর করা সম্ভব হইত না।

সেদিন যখন আমাদের এই গ্যারাজ ঘরের হাজতে ধাক্কা মারিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, তখনই সে ঘরের মধ্যে প্রায় আঠাশ উনত্রিশ জনের মতো লোক আগে হইতে আটক ছিল। এখন আমাদের তিনজনকে নিয়া আমরা একত্রিশ-বত্রিশ জনের মতো হইলাম; অর্থাৎ

ঘরের মেঝের ২৫২ স্কোয়ার ফুটের ভিতর আমাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু হিসাবে আট স্কোয়ার ফুট জায়গা ভাগে পড়িল। ইহার মধ্যেই আবার ঘরের এক কোণায় প্রস্রাবের জন্য ২০।২২টি টিনের ছোট-বড় কৌটা বা বোতল রাখা আছে। তাহার জন্যও আট-দশ স্কোয়ার ফুটের মতো জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। একেবারে সেইসব প্রস্রাবের টিন বা বোতলের ধার ঘেঁষিয়া কেহ দুর্গন্ধে শুইতে পারে না। সেজন্য আরো খানিকটা জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। তাছাড়া, ঘরের মেঝের মধ্যখানটা গ্যারেজের কায়দায় যেখানে ঢালু হইয়া নীচে দরজার দিকে নামিয়া গিয়াছে, সেখানেও লোকজনের শোয়ার খুবই অসুবিধা। এতটুকু ঘরের ভিতর এই রকম গাদাগাদি ভিড়ে শোওয়া দূরে থাকুক সকলের একসঙ্গে ভালো করিয়া বসাও কষ্টকর ছিল। রাত্রে সকলের এক সঙ্গে শোওয়া সম্ভব হইত না—কোনমতে পিঠে পিঠ ঠেকাইয়া ঠাসাঠাসি করিয়া কিছু লোক শুইত, কিছু লোক বসিয়া ঝিমাইত।

তবে এই ঘরটিতে একটি সুবিধা ছিল। ঘরের সামনের দিকে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট থাকায় তাহার ফাঁক দিয়া হাজতে বসিয়া বসিয়া সমস্ত পুলিস কুয়ার্তেলের খবরাখবর নেওয়া যাইত। কুয়ার্তেলে কে আসিতেছে না আসিতেছে, কাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, নূতন রাজনৈতিক আসামীর দল কাহারা আসিল না আসিল—সব কিছু এই হাজতে বসিয়া দেখ যাইত। অন্যান্য হাজতঘরের সম্মুখের দরজায় লোহার মোটা চাদর বা প্লেট দেওয়া কবাট থাকে বলিয়া বাহিরের দিকে তাকানোর বা কোন কিছু দেখার সুযোগ আদৌ ছিল না। সেসব হাজতঘরের দরজার কবাটে একটা করিয়া জাফ্‌রি দেওয়া জানালা বা ফোকর থাকিত বটে; কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া বাহিরে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে সেটা দেখা খুবই কষ্টকর এবং অসুবিধাজনক ছিল। আমাকে মাসখানেক এই কোলাপ্‌সিবল গেট সমন্বিত এক নম্বর হাজতে রাখা হয়। হাজতে ঢোকার দিন হইতে আমি গেটের কাছাকাছি একটি কোণায় আমার আস্তানা গাড়িয়া নিয়াছিলাম এবং প্রত্যেকদিন দিনের বেলায় সারাদিন বসিয়া বসিয়া সেখান হইতে সারা কুয়ার্তেলটার বাহিরের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করিতাম। সকাল ৯টা—১০টা হইতে অফিসার, বাহিরের লোকজন এসবের আনাগোনা শুরু হইত এবং সেই সময় হইতে ১টা—২টা পর্যন্ত প্রবল কর্মব্যস্ততা দেখা যাইত। সাঁ সাঁ করিয়া জীপ, ল্যান্ড-রোভার, ট্রাক বা অন্য ধরনের মোটর ট্রান্সপোর্ট আসিয়া দেউড়ীর ভিতর দিয়া কুয়ার্তেলে ঢুকিতেছে. বাহির হইয়া যাইতেছে। ভারী ভারী মোটর সাইকেলে চড়িয়া পর্তুগীজ গোরা পুলিস কনস্টেবলরা তাহাদের সেইসব মোটরের কিংবা সেগুলির হর্নের বিকট আওয়াজে সকলকে সচকিত করিয়া দিয়া দেউড়ীর বাহির হইতে ঢালু বারান্দা বরাবর উপরে আসিয়া উঠিতেছে কিংবা সেইভাবেই ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। নানা রকম বিচিত্র ইউনিফরম ও উর্দীপরা মিলিটারী ও পুলিস র‍্যাঙ্কের লোক বারান্দা দিয়া আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা আমাদের দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে আমাদের দেখিয়া যাইতেছে। মিস্তী (দো-আঁসলা ফিরিঙ্গী) যুবকেরা, যারা কাসিমির মন্তেইরোর কৃপায় সম্প্রতি গোয়েন্দা পুলিসের কাজে কিংবা পুলিস কুয়ার্তেলের নানারকম বাড়তি কাজে চাকুরীতে ভর্তি হইয়াছে, তাহারা গম্ভীরভাবে যতটা চটপটে ভাব দেখাইয়া পারে গট্‌ গট্‌ করিয়া বারান্দা দিয়া এদিক-ওদিক যাইতেছে। আমাদের হাজতঘরটা এমনই একটা জায়গায় ছিল যে, আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া কাহারও কুয়ার্তেলের ভিতরে ঢোকার বা ঢুকিলে বাহির হইয়া

যাওয়ার উপায় ছিল না। কোন সময় কোন রাজনৈতিক কয়েদীর দলকে বাহির হইতে আনিয়া কুয়ার্তেলের হাজতে ভর্তি করিতে হইলে আমরা তাহাদের দেখিবই। কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে হইলে কিংবা কোর্টে নিয়া যাইতে হইলে আমাদের হাজতঘরের সম্মুখের বারান্দা দিয়া তবে দেউড়ীর দিকে যাওয়া চলিবে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। কাজে কাজেই এই একমাস ধরিয়া পর্তুগীজ পুলিসের রীতিনীতি, ধরনধারণ এসব দেখার বোঝার বা জানার যথেষ্টরকম ভালো সুযোগই যে আমি পাইয়াছিলাম, তাহা বলা যায়।

আমার কাছে তখন সবই নূতন। তাহার উপর না জানি কোঙ্কনী ভাষা, না জানি পর্তুগীজ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী-মারাঠী দিয়া কোনমতে ঘরের সহবন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতেছি। আমাদের ঘরের একটি ছেলে ইংরেজী জানে। একজন পোস্টাল ক্লার্ক ভদ্রলোক এবং তাঁর দুই ভাই পুলিসের বন্দুক চুরি করিয়া জাতীয়তাবাদীদের হাতে দেওয়ার সন্দেহে অভিযুক্ত হইয়া ধরা পড়িয়া আসিয়াছেন। তিনিও মোটামুটি ইংরাজী ও হিন্দী বলিতে পারেন। এইসব নূতন বন্ধুদের সাহায্যে আমার পর্তুগীজ জেল-জীবনের শিক্ষানবীশির কাজে হাতে-খড়ি হইল। তাঁহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পর্তুগীজ পুলিসের রীতিনীতি, কোন্‌টা কি, কাকে কি বলে এসব জিনিস জানিয়া নিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রত্যেকটি হাজতঘরের সামনে একটি কেরোসিন কাঠের বাক্সে বসিয়া একজন করিয়া গোয়ানীজ পুলিস কনেস্টবল, কোমরবন্ধে রিভলবার ঝুলাইয়া আমাদের পাহারা দেয়। অবশ্য শুধু ৪ ঘণ্টার শান্ত্রী ডিউটি ছাড়া তাহাদের অন্য কাজ নাই। ইহার কিছুদিন বাদে গোয়ান পুলিস কনেস্টবলদের এই শান্ত্রী ডিউটি হইতে হঠাইয়া দেওয়া হয়। কারণ পাঞ্জিম পুলিস হেডকোয়ার্টারেই জনকয়েক গোয়ানীজ কনেস্টবল সত্যাগ্রহী রাজনৈতিক বন্দীদের গোপনে সাহায্য করার অভিযোগে ধরা পড়ে। তাহাদের দু-একজন বন্দীদের নিকট হইতে চিঠি নিয়া বাহিরে যোগাযোগ করিতে গিয়া হাতেনাতে ধরা পড়িয়া যায়। কাজেকাজেই পুলিস হেডকোয়ার্টারে হাজত পাহারা দিবার কাজেও গোরা এবং নিগ্রো মিলিটারী সৈন্যদের লাগানো হয়। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ লিসবন হইতে এই সময় বহু সংখ্যায় গোরা পর্তুগীজ কনেস্টবল আমদানী করিতে থাকেন। তাহাদের প্রধান কাজ ছিল গোয়ানীজ পুলিসের উপর নজর রাখা, খবরদারী করা এবং গোয়ানীজ পুলিস বাহিনীকে একটু শক্ত বানানো। সুতরাং সাধারণ শান্ত্রী পাহারার ডিউটি তাহাদের উপর পড়িত না। পড়িত গোরা কিম্বা নিগ্রো সৈনিকদের উপর। কিন্তু ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আমরা যখন পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে ঢুকি তখনও গোয়ান কনেস্টবলদের হাজত পাহারার শান্ত্রীর কাজ হইতে হঠানো হয় নাই: সেটা হয় আরো কয়েক মাস বাদে।

কুয়ার্তেলের হাজতে আমাদের দিন আরম্ভ হইত ভোর সাড়ে চারটা পাঁচটায়। সুব্‌ শেফ্‌ নিজে আসিয়া হাজতের ঘর খুলিয়া দিবেন, তারপর কমপক্ষে দু'জন রাইফেলধারী কনেস্টবলকে আমাদের সম্মুখে পিছনে রাখিয়া সারি বাঁধিয়া আমাদেরকে ব্যাক্‌ ইয়ার্ডের পায়খানা ও কূয়াতলায় নিয়া যাইতেন। সে সময় প্রত্যেকে নিজের নিজের প্রস্রাবের টিন ও বোতল এক হাতে নিয়া, অন্য হাতে খাবার জলের বোতল, গামছা জামাকাপড় যাহার যা কিছু আছে নিয়া, আমরা সেই ৩১।৩২ জন লোক আধ ঘণ্টার জন্য বাহিরে যাইব—সব রকমের প্রাতঃকৃত্য সমাপন, মুখ-হাত ধোওয়া, পায়খানা, স্নান, কাপড়-জামা পরিষ্কার করা, এসব ঐ আধ ঘণ্টার মধ্যে সারিতে হইবে। অন্যান্য ঘরে যেসব বন্দী আছে, তাহারা এক নম্বর

হাজত, দু'নম্বর হাজত এই হিসাবে পর পর এইভাবে বাহিরে যাইবে। তখন বোধ হয় সব মিলিয়া কুয়ার্তেল হাজতের দশ বারোটি ঘরে প্রায় ৮০—৯০ জনের মত রাজনৈতিক বন্দী ছিল। সাধারণ কয়েদী বা বন্দী এক আধজন ভিন্ন ছিল না বলিলেও হয়। এক একটি ঘর খুলিয়া সকলের প্রাতঃকৃত্য, স্নান, কাপড় কাচা, এসব সারিতে সারিতে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগিয়া যাইত।

এসব সারিয়া আবার নিজের নিজের হাজতঘরে ফিরিয়া আসিলে পর প্রত্যেকের জন্য দুটি এক আনা দামের গোল পাঁউরুটি এবং ছোট এক গ্লাস চা বা কফি বরাদ্দ ছিল। বাহিরের একজন হোটেলওয়ালা ঠিকাদারের উপর কুয়ার্তেল হাজতের বন্দীদের জন্য বরাদ্দ খাবার দিবার ভার ছিল; একজন চা-ওয়ালা রেস্তোরাঁ মালিকের উপর ভার ছিল চা, কফি ও পাঁও যোগানোর। সকালে স্নান সারিয়া হাজতে ফিরিতে ফিরিতেই পুলিসের একজন শান্ত্রী সঙ্গে করিয়া চা-ওয়ালা আসিত। কোন কোনদিন গণ্ডগোল হইলে যে পর্তুগীজ গোরা কনেস্টবলটির উপর কয়েদীদের খাবার ব্যবস্থা তদ্বির-তদারকের ভার সেও সঙ্গে আসিত। প্রত্যেক ঘরের সামনে চা-ওয়ালা আসিয়া রোজ জিজ্ঞাসা করিবে—"চাহা কিতীঁ রে, কাফি কিতীঁ? পাঁও"? দুই টুকরা পাঁওয়ের বদলে একটি অলিভ অয়েলে ভাজা চাপাটী বা পরোটাজাতীয় জিনিস পাওয়া যায়। আপনার ইচ্ছা হইলে পাঁউরুটি না নিয়া তাহাও নিতে পারেন। এইভাবে সকালবেলার জলখাবার বা 'refaecaon' (রেফাএসাঁও) শেষ হইলে বন্দীরা সেদিনকার পিটুনীর পালার জন্য, কিংবা ট্রাইব্যুনালের জন্য, কিংবা জেরা জবানবন্দীর জন্য তৈরী হয়—যার অদৃষ্টে যেদিন যেমন জোটে।

॥ ২০ ॥

কুয়ার্তেলের হাজত জীবন : অন্নমন্ত্রী

হাজত জীবনের নিয়মিত রুটিনের মধ্যে মার খাওয়ার কথা শুনিয়া কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে, রোজই সকাল বেলার চা-রুটির পর হাজতে বসিয়া সকলকে একবার করিয়া মার খাইতে হইত। ব্যাপারটা অবশ্য কোনো সময় অতদূর গড়ায় নাই। কিন্তু রোজই কিছু কিছু লোকের নিয়মিতভাবে মার খাওয়ার পালা আসিত, যেমন রোজই প্রত্যেক হাজতের জনকয়েকের মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচারের জন্য কিংবা জবানবন্দীর জন্য হাজির হওয়ার হুকুম আসিত। চা-রুটি খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই যাহাদের আদালতে যাওয়ার কথা, তাহাদের জন্য নাপিত আসিবে। জজের সামনে বা ট্রাইব্যুনালে হাজির করার সময় কয়েদীদের চুল-দাড়ি ভদ্রভাবে কামাইয়া সাফ্-সুত্রা করিয়া নিয়া যাওয়ার নিয়ম। যদি নাপিত না আসে, তাহা হইলে কুয়ার্তেলের চুল-দাড়ি কাটার সেলুনে আপনাকে নিয়া যাওয়া হইবে। এই সেলুনটি কুয়ার্তেলের পুলিস ফোর্সের হেয়ার কাটিং সেলুন। সেখানকার 'শেফ্ দোস্ বার্বেইরুস্' (Chefe dos Barbeiros বা head barber) একজন গোয়ানীজ ক্রিশ্চিয়ান পুলিস কনস্টেবল। তাহার অধীনে তাহার কয়েকজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বা সহকারী আছে, যেমন সব সেলুনেই থাকে। কুয়ার্তেলের

উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারিবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, পর্তুগীজ ও গোয়ান কনস্টেবল পর্যন্ত, সকলেই এই সেলুনে বিনামূল্যে চুল-দাড়ি কামানোর সুবিধা পায়। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য অবশ্য আলাদা নাপিত আছে। সে সেলুনের বুড়া হেড্ নাপিতের ছেলে। কুয়ার্তেলের এবং মানিকোমের পাগলা গারদে আটক প্রায় ২০০-২৫০ জন রাজনৈতিক বন্দীর ক্ষৌরী কর্মের ঠিকা ছিল এই লোকটির উপর। তাহার রোজগারও সেইজন্য তাহার বাপের চেয়ে বেশি ছাড়া কম ছিল না। তবে বাপের কনস্টেবলদের র‍্যাঙ্ক ছিল এবং অভিজ্ঞ ক্ষৌরকার হিসাবে মান-মর্যাদা বেশি ছিল। ছেলে ঠিকায় রাজনৈতিক কয়েদীদের ক্ষৌরকার্য করিত বলিয়া তাড়াতাড়িতে বেশি লোক সারিতে পারিলে তাহার সুবিধা ও আয় বেশি হইত। তাই তাহার হাত এবং ক্ষুর কেমন ছিল, সে-প্রশ্ন না করাই ভালো। তবে পুলিস মহলে তাহার বাবার ওস্তাদ ক্ষৌরশিল্পী হিসাবে নাম ছিল। তাহার হাতের একটা ভালো 'শেভ্' সত্যই আরামের ব্যাপার ছিল; দু'একবার সে আরাম উপভোগ করার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছে। যাই হোক, বাপ বা বেটা দু'জনের যার হাতে আপনার ভাগ্য হয়, আপনার কামানো শেষ হইয়া গেলে আপনাকে তাড়াতাড়ি করিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া নিয়া প্রিজন ভ্যানে গিয়া বসিতে হইবে। এইভাবে আদালতের লোক আদালতে চলিয়া যাইবে। ঠিক এই রকমই প্রত্যহই কিছু লোকের ডাক আসিবে 'পেগুন্তাস'-এর জন্য। 'পেগুন্তাস' (perguntas) কথার অর্থ জেরা বা questioning, interrogation —অবশ্য ইহার আসল অর্থ কুয়ার্তেলের মারের ঘরে নিয়া গিয়া আপনাকে একচোট উত্তম-মধ্যম প্রহার করা হইবে। পুলিসী জেরা বা 'পেগুন্তাস'-এর অজুহাতে রাজনৈতিক কয়েদীদের নিয়মিতভাবে প্রহার করা সালাজারের পুলিসী ব্যবস্থার একটা সাধারণ নীতি। যতদিন পর্যন্ত মিলিটারী আদালতে আপনার সাজা না হইয়া যাইতেছে, যতদিন পর্যন্ত আপনি পুলিস হাজতে পুলিসের হেফাজতে আটক থাকিতেছেন, ততদিন পর্যন্ত আপনাকে মাসে দুই-তিনবার করিয়া কুয়ার্তেলের এই মার দেওয়ার ঘরে আনিয়া পুলিসী জেরার নামে আপনাকে প্রহার করা হইবে। হাজতের প্রত্যেক ঘর হইতে রোজই এই রকম ৪।৫ জন করিয়া বা আরও কিছু বেশি লোকের জেরার জন্য ডাক পড়ে এবং সেটা আরম্ভ হয় সাধারণ দৈনিক চা-রুটির পালার পরই।

ট্রাইব্যুনাল বা 'পেগুন্তাস'-এর জন্য যাহাদের যাইতে হইল না, তাহাদের সেদিনকার মতো আর বিশেষ কোনো চিন্তার কারণ নাই, কোনো কাজকর্মও নাই, খালি চব্বিশ ঘণ্টা আটক থাকা ছাড়া। বেলা গোটা বারোর সময় হাজতের কয়েদীদের জন্য দুপুরের খাবার আসে। আমরা যখন ছিলাম, তখন একজন স্থানীয় হিন্দু হোটেলওয়ালা কণ্ট্রাক্টর তাহার হোটেল হইতে পুলিস পাহারায় নিজের লোকজন দিয়া হাজতের ঘরে ঘরে খাবার দিয়া যাইত। অবশ্য পুলিসের রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে কাহারো কাহারো খাবার যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত না, তাহা নয়। তবে সেটা সাধারণ নিয়ম ছিল না, শাস্তি বা নির্যাতনের রকমফের হিসাবে সেটা ঘটিত। কয়েদীদের যে খাইতে দিতে হইবে, সে দায়িত্ব সাধারণত পর্তুগীজ পুলিসকে অস্বীকার করিতে দেখি নাই। সত্যের খাতিরে বরং একথাই বলিতে হইবে যে খাওয়ার ব্যবস্থা কিংবা খাদ্য যেরকমই হোক, সারাদিনে কয়েদীদের সকলে চা-রুটি ছাড়াও দুপুরে একবার ও রাত্রে একবার যে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে হইবে, সেটা প্রত্যেক পর্তুগীজ হাজতেই মোটামুটি ঠিক ছিল। তবে মন্তেইরোর হুকুমে নির্যাতনের অংগ হিসাবে, কাহাকেও খানিকটা সায়েস্তা করার জন্য হয়ত তাহাকে কোনো ঘরে একলা

আটক রাখিয়া তাহার খাওয়া দু-তিন বেলার জন্য কিংবা কখনো-সখনো দু-তিন দিনের জন্যও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত—সেকথা আলাদা। সেরকম মধ্যে মধ্যে অনেকের ভাগ্যেই ঘটিত, কিন্তু সেটা সাধারণ নিয়ম ছিল না। আটক কয়েদীদের নিয়মিত দুই বেলা খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থার বেশী নড়চড় হইতে দেখি নাই।

দুপুর বেলার ও রাতের খাবার হোটেল হইতে আনিয়া হাজতের ঘরে ঘরে কয়েদীদের দেওয়ার ও তাহাদের খাওয়া দাওয়ার তদারক করার ভার ছিল, আমাদের সময়ে, একজন পর্তুগীজ গোরা কনস্টেবলের উপর। একটু মোটাসোটা, দোহারা নাদুস-নুদুস চেহারার এই লোকটি গোয়ার কোঙ্কনী রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে 'অন্ন মন্ত্রী' বা 'ফুড মিনিস্টার' নামে পরিচিত ছিল। বয়স তাহার বেশী ছিল না, ত্রিশ-প'য়ত্রিশের মতো হইবে; পুলিসের চাকুরিতেও সে বেশী দিন ঢোকে নাই, র‍্যাঙ্কে সে এক বিরলার কনস্টেবল। কিন্তু নিজের পদমর্যাদার গুরুত্ব এবং কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে সে একটু বেশী মাত্রায় সচেতন ছিল। কিছুটা হিউমার-জ্ঞান বর্জিত গোমড়ামুখো লোক, সহজেই চটিয়া ওঠে। তাহাকে নিয়া মজা করিতে আমোদ ছিল। অবশ্য পুলিস কুয়ার্তেলের বিভীষিকাময় আবহাওয়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের সে সুযোগ বেশী না ঘটিলেও বন্দীদের মধ্যে অল্পবয়েসী যারা, তাহারা একথা সেকথা বলিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিয়া রগড় দেখিতে একেবারে ছাড়িত না। অবশ্য তাহাকে নিয়া সবচেয়ে বেশী মজা করিত তাহার সঙ্গী পর্তুগীজ কনস্টেবলেরা এবং সেণ্ট্রি ডিউটিতে নিযুক্ত পর্তুগীজ সৈন্যরা। দু একজন গোয়ান সুব শেফ বা 'মিস্তী' (ফিরিঙ্গী গোয়ান) কনস্টেবলকেও তাহার সঙ্গে রসিকতা করিতে দেখিয়াছি, তবে খুব বেশী নয়। দেশী গোয়ান কনস্টেবলদের মুখে শুনিয়াছি লিসবন গবর্নমেণ্ট যখন গোয়াতে জাতীয় আন্দোলনকে দমাইয়া দিবার জন্য গোয়ান পুলিসদের উপর বেশী আস্থা না রাখিতে পারিয়া পুলিস কনস্টেবল পর্যন্ত খাস পর্তুগাল হইতে আমদানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সময় যাহাদের গোয়াতে পাঠানোর জন্য তাড়াহুড়া করিয়া নূতন রিক্রুট করেন, আমাদের 'অন্নমন্ত্রী' তাহাদের মধ্যে একজন ছিল। ইহাদের চাকুরি নাকি পাকা বা 'পার্মানেণ্ট' চাকুরি ছিল না। গোয়াতে আন্দোলন না থাকিলে বা গোয়ার কাজ ফুরাইলে তাহাদের চাকুরি আর থাকিবে না এইরকম একটা কথা পুলিস মহলে প্রচলিত ছিল। পর্তুগীজ কনস্টেবলদের অনেকে সেই কথা তুলিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিয়া মজা দেখিত। এবিষয়ে ওস্তাদ ছিল আমাদের মানিকোম জেলের ইনচার্জ কনস্টেবল কেরুস। কেরুস অবশ্য দুই 'বিরলা'র পাকা সিনিয়র কনস্টেবল, তাহার সার্জেণ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে। খুব ধীর স্থির অথচ বেশ রসিকতা জ্ঞানসম্পন্ন। অন্নমন্ত্রী হয়ত কোনোদিন সবেমাত্র তার হোটেলওয়ালা বাহিনীর সঙ্গে বন্দীদের খাবার নিয়া তাহাদের ঘরে ঘরে খাবার দিবার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে, কেরুস সেই সময়ে হয়ত দুই তিনজন মিলিটারী সেণ্ট্রি ডিউটীর লোক সঙ্গে জুটাইয়া নিয়া তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিল—"এই পেটমোটা শোন্"! বেচারী কাছে যাইতে খুব গম্ভীর মুখ করিয়া কেরুস বলিবে—"ভাই, বড় একটা খারাপ খবর শোনা গেল! এরা সব (মিলিটারী ছোকরাদের দেখাইয়া) মিলিটারী কুয়ার্তেলে শুনিয়া আসিয়াছে"। "কি খবর?" "সে ভাই আমি বলিতে পারিব না, তুমি ওদের মুখ হইতেই শোন।" এইভাবে ভূমিকা করিয়া টীকা টিপ্পনী সমেত তাহারা সকলে মিলিয়া তাহার সামনে যে গল্প ফাঁদিবে, তাহার মর্ম এই রকম যে, মিলিটারীর লোকেরা তাহাদের কুয়ার্তেলে অফিসারদের বলাবলি করিতে শুনিয়া আসিয়াছে যে, ডাঃ সালাজার ঠিক করিয়া

ফেলিয়াছেন, গোয়াকে আর পর্তুগালের রাখা যাইবে না, গোয়া ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; আর গোয়াতে কাজ করার জন্য লিসবন হইতে যাহাদের আনা হইয়াছে, পুলিসের লোক, মিলিটারীর লোক, সকলকেই দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কেহ হয়ত তখন মুখ আরও লম্বা এবং গম্ভীর করিয়া বলিবে—'আমাদের আর কি, ভালই হইবে দেশে ফিরিয়া যাইব এই হতচ্ছাড়া দেশে কে থাকিতে চায়?' কেহ বলিবে—'কিন্তু অনেকের তো চাকরি যাইবে'। 'কাদের'? 'এই ধর আমাদের সিনর পেট-মোটার? ওর চাকরিতো এখনও পাকা হয় নাই? গোয়া স্বাধীন হইলে ও বেচারার কি হইবে'? এই পর্যন্ত গল্প অগ্রসর হইতে না হইতেই 'অন্নমন্ত্রী' ঘোঁত ঘোঁত করিয়া উঠিবে—'বাজে কথা! এরকম হইতেই পারে না, গোয়া পর্তুগালের অধীনে চিরকাল আছে, চিরকাল ধরিয়া থাকিবে। ডাঃ সালাজার কিছুতেই গোয়া ছাড়িবেন না!' 'আহা-হা জানো না ডাঃ সালাজার যে আমাদের পেট-মোটার বোনাই?'—এইভাবে ক্রমে হৈ চৈ শুরু হইয়া যাইবে। অন্নমন্ত্রী ক্রমে ক্রমে হাত পা ছুঁড়িয়া প্রায় নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিবে। বাকিটা পাঠক আন্দাজ করিয়া নিতে পারেন।

রোজ দুপুরে এবং সন্ধ্যায় হোটেলবাহিনীসহ আমাদের একবার 'অন্নমন্ত্রী'র দেখা মিলিত। সকলে ঠিকমত খাবার পাইতেছে কিনা, খাইয়া দাইয়া থালাবাটি ঠিক ঠিক বাহির করিয়া দিতেছে কিনা, এই সব তম্বির তদারক করার ভার ছিল 'অন্নমন্ত্রী'র উপর। কাহারো শরীর অসুস্থ থাকিলে যদি খাওয়া অদল-বদল করার দরকার হয়, কিম্বা কেহ ভাত না খাইয়া রুটি খাইতে চায় বা কোনদিন ধর্মকর্মের অঙ্গ হিসাবে ফলমূল খাইতে বা উপবাস করিতে চায়—অন্নমন্ত্রীকে বলিতে হইবে। লোকটি নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল বলিয়া কিছু খাতির-তোষামোদের বশ ছিল। কোনো কোনোদিন নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য আজগুবি আজগুবি ধরনের হুকুম জারি করিত। কোনোদিন হয়ত সে হুকুম জারি করিবে, এখন হইতে হাজত ঘরের সম্মুখে হোটেলের লোকেরা থালায় থালায় খাবার দিয়া গেলে, সেই ঘরের কয়েদীদের প্রত্যেককে বাহিরে আসিয়া নিজের নিজের আলাদা থালা ভিতরে নিয়া যাইতে হইবে; খাওয়া হইয়া গেলে নিজের নিজের থালা বাহিরে রাখিয়া যাইতে হইবে, কেহ অন্য কাহারো থালা বা খাবার ছুঁইতে পারিবে না। কোনোদিন আবার হয়ত তার হুকুম জারি হইল, একজন ছাড়া কেউ খাবার থালা ভিতরে আনার জন্য বা খাওয়া শেষ হইয়া গেলে সেগুলিকে বাহিরে রাখিয়া দেওয়ার জন্য ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিবে না। এইসব হুকুম জারি করার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক তর্জন গর্জন বা চোটচাপটও সে কম করিত না। কিন্তু অল্পবুদ্ধির লোক হইলেও এবং পুলিসের লোক হইলেও মোটের উপর লোকটি খারাপ ছিল না। কাহারো অসুখবিসুখ হইলে হোটেলের লোকেদের আবার হোটেলে পাঠাইয়া তাহার জন্য কাঞ্জি ভাত কিম্বা একটু দুধের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে সে কোনো সময়ে দ্বিধা করিত না। তাহার চোটপাট যে কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের উপর চলিত তা নয়, হোটেলের চাকরবাকর বা কর্মচারীরাও কয়েদীদের পাওনা খাবার দিতেছে না বা কোনো ফাঁকি দিতেছে, ইহা জানিতে পারিলেও সে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করার চেষ্টা করিত। তাহার চোটপাট বা ধমক-চমকের মধ্যে 'সাডিজম' বা পর নির্যাতন প্রবণতার কোনো নিদর্শন ছিল না। গোয়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দরুণই তাহার চাকরি জুটিয়াছে বলিয়া হয়ত সত্যাগ্রহীদের জন্যে মনের কোণায় প্রচ্ছন্ন একটুখানি সহানুভূতি থাকিয়াও থাকিবে। কিন্তু সে যাই হোক, পর্তুগীজ সাধারণ মানুষদের মধ্যে

যে একটা সহজ মানবিকতা বোধ লক্ষ্য করিয়াছি (অবশ্য মন্তেইরো-অলিভেইরার গোয়েন্দা পুলিস বাদে) এই লোকটির ভিতরেও তাহার অভাব আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। যদিও সময় সময় আমার উপরেও সে হম্বি-তম্বি করিতে ছাড়ে নাই। অনেকদিন পর্যন্ত তাহার ধারণা ছিল আমি গোয়ান সত্যাগ্রহী, সেইজন্য বোধ হয় হম্বি-তম্বির মাত্রাটা একটু বেশী হইয়া থাকিবে। 'বুর্‌রো' (Burro=গাধা), কাঁও (Cao=কুকুর), 'পুলগুয়েদু' (Pulguedo=Vermin; মশা, মাছি, পোকামাকড়) এবং আরো দু' একটি অমুদ্রিতব্য সম্বোধন প্রায়ই তাহার মুখে শুনিয়াছি। মাড়গাঁও সত্যাগ্রহের তরুণ জনপ্রিয় নেতা ফাবিয়ান দা কস্তা-র সঙ্গে আমার প্রায় মাসখানেক এক সেলে থাকার সুযোগ হইয়াছিল। অন্নমন্ত্রী আমাদের উদ্দেশ্যে যেসব সম্বোধন প্রয়োগ করিতেন, তাহার অর্থ ফাবিয়ানের নিকট হইতেই জানি। ফাবিয়ানের উপর আমাদের অন্নমন্ত্রীমশায় একটু বেশীরকম চটা ছিলেন। কারণ ফাবিয়ান প্রথম পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে আসিয়া মন্তেইরো-র কাছে প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে কয়েকদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক করিয়াছিলেন। অন্নমন্ত্রীর ধারণা ছিল, তাহাকেই বিশেষ করিয়া অপদস্থ করা ফাবিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেই ফাবিয়ানেরও শরীর কোনোদিন অসুস্থ থাকিলে অন্নমন্ত্রী তাঁহার জন্য যতটা পারা যায় ফল বা দুধের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করে নাই। মিলিটারী ট্রাইবুনালের বিচারে আমার সাজা হইয়া যাওয়ার অনেক পরে সে জানিতে পারে যে আমি একজন ভারতীয় সত্যাগ্রহী 'শেফ' বা লীডার; এবং শুধু তাই নয় আমি একজন 'পালিতিকো' (Politico=পলিটিসিয়ান বা রাজনীতির লোক, যারা রাজনীতি করে) এবং 'পার্লামেন্তারি দানাভো দেলহী' বা নয়াদিল্লীর পার্লিয়ামেন্টের মেম্বার। তাহার পর হইতে আর সে আমায় ধমক চমক্ করিত না। হোটেলের চাকরদের ধম্‌কাইয়া চম্‌কাইয়া যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সম্ভব আমার খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কি খেয়াল হয়, একদিন আসিয়া আমার অটোগ্রাফ ও নাম ঠিকানাও লিখাইয়া নিয়া গিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"সিনর, ইহা তোমার কি কাজে লাগিবে"। সিনর সেদিন প্রথম হাসিয়া রসিকতা করিয়া জবাব দিয়াছিল—"কি জানি, তোমরা তোমাদের দেশের নাম করা লোক, পোলিতিকো, শেফ্! কে জানে হয়ত কোনো দিন তোমার সাহায্যেই আমার একটা হিল্লা হইয়া যাইবে।" পরে আমরা সকলে যখন আগুয়াদা দুর্গে বদলী হইয়া যাই তখন গোরে, শিরুভাউ, মধু লিমায়ে, ঈশ্বরভাই সকলের মুখেই—ইহার সম্পর্কে আমার ধারণার অনুরূপ ধারণা দেখিয়াছি। মোটের উপর, বেচারী নূতন পুলিসের চাকরী নিয়া পর্তুগাল হইতে আসিয়াছে বটে এবং আমাদের উপর কর্তৃত্ব জাহির করার জন্য সময় সময় হম্বি-তম্বির সঙ্গে আমাদের ধমক-চমক্ করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু মনেপ্রাণে পাজী বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক বলিয়া ইহাকে আমাদের কোনো সময়ই মনে হয় নাই।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পালা চুকিয়া যাওয়ার পর আবার একটানা একঘেয়ে চুপচাপ বসিয়া থাকা। হাজত ঘরে যারা অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সী তাহারা মধ্যে মধ্যে মেঝের কোথাও একটু জায়গা করিয়া নিয়া বাঘবন্দী কি ঐ জাতীয় খেলা বা দশ-পঁচিশ বা কড়ি খেলা জাতীয় খেলা খেলিয়া সময় কাটাইত। স্থানীয় কোঙ্কনী গোয়ান বন্দীদের মধ্যে অল্প-স্বল্প গল্প-গুজবও যে চলিত না তা নয়, কিন্তু সে দিক দিয়া অন্ধকূপ হাজতে যাহারা থাকিত তাহাদের সুবিধা ছিল বেশী। কারণ হাজত ঘরের দরজা একবার বন্ধ হইয়া গেলে ঘরের ভিতর কে কি করিতেছে তাহা কেহ বেশী দেখিতে আসিত না। এক আধবার সান্ত্রী-পাহারাও'লা

হয়তো দরজার ফুকরের কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া কে কি করিতেছে দেখিয়া গেল। তা না হইলে ঘরে বসিয়া খেলাধুলা করিয়া বা গল্প করিয়া সময় কাটানোর পথে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু আমাদের ঘরটায় কিছুটা মুশকিলের ব্যাপার ছিল। ঘরের দরজার দিকটায় একটি কোলাপসিবল গেটের বেড়া ছাড়া আর কিছু আড়াল ছিল না, বাহির হইতে সব কিছু দেখা যাইত। খেলার সময় বা গল্প-গুজবের ফলে সামান্য একটু গুঞ্জনের আওয়াজ বা হৈ-চৈ-এর উপক্রম হইলেই পাহারার সান্ত্রী ধমক দিতে চাহিত। সম্মুখে বা কছে পিঠে কোনো পর্তুগীজ অফিসার থাকিলে ধমকের মাত্রা বা আওয়াজটা কিছু বেশী হইত। দু এক সময় সুব শেফ্ বা কোনো পর্তুগীজ 'কাব্ দা গুয়ার্দ' (Cabo da guard=হাবিলদার বা কর্পোরাল) ছুটিয়া আসিয়া ধমকাইয়া খেলা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিত। কিন্তু তার ভিতরেই একটু আড়াল-আবডাল দিয়া খেলাধুলা গল্পগুজব চলিত, যতটা পারা যায়।

এইভাবে বিকাল-সন্ধ্যা কাটিয়া গেলে সন্ধ্যায় বন্দীদের ঘরে ঘরে সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ হইত। এটা বন্দীদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। পর্তুগীজরা ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান বলিয়া আমাদের মন্দির, ধুপধুনা, মালা জপ বা পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাহাদের খুব বেশী তফাৎ নাই। সন্ধ্যা বেলায় হাত জোড় করিয়া সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করা বা গান করার মধ্যে তাহারা খুব আপত্তি করার কিছু দেখে না। Prayer 'ওরাসাঁও' বা 'রেজা' (oracao বা reza) জিনিসটা মোটের উপর ভালই এইরকমই তাহারা মনে করিত। সুতরাং সন্ধ্যা বেলায় অর্থাৎ prayer বেলায় বন্দীরা একসঙ্গে বসিয়া গান করিয়া ঈশ্বর প্রার্থনা বা উপাসনা করিতে চাহিলে বাধা দিত না। সন্ধ্যাবেলায় তাই এই আধ ঘণ্টা সময়ে খনিকটা আনন্দের ও বৈচিত্র্যের সুযোগ ছিল Community singing এবং prayer-এর ভিতর দিয়া। অন্যদিকে সারা দিনের ভিতর হাজতে বসিয়া এই একটি সময়ে কিছুটা প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রাখার চেষ্টাকে রূপ দেওয়া চলিত, প্রার্থনার ভিতর দিয়া পর্তুগীজদের অজানিত দু-একটি জাতীয় সংগীত গাহিয়া। সাধারণ ঈশ্বর উপাসনা মনে করিয়া পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষ এইসব সংগীত সম্পর্কে ততটা কেয়ার করিতেন না। আমি যতটা দেখিয়াছি শুনিয়াছি পর্তুগীজ পুলিস এক 'জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে' ছাড়া আমাদের অন্য রাজনৈতিক সংগীত বা জাতীয় সংগীতের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তা ছাড়া সাধারণত সন্ধ্যাবেলায় পুলিস কুয়ার্তেলের আশেপাশে গোয়েন্দা অফিসার বড় কেহ একটা থাকিত না। দুপুরের লাঞ্চের পর 'সিয়েস্তা' বা দিবা নিদ্রা দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ করার রীতি স্প্যানিশ-পর্তুগীজ ভদ্রলোকদের বড় একটা নাই। কাজে কাজেই এক 'জন-গণ-মন' ছাড়া প্রার্থনার সময় অন্য যে কোনো রাজনৈতিক সংগীত গাওয়াতে কোনোই বাধা হইত না। তবে ইহার মধ্যে আমরা সকলেই প্রথমে যে গানটি গাহিতাম, তাহা ছিল—"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম"। আমাকে যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং আমার রাজনৈতিক মতবাদ ও কাজের কথা যাঁহারা অল্প-বিস্তর খোঁজ খবর রাখেন, সেইসব বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাদের কল্পনার চোখে আমাকে কোনো নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী অহিংস আশ্রমিকের মতো, সকলের সঙ্গে বসিয়া হাত জোড় করিয়া 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গান গাওয়ার ভূমিকায় দেখিয়া নিশ্চয়ই খুব কৌতুক বোধ করিবেন। কিন্তু পাঞ্জিম হাজতে আমি আমার মনের দিক দিয়া কোনো মতেই এই প্রার্থনার সঙ্গে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারি নাই। গোয়ার জাতীয় আন্দোলন

সম্পর্কে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখিতে হইবে, এই আন্দোলন আদর্শবাদের দিক দিয়া জাতীয়তাবাদের যে প্রথম রোমাণ্টিক স্তর তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই। সালাজারের ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক শাসনের বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়িয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের মানসিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও সেখানে রাজদ্রোহ। গোয়ার রাজনৈতিক পরিবেশে পাঞ্জিম হাজতে প্রতিদিনকার সেই "রঘুপতি রাঘব" উপাসনা তাই ভারত সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রের এক মহান অঙ্গীকার হিসাবে আমার মনে প্রতিভাত হইয়াছিল। অসহায় গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীরা ভারতের সঙ্গে ঐক্য ও সংযুক্তির দাবী তুলিয়া যে অত্যাচার নির্যাতনের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন মনে মনে এই গানের ভিতর দিয়া ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাহাদের আনুগত্য জানাইয়াছে; আজও জানায়। আমাদের পরিচিত "রঘুপতি রাঘব" উপাসনার কয়েক লাইনের সঙ্গে গোয়ার কোনো অখ্যাত অজ্ঞাত সঙ্গীতকার একটি অতিরিক্ত কলি জুড়িয়া দিয়াছিল,

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম"—ইহার পরেই
"মন্দির মসজিদ তেরে ধাম" এই কলির সঙ্গে ফিরিয়া আর একবার
"মন্দির ইগ্রেজ তেরে ধাম" দোহার।

'ইগ্রেজ' বা 'ইগ্রেজা' কথার অর্থ গির্জা চার্চ। বাংলা ভাষার 'গীর্জা' কথা পর্তুগীজ 'ইগ্রেজ' শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে ষোড়শ সপ্তদশ শতক হইতে চলিয়া আসিয়াছে: মারাঠী-কোঙ্কনীতে মূল 'ইগ্রেজ' বা 'ইগ্রেজ' শব্দই ব্যবহার হয়। গোয়ার ক্রিশ্চিয়ানদের কথা মনে রাখিয়া দোহারটুকুতে মসজিদ মন্দিরের সঙ্গে 'ইগ্রেজ' কথাটুকু কে যেন জুড়িয়া দিয়াছে।

পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজত ঘরের ছোটো ইলেকট্রিক বাল্‌বের ক্ষীণ আলোয় আমরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন বন্দী ভারত-ভাগ্য-বিধাতা প্রজানুরঞ্জক ভগবান রামচন্দ্রের নাম স্মরণ করিয়া আমরা সকলে যে এক ও অভিন্ন, সেই কথা নিজেদের মনে গাঁথিয়া নিবার চেষ্টা করিতেছি। খালি আমাদের ঘরেই নয়, হাজতের অন্য যে ঘরে একাধিক গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী আছে, সেখানেই এই গান দিয়া সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ হইতেছে। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখি একপাশে তরুণ ক্রিশ্চিয়ান ফের্নান্দিস জোয়াঁও আলবের্তে অন্যদিকে বিচোলী বাজারের মহম্মদ ওস্তাগর, মাঝে ভগৎ তুলসীরাম, নাসিকের সেই ছোট ছেলেটি, আমি নিজে। আশেপাশে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শ্রেণীর গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী, তাহাদের কেহ-বা সারস্বত ব্রাহ্মণ, কেহ মারাঠা, কেহ ক্ষত্রিয় দেশাই। সকলে গলা মিলাইয়া এক সুরে গাহিয়া চলিয়াছি।

ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
মন্দির মসজিদ তেরে ধাম
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
মন্দির ইগ্রেজ তেরে ধাম
পতিত পাবন রাজা রাম............

আমার জীবনে ভারত-আত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে কখনো অনুভব করি নাই। প্রতি সন্ধ্যায় কমপক্ষে অন্তত পাঁচ সাতখানি গান গাওয়া হইবে। দু চারটি মারাঠা প্রার্থনার মাঝে মাঝে একটি দুটি রাজনৈতিক সঙ্গীত। এই সান্ধ্য উপাসনার ভিতর দিয়াই গোয়ার লোককবি গজানন বায়কতের "আজলা ত্রিবার মঙ্গলবার, স্বাতন্ত্র্যাচী সিংহগর্জনা আঁতা ইয়ে

উঠনার" বা "প'ুয়ে চলা প'ুড়ে চলা প'ুড়ে! রউন চলা পনজীবরী বিজয়ী ঝাণ্ডে" গোয়া মুক্তি আন্দোলনের এইসব জনপ্রিয় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

উপাসনা শেষ হইয়া যাইতে না যাইতেই সন্ধ্যাবেলার খাবার আসিয়া যাইবে। তখন আবার কিছুটা হৈচৈ, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে তাও শেষ হইয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ার শেষে আবার কিছুটা একঘেয়ে রকম জাগিয়া থাকা, যতক্ষণ ঘুম না আসে। অবশ্য আমাদের হাজতে সকলে একসঙ্গে শুইয়া ঘুমানো এক মহাহাঙ্গামার ব্যাপার ছিল। তবু উহারই মধ্যে সকলে যত্ন করিয়া আমার জন্য কিছুটা জায়গা করিয়া দিতই। গোয়াবাসী সহবন্দীরা তাহাদের সাধ্যমত আমার কোনো অসুবিধা হইতে দিত না। আমার শোয়ার জায়গা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের দু' তিনজন হয়ত ভালো করিয়া শুইতে বা বসিতেও পারিত না। কিন্তু আমার ওজর-আপত্তিতে কান না দিয়া আমার জন্য একটু জায়গা না করিয়া দিয়া তাহারা নিজেরা কোন দিন শুইতে যাইত না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত হাজতে আধো-জাগ্রত, আধো-তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, কখনো একটু ঘুমাইয়া কখনো পাহারাওয়ালার হাঁকে ডাকে জাগিয়া উঠিয়া খানিকটা জাগিয়া জাগিয়া থাকিয়া আমাদের রাত কাটিয়া যাইত।

॥ ২১ ॥

এক নম্বর হাজতের কাহিনী

পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে ঢোকার পর হইতে আমার মনে যেসব প্রশ্ন জাগে, তাহার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল ঃ প্রথম, ইহারা এখন আমাকে নিয়া কি করিবে? দ্বিতীয়, ইহারা আমাকে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে এক সঙ্গে রাখিল কেন? এ দুই প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করিতে আমার খুব বেশীদিন লাগে নাই, তবে একেবারে প্রথমেই ব্যাপারটা ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাহার কারণ, পর্তুগীজ পুলিস পারতপক্ষে ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের একত্র এক হাজতে থাকিতে দিত না। হাজতে স্থানাভাবে তাহাদের সময় সময় এই পলিসির ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে বটে। কিন্তু সাধারণত যে-সব ভারতীয় বন্দীকে একদিন বা দুইদিন হাজতে রাখিয়া ছাড়িয়া দিবে বলিয়া তাহারা ঠিক করিত মাত্র তাহাদেরকেই গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে রাখা হইত। অন্যান্য বাছাই করা বন্দীদের কোনো সময়েই তাহারা গোয়ার বন্দীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকিতে বা গোয়াবাসী বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশা করার সামান্যতম সুযোগ দিতে চাহিত না। ইহার অনেক পরে—আগুয়াদা দুর্গে বদলি হওয়ার পর—আগুয়াদার মিলিটারী কমাণ্ডাণ্ট লেফটেনাণ্ট আকোঁসো কস্তা আমার কাছে সোজাসুজি স্বীকার করিয়াছিলেন—"তোমাদের আলাদা রাখার কারণ, তোমরা আমাদের 'প্রজা'দের মাথায় আজে বাজে সব 'আইডিয়া' ঢুকাইয়া দিবে এটা আমরা চাই না।' কারণ যাহাই হোক, যে-সব ভারতীয় বন্দীকে তাহারা বেশীদিনের জন্য আটক রাখিবে তাহাদের গোয়াবাসী বন্দীদের সংস্পর্শে আসিতে না দেওয়াই ছিল পর্তুগীজ পুলিসের সাধারণ নিয়ম। কাজে কাজেই আমার বেলায় সে নিয়ম যখন আলগা করা হইল, তখন

প্রথমটায় আমি নিজে এবং এক নম্বর হাজত ঘরের আমার সহবন্দীরা সকলেই ধরিয়া নিয়াছিলাম যে, আমাকেও হয়ত উহারা বেশীদিন রাখিবে না। খুব বেশী হইলে সাত-আট দিন রাখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আমার আগে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার অধ্যাপক বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডেকে পর্তুগীজরা মাত্র ক'দিন রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে আমাকেও তাহারা ছাড়িয়া দিবে, ভারত পার্লিয়ামেণ্টের কোনো সদস্যকে তাহারা বেশীদিন আটক রাখিতে সাহস পাইবে না এই ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হয়। দেশপাণ্ডে হাজতে পর্তুগীজ পুলিসের কাছে মার খাওয়ার ফলে আমি যে ধরা পড়ার সময় মার খাওয়ার হাত হইতে বাঁচিয়া যাই, তাহা কেন ও কিভাবে ঘটে সে কথা উপরে বলিয়াছি। কিন্তু প্রহারের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ফলে আমি আটক পড়িয়া গেলাম। আর শুধু আটকই পড়িলাম না। পাঞ্জিম হাজতে ঢোকার পরের দিন হইতে রীতিমত দুর্ভোগ ও বে-ইজ্জতির পালা শুরু হইয়া গেল। উপরের হুকুমে আমার গায়ে হাত না দিতে পারার ফলে ডাঃ সালাজারের 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিস এবং মন্তেইরোর পিটুনী পুলিসদের মনে যে আক্ষেপ থাকিয়া গিয়াছিল, আমাকে পাঞ্জিমে আনার পরের দিন হইতে কিভাবে সুদে-আসলে তাহা পূরণ করিয়া নেওয়া যায়, সেইটা দাঁড়াইয়া গেল অলিভেইরো-মন্তেইরো কোম্পানীর প্রধান চিন্তা। আমাকে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে এক হাজতে এক সাথে রাখার কারণও কতকটা তাই। ভারত হইতে যখন পর পর ভারতীয় সত্যাগ্রহীদল আসিতে আরম্ভ করিল, পর্তুগীজ ভারতের বড়লাট জেনারেল পাউলো বের্ণার্দ গেদীস পুলিসের সঙ্গে এবং লিস্বন সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের পারতপক্ষে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে রাখা হইবে না। বেশীর ভাগকেই মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই বুদ্ধির কাজ হইবে। তাহার কারণ প্রথমত, গোয়াতে অত লোককে আটক রাখার মত অত জেলও নাই। তাছাড়া, খরচপত্রের প্রশ্নও আছে। সত্যাগ্রহীদের ধরিয়া ধরিয়া আফ্রিকাতে মোজাম্বিক কিংবা আংগোলায়, অথবা খাস পর্তুগালে কিংবা সমুদ্রপারে কোনো পর্তুগীজ দ্বীপে চালান দেওয়ার কথাও যে ওঠে নাই তা নয়। ইতিপূর্বে গোয়ার বহু রাজনৈতিক বন্দীকে এভাবে সমুদ্রপারে চালান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় বন্দীও যে ছিলেন না তা নয়। শ্রীদত্তাত্রেয় দেশপাণ্ডে আজও নির্বাসিত অবস্থায় পর্তুগালে আছেন। পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া তিনি লিসবনের উন্মাদাগারে দিন কাটাইতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া এখন একেবারে ঢালাওভাবে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের আফ্রিকায় বা বিদেশে সমুদ্রপারে চালান দিতে চাহিলে ভারত গভর্নমেণ্ট চুপ করিয়া মুখ বুঁজিয়া তাহা সহ্য করিবেন, তাহা নাও হইতে পারে। বরং ইহা নিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে সারা দুনিয়া জুড়িয়া পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে গোয়ার ব্যাপার নিয়া বিরাট হৈ চৈ করার সুবিধা হইয়া যাইবে। ভারত নৌ-বাহিনীর ক্রুজার 'আই-এন-এস দিল্লী' ইহার কিছুদিন আগে যে একবার গোয়া হইতে রাজনৈতিক বন্দীদের সমুদ্রপারে জোর করিয়া চালান দেওয়া হইতেছে এই সন্দেহ করিয়া একটি পর্তুগীজ জাহাজকে মাঝ-সমুদ্রে থামাইয়া খানা-তল্লাসী পর্যন্ত করিতে চাহিয়াছিল, গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ সে-কথা তখনো ভোলেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের মনে তখনও বেশ কিছুটা ভয় থাকিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের যে এরকম ভাবে বিদেশে নির্বাসনে পাঠানো যাইবে না বা দিতে গেলে তাহার ফলাফল খুব ভাল হইবে না, ইহা বুঝিয়াই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সত্যাগ্রহী-

দের যতটা পারা যায় ঠেঙ্গাইয়া তাড়ানোর নীতি গ্রহণ করে। এ বিষয়ে মন্তেইরোর পরামর্শ তাঁহাদের খুব কাজে লাগে। মন্তেইরো ইংরেজ আমলে যে কিছুদিন বোম্বাই পুলিসের সার্জেণ্টের কাজ করিয়া গিয়াছিল সে কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সত্যাগ্রহীদের কিভাবে ঠেঙ্গাইয়া সিধা করিতে হয় ভারত হইতে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের সময় সে সে-বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ফিরিয়াছে। কাজে কাজেই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাছে—এমন কি লিসবন হইতে আগত সালাজারের 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের বড় সাহেবদের কাছেও—মন্তেইরোর পরামর্শের যথেষ্ট দাম ছিল। মোটের উপর সকল দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এইটাই ঠিক হয়, সত্যাগ্রহীরা যখন ভারতের জাতীয় পতাকা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র শস্ত্র নিয়া আসিতেছে না তখন তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া উত্তম-মধ্যম ঠেঙ্গানি দিয়া বিদায় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। ঠেঙ্গানি দেওয়ার সময় এমনভাবে শিক্ষা দিয়া দিতে হইবে যে, পর্তুগীজ পুলিসের লাঠির বাড়ি কিরকম, সহজে তাহার কথা যেন ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের মন হইতে মুছিয়া না যায় বা ভুলিয়া দ্বিতীয়বার গোয়ায় ফিরিয়া আসার শখ যেন কাহারো না হয়। জেনারেল বের্ণার্দ গেদীস্ ইহার উপরে বুদ্ধি খাটাইয়া স্থির করেন সত্যাগ্রহী দলের নেতা বা লীডার হইয়া যাহারা আসিবে তাহাদের মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করিয়া আইনত সাজা দিতে হইবে। বেশীর ভাগ সত্যাগ্রহীকে মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হোক তাহাতে আপত্তির কিছু নাই; কারণ আটক রাখিলেই খাইতে দিতে হইবে, খরচ লাগিবে। কিন্তু তাহা হইলেও সত্যাগ্রহীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হিসাবে যাহারা আসিবে তাহাদের কয়েকজনকে বাছাই করিয়া বিচারের জন্য সোপর্দ না করিলে বা আইনত শাস্তি না দিতে পারিলে, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট এবং পর্তুগীজ আইন-আদালতের মর্যাদা থাকিবে কি করিয়া? অবশ্য ইহার ভিতরে কূটনীতি বা 'হাই ডিপ্লোমাসি'-ও যে কিছুটা ছিল না তা নয়। পরে পর্তুগীজ পুলিস ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তায় আভাসে ইঙ্গিতে যতটুকু জানিতে পরিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে, আমাদের কয়েকজনকেও আটক রাখাটা আদৌ ঠিক হইবে কিনা সেটা গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। পরে লিস্বনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া স্থির হয়, সত্যাগ্রহীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে লম্বা শাস্তি দিয়া আটক রাখিলে, পরে তাহাদের মুক্তির প্রশ্নকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে প্রয়োজন মত রাজনৈতিক দরকষাকষি করার সুবিধা হইবে। গভর্নর জেনারেল বের্ণার্দ গেদীস্ এবং পর্তুগীজ ভারতের তখনকার 'শেফ্ দে গাবিনেত্' (Chefe de Gabinet) বা শাসন পরিষদের চীফ্ সেক্রেটারী, কাপ্তেন কার্মো ফেরেইরা, ইঁহারা দুজনে পর্তুগালের বৈদেশিক মন্ত্রী ডাঃ পাউলো কুন্যা এবং ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে শেষ পর্যন্ত আমাদের কয়েক-জনকে বাছাই করিয়া আটক রাখার ও যথারীতি ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। মন্তেইরো নানা সাহেব গোরের কাছে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াও ফেলিয়াছিল—"অমি তোমাদের ধরিয়া রাখিতে চাহি না; কিন্তু কি করিব, আমার উপর গভর্নর জেনারেল আছেন, তাঁহার উপরে লিস্বন গভর্নমেণ্ট আছে; আমাদের কথায় তো আর সব কাজ হয় না!"

সে যাই হোক, অধ্যাপক বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডেকে ছাড়িয়া দেওয়ার পরেও আবার আর একজন পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য সত্যাগ্রহী দলের নেতা হিসাবে গোয়ায় আসিতেছে শুনিয়া এবার প্রথম হইতেই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ ব্যক্তিকে আটক

রাখিতে হইবে। ইহাকে সহজে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সুতরাং আমাকে গ্রেপ্তার করার সময় যে প্রহার করা হইবে না বা আমার শরীরে হাত দেওয়া হইবে না, যতটা পারা যায় আমার উপর কোনোপ্রকার শারীরিক নির্যাতন না করিয়া পঞ্জিম কুয়ার্তেলে নিয়া গিয়া আমাকে আট্‌কাইয়া রাখা হইবে এবং যথাসময়ে বিচারের ও শাস্তি দেওয়ার জন্য মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে আমাকে হাজির করা হইবে—আমার সম্পর্কে এসব সিদ্ধান্ত আমি গোয়ার ভিতরে গিয়া পর্তুগীজ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই মোটামুটিরকম স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া ডাঃ সালাজারের পেয়ারের 'ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস' —'পিদে'— তাহাদের এক্তিয়ার ছাড়িবে কেন? সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং রাজদ্রোহ দমানোর জন্য খাস্‌ লিস্‌বন হইতে তাহারা গোয়ায় আসিয়াছে। সুতরাং আমাকেও কিছুটা শিক্ষা না দিয়া তাহারা ছাড়িবে কি করিয়া? তাহারা তাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল—'বেশ, গোরে, লিমায়ে, দেশপাণ্ডে-র মত ইহাকে না হয় নাই মারধোর করা হইল? কিন্তু হাতে না মারিয়া অন্যভাবে শোধ তোলা যায় না?' আমাকে পঞ্জিম কুয়ার্তেলে আনিয়া এক নম্বর হাজতঘরে রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য একটি ছিল ইহাই।

এই ঘরে যে আঠাশ-ঊনত্রিশজন লোককে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন বলিয়া আটক রাখা হইয়াছিল তাহাদের কাহারো বিরুদ্ধে—দুইজন স্কুলের ছাত্র অল্‌ভারিস ও ফের্নান্দিস ছাড়া, স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠে তাহারা ভারতীয় জাতীয় পতাকা টাঙগাইয়া রাখিয়াছিল —কোনো আইন-অমান্যের বা নির্দিষ্ট অপরাধ করার অভিযোগ ছিল না। তাহাদের কেহ প্রত্যক্ষভাবে গোয়ার ভিতরকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বা অন্য কোনোপ্রকার প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য গ্রেপ্তর হইয়া আসে নাই। ইহাদের মধ্যে দু' চারজন যে রাজনৈতিক কর্মী ছিল না তা নয়। কয়েকজন গোপনে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের কিংবা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী আজাদ গোমন্তক দলের সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্ক রাখিত। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পর্তুগীজ পুলিসের নির্বিচার দমননীতি অনুযায়ী ঢালাও গ্রেপ্তারের বেড়াজালে আট্‌কা পড়িয়া হাজতে আসিয়াছে। এই ধরনের লোকেদের উপর মারধোর করা সোজা। ইহাদের উপর মাত্রাহীন অত্যাচার করিয়া জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায় সহজে। চল্‌তি পর্তুগীজ-কোঙকনী পরিভাষায় এক নম্বর হাজত ঘরের বেশীর ভাগ লোক ছিল 'সুস্‌পেইত্‌' ('suspeito' বা 'suspect' কথার অপভ্রংশ)। কোথাও হয়ত গোপনে পর্তুগীজ-বিরোধী রাজনৈতিক হ্যাণ্ডবিল বিলি হইয়াছে; কোনো গ্রামের বাজারে হয়ত গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের পোস্টার দেখা গিয়াছে কিংবা কোনো শহরে কেহ হয়ত কোনো সরকারী বাড়ির উপর ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে—তাহা হইলেই হইল, গ্রামসুদ্ধ লোককে পুলিস প্রথমে কোমরে দড়ি দিয়া কাছাকাছি যে থানা বা কুয়ার্তেল থাকিবে সেখানে আনিয়া পিটাইবে। তারপর তাহাদের ভিতর হইতে বাছাই করা কিছু লোককে জেলা পুলিস কুয়ার্তেলে নিয়া গিয়া হাজতে দু' তিন মাস আটক রাখা হইবে এবং জেরা-জবানবন্দীর নামে মধ্যে মধ্যে মারের ঘরে নিয়া গিয়া পিটানো হইবে। ইহাদের ভিতর হইতে আরও কিছুটা বাছাই করিয়া বা যাহাদের নামে গোয়েন্দাদের রিপোর্ট আসিবে (অনেক সময় গ্রেপ্তারের পরে গোয়েন্দাদের খোঁজ খবর করিয়া রিপোর্ট দিতে বলা হয়) তাহাদের 'সুস্‌পেইতো' হিসাবে আনা হইবে পঞ্জিমের বড় কুয়ার্তেলে। এখানে তাহাদের

এক মাসও থাকিতে হইতে পারে, আবার ছয় মাস নয় মাস পর্যন্ত থাকিতে হইতে পারে —কতদিন থাকিতে হইবে সেটা নির্ভর করে 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের মর্জির উপর, কারণ, এসব ব্যাপারে পঞ্জিম কুয়ার্তেলে তাহারাই কর্তা। যাহার গায়ে রাজনীতির একটু ছোঁয়াচ আছে, যাহাকে একটু ঘন ঘন ভারতে কারওয়ার বা বেলগাঁও কি সাবন্তবাড়ীর দিকে আসা যাওয়া করিতে দেখা গিয়াছে, যে হয়ত বেলগাঁওয়ের কোনো কংগ্রেসী জনসভায় উপস্থিত ছিল বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে (গোয়েন্দাদের রিপোর্টে এই ধরনের যেমন তেমন একটা কিছু অভিযোগ থাকিলেই হইল) তাহা হইলেই আর কথা নাই। এরকম কোনো লোককে আমি সাধারণত ছয় হইতে আট মাসের আগে হাজত হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখি নাই। আর এই ছয় মাস বা আট মাসকাল ধরিয়া—যাহার ভাগ্যে যেরকম হয় —তাহাদের শুধু আট্‌কাইয়া রাখাই হইবে না। প্রতি দশ পনেরো দিন অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে তাহাদের প্রত্যেককে এক এক করিয়া কুয়ার্তেলের পিছনদিকে কয়েদীদের প্রহার দেওয়ার যে বিশেষ ঘর আছে সেখানে নিয়া গিয়া 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতিতে নৃশংসভাবে প্রহার করা হইবে। আগেই বলিয়াছি, এটা পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজত-জীবনের সাধারণ রুটিনের মধ্যে। সাধারণ লোকের মনে নিছক আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এত ব্যাপক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা আমি আমার অভিজ্ঞতায় কোথায় দেখি নাই। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্যাতন বা শারীরিক অত্যাচার কম হয় নাই। বিপ্লবী সন্দেহে বৃটিশ পুলিসের জেলেও চৌদ্দ-পনেরো বছর থাকার সৌভাগ্য, আরো অনেক বন্ধু ও সহকর্মীর মতো আমারও হইয়াছে। কিন্তু নানান্ কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিসী নির্যাতনের উপর কিছুটা বিধিনিষেধের সীমানা টানা ছিল। আইনত প্রতিকার চাওয়ার ও প্রতিকার পাওয়ার দু' একটি পথ খোলা ছিল! কিন্তু শুধু গোয়াতে কেন, খাস পর্তুগালেও সালাজার আমলে (এক খোদ সালাজার সাহেব এবং সালাজারের 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র খেয়ালখুশী বা মর্জি ছাড়া) 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিস বা 'পিদে'র দমননীতি ও নির্যাতনের উপর কোনো বিধি-নিষেধ দেওয়া নাই বা তাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার নাই। গোয়াতে 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের এই ঢালাও দমন-নীতি বা নির্যাতন নীতির একটা দিক প্রযুক্ত ছিল, রাজনীতির সঙ্গে বেশী সংশ্লিষ্ট নয়, হয়ত খুব দূরে থাকিয়া যে-সব লোক গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ক্ষীণ সহানুভূতি দেখাইয়াছে বা দেখাইতে পারে, এমন লোকেদের বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষভাবে ও সক্রিয়ভাবে যাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত আছে বা সবকিছু জানিয়া শুনিয়া তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে তাহাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালাইয়া গায়ের ঝাল মিটানো যায় কিন্তু সেভাবে তাহাদের মনে বা জনসাধারণের মনে কোনো আতঙ্ক বা ভীতি সৃষ্টি করা যায় না। তাহা করিতে হইলে রাজনীতির সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক তত ঘনিষ্ঠ নয়, শারীরিক অত্যাচার ও নির্যাতন বেশী করিয়া চালানো দরকার তাহাদের উপর। তাহা হইলে তাহাদের মুখে মুখে সেই অত্যাচারের কথা ছড়াইয়া পড়িয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনো অংশ গ্রহণ করা বা তাহাকে সমর্থন করা সম্পর্কে সহজেই সাধারণ লোকের মনে ব্যাপকভাবে বিভীষিকা সৃষ্টি করা যায়। পুলিসের এবং গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা সম্পর্কে লোকের মনে একটা প্রবল ভয়ের ভাব বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সুতরাং জাবেদা বা ঢালাও গ্রেপ্তারের ফলে যে-সব 'সুস্পেইত্' হাজতে আসে, মার-ধোরটা তাহাদের উপর একটু বেশী মাত্রায় চলে।

আমাদের এক নম্বর হাজত ঘরটা ছিল প্রধানত এইসব অপেক্ষাকৃত নিরীহ 'সুস্‌পেইতো'-দের ঘর। আমাকে এখানে রাখার কারণ, আমাকে খানিকটা নাকাল বা নাজেহাল করা। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কারণ আমাকে যতটা পারা যায় নাকালের চূড়ান্ত করিয়া গোয়ার সাধারণ রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একটা 'পলিটিকাল এফেক্টে'র সৃষ্টি করা—যাহাতে গোয়াতে লোকে এটা বুঝিয়া যায় যে, ভারত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য বলিয়া পর্তুগীজ সরকার আমাকে কোনরকম রেয়াৎ করিতেছে না, পর্তুগীজ পুলিস সকলকেই টিট্ করিতে জানে।

আমাকে মারা হইবে না, বা আমার উপর কোনপ্রকার শারীরিক নির্যাতন করা হইবে না। আমার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের এই হুকুম পুলিসের উপর থাকিলেও, 'পিদে'-র লোকেরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করে, অত সহজে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়াটাও ঠিক হইবে না। নাও যদি আমাকে মারা হয়, আমাকে অন্যভাবে সমঝাইয়া দিতে হইবে পর্তুগীজ জেল কি জিনিস। তাছাড়া, আমাকে যখন হাতে পাওয়াই গিয়াছে তখন আমাকে সকল রকমে নাজেহাল করিয়া এবং অপমানের চূড়ান্ত করিয়া গোয়ার সাধারণ রাজনৈতিক বন্দীদের চোখের সামনে এটাও দেখাইয়া দিতে হইবে যে, তাহাদের কাছে ভারত পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার হোক, আর যেই হোক, কাহারো কোনো খাতির নাই। ভারত পার্লিয়ামেণ্টের একজন মেম্বারের এত দুর্গতি সত্ত্বেও ভারত সরকার বা নেহরু কিছু করিতে পারিতেছেন না, ইহা দেখিলে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীরাও এটা বুঝিয়া যাইবে যে, ভারতের উপর বা নেহরুর উপর ভরসা রাখিয়া বেশি কিছু লাভ নাই। অর্থাৎ কতকটা ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখানোর বিপরীত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া, বৌকে (পরের মেয়ে, বাহিরের লোক) মারিয়া ঝিকে (নিজের মেয়ে, গোয়ার লোক) শেখানোর কায়দায় গোয়ার বন্দীদের সঙ্গে আমাকে রাখিয়া আমার উপর কিছুটা জোর-জুলুম বা অত্যাচার চালানো হয়। এক নম্বর হাজত ঘরের বর্ণনা আগেই দিয়াছি। হাজতে বন্ধ হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, মোটামুটি নিজের অবস্থাটা একটু বুঝিয়া নিয়া আমি আমাদের হাজতের শান্ত্রী পাহারাকে ডাকিয়া বলিলাম,—"একজন অফিসারকে ডাকিয়া দাও, আমি কথা বলিতে চাই।" আধ ঘণ্টা বাদে সেদিনকার ডিউটিতে যে 'সুব্ শেফ্' ছিল সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কি চাই?' আমি তাহাকে জানাইলাম—"আমি কিছু চাই না, তবে আমি একজন ইণ্ডিয়ান সিটিজেন, ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেণ্টের একজন মেম্বার; তোমরা আমাকে এইরকম অপরিচ্ছন্ন ঘরে বে-আইনীভাবে রাখিতে পারো না। আমি এখনি আমাদের দেশের কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তোমার উপরওয়ালাদের জানাও, আমাকে আমাদের কন্সালের সঙ্গে দেখা করিতে দিতে তাঁরা আইনত বাধ্য। সেটুকুর বন্দোবস্ত তাঁহারা করুন এবং যদি সম্ভব হয় আমাকে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন বা কম লোক যেখানে আছে এমন হাজত ঘরে নেওয়ার বন্দোবস্ত করুন—আমি এ ঘরে থাকিব না।" এই 'সুব্ শেফ্'টি একজন গোয়ান মিস্তী, ইংরাজী বোঝে কিন্তু বলিতে পারে না। আমাদের ঘরে আলভারিস্ নামে যে ছেলেটি ছিল সে কিছুটা পর্তুগীজ জানে, ইংরাজীও জানে। 'সুব্ শেফ্' সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া বলিল—"ইহাকে বল, আমি ইহার কথা 'আজেন্তে'র কাছে রিপোর্ট করিতেছি। কন্সালের সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত 'আজেন্ত' করিবে। আমি সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিব না।" আমি ভাবিলাম, ইহার পরে হয়ত 'আজেন্ত' নামীয় জীবের সঙ্গে দেখা হইবে। তাহার কাছে আবার ঘর বদলের ও কন্সালের সঙ্গে দেখা করার দাবী জানাইব। কিন্তু মিনিট

দশেক বাদে হাজত ঘরের সামনে যাহারা দেখা দিল তাহারা কেউ 'আজেন্ত' নয়। তাহারা কয়জন পর্তুগীজ পুলিসের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বিভাগের প্রতিনিধি; জমকালো পোশাকে জরীর জাব্বা-জোব্বা, ঝালর লাগানো, বুকে নীল, লাল ও সোনালী রংয়ের কাজ করা এনামেলের চাক্তি ব্যাজ—"Policia Internacional de defesa do Estado"—সালাজারের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সংরক্ষণ বাহিনী বা সংক্ষেপে PIDE। অর্থাৎ পর্তুগালে সালাজারী গেস্টাপো বাহিনীর কয়েকজন অফিসার আমাদের হাজত ঘরের সম্মুখে আসিয়া উদিত হইল এবং তাহাদের একজন আঙ্গুল-ইশারায় আমাকে সম্মুখে আসিতে হুকুম করিল।

॥ ২২ ॥

সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস

এতগুলি লোক আমায় ডাকাডাকি করিতেছে দেখিয়া আমি হাজতের দরজার দিকে আগাইয়া গেলাম। দরজার কোলাপ্সিবল গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুন্ডাগোছের যাহার চেহারা, কানের দু পাশে লম্বা ধরনের ল্যাটিন ফ্যাশনের রুডল্ফ ভ্যালেণ্টিনো জুল্‌ফি, কাইজারী-হিন্দ ধরনের চুম্‌রান গোঁফ, চোখে একটি আটকোণা রিমলেস অথচ সোনার হাতলওয়ালা চশমা, শার্টের হাতা কনুইয়ের কাছে যেখানে গুটানো সেখানে একটা সোনার তাবিজ দেখা যাইতেছে, ধমকের সুরে চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'সতিয়াগ্রাহী' অর্থাৎ সত্যাগ্রহী? আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম যে হাঁ, আমি তাহাই বটে। 'ইন্দিয়ানো' ভারতীয়? আবার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। 'পার্লামেন্তারিও ইন্দিয়ানো'? বুঝিলাম আমি ভারতের পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য কি না, তাহা জানিতে চাহিতেছে। উত্তর দিলাম—'ইয়েস্'। দেখি উহাদের সঙ্গে একজন গোয়ানীজ মিস্তী যুবক দাঁড়াইয়া আছে, আমি 'ইয়েস' বলিতেই সে তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'সিং সিং'। বুঝিলাম সে দোভাষীর কাজ করিতেছে। কিন্তু মাত্র একদিন গোয়া বাসে আমার পর্তুগীজ ভাষাজ্ঞান 'সিং-সিং'-র অর্থ ভেদ করা পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই (পর্তুগীজ 'সিং' বা 'Sim' কথার অর্থ 'হাঁ')। কিন্তু সেই 'সিং-সিং' উত্তর জুল্‌ফিওয়ালার কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া এবং আরো জোরে জোরে চিৎকার করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই—"ওহ! ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার! পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার! ওরকম অনেক পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার আমার দেখা আছে। তুই বেটা ভুলিস না এটা তোদের নয়াদিল্লী নয়, এটা পাঞ্জিম। এখানে আমাদের রাজত্ব, তোদের নেহরুর রাজত্ব নয়, মামার বাড়ি নয়, যা খুশি চাহিলেই এখানে পাওয়া যাইবে না। ওঃ ইনি আবার এই ঘরে নাকি থাকিবেন না! ওঁর জন্য বুঝি একটা বাগানসুদ্ধ ভিলা চাই? যা না, তোর নেহরু......'র কাছে চাহিয়া পাঠা......"। ইহার পরে তাহার কথা আর উদ্ধৃতব্য বা মুদ্রিতব্য নয়। আমার সুবিধা ছিল পর্তুগীজ ভাষা তখন কিছুই বুঝিতাম না, গালাগালিও বুঝিতাম না। অবশ্য লোকটির ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং চিৎকার শুনিয়া এটুকু

বুঝিতেছিলাম যে, কিছু অশ্রাব্য গালাগালি আমার উপর বর্ষিত হইতেছে। মিস্তী দোভাষী যুবক বেচারী সঙ্কোচেই হোক, আর অশ্লীল পর্তুগীজ গালাগালির সম্যক ইংরাজী পরিভাষাজ্ঞানের অভাবেই হোক (কে আর ইংরাজী শেখার সময় ইংরাজদের অশ্লীল পরিভাষা আয়ত্ত করে?), ততক্ষণে একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছে। এইভাবে খানিকক্ষণ গালাগালি ও ধমক-চমক করিয়া ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের এই দলটি চলিয়া গেল। আবার ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক পরে আর একদল আসিয়া আবার এই ধরনের গালাগালি। মধ্যে মধ্যে হাতের রবার ট্রাঞ্চিয়ন উঁচাইয়া মারিতে আসার ভান করিত; কিন্তু মারিত না। সারাদিনে ৩।৪ বার এই রকম। অবশ্য বেলা একটা-দুইটার পরে সাধারণতঃ আর কেহ গালাগালি দিতে আসিত না; কারণ, ততক্ষণে সকলে দুপুরের সিয়েস্তা করিতে চলিয়া যাইত।

কয়েকদিন এইভাবে চলিল। বুঝিলাম, আমাকে প্রহার না করার শোধ তুলিয়া নেওয়া হইতেছে। আমি মধ্যে মধ্যে একবার করিয়া দাবী জানাই—আমি এক নম্বর হাজত-ঘরে এভাবে থাকিতে রাজী নই, আমাকে আমাদের কন্সালের সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হোক। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের এক-একটি দলও তাহার উত্তরে রোজ তিন-চারবার করিয়া এইভাবে দল বাঁধিয়া আসিয়া আমাকে গালাগালি করিয়া যায়। ইহার মধ্যে উপরোক্ত জুল্‌ফিওয়ালাটি প্রায় প্রত্যেকটি দলের সঙ্গেই আসিত। কয়েকদিন বাদে এই লোকটির সামনেই আমাকে জবানবন্দীর জন্য হাজির করা হয়। ইহার পুরা নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি; তবে সকলে তাহাকে 'আলেশান্দ্র' (Alexandre) নামে ডাকিত। তবে এটি তাহার উপাধি, নাম নয়; তাহার ডাকনাম বা ক্রিশ্চিয়ান নামের অনেকগুলি শব্দের মধ্যে একটি। কিন্তু নাম ধাম যাই হোক, নিছক 'সাডিজম' বা নৃশংস অত্যাচার প্রবণতায় ইহার জুড়ি আমি বড় বেশি দেখি নাই। ইহার অত্যাচারের একদিনকার কাহিনী এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আমার তখন পঞ্জিম পুলিস হেফাজতে কয়েক মাস থাকা হইয়া গিয়াছে। পঞ্জিম কুয়ার্তেলের গারদে তখন আমি নাই। নানা সাহেব, শিরুভাই, মধু লিমায়ে, জগন্নাথ রাও, রাজারাম পাতিল—আমরা সকলে তখন মণিকোমের পাগলা গারদে বদলি হইয়া গিয়াছি। হঠাৎ একদিন আমার পুলিস কুয়ার্তেলে যাওয়ার ডাক পড়িল; আমার জবানবন্দীর দু'একটি জায়গা ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের কাছে পরিষ্কার ঠেকিতেছে না। সেইজন্য আমাকে ফের নূতন করিয়া জেরা করা হইবে। এই সময় আমি যে জেলে থাকিতাম তাহার তিন চারিটি সেল তফাতে একটি সেলে কামাথ নামে একজন লোককে আটক রাখা হইয়াছিল। সেদিন আমার সঙ্গে প্রিজন ভ্যানে করিয়া তাহাকেও কুয়ার্তেলে নিয়া যাওয়ার হুকুম আসে। সেদিন মাত্র আমাদের এই দুই জনেরই কুয়ার্তেলে যাওয়ার পালা আসে। কামাথ 'সুস্‌পেইতো' বা রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে আটক থাকিলেও সকলেই জানিত যে, সে একজন ভিক্ষাজীবী এবং আধা-পাগল গোছের অতি নিরীহ ব্যক্তি। বিচোলী কিংবা মাপ্‌সার কাছে কোনো গ্রামের বাজারে সে থাকিত। তাহার কোনো নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি ছিল না; আত্মীয়-স্বজন বলিতে কেহ ছিল না। বলা বাহুল্য, রাজনীতির সঙ্গে তাহার কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। Tramp বা ভবঘুরে জাতীয় লোক যেমন হয়, যদি কেহ তাহাকে দয়া করিয়া খাইতে দিল তাহা হইলে খাইল; না হইলে না খাইয়াই সারাদিন কাটাইয়া দিল। ক্ষুধা পাইলে এর-ওর কাছে গিয়া খাবার বা পয়সা চাহিয়া নিত; এর ওর দাওয়ায় রাত্রিবেলা ঘুমাইয়া থাকিত।

মাথা খারাপ ভিখারী ভবঘুরে হিসাবে সকলে কামাথকে জানিত, বাজারের সকলেই সেই হিসাবে তাহাকে কিছুটা দয়াও করিত, নিতান্ত নিরীহ লোক বলিয়া ভালও বাসিত। ইতোমধ্যে কামাথের দুরদৃষ্ট! একদিন সে যে বাজারে থাকিত সেখানে গোপনে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সত্যাগ্রহের কিছু হ্যান্ড-বিল বিলি হয়। কে বিলি করিয়াছে; কখন বিলি হইয়াছে, স্থানীয় পুলিস কোনই সন্ধান পায় নাই। তখন থানায় সেই এলাকার পুলিসের গোয়েন্দা ইনফরমারদের ডাক পড়িল। পুলিসের মারমূর্তি দেখিয়া নিজেদের চাকুরী বাঁচানোর গরজে তাহাদের একজন কামাথের নাম করিয়া দেয় এবং বলে—"কামাথ পাগলের ভান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমি উহাকে অমুক দিন একজন বাহিরের অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়াছিলাম এবং সেই অপরিচিত লোকটিকে উহার হাতে একটি কাগজের বান্ডিল দিতে নিজের চোখে দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, ঐ বান্ডিলেই এই সব হ্যান্ড-বিল ছিল।" আর যায় কোথা? সঙ্গে সঙ্গে থানা পুলিস, সিকিউরিটি পুলিস এবং মিলিটারী পাঠাইয়া কামাথকে গ্রেপ্তার করিয়া, হাত-কড়া লাগাইয়া থানায় নিয়া আসা হইল। কিন্তু তিন-চার দিন ধরিয়া থানার হাজতে রাখিয়া মারধোর করার পরেও যখন তাঁহার মুখ হইতে কোন স্বীকারোক্তি বাহির করানো গেল না, তখন সেখানকার পুলিস নিরুপায় হইয়া কামাথকে পঞ্জিম কুয়ার্তেলে পাঠাইয়া দিল। সেখানে ইন্টারন্যাশনাল পুলিসের বড় কর্তারা আছেন, তাঁহারা যাহা পারেন করুন। কামাথ বেচারী সেই সময় হইতে পুলিস হেফাজতে আটক হইয়া আছে। আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন কামাথের পুলিস কুয়ার্তেলে সাত-আট মাসের উপর আটক থাকা হইয়া গিয়াছে। এই সাত-আট মাসের মধ্যে সালাজারের ইন্টারন্যাশনাল পুলিসের নিয়ম ও রুটিন মাফিক তাহার কমপক্ষে পনরো-ষোলোবার পিটুনী ঘরে গিয়া সেখানকার স্পেশ্যাল পিটুনী খাওয়া হইয়া গিয়াছে। নিরীহ, আধা-পাগল এই লোকটি যে জীবনে কাহারও অনিষ্ট করে নাই, এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চোরের মার খাইয়া আতঙ্কে, ভয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গিয়াছে। তখন আর সে সংলগ্নভাবে কথা বলিতেও পারে না। কাহাকেও দেখিলে ভয়ে ঘরের কোণায় গিয়া আত্মগোপন করিয়া পালাইয়া থাকিতে চাহিত। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে চমকাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত। আমাদের ঘর হইতে মাত্র কয়েকটি সেল ওপাশে থাকে বলিয়া হতভাগ্যের সেই কাতর আর্তনাদ অনেক সময় রাত্রে আমাদের কানেও আসিয়া পেঁছাইত।

কুয়ার্তেলে যাওয়ার হুকুম আসিতে কামাথ সেদিন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার সঙ্গে প্রিজন-ভ্যানে করিয়া কুয়ার্তেলে চলিল। আমার মতই কামাথও পূর্ববর্ণিত আলেশান্দরে-র জিম্মায় ছিল। প্রহরীরা আমাদের আলেশান্দরে-র কামরায় হাজির করার সঙ্গে সঙ্গে আলেশান্দর অপর একজন অফিসারের দোভাষীর সাহায্যে আমায় জানাইল, আমাকে তাহার আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে—"Muito a perguntar"। তবে তাহার খাস দোভাষী আজও কাজে আসে নাই। সুতরাং আমাকে এখন অপেক্ষা করিতে হইবে (অর্থাৎ খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে); ইতোমধ্যে সে অন্য কাজে যাইতেছে। এই বলিয়া সে প্রহরীদের ইশারায় কামাথকে তাহার পিছনে পিছনে আনার জন্য হুকুম করিয়া পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এই ঘরটি কুয়ার্তেলের স্পেশ্যাল পিটুনী ঘরগুলির মধ্যে অন্যতম। সেই ঘরের দরজায় যমদূতের মতো একজন নিগ্রো মিলিটারী শান্ত্রী সঙ্গীন-খাড়া রাইফেল নিয়া পাহারা দিতেছে। অথচ দুই ঘরের মধ্যের দরজা অল্প-একটু ফাঁক করিয়াও

রাখা হইয়াছে। আমার ধারণা, আমাকে অপর ঘরের ভিতর যে অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইবে তাহা দেখানোর জন্য ইচ্ছা করিয়াই দরজাটা একটুখানি খোলা রাখা হইয়াছিল, যেন আমি বুঝিয়া যাই আমার ভাগ্যেও প্রয়োজনমতন এই পুরস্কার জুটিতে পারে। আলেশান্দর, কামাথ সেই ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার করিয়া কি একটা প্রশ্ন করিয়াই মারের 'তক্তা' দিয়া তাহার মুখের একপাশে প্রচণ্ড একটি ঘা মারিল। কামাথ আচমকা ঘা খাওয়ার সেই ধাক্কা এবং টাল সামলাইয়া ফের সোজা হইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই তক্তার বাড়ি তার গায়ে মাথায় পিঠে অবিরাম আসিয়া পড়িতে শুরু করিল।

এখানে সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের উদ্ভাবিত মারের বিশেষ পদ্ধতির কথাটা একটু বর্ণনা করা দরকার। এটা তাহাদের গোয়ার পেটেণ্ট। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস কিল, চড়-চাপড়, ঘুঁষি এ-সব অপেক্ষাকৃত মৃদু দাওয়াই যে প্রয়োগ করিত না, তাহা নয়। কিন্তু তাহাদের প্রহারের আসল অস্ত্র রবার ট্রাঞ্চিয়ন্ এবং বিশেষ ধরনে তৈরি কেরোসিন কাঠের একটি তক্তা। রবার ট্রাঞ্চিয়ন্ দিয়া মারার সুবিধা এই, ইহাতে গায়ে কোনো মারের দাগ থাকে না। কোনো সময় এক-আধটু ফোলা দাগ কোথাও যদি থাকেও অল্পেই তাহা মিলাইয়া যায়। শুনিয়াছি হিটলার আমলে নাৎসীরা এবং মুসোলিনীর সময়কার ফ্যাসিস্টরা মারধোরের সময় এই রকম শক্ত রবারের ট্রাঞ্চিয়ন্ ব্যবহার করিত। আমাদের দেশে পুলিস যে রকম কাঠের ডাণ্ডা বেটন হিসাবে ব্যবহার করে, এও সেইরকম, খালি শক্ত রবারের তৈরি আর চামড়া দিয়া মোড়া। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি (আমার অন্যান্য সহবন্দীদেরও অভিজ্ঞতা আমারই মতন) কাঠের বেটনের চেয়ে রবারের ট্রাঞ্চিয়নের মারটা গায়ে লাগে বেশি। তবে কাঠের বেটনের ঘা হাড়ের উপর পড়িলে অনেক সময় চামড়া বা মাংস থেঁৎলাইয়া কাটিয়া যায়, রবার ট্রাঞ্চিয়নে কখনও কাটে না। সালাজার এখন য়ুরোপের সবচেয়ে বনেদী ফ্যাসিস্ট। পিলসুডস্কি, মুসোলিনী, হিটলার, এঁরা য়ুরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে বহুদিন হইল বিদায় নিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম-সাময়িক সালাজার আজও টিঁকিয়া আছেন (সালাজার প্রথম ১৯২৬-২৭ সালে ক্ষমতা দখল করেন)। আর তাঁহার সঙ্গে সমস্ত পর্তুগীজ সাম্রাজ্য জুড়িয়া টিঁকিয়া আছে ফ্যাসিস্ট শাসনের প্রতীক চিহ্ন রবার ট্রাঞ্চিয়ন্। কিন্তু সালাজারী ফ্যাসিজম্ খালি রবার ট্রাঞ্চিয়নের প্রতীক চিহ্নটুকু নিয়া সন্তুষ্ট থাকে নাই—তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাথা খাটাইয়া বিভিন্ন রকমের মারের বা প্রহারের যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে।

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন লেখক জন গান্থার তাঁর 'ইন্‌সাইড আফ্রিকা' বইয়ে উল্লেখ করিয়াছেন পর্তুগীজ পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় (পূর্ব আফ্রিকায় পর্তুগীজ উপনিবেশের নাম মোজাম্বিক, রাজধানী লোরেঞ্জো-মারকুয়েস; পশ্চিম আফ্রিকায় আংগোলা, রাজধানী লুয়াণ্ডা। পর্তুগাল সাম্রাজ্যের বিস্তার আফ্রিকার ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্সের পরই আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে পর্তুগালের স্থান।) নিগ্রো সাধারণ লোকেদের পাশ নিয়া চলাফেরা করিতে হয়। যদি কোনো সময় কোনো নিগ্রো বিনা পাশে ধরা পড়ে, তাহা হইলে থানায় নিয়া গিয়া তাহাকে হাজতে ভরিয়া পিং-পং বা টেবিল টেনিস ব্যাটের মত তৈরি কাঠের একটি গোল তক্তা দিয়া মারা হয়। সেই তক্তাটির মধ্যে মধ্যে আঙ্গুল-প্রমাণ চওড়া ছিদ্র করা থাকে। চামড়ার উপর যেখানে সেই তক্তার বাড়ি পড়িবে সঙ্গে সঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া যাইবে কিংবা ফোস্কা পড়িয়া ফাটিয়া রক্ত পড়িবে। গান্থার লোরেঞ্জো-

মার্কুয়েসের পুলিসের বড়কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনারা এভাবে মারধোর না করিয়া যাহাদের পাশ থাকে না তাহাদের আইনত জেলে পাঠাইয়া সাজা দেন না কেন?" সে ভদ্রলোক হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন—"সিনর গান্থার, এটা বুঝিতেছেন না কেন, এভাবে খরচা কত কম পড়ে? হাঙ্গামা কত কম? এক-এক বেটা নিগ্রোকে একবার এভাবে ধরিয়া ভালো করিয়া পিটাইয়া দিতে পারিলে আর সে ভুলেও বিনা পাশে বাহির হওয়ার সাহস করিবে? জেলে পাঠাইতে গেলেই খরচা! কোর্টে পাঠাইতে গেলেই খরচা! আমরা অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া বিনা খরচে পিটাইয়া বেটাদের ঢিট্ করিয়া দেই।"*

গোয়াতেও ইন্টারন্যাশনাল পুলিসের লোকেরা হাজতে মারধোর বা নির্যাতন করার জন্য কাঠের তক্তাই ব্যবহার করে, তবে সেগুলি টেবিল টেনিসের ব্যাটের মতো গোল নয়। বরং কতকটা ক্রিকেট ব্যাটের মতো যদিও অতো ভারি নয় এবং তাহার দুই দিকই প্লেন বা সমান। চব্বিশ হইতে ছাব্বিশ ইঞ্চি লম্বা একটি শক্ত কেরোসিন কাঠের তক্তা, আধ ইঞ্চি হইতে পৌনে এক ইঞ্চির মতো পুরু; তাহার এক দিকে ক্রিকেট ব্যাটের মতো একটা হাতল (অর্থাৎ ধরার জন্য তক্তার এক দিক খানিকটা সরু করিয়া কাটা)। এই তক্তা দিয়া সমস্ত শরীরে যাহাকে আগা-পাছ-তলা করিয়া পিটানো বলে, সেইভাবে পিটানো ইন্টারন্যাশনাল পুলিসের সাধারণ রীতি। তাহাদের হাতে যে কয়েদী আসিবে তাহার আর উপায় নাই। এই তক্তার মার খাইয়া সমস্ত শরীরে কালশিরা এবং চামড়া-ফাটা দগদগে ঘা নিয়া তাহাকে পিটুনি-ঘর হইতে ফিরিতে হইবে। এক-আধ দিন নয়; রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে সে যতদিন হাজতে থাকিবে দশ দিন, পনরো দিন অন্তর তাহাকে এইভাবে মার খাইতে হইবে। খুব উঁচু অভিজাত বংশের লোক না হইলে বা ধনী পরিবারের লোক না হইলে (অর্থাৎ যে সব লোকের আত্মীয়-স্বজনরা গিয়া হয়ত গভর্নর জেনারেলকে কিংবা পুলিস কমাণ্ডাণ্টকে ধরাধরি করিতে পারে, তদ্বির করিতে পারে তাহাদের ছাড়া) সাধারণতঃ এই তক্তা-পিটুনী হইতে (যতদিন না সে আদালতে সোপর্দ হইতেছে) কাহারও সাধারণতঃ অব্যাহতি নাই।

কামাথের শরীরের উপর নির্বিচারে সেই পিটুনী-তক্তার মার আসিয়া পড়িতেছে আমি এ-ঘর হইতে দেখিতেছি, যদিও দরজা আধ-ভেজানো বলিয়া সবটা দেখিতে পাইতেছি না। দরজার সামনে রাইফলধারী নিগ্রো শান্ত্রী; তাহাকে ঠেলিয়া কামাথকে বাঁচাইতে যাওয়ার উপায় নাই। বেচারী কামাথ অসহায়ভাবে মাটিতে পড়িয়া কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করিতেছে, গোঁ-গোঁ করিয়া গোঙাইতেছে। খানিকক্ষণ এইভাবে মার খাওয়ার পর অজ্ঞান হইয়া গেল। তখন কুয়ার্তেলের পুলিসের ডাক্তার তাঁর দৈনিক রাউণ্ডে আসিয়াছিলেন, তাঁহার

---

* কিন্তু পর্তুগীজ ইস্ট আফ্রিকা ও ওয়েস্ট আফ্রিকায় তাই বলিয়া নিগ্রো এবং সাদা চামড়ার লোকেদের মধ্যে আইনত কোনো বর্ণবৈষম্য নাই। নিগ্রোরা লেখাপড়া শিখিয়া ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন করিলে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স দিতে পারিলে দরখাস্ত করিয়া আইনত যে কোনো সাদা চামড়ার লোকের মতো পর্তুগীজ নাগরিকের অধিকার অর্জন করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ নিগ্রোই এত গরীব যে তাহাদের পক্ষে এত ট্যাক্স বা ফি দিয়া পর্তুগীজ সাহেব সাজা সম্ভব হয় না। ফলে আংগোলা এবং লোরেঞ্জো-মার্কুয়েসে সবসুদ্ধ দেড় কোটির মতো নিগ্রো অধিবাসীদের মধ্যে হাজার পঞ্চাশ-ষাটের বেশি নাগরিক অধিকারসম্পন্ন লোক নাই।

ডাক পড়িল। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর লোবো। লোবো কথার অর্থ নেকড়ে বাঘ হইলেও এ ব্যক্তি নিরীহ চাকুরীজীবী লোক। ইণ্টারন্যাশনাল প্রলিসের কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি নাড়ী টিপিয়া বলিলেন ঠিক আছে, মরে নাই। আলেশান্দর তখন দেখিলাম একটি এনামেলের জগে করিয়া এক জগ জল আনিয়া কামাথের ম্বখের উপর ঢালিয়া দিল। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় তাহার জ্ঞান হইতেই আবার তাহার উপর অবিশ্রাম তক্তার বাড়ি পড়িতে লাগিল, আবার বেচারী অজ্ঞান হইয়া গেল। আবার তাহার ম্বখে জল ঢালিয়া তাহার জ্ঞান করানো হইল; তখন আবার প্রহার শ্বর্ব হইল। এইভাবে তিনবার তাহাকে মারিয়া তবে সেদিনকার মতো আলেশান্দর ক্ষান্ত হয়। তারপর তাহাকে দ্বজন শান্ত্রী দ্ব দিক হইতে ধরিয়া কোনমতে নিয়া গিয়া প্রিজন-ভ্যানে আনিয়া বসাইয়া দিল। তখন বেচারী থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে আর গোঙাইয়া গোঙাইয়া খালি ঈশ্বরকে ডাকিতেছে—'হে দেবা! হে দেবা!'

এ ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ইহার পরের দিন কামাথকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইণ্টারন্যাশনাল প্রলিসও ব্রঝিয়াছিল যে, কামাথকে রাখিয়া কোনো লাভ নাই, সে কিছ্ব জানে না। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোককে ছাড়িয়া দেওয়ার আগে তাহাকেও শেষবারের মতন মারিয়া তবে ছাড়া হয়, ইহাই পর্তুগীজ প্রলিসের সাধারণ নিয়ম। বেচারী কামাথের দ্বর্ভাগ্য তাহার ম্বক্তির আদেশ হওয়ার পর তাহাকে শেষবারের মতো মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার ভার পড়িয়াছিল আলেশান্দরে-র উপর। অন্য কেহ হইলে কামাথ হয়ত কিছ্বটা অল্পের উপর দিয়া বাঁচিতে পারিত; যদিও একেবারে মার না খাইয়া রেহাই পাইত না।

কুয়ার্তেলে অলিভেইরা-মন্তেইরোর অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এবং বিশেষ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমানোর জন্য লিসবন হইতে ইণ্টারন্যাশনাল প্রলিসের লোকেরা আসার আগে গোয়াতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর এই ধরনের ন্বশংসভাবে মারধোর করার প্রথা চাল্ব হয় নাই। যতদিন আমি প্রলিস হেফাজতে ছিলাম অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ১১ই জ্বলাই হইতে ১৯৫৬ সালের জান্বয়ারি মাস পর্যন্ত—প্রথমে পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে, তারপরে মানিকোমের পাগলা গারদে—এই ধরনের ন্বশংস ও পাশবিক নির্যাতন দিনের পর দিন চলিতে দেখিয়াছি। উপরে যে তক্তা-পিটুনীর বর্ণনা, শারীরিক নির্যাতন পদ্ধতির উহাই একমাত্র নিদর্শন নয়। ব্বটের লাথি, বন্দীদের জোর করিয়া মাটিতে শোয়াইয়া তাহাদের উপরে ব্বট পরিয়া প্রলিসের ন্বত্য, ঠাণ্ডা কলের জলের ধারার নীচে তিন ঘণ্টা চার ঘণ্টা করিয়া জোর করিয়া মাথা ঠুসিয়া রাখা, শরীরের গোপন স্থানে কোমলাঙ্গে প্রহার করা, ব্লেড দিয়া পায়ের তলাকার চামড়া কাটিয়া দেওয়া, হাত ধরিয়া ছাদ হইতে ঝোলাইয়া রাখা, ইলেকট্রিক শক্ লাগানো—অলিভেইরা একে-একে সবকিছ্বরই প্রবর্তন করিয়াছিল। রাজ-নৈতিক বন্দীদের শাস্তি দেওয়ার একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ঘটিত কোনো বিদেশী সাংবাদিক গোয়ায় রাজনৈতিক বন্দীরা কিভাবে আছে তাহা দেখিতে আসিলে। গোয়াতে কি ঘটিতেছে তাহা দেখার জন্য কৌত্বহলভরে কখনো কখনো দিল্লী, বোম্বাই বা করাচী হইতে বিদেশী সাংবাদিকেরা পাঞ্জিমে আসিতেন। অনেক সময় তাঁহাদেরকে রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে নিয়া আসা হইত। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া কেনো বন্দী যদি কোনো সময়ে প্রলিসের দ্বর্ব্যবহার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ তাঁহাদের কাছে করিত, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সাংবাদিক ভদ্রলোকেরা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের শাস্তি হিসাবে অকথ্য রকমের

নৃশংস অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে হইত। ১৯৫৪ সালের টেরেখোল সত্যাগ্রহের অধিনায়ক টোনী ডি সুজার ছোট ভাই হেনরী ডি সুজা অপরাধের মধ্যে একবার একজন আমেরিকান সাংবাদিকদের কাছে খালি বলিয়াছিল তাহাকে ও তাহাদের ঘরের অন্যান্য লোকেদের পাঁচ মাসের উপর বিনা বিচারে, বিনা অভিযোগে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। আর যায় কোথায়! স্বয়ং পুলিস কমাণ্ডাণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া মন্তেইরোর পিটুনী-বাহিনীর এবং ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের ছোট-বড় যে যেখানে আছে সকলে মিলিয়া হেনরীকে পিটাইতে শুরু করে। তারপর তাহারা তাহাকে কুয়ার্তেলের একটি বন্ধ সেলে আটকাইয়া তিন মাস ধরিয়া দিনের পর দিন তাহার উপর যে অত্যাচার চালায় তাহাতে চিরকলের মত হেনরীর শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ হেনরী সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়া আগুয়াদা দুর্গে তেরো বছরের মেয়াদ খাটিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছিল না। টোনী ডি সুজার ভাই বলিয়া নিছক সন্দেহের উপর সে গ্রেপ্তার হয়। প্রায় এক বছরের উপর বিনা বিচারে আটক রাখিয়া তাহাকে মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হইলে পর জজের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে—"আমি সত্যাগ্রহ করি নাই; কিন্তু আমি সত্যাগ্রহ সমর্থন করি এবং বিশ্বাস করি যে, পর্তুগীজদের জোর করিয়া এখানে থাকার কোনো অধিকার নাই।" খালি এই অপরাধে এক কথায় তাহার তেরো বছরের সাজা হইয়া যায়।*

এইভাবে খালি হেনরী একা নয়। হেনরীর মতো শত শত গোয়াবাসী স্বাধীনতাকামী যুবক সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস বাহিনীর তদারকে এবং তাহাদের হাতে যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছে ও আজও করিতেছে, নিজের চোখে না দেখিলে আমার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিসের হাতে আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীরা যে নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, পাশবিকতা ও নৃশংসতার মাত্রার হিসাবে সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের অত্যাচারের কাছাকাছি নয়। আমার নিজের উপর গোয়াতে কোনো শারীরিক অত্যাচার ও মারধোর হয় নাই—খালি একা আমার উপরেই হয় নাই (কেন ও কি কারণে তাহা উপরে বলিয়াছি)—তাহা সত্ত্বেও একথা বলিতেছি। আমাদের দেশের লোকের ফ্যাসিস্ট শাসনের বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া এই ধরনের অত্যাচারের কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তবু সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস কি জিনিস তাহার একটা আভাস দিবার জন্য দু-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিতে হইল, যাহাতে আমাদের দেশের লোকেরা ভালো করিয়া বোঝে গোয়ার মুক্তিযোদ্ধারা কি ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

---

* শ্রীহেনরী ডি. সুজা ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহার আত্মীয়স্বজনের চেষ্টায় এই বছর মুক্তি পাইয়া গোয়া হইতে ভারতে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছেন। কয়েক মাস হইল তিনি বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

॥ ২৩ ॥

গোয়ার মুক্তি আন্দোলন ও রাম দেশাই-দের কথা

পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে আমি তেইশ-চব্বিশ দিন মাত্র ছিলাম। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তখন মাঝামাঝি সময়। গোয়ার ভিতরে এবং বাহিরে ভারতে তখন প্রবল উত্তেজনা চলিতেছে। কিন্তু গোয়ার ভিতরকার প্রকাশ্য আন্দোলন তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে বলিলেও চলে। গোয়ার ভিতরে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সত্যাগ্রহের শেষ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হয় ১৯৫৫ সালের ৬ই এপ্রিল—যে দিন মাপ্সাতে গোয়া কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া শ্রীযুক্তা সুধাবাঈ যোশী গ্রেপ্তার হন। সেদিন শুধু মাপ্সাতেই নয়, গোয়ার সবচেয়ে বড় শহর মাড়গাঁও-এও প্রকাশ্যভাবে সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠান হয়। তাহার নেতা ছিলেন ফাবিয়ান দা কস্তা। ইহার পরে গোয়ার ভিতরকার জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ অবশ্যম্ভাবীরূপে সশস্ত্র সংগ্রাম ও গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথে চলিতে আরম্ভ করে। গোয়া কংগ্রেসের তখন যে সংগঠন ছিল এবং আন্দোলনের পিছনে তখন যে পরিমাণ গণ-সমর্থন ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আরো কিছুদিন গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের সত্যাগ্রহের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান চালাইয়া যাওয়া যে সম্ভবপর হইত না তাহা নয়। কিন্তু ভারত হইতে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের আসা আরম্ভ হইলে পর যে কোনো কারণেই হোক, গোয়া কংগ্রেসের যে সমস্ত কর্মী তখনও জেলের বাহিরে ছিলেন—অবশ্য তাঁহাদের সকলকেই তখন পুলিসের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়া কোনোমতে গ্রেপ্তার এড়াইয়া চলিতে হইতেছিল—তাঁহাদের মনে ধারণা হয় যে, এখন গোয়ার ভিতরে আর সত্যাগ্রহ চালানোর দরকার নাই; আন্দোলন এখন প্রধানত ভারত হইতে পরিচালিত হইতে থাকিবে। জনসাধারণের মনেও একটা ধারণা জন্মে যে, এখন ভারত হইতে সত্যাগ্রহী দল আসিতেছে এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় নেতারাও যখন আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন (আমরাই তখন তাঁহাদের কাছে ভারত হইতে আগত 'বড়' নেতা!), তাহা হইলে ভারত সরকার এবার নিশ্চয়ই পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

আমি যখন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করি, পণ্ডিত নেহরু তখন সবেমাত্র রুশিয়া পরিভ্রমণ শেষ করিয়া রোমের পথে গ্রেট বৃটেন হইতে ভারতে পৌঁছিয়াছেন। সেই সময়ে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী গোয়া হইতে বিতাড়িত সত্যাগ্রহীদের মারফত সারা ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়া প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা গোয়া সমস্যা নিয়া পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইয়া গরম গরম বিবৃতি দিতেছেন। হায়দরাবাদের মত, গোয়ার সম্পর্কেও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে 'পুলিসী' ব্যবস্থা বা কোনোপ্রকার সামরিক ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রযুক্ত হোক এরকম একটা দাবী চারিদিক হইতে উঠিতে থাকে। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য কোন সময়েই একথা গোপন করেন নাই যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় ভারতের পক্ষে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে এরূপ কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না। গোয়াতে মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য বেশি সংখ্যায় ভারতীয় সত্যাগ্রহী পাঠানোর পরিকল্পনায় ভারত সরকার কোনো সময়েই প্রকাশ্য সমর্থন জানান নাই। কিন্তু তাহা

সত্ত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া ও য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পণ্ডিত নেহরু নিজেও গোয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সমস্ত বিবৃতি দেন তাহাতে গোয়ার ভিতরে জনসাধারণের মনে একটা নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, যুদ্ধ বা 'পুলিসী' ব্যবস্থা না হইলেও ভারত সরকার গোয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই এবার এমন কোনো জোরালো কূটনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন যাহাতে অচিরেই গোয়া সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এবং পর্তুগীজরা গোয়া, দমন, দিউ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। পণ্ডিত নেহরু নিজে না হইলেও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দেওয়ার যুক্তি হিসাবে বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা, অর্থাৎ কংগ্রেস ও ভারত গভর্নমেণ্ট, কূটনৈতিক পথে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পর্তুগীজদের উপর আন্তর্জাতিক 'চাপ' দিয়া অচিরেই গোয়া সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করিতেছেন। কংগ্রেস সভাপতি বা কংগ্রেস নেতাদের এইসব কথা রেডিও মারফত শুনিয়া গোয়ার সাধারণ লোকে স্বভাবতই এটা ধরিয়া নেয় যে এবার ভারত সরকার সত্য সত্যই কিছু করিতে যাইতেছেন।

অবশ্য গোয়ার বা ভারতের জনসাধারণের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার জন্য পণ্ডিত নেহরুকে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা চলে না। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থার বাস্তব কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে ধারণা খুবই অস্পষ্ট। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের দেশের নেতাদের মর্যাদা ও শক্তির পরিমাণ ও সীমানা সম্পর্কে নিতান্ত অবাস্তব ও কল্পনাশ্রয়ী থাকিয়া গিয়াছে। 'পণ্ডিতজী সব ঠিক কর দেঙ্গে'—জাতীয় একটা আশা বা আশ্বাস, সহজেই লোকের মনে দানা বাঁধিয়া ওঠে। গোয়ার ভিতরে এই আশা শুধু সাধারণ লোকের মনেই নয়, শিক্ষিতদের মনেও এই সময়ে খুব বেশি করিয়া জাগিয়াছিল। গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, এবং ১৯৫৪ সালে গোয়াতে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন আবার নূতন করিয়া শুরু হওয়ার পর হইতে গোয়ার জনসাধারণ যে ধরনের অমানুবিক ও নির্বিচার পুলিসী দমননীতির সম্মুখীন হইয়াছে, সে সম্পর্কে যাঁহাদের কোনো ধারণা আছে, তাঁহাদের পক্ষে গোয়াবাসীদের ভিতর ভারত গভর্নমেণ্ট, ও বিশেষ করিয়া পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে, গোয়া সমস্যার সমাধান বিষয়ে এই প্রত্যাশার মনোভাবকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা ও বোঝা কঠিন হইবে না। ১৯৫৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদ প্রায় চার-পাঁচ হাজারের মত গোয়াবাসী রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার হইয়া, ৭।৮ মাস করিয়া বা কমপক্ষে ৩।৪ মাস করিয়া আটক থাকিয়া, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ইন্‌স্পেক্টর অলিভেইরা-র উদ্ভাবিত পিটুনী-তক্তার মার খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গোয়ার ভিতরে আন্দোলনের নেতা বা কর্মী হিসাবে যাঁহারা কাজ করিতে পারেন এমন লোক তখন প্রায় দুই শতের উপর গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছেন। প্রায় শতাবধি লোকের দশ হইতে একুশ-বাইশ বছর সাজা হইয়া গিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে গোয়ার ভিতরে জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক কোনো সংবাদপত্র নাই, থাকা সম্ভব নয়। ভারতে বৃটিশ দমননীতির কঠোরতম দিনগুলিতে—দু' একবার ছাড়া সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র কোন সময়েই সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় নাই। বন্ধ হইলেও হয় তাহা জরুরী সরকারী প্রেস আইন ও দমননীতির প্রতিবাদে সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়াছে। কিংবা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে দু' চারিটি সংবাদপত্রের নিকট হইতে মোটা টাকার জামানত দাবী করিয়া, অথবা রাজদ্রোহের মামলা, কিংবা প্রেস আইন অনুযায়ী মামলা চালাইয়া সময় সময় তাহাদের

মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোনো সময়েই জনমতের দাবী যত ক্ষীণভাবেই হোক সংবাদপত্রের মারফত প্রকাশ করাটা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু গোয়াতে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিলেই সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মোট মূলধনের চেয়ে বেশি পরিমাণ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা রাখিতে হয়। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু আগে হইতেই, পুলিসের দ্বারা সেন্সার না করাইয়া সংবাদপত্র কেন, বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র, রেস্তোরাঁ-হোটেলের ছাপানো বিল বা মেনু পর্যন্ত ছাপানো যাইত না; আজও তাহা যায় না। সরকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বা সরকারের সম্মতি ভিন্ন, জনমত প্রকাশের বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। গণ-বিক্ষোভ প্রকাশের তো কোনো কথাই ওঠে না। রাজদ্রোহের মনোভাব আছে—কাহারো সম্পর্কে পুলিসের এরূপ সন্দেহ হইলেই, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া কোনো না কোনো অজুহাতে সাজা দেওয়া হইবে। আমরা বৃটিশ আমলে ১৯২১ সালে 'অসহযোগ' আন্দোলনের সময়, ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্যের কালে, পরে যুদ্ধের সময়, বা ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময়েও—বৃটিশ আইন-কানুনের বেড়াজালের মধ্যেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারের যতটুকু সুযোগ সুবিধা নিতে পারিয়াছি, তাহার শত ভাগের এক ভাগও গোয়াতে (বা খাস পর্তুগালে) পাওয়া সম্ভব নয়। সেখানকার আইন-কানুনই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই অবস্থার ভিতরে, সালাজারী শাসনের এই প্রচণ্ড দমননীতি ও স্বেচ্ছা- শাসনের বিরুদ্ধে দুই বছর ধরিয়া অকুতোভয়ে সংগ্রাম করার পর, মুক্তিকামী গোয়াবাসীরা যদি স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মুখের দিকে তাকাইয়া কার্যকরী সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়া থাকে তো সেজন্য তাহাদেরকে নিশ্চয়ই কোনো দোষারোপ করা চলে না।

গোয়াত ভারত হইতে আমাদের সত্যাগ্রহ অভিযান, তাহাদের সেই প্রত্যাশাকে আরও বেশি করিয়া জাগাইয়া তোলে। তাহার ফল হয় এই যে, গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের প্রকাশ্য আন্দোলন কিছুটা ঝিমাইয়া পড়ে; কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে। গোয়া কংগ্রেসের যা কিছু সংগঠন তখন ছিল তাহা এই সময় সম্পূর্ণ গুপ্ত সংগঠনের রূপ নিয়াছিল। প্রথম হইতেই গোয়া কংগ্রেস বা অন্য কোনো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কোনদিন গোয়াতে প্রকাশ্যভাবে সংগঠিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়ায় আসিতে আরম্ভ করিলে পর, গোয়ার ভিতরে গোয়া কংগ্রেসের কর্মীদের প্রধান কাজ দাঁড়াইয়া যায়, তাহাদের পথ দেখাইয়া ভিতরে আনার বন্দোবস্ত করা, তাহাদের সত্যাগ্রহের জায়গা ঠিক করা ইত্যাদি। আমাদের গোয়ার ভিতরে আসায় গোয়ার ভিতরে সাধারণ লোকের মনে স্বভাবতই ভারত হইতে গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে খুব বড় রকমের ও জোরালো রকমের কোনো ব্যবস্থা দুই-চারি মাসের ভিতর অবলম্বিত হইতে যাইতেছে এই ধরনের প্রত্যাশা হইতে একটা উত্তেজনার ভাব—ইংরাজীতে যাহাকে 'টেনশন্' বলে সেইরকম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই আবহাওয়াকে গোয়ার ভিতরে প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার কাজে লাগানোর মত সংগঠন তখন আদৌ ছিল না। তাই বলিয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিসের দমননীতির প্রকোপ একটুও কমে নাই। ভারত হইতে গোয়া সীমান্তের ভিতরে যেদিকেই বা যেখানেই ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা আসুক না কেন, সেই জায়গার আশেপাশে যেখানে যত গ্রাম বা বসতি আছে সমস্ত জায়গায় ধরপাকড় আরম্ভ হইয়া যাইবে। সত্যাগ্রহীরা বিশেষ করিয়া এই রাস্তায় কেন আসিল, এই সব গ্রাম ও বাজারের ভিতর দিয়া কেন আসিল, কে তাহাদের পথ দেখাইয়া আনিয়াছে,

কেহ তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে কিনা, সাহায্য করিয়াছে কিনা—এইসব জিনিস অনুসন্ধানের জন্য পুলিসের ও মিলিটারীর হামলা হইবে। ইহার হাত হইতে কোনমতেই কাহারো অব্যাহতি নাই। একবার পুলিসের সন্দেহ হইলেই হইল। সময় সময় ইহার ফলে নিতান্ত নিরপরাধ লোকও পুলিসের বেড়াজালে পড়িয়া কুয়ার্তেল হাজত পর্যন্ত আসিয়াছে। আমার পঞ্চম কুয়ার্তেলের হাজতে থাকার সময় তাহার দু'একটি কৌতুকাবহ নিদর্শন চোখে আসিয়াছে।

আমাদের একনম্বর হাজতে ঢুকিয়া আমি রাম দেশাই নামে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখি। তিনি সুপারির ব্যবসায়ী। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর ভারত-গোয়া বর্ডারে পুলিসের কড়াক্কড়ি বাড়িয়া গিয়াছে। আইনী বে-আইনী কোনভাবেই আর পুনা, বেলগাও, কারওয়ার বা সাবন্তবাড়ীর দিকে সুপারি চালান দেওয়া যাইতেছে না। রাম দেশাই অবশ্য গোয়ার বর্ডার এলাকার ছোট ছোট ব্যবসায়ীর মত বে-আইনীভাবেই তাঁহার সুপারি চালান দিতেন। তাঁহার অবশ্য নিজের কিছু সুপারির বাগানও আছে। স্মাগলিং গোয়া সীমান্তের সাধারণ লোকের জীবিকা অর্জনের একটা সহজ ও প্রায়-সমাজ-সম্মত উপায়। গোয়াতে জিনিসপত্রের—বিশেষ করিয়া বিদেশ হইতে আমদানী জিনিসের—দাম সীমান্তের এপারে ভারতীয় এলাকার তুলনায় অত্যন্ত কম; হার নিতান্ত নামমাত্র। পড়তা বুঝিয়া, একটু পথ ঘাট দেখিয়া সেই সব জিনিস ভারতের এলাকায় লুকাইয়া চালান দেওয়া, আবার যেসব জিনিস গোয়ায় পাওয়া যায় না, বা যেসব জিনিসের দর বেশি, সেইসব জিনিস ভারত হইতে গোয়ায় আনিয়া বিক্রী করাতে বর্ডার এলাকার লোকেরা খুব বেশি দোষের কিছু দেখে না—বিশেষ করিয়া গোয়াতে। কারণ গোয়াতে গোয়ার ভিতরে থাকিয়া সাধারণ লোকের জীবিকা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। 'স্মাগলিং' বা 'ব্ল্যাক' করা কথা দুইটি কোঙ্কনী গোয়াতে জীবিকা অর্জনের অন্যান্য পাঁচটি পেশার মত একটি সাধারণ পেশা বলিয়া স্বীকৃত এবং ততটা নিন্দার্হ নয়; অন্যান্য আর পাঁচটা ব্যবসার মতই একটা ব্যবসা। সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সঙ্গে বা মুক্তি আন্দোলনের সক্রিয় সাহায্যকারী এবং আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অনেক লোককেও (যাহারা রাজনৈতিক কারণে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আসিয়াছে) তাহাদের 'জীবিকা'র কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অসঙ্কোচ উত্তর পাইয়াছি—'ব্ল্যাকের কাজ করি'। এইসব লোকই আবার পুনা বা বেলগাঁও হইতে গোপনে গোয়া কংগ্রেসের বা আজাদ গোমন্তক দলের লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টারের বাণ্ডিল নিয়া আসিয়াছে। গোয়ার ভিতরে যথাস্থানে সে সব পেঁছাইয়া দিয়াছে, গ্রামে গ্রামে বিলি করার বন্দোবস্ত করিয়াছে। কাজে কাজেই পর্তুগীজ পুলিসের কিছুটা নজর এইসব লোকের উপরও কিছুটা আসিয়া পড়িয়াছিল। রাম দেশাই জেলে আসার আগে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহায়তার জন্য কিছু করেন নাই। বরং সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর সুপারির ব্যবসায়ে মন্দা আসিয়াছে, বাজার নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপরেই চটা ছিলেন। ধর্মভীরু, গেরস্থ লোক, হাজতেও নিয়মিত পূজা অর্চনা করেন। সুপারির বাগান আর সুপারির চোরাই চালানের ব্যবসায়ে অল্প দু' চার পয়সা জমাইয়াছেনও। বেচারী গোয়াতে সুপারির ব্যবসায়ের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া ভারতে তাঁহার কোনো আত্মীয়কে চিঠি লিখিয়া এই সময় খবর দেন—"এদিককার বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ, বর্ডারের কড়াক্কড়ির ফলে এখান হইতে বেশি কিছু পাঠানো সম্ভব হইবে না। ওদিক হইতে কিছু পাঠানো যায় কিনা খবর দাও" ভদ্রলোক মারাঠী-

কোঙ্কনীতে জড়াইয়া মেসেজ লিখিয়া খামে করিয়া ডাকে চিঠি দিয়াছেন। পুলিস সেন্সরে যথারীতি সে চিঠি ধরা পড়িতেই আর যায় কোথায়? নিশ্চয়ই বুড়ো দেশাই তলায় তলায় কিছু করিতেছে! তা' ছাড়া, দেশাই কিছুদিন আগে ভারতে কোথায় গিয়াছিল? দেশাই আসলে গিয়াছিলেন পুনা হইতে নাসিকে, বহুকালগত পিতামাতার সপিণ্ডকরণের জন্য। সপিণ্ডকরণ কি, তাহা পর্তুগীজরা বোঝে না। তাহার উপর দেশাইদের গ্রামের কাছ দিয়া ক'দিন হইল ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের একটি দল আসিয়াছে। সুতরাং দেশাইয়ের থানায় ডাক পড়িল এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে পঞ্জিম কুয়ার্তেলের এক নম্বর হাজতে তাঁহার জায়গা হইয়া গেল। আমি যতদিনে গোয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি ততদিন হাজতে ছেলেপিলের দল মিলিয়া দেশাইকে সত্যাগ্রহের এবং সত্যাগ্রহীদের কথা কিছু কিছু বুঝাইয়াছে। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের হাতে লাঠি গুঁতা খাওয়ার পর দেশাই পর্তুগীজদের উপরও হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। অবশ্য আমি যাওয়ার পর তাঁহাকে খুব বেশিদিন থাকিতে হয় নাই। তিনি যাওয়ার ক'দিন আগে সঙ্গোপনে আমাকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার ছেলেরা তাহাদের থানার শেফ্‌কে কিছু টাকা দিয়া ভালো রিপোর্ট লিখাইয়া নিয়াছে, তাঁহাকে বেশিদিন হয়ত আর থাকিতে হইবে না। তবে গোয়া ভারতে 'বিলীন' (ইংরাজী merged শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ) হইয়া যাওয়ার পর আমি যেন একবার তাঁহার বাড়িতে আসি। তাঁহার বাড়িতে দু'দিন না থাকিয়া আমার বাংলা দেশে ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। গোয়া যে 'বিলীন' হইবেই সে সময় অন্যান্য সকলের মত রাম দেশাই-ও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যা হোক, সত্য সত্যই শেষ পর্যন্ত একদিন বিকালবেলায় তাঁহার খালাসের ডাক আসিল। গোয়াতে কয়েদী খালাসের নিয়ম, আসামী যেখান হইতে ধরা পড়িয়াছে পুলিস প্রিজ্‌ন ভ্যানে করিয়া তাহাকে সেখানে নিয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিবে। রাম দেশাই তাড়াতাড়ি করিয়া তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া নিয়া হাত জোড় করিয়া আমার কাছে বিদায় নিতে আসিলেন। বেচারী হিন্দী-ইংরাজী জানেন না। মারাঠী-কোঙ্কনীতে মিশাইয়া এক গাল হাসিয়া দেশাই জানাইলেন—"মি জাতো" (আমি যাইতেছি)। তাহার পর একটি হিন্দী জানা ছেলেকে কাছে ডাকিয়া আমাকে বলিতে বলিলেন,—"চৌধুরী সাহেবকে জানাও, গোয়া বিলীন হওয়ার পর আমার কথা যেন না ভোলেন। আমার বাড়িতে তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুপারির ব্যবসার কি হইবে?" দেশাই উত্তর দিলেন, "আমি আর বেশি ভাবিতেছি না, এত সব ছোট ছোট ছেলেরা দেশের স্বাধীনতার জন্য এত কষ্ট করিতেছে, আমার না হয় একটু আর্থিক ক্ষতি হইল।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"চৌধুরী সাহেব, আমি ব্যবসায়ী লোক, ভীরু লোক। রাজকরণের (পলিটিক্স) কথা কিছু জানি না। তবু তোমাদের দেখিয়া কিছু শিক্ষা নিয়া গেলাম। আমি হয়ত তোমাদের কাজে বেশি কিছু সাহায্য করিতে পারিব না; কিন্তু যাহারা গোমন্তকের মুক্তির জন্য লড়িতেছে আর কোনদিন তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিব না। ভগবান তোমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন।"

রাম দেশাইয়ের কথা আমার বেশি করিয়া মনে থাকার একটি ব্যক্তিগত কারণও আছে। রাম দেশাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার পরনে একটি ছাড়া ধুতি নাই; সেটিও ছেঁড়া ছিল। ধরা পড়ার আগে দু'দিন বনে-জঙ্গলে চলিতে চলিতে কাঁটা গাছে লাগিয়া ধুতিটি একেবারে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া গিয়াছিল। সঙ্কোচে তিনি আমাকে হাতে করিয়া ধুতিটি

দিতে সাহস পান নাই। ঘরের অন্য একটি ছেলের হাতে আমাকে দিবার জন্য দিয়া গিয়াছিলেন। ধুতিটি আজও গোয়ার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আমার কাছে আছে। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের নির্বিচার দমননীতির কল্যাণে রাম দেশাইয়ের মত আরো অনেকেই প্রথম হাজতে আসিয়া তারপর পর্তুগীজ-বিরোধী জাতীয় মনোভাবের সংস্পর্শে আসিয়াছেন ও জাতীয়তার দীক্ষা নিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। রাম দেশাইয়ের মত লোকের মন এভাবে পরিবর্তিত হইবে কে কল্পনা করিয়াছিল? রাম দেশাই নিজে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই কখনো নিজের সম্পর্কে এ ধরনের কল্পনা করেন নাই। গোয়ার জাতীয় আন্দোলনে অলিভেইরা-মন্তেইরো-কোম্পানীর অবদানও ইহাতে কম নয়। সালাজারী দমননীতির স্টীম রোলারের নিষ্পেশন হইতে রাম দেশাইয়ের মত নিরীহ লোকেরাও অব্যাহতি পান নাই বলিয়া এরূপ অনেকে তাহার চাপে কমবেশি পর্তুগীজ-বিরোধী হইয়া উঠিতে বাধ্য হন।

॥ ২৪ ॥

পর্তুগীজ রাজত্বের থানা-পুলিসের নানান কথা : গোয়ার বীর মহিলা রাজবন্দীরা

পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে তেইশ চব্বিশ দিন আমাকে আটক রাখার পর, আমায় যে মানিকোমের পাগলা গারদে বদলি করা হয় সেকথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এই তেইশ চব্বিশ দিনের ভিতরে গোয়াতে, এবং শুধু গোয়াতেই নয়, খাস পর্তুগাল সহ সমগ্র পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে, সালাজারী শাসনের স্বরূপ কী তাহা ভালভাবে সমঝিয়া যাইতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নাই।

পাঞ্জিম কুয়ার্তেল খালি গোয়ার নয়, গোটা পর্তুগীজ ভারতের পুলিস হেড কোয়ার্টার— Quartel Geral da Policia do Estado da India। এখানকার পুলিস কমাণ্ডাণ্ট গোটা পর্তুগীজ ভারতের পুলিসের বড়কর্তা। উপরে গোয়ার ভূতপূর্ব পুলিস কমাণ্ডাণ্ট কাপ্তেন রুম্বার কথা বলিয়া আসিয়াছি। আমি যখন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করি সে সময় রুম্বা সেখানে ছিল না। গোয়াতে গুজব ছিল নতুন গভর্নর-জেনারেল, জেনারেল বের্নার্দ গেদীসের সঙ্গে রুম্বার বনিবনাও হইতেছিল না। এ সম্পর্কে আমি যাওয়ার পর দুই রকমের গুজব শুনিয়াছি। এক নম্বর, বের্নার্দ গেদীস কিছুটা লোক ভালো, ভদ্রগোছের লোক; তিনি নাকি গোয়াতে আসিয়া রুম্বার দমননীতি এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব পছন্দ করেন নাই এবং সেইজন্যই দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি বাধে। অনেকের আবার মত ছিল যে তা নয়, দু'জনের মধ্যে আসল গণ্ডগোল ছিল কর্তৃত্ব লইয়া। রুম্বা পদমর্যাদায় গভর্নর-জেনারেলের অনেক নীচে হইলেও গোয়াতে অনেক আগে হইতে সে ছিল বলিয়া গোয়ায় তাহার দল-বল বেশি ভারী ছিল। জেনারেল গেদীসের পূর্ববর্তী গভর্নর-জেনারেলরা আন্দোলন দমানোর ভার পুলিসের ও রুম্বার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাজে কাজেই রুম্বার আত্মীয়তার কথা বলিতে পারে এমন লোক গোয়ার ভিতরে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা পর্তুগীজ ও মিস্তী সমাজের মধ্যে কিংবা সরকার-ঘেঁষা গোয়াবাসী ক্রিশ্চিয়ান অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় বেশি কেহ ছিল না। কিন্তু পাউলো

বের্নার্দ গেদীস প্রথমত ছিলেন 'আর্মি' বা মিলিটারীর লোক এবং 'আর্মি'-ই হইতেছে সালাজারের একচ্ছত্র শাসনের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। তাছাড়া, সালাজারের সঙ্গে যে সমস্ত অফিসারের ব্যক্তিগত দহরম-মহরম খুব বেশি গেদীস তাঁহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং গেদীসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রুম্বার জিতিবার কোনই আশা ছিল না। গেদীস গভর্নর-জেনারেল হইয়া গোয়ায় আসাতে গোয়া এবং পর্তুগীজ ভারতের পুলিসের বড়কর্তা হিসাবে তাহার আগেকার মত একচ্ছত্র আধিপত্য আর চালানোর সুবিধা হইবে না, একথা বুঝিয়াই হয়ত রুম্বা গোয়া হইতে বিদায় নেওয়াই তাহার পক্ষে মঙ্গলের হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া রুম্বা-গেদীস সংঘর্ষের প্রধান কারণ রুম্বার দমননীতি সম্পর্কে গেদীসের বিরাগ বা আপত্তি, এরূপ মনে করারও কোন তথ্যসম্মত বা যুক্তিসংগত কারণ আছে বলিয়া আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝি নাই। রুম্বা চলিয়া যাওয়ার পর গেদীসের আমলে গোয়াতে পর্তুগীজ দমননীতির প্রকোপ বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই বা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট যেদিন ২২ জন নিরস্ত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে গোয়া সীমান্তের কাছে পর্তুগীজ সৈন্যেরা গুলী করিয়া হত্যা করে, তখন পুলিস কমান্ডাণ্ট হিসাবে রুম্বা গোয়াতে উপস্থিত ছিল না। জেনারেল বের্নার্দ গেদীসই তখন গোয়ার সর্বময় শাসনকর্তা এবং আইনত পর্তুগীজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা কমান্ডার-ইন-চীফ। আর শুধু ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের কথাই নয়, তাহার প্রায় এক বছর পরেও যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন একেবারে থামিয়া গিয়াছে, তখনও রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের উপর মন্তেইরো-অলিভেইরা কোম্পানীর অত্যাচার ও নির্যাতন আগের মতই চলিয়াছে। পর্তুগীজ আইনে প্রাণদণ্ড নাই; কিন্তু হাজতে পুলিস যত রাজনৈতিক বন্দীকে শুধু পিটাইয়া মারিয়াছে তাহা ঘটিয়াছে জেনারেল বের্নার্দ গেদীসের আমলেই। আজও পর্তুগীজদের নির্যাতন কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই।

তবে এ সম্পর্কে জেনারেল গেদীসের দায়িত্ব যতই থাকুক, দোষ সবটাই তাঁর নয়। তিনি নিজে মিলিটারীর লোক হওয়া সত্ত্বেও এবং সালাজারী শাসনে মিলিটারীর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের ক্ষমতা ডাঃ সালাজারের নিজস্ব গেস্টাপো বাহিনী 'পিদে' বা ইন্টারন্যাশনাল পুলিসের উপরে নয়। পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে নৃশংস নির্যাতন আমি নিজের চোখে দিনের পর দিন দেখিয়াছি, তাহার হোতা ছিল প্রধানত 'পিদে' এবং গোয়া পুলিসের গুপ্ত গোয়েন্দা বিভাগ, অর্থাৎ ইন্সপেক্টর অলিভেইরা এবং মন্তেইরো। কুয়ার্তেলের ভিতরে তাহাদের উপর কথা বলিতে পারে, এমন ক্ষমতা-সম্পন্ন কোন লোক ছিল না। গভর্নর-জেনারেল বের্নার্দ গেদীসকে জিজ্ঞাসা করিয়াই যে কুয়ার্তেলে রাজনৈতিক বন্দীদের তক্তাপেটা করা হইত, এরূপ মনে করারও কারণ নাই। গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের অনেকের কাছে শুনিয়াছি, হাজতে তাহাদের পুলিসের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে কোন অভিযোগ তাহাদের আত্মীয়স্বজনেরা যদি কোনমতে গেদীসের কাছে পেশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অনেক সময় তাহার প্রতিকার হইত। কিন্তু সাধারণ রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের পক্ষে একেবারে খোদ গভর্নর-জেনারেলের কাছে গিয়া নালিশ জানানো বা তাহার তদ্বির করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সম্ভবপর হইত না, তাহা না বলিয়া দিলেও চলে। তবু তাহারই ভিতর একটু অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান পরিবারের লোকেদের কিছুটা সুবিধা ছিল। তাহাদের আত্মীয়স্বজনেরা

কোন কোন সময় চার্চের পাদ্রী সাহেবদের ধরিয়া দুই একটি ক্ষেত্রে যে এভাবে তদ্বির করিয়া ফল পান নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

আমি যখন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করি, তখন কমাণ্ডাণ্ট হিসাবে রুম্বার 'একটিনী' করিতেছেন, রুম্বা-আমলের এ্যাডজুটাণ্ট-কমাণ্ডাণ্ট। ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। প্রায় পঞ্চাশের কাছে বয়স; পেটমোটা নাদুস-নুদুস চেহারা। পুলিস ইউনিফর্মের উপর মিলিটারী কোট, ক্রস্‌বেল্ট, স্টার, জরী দেওয়া বারান্দাওয়ালা মিলিটারী টুপী। এসবের সঙ্গে ক্যাজুয়াল পাম্প-শু এবং রেশমী মোজা পরা; একটু থপ্‌ থপ্‌ করিয়া হাঁটার অভ্যাস—লোকটি মানুষ হিসাবে খুব মন্দ ছিলেন না। তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী সমীহ করিয়া কথা বলিলে খুবই খুসী হইতেন। কিন্তু গোয়ার ভিতরে কোথাও কেহ 'সত্যাগ্রহ' করিতেছে, ইহা শুনিলেই আর তাঁহার মেজাজ ঠিক থাকিত না; নিজেই লাঠি কাঁধে করিয়া সশরীরে সেখানে গিয়া হাজির হইতেন। চটিয়া গেলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। গোয়ার ভিতরকার অনেক সত্যাগ্রহী—যাঁহারা গোয়ার ভিতরে প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহ করিয়াছেন—এই ভদ্রলোকের হাতের চড়-চাপড় কিল-গুঁতা বহু খাইয়াছেন। জনৈক আমেরিকান সাংবাদিকের কাছে বিনা বিচারে মাসের পর মাস আটক থাকা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিসের দুর্ব্যবহারের সম্পর্কে অভিযোগ জানানোয় হেনরী ডি সুজাকে কিভাবে মারধোর খাইতে হইয়াছিল, সেকথা উপরে বলিয়াছি—হেনরীর প্রহারকদের মধ্যে এই এ্যাডজুটাণ্ট সাহেবও একজন ছিলেন। হতভাগা 'কানেকো' আর 'কানারি'-রা* কিনা পর্তুগালের বিরুদ্ধে এবং ডাঃ সালাজারের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চায়! —এ ধারণাটাও এই পেটমোটা দারোগা সাহেবের কাছে অসহ্য বলিয়া মনে হইত। কিন্তু রাগটা পড়িয়া গেলে ভদ্রলোক আবার বেশ নরম মেজাজের হইয়া যাইতেন এবং তখন সময় বুঝিয়া তাঁহার কাছে ছোটখাটো সুযোগ-সুবিধার জন্য নালিশ জানাইলে সে দরখাস্ত সহজেই মঞ্জুর হইয়া যাইত। বলিতে বাধা নাই, আমি নিজেও দু'-একবার তাঁহার এই ভালোমানুষির সুযোগ নিয়াছি।

আমরা যখন পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে ছিলাম তখন কুয়ার্তেলের হাওয়া বেশ সরগরম। ১৫ই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে কি করা যায় না যায়, তাহার জল্পনা-কল্পনায় পুলিস, মিলিটারী বড় বড় পদস্থ কর্মচারীরা সকলেই খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া আছেন। মোটরবাইকে করিয়া, জীপে করিয়া দলে দলে নানারকম ইউনিফর্ম পরা পুলিস, মিলিটারীর লোক (বা সশস্ত্র পুলিসের লোক), সিকিউরিটি পুলিস, সাধারণ পর্তুগীজ কনস্টেবল থানার ভিতরে অনবরত আসা-যাওয়া করিতেছে। 'পিদে'র লোকেরা সবচেয়ে ভালো এবং জাঁকালো পোষাক পরিয়া গম্ভীরভাবে আমাদের বারান্দা দিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে। মন্তেইরো চট্‌পট্‌ আসিতেছে, চট্‌পট্‌ চলিয়া যাইতেছে—আমাদের এক নম্বর হাজতে বসিয়াই সব কিছু দেখিতে পাইতেছি। কুয়ার্তেলে পুলিসের লোক হোক, রাজনৈতিক বন্দী হোক, কে আসিল কে গেল আমরা জানিতে পারিতামই; কারণ আমাদের হাজত ঘরটা কুয়ার্তেলের দেউড়ীর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল। আমাদের ঘরের পাশেই পর পর কয়েকটা অন্ধকূপ হাজত। দুই নম্বর হাজতঘরে ভারতীয়দের রাখা হইয়াছে—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও জনসঙ্ঘের বিশিষ্ট নেতা জগন্নাথরাও যোশী সেই ঘরে আটক আছেন। তাহার

* পর্তুগীজ ভাষায় 'নেটিভ'দের অবজ্ঞাসূচক নাম—'Caneco' বা 'Canarin'।

পরে আর সব কয়টি অন্ধকূপ ঘরে আমাদের ঘরের মতই গাদাগাদি করিয়া ২৫ জন, ৩০ জন করিয়া গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীকে আটক রাখা হইয়াছে। তাহার পর 'পিঁজরা' বা খাঁচা-হাজত। সেখানে মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হইয়াছিল—আর ছিলেন সাতারার কম্যুনিস্ট কর্মী শ্রীরাজারাম পাতিল এবং মাপ্সার জাতীয়তাবাদী কর্মী শ্রীসিরসাট্। ৯—১০ জন মহিলা বন্দী এই সময় কুয়ার্তেলে ছিলেন। শ্রীযুক্তা সুধাবাঈ যোশী ও শ্রীযুক্তা সিন্ধু দেশপাণ্ডের নাম তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তা'ছাড়াও কয়েকজন হিন্দু ও কয়েকজন ক্রিশ্চিয়ান মহিলা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। সুধাবাঈ গোয়ার মেয়ে, কিন্তু তাঁহার বিবাহ হইয়াছে পুণায়। সিন্ধু দেশপাণ্ডে পুণার প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির নামকরা মহিলা কর্মী। ১৯৫৪ সালেও একবার তিনি আত্মগোপন করিয়া গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংগঠন গড়ার কাজে সাহায্য করার জন্য গোয়াতে আসিয়া ধরা পড়েন। পর্তুগীজ পুলিস তাঁহাকে তখন গ্রেপ্তার করিয়া গোয়ার বর্ডারে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। তিনি তাহার কিছু পরেই আবার আত্মগোপন করিয়া গোয়ার ভিতরে যান এবং প্রায় মাস ছয়েক আত্মগোপন করিয়া গোয়াতে ঘুরিয়া সংগঠনের কাজ করার পর দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন। এবার আর পুলিস তাঁহাকে ছাড়ে নাই। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্যে হাজতে আটকাইয়া রাখে। সিন্ধু দেশপাণ্ডের আমাদের অন্যান্য সকলের মতই—অর্থাৎ ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের মত—দশ বছর ও দুই বছর অর্থাৎ একুনে বারো বছর সাজা হয়। এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের সঙ্গে ছাড়া পাইয়া তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।*

বাঙলাদেশের বিপ্লবী যুগের মেয়েদের ছাড়া আমি সচরাচর সুধাবাঈ ও সিন্ধু দেশপাণ্ডের মত অকুতোভয় সাহসসম্পন্না তেজস্বিনী মহিলা কর্মী কম দেখিয়াছি। বিশেষ করিয়া সিন্ধুর মত। লেশমাত্র ভয়ডর না রাখিয়া অবলীলাক্রমে পাহাড়-পর্বত জঙ্গল পার হইয়া, দুর্বল ছিপ্ছিপে গড়নের মৃদুভাষিণী এই মেয়েটি ভারতের বুক হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলার সংকল্প নিয়া লড়ার জন্য গোয়ায় ছুটিয়া গিয়াছেন। গোয়া হইতে একবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেওয়ার পর আবার দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি গোয়ায় লুকাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ খবর পর্তুগীজ পুলিসের কাছে পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মন্তেইরো এবং অলিভেইরা তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে। মন্তেইরোর দেশী গোয়ানীজ গোয়েন্দা চরদের, সিকিউরিটি পুলিসের এবং 'পিদে'র (অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের), সশস্ত্র পুলিস, মিলিটারী—সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া সিন্ধু গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর ঘুরিয়াছেন। তাঁহার একটু সুবিধা ছিল এই যে, তিনি খুব সহজভাবে কোঙ্কনী ও ক্রিশ্চিয়ান কোঙ্কনী (পর্তুগীজ শব্দ মিশ্রিত কোঙ্কনী) বলিতে পারিতেন। কখনো দিশী ধরনের শাড়ী পরিয়া,

---

* সুধাবাঈ আমাদের সঙ্গে মুক্তি পান নাই। গোয়াতে তাঁহার জন্ম এবং তাঁহার বাপ-মা আইনত পর্তুগীজ প্রজা বলিয়া পর্তুগীজরা তাঁহাকেও ভারতীয়া বা ভারতীয়-নাগরিকা হিসাবে আইনত গণ্য করিতে চান নাই। সেজন্য ১৯৫৭ সালে যখন পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট গোয়াতে আটক সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের একসঙ্গে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সুধাবাঈ তাহার সুবিধা পান নাই। তিনি মাত্র ১৯৫৯ সালে, গত বছর এপ্রিল মাসে গোয়ার মাড়গাঁও জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কখনো গোয়াতে ক্রিশ্চিয়ান মেয়েদের মতো ফ্রক পরিয়া তিনি গোয়ার প্রায় সর্বত্র ঘুরিয়া কর্মীদের নিয়া গোপন বৈঠক করিয়াছেন, সংগঠন গুছাইয়াছেন, ভারতের সঙ্গে বেলগাঁও-পুণা-বোম্বাইয়ে লোক পাঠাইয়া যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫৪'র শেষ দিক হইতে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি দুইবার এভাবে গোয়াতে না গেলে এবং না কাজ করিলে গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কতদিন চলিত, বলা কঠিন।

সুধাবাঈ গোয়া গিয়াছিলেন কিছু পরে, প্রকাশ্যভাবে। তিনি সংগঠনের কাজের সঙ্গে খুব জড়িত ছিলেন না। তিনি গিয়াছিলেন মাপ্‌সায় গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়া। পুত্র-কন্যাকে স্বামীর কাছে রাখিয়া তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়া গোয়াবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামের পাশে গিয়া দাঁড়াইতে চান। তিনি যাওয়া মাত্রই যে পর্তুগীজ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইবেন এবং হয়ত লম্বা মেয়াদের সাজাও হইবে—একথা জানিয়াও তিনি গোয়াতে যাইতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার ষোলো বছরের সাজা হইয়াছিল। গোয়াতে তাঁহার পিতৃগৃহ বলিয়া তিনি পর্তুগীজ আইনে পর্তুগীজ প্রজা। তাঁর দুই ভাইও এখন আগুয়াদা দুর্গে লম্বা মেয়াদের সাজা খাটিতেছেন। আমি পঞ্জিম কুয়ার্তেলের এক নম্বর হাজতে যখন ছিলাম, সে সময় অনেকদিন ভোরে পুলিস পাহারায় বাহিরে হাত-মুখ ধুইতে যাওয়ার পথে বারান্দায় মহিলা বন্দীদের সঙ্গে এক-আধবার দেখা হইয়া যাইত। সিন্ধু ও সুধাবাঈ ছাড়াও আরও সাত-আটজন মহিলা বন্দী সে সময় কুয়ার্তেলে ছিলেন—তাঁহারা সকলেই পিঁজরা হাজতে ছিলেন। তাঁহাদেরকেও আমাদের মতই হাত-মুখ ধোয়ার জন্য এবং স্নানের জন্য আলাদা বাথ-রুমে লইয়া যাওয়া হইত। আমরা অবশ্য যাইতাম কুয়াতলায়। সেই সময় পথে কোন কোনদিন মহিলা বন্দীদের সঙ্গে দেখা হইত। ভদ্র গোয়ানীজ পাহারাওয়ালা থাকিলে এক আধটি কথা বলা বা খবরাখবর নেওয়ার অসুবিধা হইত না। পর্তুগীজ পুলিসদের সম্পর্কে একটা কথা এখানে না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, এক 'পিঁজরা-হাজতে' রাখা ভিন্ন, মহিলা বন্দীদের সঙ্গে তাহারা হাজতে বা জেলে কোনপ্রকার অসম্মান বা অপমানসূচক ব্যবহার করে নাই। জাতি হিসাবে পর্তুগীজদের একটি বড় সদ্‌গুণ এই যে, সাধারণ পক্ষে তাহারা মহিলাদের সম্পর্কে কিছুটা শালীনতাবোধসম্পন্ন এবং বিবেচনাশীল। রাজনৈতিক বন্দীদের মহিলা আত্মীয়স্বজন বা পত্নীরা তাঁহাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পুলিস বা জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সুবিধা পাইতেন। পুরুষ আত্মীয়স্বজনের অবশ্য সে সুবিধা ছিল না। আমরা হাজতে থাকিতে নানাভাবে মহিলা বন্দীরা কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা খোঁজ নিতে চেষ্টা করি। 'পিঁজরা' হাজতে অন্ধকার খাঁচার মত ঘরে তাঁহাদের মাসের পর মাস রাখা হইয়াছে, এছাড়া অভিযোগ করার মত বা প্রতিবাদ জানানোর মত বিশেষ কিছুই পাই নাই। মহিলা বন্দীদের গ্রেপ্তারের সময় দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু গালাগালি করা ছাড়া বা অল্প কিছু রুক্ষ ব্যবহার ছাড়া মারধোর বা কোনরূপ শারীরিক নির্যাতন করা হয় নাই। শুনিয়াছি মাপ্‌সায় গোয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়া সুধাবাঈ যখন গ্রেপ্তার হন, তখন তাঁহাকে কিছু ধাক্কা ও চড়-চাপড় খাইতে হয়। কিন্তু হাজতে আন্ডার ট্রায়াল বা 'সুস্‌পেইত' হিসাবে থাকার সময় পুরুষ বন্দীদের যেমন নিয়মিতভাবে পিটুনী-ঘরে নিয়া গিয়া তক্তাপেটা করা হইত, মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের কখনও সেটা সহ্য করিতে হয় নাই। সুধাবাঈ ও সিন্ধু দেশপাণ্ডের তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে গোয়ান পুলিসদের তো

বটেই, আমি দুই-একজন সুব্ শেফ্ ও উচ্চপদস্থ পর্তুগীজ পুলিস অফিসারকেও অত্যন্ত সম্ভ্রম-মিশ্রিত প্রশংসার সঙ্গে কথা বলিতে বা আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। মিত্রা কাকোড়কর (গোয়া মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা পুরুষোত্তম কাকোড়করের ভগ্নী), শালিনী, কুমুদিনী, ইভা, সেলিনা প্রত্যেকের সম্পর্কেই একথা বলা যাইতে পারে। তবে ইঁহাদের সকলের মধ্যে সুধাবাঈ ও সিন্ধুই নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। আমরা পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে থাকিতে থাকিতেই ইঁহাদের মধ্য হইতে মিত্রা ও শালিনীর সাজা হইয়া যায়। গোয়াতে ইঁহারা দুজনই রাজনৈতিক কারণে প্রথম দণ্ডিতা মহিলা-বন্দী। ট্রাইব্যুনালের মিলিটারী জজেরা যখন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন—'তোমরা কি বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে চাও না জেলে যাইতে চাও?'—দুজনেই বিনা দ্বিধায় একসঙ্গে উত্তর দেন—"গোয়া বিদেশী পর্তুগীজদের দখলে থাকিতে সমস্ত গোয়াটাকেই আমরা একটা বড় আকারের জেল ছাড়া কিছু মনে করি না।" মিলিটারী আদালতে প্রথম মহিলা আসামী বলিয়া বোধহয় তাঁহাদের একটু কম করিয়া চার বছর আর দুই বছর, অর্থাৎ ছয় বছর করিয়া সাজা হইয়া যায়। ইঁহাদের পরে যে সমস্ত মহিলা সত্যাগ্রহীকে ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হয় তাঁহাদের আর কাহাকেও অবশ্য সালাজারের মিলিটারী জজেরা কোনো খাতির দেখান নাই। ফলে প্রত্যেকেরই দশ, বারো বছর করিয়া এবং সুধাবাঈয়ের ষোলো বছর সাজা হইয়া গিয়াছে।

কুয়ার্তেলে পিঁজরা হাজতের পর ছিল পর্তুগীজ মিলিটারী সৈনিকদের হাজত। সৈন্যদলের কোনো লোক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে বা অন্য কোন অপরাধ করিলে তাহাদের আনিয়া এইসব ঘরে রাখা হইত। এইসব ঘরে সাধারণত কোন গরাদ দেওয়া বা দরজা বন্ধ করিয়া তালা দেওয়া থাকিত না। তাহারা প্রত্যেকেই খাট বিছানা পাইত, পুলিস কুয়ার্তেলের এলাকার ভিতর ইচ্ছা মতন ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। তাহাদের খাবার আসিত পর্তুগীজ পুলিসের মেস হইতে। আমরা কুয়ার্তেল হইতে বদলি হইয়া যাওয়ার পর অল্পকিছু পর্তুগীজ সৈন্যদলের লোকেদের এখানে আনিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তালা দিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা নাকি ১৫ই আগস্ট সীমান্তে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালাইতে অস্বীকার করে। পরে শুনিয়াছি, তাহাদের সকলকেই লম্বা সাজা দিয়া পর্তুগালে জেলে পাঠানো হইয়াছে। এ সংবাদ আমরা পাই মিলিটারী গার্ডদের কাছেই মানিকোম্ পাগ্‌লা গারদে বসিয়া।

আগেই বলিয়াছি, কুয়ার্তেলের ব্যাক্ ইয়ার্ডে কয়েকটি নূতন বানানো ছোট ছোট সেল—যতদূর মনে পড়ে, মোট চারটি সেল সেখানে ছিল। তাহার একটিতে শ্রীযুক্ত গোরে ও বন্ধুবর শ্রীধর পুরুষোত্তম লিমায়াকে রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের পাশের সেলে ফাবিয়ান দা কস্তা এবং পোখ্ড়ে ও গোখ্লে নামে দুইজন ভারতীয় সত্যাগ্রহী ছিলেন। তৃতীয় সেলটিতে ছিলেন গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও মাপ্সার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ দুভাষী। ডাঃ দুভাষী গোয়ার সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশের লোক বলিয়া হাজতে শোওয়ার জন্য একটি খাট পাইয়াছিলেন; আর গোরে ও লিমায়ের কপালে ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের চেষ্টা ও তদ্বিরের ফলে একটি করিয়া খাট ও মশারি জুটিয়াছিল। ফলে এই তিনজন অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় হাজতে অপেক্ষাকৃত ভাবে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেলগুলি একেবারে পাইখানার কাছাকাছি থাকাতে তাঁহাদের সময় সময় বিকট দুর্গন্ধের আবহাওয়ায় থাকিতে হইত। পর্তুগীজ পুলিসের কিছুটা পরিচ্ছন্নতা বোধ থাকিলে হয়ত এটা হইত না; কারণ সবগুলি পাইখানাই ছিল আধুনিক

ধরনের ফ্লাশ পাইখানা। কিন্তু এগুলি ব্যবহার করিত প্রধানত থানার পর্তুগীজ ও গোয়ান কনস্টেবলেরা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় পর্তুগীজদের মত অপরিষ্কার স্বভাবের ইউরোপীয় জাতি দেখি নাই। উত্তর ইউরোপীয়দের তুলনায় দক্ষিণের লাতিন জাতির লোকেরা কিছু অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হয়। দারিদ্র্যও বোধহয় ইহার একটি কারণ। নিরক্ষর কৃষিজীবী সমাজের অনগ্রসরতার প্রভাবও ইহাতে হয়ত আছে—কিন্তু কৃষিজীবী সমাজের লোক হইলেই অপরিষ্কার হয় না। পর্তুগীজ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যেও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবোধের অভাব ঐ শ্রেণীর ইংরাজ বা উত্তর ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক বেশি বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তবে কারণ যাই হোক, গোরে প্রভৃতি ব্যাক্ ইয়ার্ডের সেলে বন্দী রাজনৈতিক কয়েদীদের পক্ষে তাহার ফল নিতান্ত মারাত্মক হইয়াছিল; বারংবার অভিযোগ জানাইয়াও ডাঃ দুভাষী বা গোরে-রা ইহার কোনো প্রতিকার করাইতে পারে নাই। ১৯৫৬ সালে বোধহয় অক্টোবর-নভেম্বর মাস হইবে একদিনের জন্য একবার আমরা কয়েকজন আগুয়াদা দুর্গের জেল হইতে পঞ্জিম কুয়ার্তেলে আসি। তখন দেখি, এইসব পায়খানাগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে আর তাহার জায়গায় খুব আধুনিক ধরনের "বক্স-সেল" হাজতের জন্য "বাক্স"-কুঠ্‌রী তৈয়ারী হইয়াছে। সে সময় ঘণ্টা কয়েকের জন্য আমি নিজেও একটি "বক্স-সেলে" থাকিয়া গিয়াছি—সেখানে ঐ ধরনের পাইখানার দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু তাহাতে পর্তুগীজ পুলিসদের পরিচ্ছন্নতাবোধের কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে কিনা বা তাহাদের অপরিষ্কার স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে কিনা তাহা বলিতে পারি না। আগুয়াদা দুর্গে দিনের পর দিন পর্তুগীজ সৈন্য, সার্জেণ্ট ও অফিসারদের চাল-চলন দেখিয়া সেরূপ মনে করার কোনো কারণ পাই নাই।

ব্যাক্ ইয়ার্ডেও আমাদের রোজ সকালবেলায় একবার আসিতে হইত হাত মুখ ধোওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের চব্বিশ ঘণ্টার জমানো প্রস্রাবের বোতল বা টিনের কৌটা সাফ করিয়া নেওয়ার জন্য। যে যা করিতে চায় সবকিছু আধ ঘণ্টার মধ্যে সারিতে হইবে। সারাদিনে সেই সময় আমাদের একবার করিয়া পাইখানা যাওয়ার হুকুম ছিল। প্রত্যহ ভোরে সেই আমাদের একবার করিয়া গোরে লিমায়ে ও ডাঃ দুভাষীর সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হইত। কথা বলার হুকুম ছিল না—মেয়েদের বেলায় পুলিস যেটুকু খাতির করিত, এক্ষেত্রে তাহা হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তবে ভরসার মধ্যে আমার পনরো-ষোলো বছর বৃটিশ জেলে অর্জিত অভিজ্ঞতাটুকু ছিল। সালাজারের ফ্যাসিস্ট পুলিসের বা 'পিদে'র দৃষ্টি এড়াইয়া থাকাকালীন ভারতীয় সহবন্দীদের সঙ্গে কিংবা অন্য সেলে বা হাজতে আটক গোয়াবাসী বন্দীদের সাম্‌নাসাম্‌নি কথা বলার সুযোগ না থাকিলেও অন্যভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার কোনো বাধা হয় নাই।

॥ ২৫ ॥

কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে ঢোকার দিন হইতেই আমি গোয়াতে ভারতের রাষ্ট্রদূত বা কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিতে থাকি। তখনও পর্যন্ত গোয়াতে আমাদের দূতাবাস কাজ করিতে ছিল এবং পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী যদি কোনো দেশে অপর কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রজা আসিয়া কোনো কারণে গ্রেপ্তার হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার নিজের দেশের রাষ্ট্রদূত বা কন্সালের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজের মামলার তদ্বির তদারকের বন্দোবস্ত করিয়া নিবার অনুমতি দেওয়া হয়। অবশ্য এ নিয়ম ততক্ষণই কার্যকরী হয় যতক্ষণ উভয় দেশের ভিতর কূটনৈতিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। যদি কোনো কারণে তাহাদের ভিতর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও একের অন্যের সঙ্গে সরকারীভাবে প্রত্যক্ষ আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া যায় বা যদি তাহারা একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় কোনো রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কাজ চলিতে থাকে। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিক হইতেই গোয়ার প্রশ্নকে উপলক্ষ করিয়া ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের কূটনৈতিক সম্পর্ক যথেষ্ট তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভারত গভর্নমেণ্ট ১৯৫৩ সালের জুন মাসে গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদে তাঁহাদের লিস্‌বনে অবস্থিত দূতাবাস বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাহা হইলেও দুই দেশের ভিতর কূটনৈতিক সম্পর্ক সরকারীভাবে ছিন্ন হইয়া যায় নাই এবং বিশেষ করিয়া গোয়াতে আমাদের সরকারী দূতাবাস বন্ধ করারও কোনো কথা হয় নাই। আমি যে সময় গোয়াতে গিয়া গ্রেপ্তার হই, তখন সেখানে আমাদের কন্সাল বা দূত হিসাবে কাজ করিতেছিলেন শ্রীমণি নামে জনৈক তামিল ভদ্রলোক, ভারতের বৈদেশিক বিভাগের একজন অভিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইতিপূর্বে তিনি ফরাসী পণ্ডিচেরীতে কিছুদিন ছিলেন। পণ্ডিচেরী সম্পর্কে ফরাসী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্টের আপোস-মীমাংসা হইয়া গেলে পর তাহাকে পর্তুগীজ ভারতের এলাকার ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের দূত হসাবে পাঠানো হয়। আমার যতদূর ধারণা, গোয়াতে এই সময়কার নিতান্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির ভিতরেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও কুশলতার সঙ্গে তাঁহার কাজ করিয়া গিয়াছেন; অবশ্য তখন প্রতিদিন অবস্থার এত দ্রুত অবনতি ঘটিতেছিল যে, আমরা গোয়ার ভিতর যাওয়ার পর তিনি দুই মাসের বেশি আর গোয়াতে টিঁকিতে পারেন নাই। ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজ সৈন্যেরা যখন নির্বিচারে গুলী চালাইয়া ২২ জন সত্যাগ্রহীকে হত্যা করে, ভারত গভর্নমেণ্ট তাহার প্রতিবাদে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সকল প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। ফলে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে গোয়াতে ভারতের দূতাবাসও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাহার পূর্ব পর্যন্ত খালি গোয়াতেই নয়, পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার রাজধানী লোরেঞ্জো মার্কুয়েসেও আমাদের দূতাবাস কাজ করিতেছিল।

গোয়াতে ভারতীয় দূতাবাস তখনও খোলা ছিল বলিয়া আমার নিজের দিক দিয়া

দুইটি কারণে আমি কন্সালের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলাম। একটি কারণ নিছক ব্যক্তিগত, কন্সালের মারফৎ দেশের জনসাধারণ ও আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া যে আমি প্রাণে বাঁচিয়া আছি এবং গোয়াতে পুলিস হাজতে যতটুকু সম্ভব সে হিসাবে সুস্থ আছি। দ্বিতীয় কারণ, ভারত সাধারণতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার যে আইনসম্মত অধিকার আমার আছে, পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সেই অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করিয়া নেওয়া। মনে মনে ইহার পিছনে আর একটু সংকীর্ণতর স্বার্থবোধও যে কাজ করিতেছিল না তাহা নয়। মনে অসত্যাগ্রহী-সুলভ একটা ভরসা ছিল যে কন্সালকে বলিলে তিনি চেষ্টা করিয়া হয়ত আমাকে এক নম্বর হাজত-ঘরের ভিড় এবং অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হইতে কোনো অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন হাজত-ঘরে বদলি করার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন—যেখানে অন্তত হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া থাকিতে পারিব এবং শুইয়া বসিয়া থাকিতে একঘেয়ে লাগিলে অন্তত সাত আট পা হাঁটিয়া একটু শরীর চালনা করিতে পারিব। আমাদের এক নম্বর হাজত-ঘরে গোয়ার বন্দোবস্ত কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনা পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে। কিন্তু শোওয়ার জায়গার অভাবের চেয়ে যাহা আমাদের পক্ষে মারাত্মক রকমের শারীরিক অস্বস্তির ও ক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা হইতেছে ঘরের ভিতর সকালে সন্ধ্যায় একটু উঠিয়া হাঁটার বা পায়চারি করার মত জায়গার অভাব। শুইয়া না থাকিলে উঠিয়া বসিতে কিংবা দাঁড়াইতে পারি; কিন্তু অতটুকু ঘরে অত লোকের ভিতর এক হাত এদিক ওদিক নড়াচড়া করার উপায় নাই। গোয়াতে উনিশ মাস কারাবাসের মধ্যে যে ঘটনাকে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা এই—পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে হোক, মানিকোমের পাগলা গারদের সেলে হোক, কিংবা আগুয়াদা দুর্গের বন্দীশালায় হোক—বন্দীদের সারাদিন হাজতের বন্ধ ঘরে অটক থাকিতে হইবে। ছোট ছোট ঘরের ভিতর শোওয়া আর বসা এ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে নড়াচড়া করার কোনো উপায় নাই, কোনো ব্যবস্থা নাই। পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজত এবং মানিকোমের পাগলা গারদের সেলে আমি ছয় মাস ছিলাম—এই ছয় মাসে সমস্ত শরীর, এইভাবে বন্ধ ঘরে আটক থাকিয়া থাকিয়া প্রায় পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া ওঠার উপক্রম করিয়াছিল।

কিছু পরের কথা হইলেও আগুয়াদার অবস্থাটা এই প্রসঙ্গে বলিয়া লইতে চাই। আগুয়াদা দুর্গে বদলি হওয়ার পর আমরা চারজন—গোরে, শিরুভাই লিমায়ে, ঈশ্বরভাই দেশাই ও আমি—থাকার জন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় সেল পাই। সেখানে অবশ্য একটু খালি পায়চারি করার জায়গা ছিল। কিন্তু সেখানেও চারজন কেন, দুজনও একসঙ্গে এক সময় পায়চারি করা যাইত না। আমরা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঘরে পায়চারি করার আলাদা আলাদা সময় ঠিক করিয়া নিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া সপ্তাহে পাঁচ দিন করিয়া আমাদের সেলের সম্মুখের উঠানে বিকালে আধ ঘণ্টা করিয়া চারিদিকে রাইফেলধারী মিলিটারী পাহারার নজরের মধ্যে থাকিয়া পায়চারি করার অনুমতি ছিল। বলা বাহুল্য, পাঞ্জিম কুয়ার্তেল কিংবা মানিকোমের জেলের তুলনায় একে প্রায় স্বর্গসুখ বলা চলে। তা ছাড়া আগুয়াদাতে স্নানের সময়, পায়খানা পরিষ্কার করার সময়, কিংবা আমাদের সেল হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত পানীয় জলের কুয়া হইতে মাথায় করিয়া জল আনার সময়, প্রত্যহ জেলের গুদাম হইতে আমাদের রান্নার জন্য জ্বালানী জিনিস বহিয়া আনার কালে খোলা হাওয়ায় চলাফেরা করার আরও কিছুটা সুযোগ দিনের মধ্যে দু' একবার

যে হইত না তা নয়। কিন্তু মোটের উপর, আগ্নয়াদাতে রাজনৈতিক বন্দীদের বাহিরে খোলা জায়গায় চলাফেরা করার যেটুকু সুযোগ আছে, তাহা পাঞ্জিম কুয়ার্তেল কিংবা মানিকোমের তুলনায় কিছুটা ভালো হইলেও, আগ্নয়াদাতেও এক একটি সেলে যেভাবে বন্দীদের গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে, তাহাকে কোনো আধুনিক সভ্য দেশের জেল-ব্যবস্থার সংগে তুলনা করা চলে না। আমার সাক্ষ্য অনেকের কাছে পর্তুগীজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রোশ-প্রসূত বলিয়া মনে হইতে পারে; পর্তুগীজবিরোধী রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা বলিয়া মনে হইতে পারে। সেইজন্য এ বিষয়ে একজন অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের মতামত এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন মনে করিতেছি—ইনি গ্রেট বৃটেনের "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" ও "ইকনমিস্ট" কাগজের প্রতিনিধি মিসেস তায়া জিন্‌কিন। মিসেস জিন্‌কিন ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে গোয়ায় যান এবং তখন তিনি আগ্নয়াদা দুর্গে গিয়া আমাদের সংগে দেখা করার অনুমতি পান। আমাদের ঘরটি ছাড়াও আগ্নয়াদা দুর্গে বন্দীদের রাখার জন্য যে কয়টি 'ভালো' (কর্তৃপক্ষের মতে) ঘর ছিল, তাহার একটিতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, অন্য ঘরগুলিতে তাঁহাকে ঢুকিতেই দেওয়া হয় নাই। কিন্তু শুধু আগ্নয়াদার সেই 'ভালো' ঘরখানি দেখিয়াই মিসেস জিন্‌কিন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সেখানকার 'খারাপ' ঘরগুলি এবং পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে বা মানিকোমে যে সমস্ত সেলে আমরা ছিলাম, তাহার অবস্থা পাঠকেরা সহজেই আন্দাজ করিতে পারিবেন।

মিসেস জিন্‌কিন লিখিতেছেন—"জেলের ঘরগুলি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক বন্দীতে বন্দীতে ঠাসা ভর্তি। অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে তাহাদেরকে এইসব ঘরে গাদাগাদি করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি যে ঘরটি দেখিয়াছিলাম, সেখানে খুব ঠাসাঠাসি করিয়া হয়ত ৩০ জন লোক থাকিতে পারে। সেখানে ৬৮ জনকে রাখা হইয়াছিল। তাহাদের শোয়ার খাটগুলি একটি অন্যটির সংগে এবং দেওয়ালের সংগে, গায়ে গায়ে লাগানো। দু' পাশে দু' সারি খাটের ভিতর সরু একটি আসা যাওয়া করার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। খাটগুলি দু'তলা বলিয়া নীচের এক সারি করিয়া বিছানার ঠিক উপরে উপরে আর এক সারি করিয়া বিছানা পাতা। উপর তলার বিছানাগুলি এত নীচে যে, যাহাদের নীচের তলায় থাকিতে হয় তাহাদের সেখানে বসার কোনো উপায় নাই। বিছানায় আসিলে শুইয়া পড়িতে হইবে। উপরের বিছানার লোকেদেরও সেই অবস্থা। সেই ঘরে কার্যত কোন জানালা নাই বলিলেও চলে; দরজা মাত্র একটি। ঘরের এক কোণায় রান্নার একটি জায়গা আর তাহার সামনে ফোকরের মত ছোট্ট একটি ঘর—সেইটি একসাথে পায়খানা ও বাথ-রুমের কাজ করে। ইহার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেই মার খাইতে হয়।"

মিসেস জিন্‌কিন যে ঘরটিতে গিয়াছিলেন, তাহা আগ্নয়াদা দুর্গের বন্দীশালায় আমাদের দুই নম্বর সেলের ঠিক পাশের তিন নম্বর সেল। আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়াই তিনি এই ঘরে যান। তিনি যে অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন—তাহাই আগ্নয়াদার অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থা! তবু আগ্নয়াদা দুর্গের সমস্ত ঘর মিসেস জিন্‌কিন দেখেন নাই। এই কাহিনীর আগ্নয়াদা পর্বে প্রবেশ করিলে পাঠক তাহাও জানিতে পারিবেন। পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের এক নম্বর হাজতের সংগে আগ্নয়াদার প্রধান তফাৎ এই ছিল যে, আগ্নয়াদায় আমরা প্রতি দুজনে একটি করিয়া লোহার ফ্রেম ও কাঠের তক্তা দেওয়া দু'তলা তক্তপোশ পাইয়াছিলাম; পাঞ্জিমে আমাদের খালি মেজের উপর শুইতে হইত। এ ছাড়া

বেশি কোনো তফাৎ ছিল না। আমি পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের এক নম্বর হাজতে এই অবস্থায় ক'দিন থাকিয়াই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম। আজ আগুয়াদা হইতে আমরা চলিয়া আসিয়াছি (মাত্র এক বছরের মত সময় আমরা সেখানে ছিলাম), কিন্তু গোয়ার মুক্তি-যোদ্ধারা বছরের পর বছর—দশ বারো হইতে ষোলো, আঠারো, একুশ, এমনকি আঠাশ বছর ধরিয়া এই জীবন্ত-সমাধির অবস্থায় থাকিবে!

যাহা হউক, পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে ঢোকার পর হইতে এক নম্বর হাজতে ভিড় ও মহা-অস্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কবল হইতে কিভাবে উদ্ধার পাইব, আমার মনে সেও একটা চিন্তা দাঁড়াইয়া গেল। কুয়ার্তেলের অফিসারদের ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারা পারতপক্ষে আমাকে ভারতীয় কন্সালের সঙ্গে দেখা করিতে দিতে চাহিবে না। আমি সবেমাত্র পর্তুগীজদের কারাগারে ঢুকিয়াছি। পর্তুগীজদের ভাষা বুঝি না, আইন-কানুন কিছুই জানি না। চোখের উপর যে সব ব্যাপার ঘটিতে দেখিতেছি, তাহাতে ইহাদের আইন-কানুন যে কিছু আছে তাহাও মনে হইতেছে না। অন্তত আমরা যে সমস্ত আইন-কানুনের সঙ্গে অভ্যস্ত সে ধরনের আইন যে ইহাদের মুলুকে নাই, সেটাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কাজে কাজেই কন্সালের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজের জন্য কিছুটা সুরাহা করিয়া নেওয়ার জন্য কোন্ পথে কিভাবে অগ্রসর হই, সেটা একটা ভাবনা দাঁড়াইয়া গেল। কিছু চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম প্রথমে ব্যাক্ ইয়ার্ডের সেলে গোরে-র সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। গোরে এবং শিরুভাই লিমায়ে আমার চেয়ে প্রায় দু' মাস আড়াই মাস আগে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কপালে অন্তত খাট-বিছানা জুটিয়াছে; এখানকার অবস্থার সঙ্গে তাঁরা দু'জনে নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি পরিচিত। সুতরাং আমার কারাজীবনকে এখানে যদি একটু সুসহ করিয়া নিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে তাঁহাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা পাওয়া দরকার। কিন্তু মুশকিল এই, তাঁহারা যেখানে আছেন, সেটা আমার হাজতঘর হইতে অনেক দূরে, কুয়ার্তেলের পিছন দিকের উঠানে। আমাদের সেলের সামনেও যেমন, তাঁহাদের সেলের সামনেও তেমনি কোমরবন্ধে রিভলবার, হাতে সঙগীন-উঁচানো রাইফেল নিয়া শান্ত্রী পাহারা চব্বিশ ঘণ্টা খাড়া থাকে। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া সেখানে পেঁছানো কঠিন। সারা দিনের মধ্যে ভোরবেলায় সঙগীন-রাইফেল-ধারী পুলিস পাহারায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনের সময় পায়খানার কাছাকাছি গেলে একবার করিয়া চোখের দেখা হইত বটে, কিন্তু কথা বলার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ক্রমে উপায় বাহির হইল। কিছুটা বেশি দিন জেলে থাকার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সকলেই ভাল করিয়া জানেন যে, জেলের কোনো বিধিনিষেধই এমন হয় না, যাহার অন্ধিসন্ধিতে কোনো না কোনো ফাঁক না থাকে। বরং বাহির হইতে যেখানে বজ্র-আঁটুনির সমারোহ বেশি হয়, ফস্কা গেরো সেখানেই বেশি থাকে। সালাজারের জেলও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নয়; ভারতে ইংরেজদের জেলও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। কিভাবে পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে গোরেদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিলাম, এখানে তাহা বলার দরকার নাই। তবে এই সূত্রে আমার বৃটিশ জেলে লম্বা কারাবাসের অভিজ্ঞতা যে পর্তুগীজদের জেলেও কিছুটা কাজে লাগে, তাহা পাঠক সহজেই আন্দাজ করিতে পারেন। এই সময় আমাদের সঙ্গে আটক জনৈক ভারতীয় অ-রাজনৈতিক বন্দীর যে সহায়তা পাইয়াছিলাম, তাহাও ভোলার নয়। এই ব্যক্তি ঘটনাচক্রে গোয়ায় গিয়া পুলিসের হাতে ধরা পড়ে এবং কিছুকালের মধ্যেই ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসে। রাজনৈতিক সত্যাগ্রহী

ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় কয়েদীকে ধরিয়া রাখার কোনো ইচ্ছা বা গরজ পর্তুগীজ পুলিসের তখন ছিল না। এই ব্যক্তিও কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়া গোয়াতে আসে নাই, ইহা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ পুলিস তাহাকে বর্ডার পার করিয়া ছাড়িয়া দেয়। আমাদের সঙ্গে এক নম্বর হাজতেই সে কিছুদিন ছিল এবং একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, কুয়ার্তেলে তাহার সাহায্য এবং কুয়ার্তেলের পাহারা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহার দেওয়া সুলুক-সন্ধান না পাইলে আমার একার চেষ্টায় অত তাড়াতাড়ি গোরে ও শিরুভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইত না। একথাও বলা বাহুল্য যে, গোয়ানীজ পুলিস শান্ত্রীদের সহায়তা ভিন্ন ইহা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এখন আর কুয়ার্তেলে ততটা সুবিধা নাই। এখন কুয়ার্তেলের হাজতে এবং সেলে শান্ত্রীর কাজ করে পর্তুগীজ গোরা মিলিটারী। কুয়ার্তেলে আমরা দুর্দান্ত 'ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস' বা 'পিদে'-র—চোখের সম্মুখে থাকায় অবশ্য গোরা সৈনিকদের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় নাই, কিন্তু পরে আমরা অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে বা অযাচিতভাবে গোয়াতে জেলের ভিতর সেরূপ সাহায্য পাইয়াছি। সময় মতন সে কথা বলিব। এখানে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উপর যে গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই গভর্নমেণ্টের সাধারণ বেতনভুক কর্মচারীরাই তাহার সবচেয়ে বেশি বিরোধী হয়। কি পর্তুগালে হোক, আর গোয়াতে হোক, সালাজার গভর্নমেণ্টের সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা সেইখানে।

একথা পাঠক নিশ্চয়ই আন্দাজ করিতে পারিতেছেন যে, গোরেদের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইয়াছিল, চোরাই চিঠির মাধ্যমে। গোরেকে আমার অবস্থার কথা জানাইতে তিনি আমার ব্যবহারের জন্য একটি ধুতি, জামা ও একটি সাবান পাঠাইয়া দেন। তিনি এ সংবাদও আমায় পাঠান যে, সপ্তাহ খানেকের ভিতর কন্সাল জেনারেল মিঃ মনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আপাতত ইহা ছাড়া করার কিছু নাই। ১৫ই আগস্টের পর ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেয়, তাহার জন্য অপেক্ষা করাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে আমি গোরের সঙ্গে ভিন্নমত ছিলাম না। রাম দেশাই যে আমায় একটি ধুতি দিয়া গিয়াছিলেন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। গোরের ধুতিটি হাতে আসিলে আমার দুটি গোটা ধুতি সম্বল হইল। আমার পরনের ছেঁড়া ধুতিটিকে কাচিয়া নিয়া, তাহা দিয়া রাতে শোয়ার সময় মেজের উপর চাদর হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকিলাম। অন্ন তো তখন ডাঃ সালাজারই যোগাইতেছেন। ঈশ্বরের দয়ায় দু'খানি বস্ত্রও পাওয়া গেল, জামাও একটি পাইলাম। তাহার উপর মেজের বিছানার চাদরও একটা জুটিয়া গেল। আর চাই কি? এখন সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস আমায় নিয়া কি করিবে সেটুকু জানিতে পারিলেই হয়; তখন নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে পারি।

এইভাবে আমার দিন কাটিতেছে। রোজই একবার, দুবার, তিনবার ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের গালাগালি আমাকে খাইতে হয়। তাহাও প্রায় রুটিনে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বেচারীরা আমাকে মারিয়া হাতের সুখ মিটাইতে পারে নাই; নিজেদের ভাষায় অশ্লীল-বাপান্ত গালাগালি করিয়া যতটা পারে মনের ঝাল তুলিয়া নিতেছে। আমার গায়ে বা মনে তাহাতে ফোস্কা পড়ে না; কারণ শ্লীল বা অশ্লীল পর্তুগীজ ভাষার কোনো কথাই তখন বুঝি না। দুপুরে, সন্ধ্যায় 'অন্নমন্ত্রী' মহাশয় ধমক-চমক করিয়া ভাত-তরকারী পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া যাইতেছেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন হাজতঘর খুলিয়া আমাকে

কুয়ার্তেলের চুল-দাড়ি-কাটার সেলুনে নিয়া যাওয়া হইল। কোনো কথাবার্তা নাই, জামাই আদরে চুল ছাঁটিয়া, দাড়ি কামাইয়া স্নানের জন্য একটি বাথ-রুমে ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। স্নান করিয়া বাহির হইলে আমার উপর হুকুম হইল, আমি যেন বিকাল তিনটার সময় জামা-কাপড় পরিয়া তৈরি থাকি, আমাকে কন্সালের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে হইবে।

কন্সাল জেনারেল মিঃ মনির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়ার দরকার নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পর্তুগালের কূটনৈতিক সম্পর্কের তখন এত অবনতি ঘটিয়াছে যে, মিঃ মনি তাঁহার সাধ্যমতন চেষ্টা করিয়াও আমার জন্য খুব বেশি কিছু করিতে পারেন নাই। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যও তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান। ইহার ফলে আমার যে কোনো উপকার হয় নাই তাহা নয়। তিনি আমার বাড়িতে আমার পঞ্জিম হাজতে থাকার খবর দিতে পারিয়াছিলেন। বোধহয় তাঁহার চেষ্টাতেই আমি বাড়িতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে একটি চিঠি লেখার অনুমতি পাই। যদিও জুলাই মাসে লেখা চিঠি অক্টোবরের গোড়ায় আমার দাদার হাতে পেঁছায়, তাহা হইলেও চিঠিটা ডাকে শেষ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল ঠিকই। আর মিঃ মনি আমার জন্য পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের নিকট কুড়িটি টাকা জমা দেওয়ার অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও চেষ্টা করিয়া আমাকে এক নম্বর হাজত হইতে অন্যত্র বদলির বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার কারাবাসের অবস্থাকে সুসহ করার জন্য তিনি কতটুকু কি করিতে পারিয়াছিলেন বা না পারিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে যাহা এখানে প্রাসঙ্গিক—এবং কিছুটা কৌতুকাবহও বটে—তাহা হইল এই সাক্ষৎকারের সময়কার সরকারী সাঁজোয়া বন্দোবস্ত, যাহা নিজের চোখে না দেখিলে আমার পক্ষে পর্তুগীজ সরকারের আসল মানসিকতাটা বোঝা কঠিন হইত। সেই মানসিকতাকে কতকটা যাত্রা-দলের রাজা বা সেনাপতির মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে যাহা খালি তরোয়াল ঘুরাইয়া এবং জরির পোশাক পরিয়া হাঁক-ডাক করিয়া প্রতিপক্ষের মনে ভয় এবং সম্ভ্রম জাগাইতে চায়।

সেদিন মিঃ মনির সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার, গোরের ও শিরুভাইয়ের একত্র ডাক পড়িয়াছিল। যথাসময়ে আমাদের নিজ নিজ হাজত বা সেলের কুঠুরী হইতে বাহিরে আনা হইল। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করিয়া সশস্ত্র গোরা পর্তুগীজ কনস্টেবল; তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া সেফ্‌টি ক্যাচ খোলা স্টেনগান, নল মাটির দিকে মুখ করা, ঘাড় হইতে চামড়ার স্ট্র্যাপে স্লিং করিয়া ঝুলানো, যেন প্রয়োজন পড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলী চালানো যায়। আমাদের আনিয়া পঞ্জিম কুয়ার্তেলের যে একটিমাত্র সবেধন নীলমণি সবুজ রংয়ের প্রিজন্ ভ্যান আছে, তাহাতে চড়ানো হইল। এক পাশে আমি, আমার দু' পাশে দু'জন স্টেনগানধারী গোরা পুলিস; অপর পাশের বেঞ্চে গোরে এবং শিরুভাই, তাহাদের দু' পাশে একজন করিয়া ও মধ্যে একজন, মোট তিনজন গোরা পুলিস। ভ্যানের পিছনের দিকে, ভিতরের কুঠুরীর বাহিরে দুটি সীটে দু'জন স্টেনগানধারী আর সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশে স্টেন হাতে সেদিনকার ডিউটিতে যে সুব্ শেফ্ আছে সে। ইহাতেও রক্ষা নাই। আমাদের সামনে পিছনে একটি করিয়া ল্যাণ্ড-রোভার বোঝাই করা রাইফেলধারী মিলিটারী।

গাড়ি চলার আগে সুব্ শেফ্ আমাদের একবার শাসাইয়া গেলেন—"nao falar" ("কথা বলা বারণ")! সাঁ করিয়া তিনখানি গাড়ি সাইরেন বাজাইয়া দেউড়ী দিয়া বাহির

হইয়া গেল। কন্সালের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের জায়গা ছিল মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের দপ্তর। অক্টোবর মাসে আমাদের এইখানেই বিচারের জন্য আনা হয়। কুয়ার্তেল হইতে এই বাড়ির দূরত্ব এক মাইলেরও কম হইবে। কিন্তু এইটুকু পথের জন্যই আমাদের সামনে পিছনে মিলিটারী পাহারার গাড়ি দিয়া সমারোহ করিয়া কন্সালের সঙ্গে দেখা করার জন্য আনা হইল। সাক্ষাতের জায়গায় আসিয়া দেখি সেখানে আরও সমারোহ, গোটা বাড়িটাকেই একেবারে মিলিটারী দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। বাড়ির ভিতর প্রত্যেক ঘরের দরজায় দরজায় রাইফেল হাতে মিলিটারী শান্ত্রী দাঁড়াইয়া। দেখিলে মনে হয়, ভারতের কন্সাল জেনারেল যেন তাঁহার সৈন্যসামন্ত নিয়া আমাদের পর্তুগীজদের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, আর তাহারই বিরুদ্ধে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতি চলিতেছে।

আমরা যখন গেলাম, তখনো মিঃ মনি আসেন নাই। আমাদের কিছু আগেই আনা হয়, তাই আমাদের পাশের একটি ঘরে নিয়া গিয়া বসাইয়া রাখা হইল। এখানেও যথারীতি আমাদের ধমকাইয়া বলিয়া দেওয়া হইল—'কথা বলার চেষ্টা করিও না'। তবে পর্তুগীজ চরিত্রের সুবিধার মধ্যে এইটুকু যে, পর্তুগীজ সাধারণ লোকেরা (সৈনিকেরাও তাহাদের মধ্যেই পড়ে) অত্যন্ত ফুর্তিবাজ ঢিলেঢালা ধরনের। ইংরেজ গোরাদের মত বেশিক্ষণ মুখ গোমড়া করিয়া ঘাড় গোঁজ করিয়া থাকিতে পারে না। উপরওয়ালার হুকুমে সাঁজোয়া মিলিটারীপনা যত তোড়জোড় করিয়া আরম্ভ হয়—উপরওয়ালা অফিসার কেহ সামনে না থাকিলেই হইল—ঢিলেপনা তত তাড়াতাড়ি শুরু হয়। তখনও আমার অবশ্য পর্তুগীজদের বেশি দেখার ও তাহাদের সম্পর্কে খুব বেশি জানার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু গোরে তখন দু' মাস আড়াই মাস ধরিয়া তাহাদের স্বভাব-চরিত্র কিছুটা লক্ষ্য করিয়াছেন। ঘরে ঢুকিয়া তিনি একবার চোখের ইশারায় জানাইলেন—'ঘাবড়ানোর কিছু নাই, সুব্ শেফ্‌টাকে বিদায় হইতে দাও।' সুব্ শেফ্ ঘরের ভিতর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া—চারিদিকে তাকাইয়া, শান্ত্রী পাহারা সব ঠিক আছে দেখিয়া নিয়া ট্রাইব্যুনালের দপ্তরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার সমান র্যাঙ্কের সার্জেণ্ট জাতীয় কয়েকজন মিলিটারী নন-কমিশনড্ অফিসার গল্প-সল্প করিতেছিল ও মদ খাইতেছিল। সুব্ শেফ্ সেদিকে চলিয়া যাইতেই ঘরের গুমট আবহাওয়া যেন কিছুটা হাল্কা হইয়া গেল। ঘরে আমাদের দরজা জানালা পাহারা দেওয়ার জন্য তিনজন মিলিটারী শান্ত্রী ছিল। অফিসার বিদায় নিতেই তাহারা 'অ্যাটেনশন' ভঙ্গী হইতে 'স্ট্যাণ্ড ইজি' ভঙ্গীতে দাঁড়াইল, তারপর এদিক ওদিক দেখিয়া নিয়া একজন দরজার কাছের একটি বেঞ্চিতে ও অপর দুইজন জানালার তাকের উপর বসিয়া পড়িল। গোরেও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের একজনের দিকে তাকাইয়া খুব বিনীত মিনতির সুরে বলিলেন—"Senor, Faze Favor! Quero beber agua" (মহাশয়, একটু অনুগ্রহ করিবেন? আমি একটু জল খাইতে চাই—পর্তুগীজ ভাষায় 'Faze Favor' কথার অর্থ ইংরাজী 'Please' কথার মত; আক্ষরিক অর্থ make a favour)। সে ব্যক্তি একটু মাথা দুলাইয়া সম্মতি জানাইয়া রাইফেল বেঞ্চির সঙ্গে ঠেকাইয়া কাত করিয়া রাখিয়া ঘরের এক কোণে একটি নারিকেলের দড়ির জালে মোড়া কাঁচের সরাইয়ে খাবার জল ছিল, একটি গ্লাশে করিয়া আনিয়া গোরের হাতে দিল। গোরে তখন কাজ চালানোর মত দু' একটি পর্তুগীজ কথা বলিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছেন। গোরের জল খাওয়া হইতেই সে তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিল—'সাতিয়াগ্রহী? ইন্দিয়ানো? ইন্দু উ ক্রিস্তাঁও (সত্যাগ্রহী? হিন্দু না খৃষ্টান?)? গোরে উত্তর দিলেন—সি, সি, সত্যাগ্রহী ইন্দিয়ানো; নাও ক্রিস্তাঁও, ইন্দু।' সেও গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। পর্তুগীজ সাধারণ মানুষের আচার ব্যবহারের নিয়ম অনুযায়ী এই দু' একটি কথা বলার অর্থ তখন আমাদের মধ্যে ভাব হইয়া গিয়াছে, পরস্পরকে তত ভয় করার আর দরকার নাই। আমরাও ক্রমে ক্রমে ভাবগতিক বুঝিয়া নিজেদের মধ্যে একটু একটু করিয়া দু' একটি কথা বেশি আওয়াজ না করিয়া মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলাম। একজন শান্ত্রী তাহা শুনিয়া একটু আপত্তি জানাইয়া বলিল—"fala na Portuguesa" (পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলো)। গোরে খুব মুখ কাঁচুমাচু করিয়া জানাইলেন—"এখনো বলিতে শিখি নাই, সবেমাত্র শিখিতে চেষ্টা করিতেছি।" তখন সে সন্তুষ্ট হইয়া হুকুম দিল, তাহা হইলে "ফালা কোঙ্কনী।" আর আমাদের কোনো বাধা থাকিল না। আমরা মৃদুস্বরে হইলেও স্বচ্ছন্দে ইংরাজীতে পরস্পরের খবরাখবর নিতে আরম্ভ করিলাম। আমরাও যেমন পর্তুগীজ জানি না, ইহারাও ইংরাজী কোঙ্কনী কিছুই জানে না! ইহার খানিকক্ষণ পরেই সুব্ শেফ্ আসিয়া আমাকে ডাক দিল। বুঝিলাম মিঃ মনি আসিয়া গিয়াছেন। তাহার পিছনে পিছনে ট্রাইবুনালের জজেদের খাস কামরায় হাজির হইলাম। মিঃ মনি, ভারতীয় দূতাবাসের দোভাষী মিস ডায়াজ (ইনি গোয়াবাসিনী, ইঁহার পিতা গোয়ার বিখ্যাত চিকিৎসক পরলোকগত ডাঃ ডায়াজ গোয়ার মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন) এবং একজন স্টেনোগ্রাফার, টেবিলের একদিকে বসিয়া। টেবিলের ডাইনে বাঁয়ে দু'জন দু'জন করিয়া চারজন পর্তুগীজ কর্মচারী। তাহাদের একজন পর্তুগীজ তরফের মিলিটারী দোভাষী। আমাকে টেবিলের সামনের দিকে একটি চেয়ারে বসিতে দেওয়া হইল, আমরা কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম।

॥ ২৬ ॥

কুয়ার্তেল হাজত হইতে মানিকোমের পাগলা গারদে

কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে সেদিনকার সাক্ষাৎকারের পর আমাদের বেশিদিন আর পাঞ্জিমের কুয়ার্তেলে রাখা হয় নাই। তখন প্রায় প্রতিদিনই দলে দলে রাজনৈতিক বন্দী আসিয়া কুয়ার্তেলের সমস্ত হাজতঘর ভর্তি করিয়া ফেলিতেছিল। আমি গোয়ায় ঢোকার পর এবং ১৯৫৫ সালের পনরোই আগস্টের পূর্বে, আর দুই দল সত্যাগ্রহী ভারত হইতে আসে—তাহার মধ্যে প্রথম দলে জম্মু ও কাশ্মীর হইতে আগত কিছু সত্যাগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয় দলে আসেন ডাঃ লোহিয়ার সোস্যালিস্ট দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত মধু লিমায়ে। এই দুই দল সত্যাগ্রহীর ভিতর এক মধু লিমায়ে ভিন্ন আর কাহাকেও গোয়ার পুলিস কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করিয়া গোয়ার ভিতরে আটকাইয়া রাখে নাই। বাছাই করিয়া দু' চারজন যাঁহাদেরকে তাহারা ধরিয়া রাখিয়াছিল তাঁহাদেরকেও অল্পদিনের ভিতরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়—অর্থাৎ তাঁহাদেরকে পুলিস পাহারায় গোয়া-ভারত বর্ডারে আনিয়া মুক্তি দেওয়া হইত। আমার সঙ্গী ভগৎ তুলসীরামজী ও নাসিক হইতে আগত ছেলেটিকে

দিন তিন-চারেকের ভিতর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মধু লিমায়ের সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মধু লিমায়ে ভিন্ন আর কাহাকেও পাঞ্জিম কুয়ার্তেল পর্যন্ত আনা হয় নাই। গ্রেপ্তারের পরেই তাঁহাদের বর্ডার পার করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, গোয়ার ভিতরে এই সময় যাহারা গ্রেপ্তার হইতেছিলেন তাঁহারা সকলেই গোয়াবাসী। প্রত্যাসন্ন ১৫ই আগস্টের হাঙ্গামার কথা ভাবিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তখন নির্বিচারে একধার হইতে যে কোনো লোককে একটু সন্দেহ হইলেই গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহাতে ১৫ই আগস্ট ভারত হইতে গোয়ার দিকে যদি ব্যাপক গণ-সত্যাগ্রহ অভিযান আরম্ভ হয় তাহা হইলে গোয়ার ভিতরে যেন কিছু না হয়। গোয়ার ভিতরে সেইজন্যই গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহার ফলে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ কিছুটা মুশকিলেও পড়িয়া যান—এত লোককে রাখা হইবে কোথায়? পাছে এই বিপদ দেখা দেয় সেইজন্য তাঁহারা পাঞ্জিম শহরের উপকণ্ঠে মানিকোম্ পল্লীতে একটি যে পাগ্লা-গারদ ছিল সেখানে আগে হইতেই কিছুটা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুয়ার্তেলের হাজতে ভিড় একটু বেশি হইয়া গেলেই তাঁহারা রাজনৈতিক বন্দীদের পাঠাইয়া দিতেন এই পাগলা গারদে। ১৫ই আগস্টের 'প্রস্তুতি'র জন্য কুয়ার্তেলের হাজত খালি করিয়া আমাদেরকেও যথারীতি সেই পাগলা গারদে চালান দেওয়া হইল। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বোধহয় ৩রা আগস্ট—হঠাৎ একদিন আমাদের ডেরা-ডান্ডা গুটাইয়া মানিকোমে যাওয়ার ডাক আসিল।

আমাকে ইহার কিছুদিন আগে এক নম্বর হাজত হইতে দুই নম্বর হাজতে বদলী করা হয়। কন্সালের সঙ্গে দেখা হওয়ার ক'দিন বাদে সত্যাগ্রহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জনৈক 'সুব্ শেফের' চেষ্টায় আমি এক নম্বর হাজতের ভিড় এবং গাদাগাদির হাত হইতে ক'দিনের জন্য অব্যাহতি পাই। এই সুব্ শেফ্ ভদ্রলোক একজন গোয়াবাসী খৃষ্টান। যে কোনো কারণেই হোক সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে ইনি পারতপক্ষে খুবই ভালো ব্যবহার করিতেন এবং নিজেকে বাঁচাইয়া যতটা হয় রাজনৈতিক বন্দীদের ছোটো-খাটো উপকার করার জন্য তিনি খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের কাছেও তাঁহার সম্পর্কে প্রশংসাই শুনিয়াছি। দু' একজন যে তাঁহাকে মতলববাজ বলিয়া মনে না করিত তাহা নয়; অনেকে ভাবিত যে তাহাদের গোপন কথা জানার উদ্দেশ্য নিয়া ভদ্রলোক একটু গরজ দেখাইয়া তাহাদের মনে বিশ্বাস উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি এরূপ কোনো মতলব তাঁহার ছিল না। তাঁহার সঙ্গে অল্পসল্প আলোচনায় যেটুকু জানিতে পারিয়াছিলাম তাহাতে আমার মনে হইয়াছে ই'হার ধারণা ছিল গোয়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলন ক্রমে জয়যুক্ত হইবে। পর্তুগীজ শাসন সম্পর্কে বিশেষ করিয়া গোরা পর্তুগীজ অফিসারদের সম্পর্কে তাঁহার মনে কিছুটা বিক্ষোভ ছিল—লিস্‌বন হইতে আগত সাদা চামড়ার পর্তুগীজ কনস্টেবলরা যে গোয়ার 'সুব্ শেফ'-দের চেয়ে বেশি বেতন পায় ও মান-মর্যাদা বেশি পায় সেটা তাঁহার কিছুতেই বরদাস্ত হইত না। গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ ও গোয়ানীজদের ভিতর জাতিগত বা বর্ণগত বৈষম্য সেরকম না থাকিলেও অল্পস্বল্প তারতম্য দু' একটি বিষয়ে যাহা আছে গোয়াবাসীরা তাহা আদৌ পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়ত চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্রে—বিশেষ সুব্ শেফের উপরের র‍্যাঙ্কে প্রমোশনের ক্ষেত্রে গোয়াবাসীদের তুলনায় পর্তুগীজদের বেশি সুবিধা দেওয়া হয় বলিয়া গোয়াবাসী ক্রিশ্চিয়ানদের মনেও যথেষ্ট অসন্তোষ আছে। একজন শিক্ষিত

গোয়াবাসী ক্রিশ্চিয়ানকে জীবিকার জন্য কোনো পেশায় লাগিতে হইলে হয় ভারতে আসিতে হইবে নয়ত গোয়া ছাড়িয়া সমুদ্র পারে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পূর্ব-আফ্রিকায়) যাইতে হইবে। পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকাতেও গোয়াবাসীদের জীবিকার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম। খাস পর্তুগালে একই কারণে পর্তুগীজ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের প্রকোপ গোয়াবাসীদের অনুপাতে কিছু কম নয়। কাজে কাজেই পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সর্বত্র, এবং গোয়াতেও, চাকুরি-বাকুরির যা কিছু পথ খোলা আছে সেগুলি পর্তুগালের লোকেদের জন্য একচেটিয়া থাকে। মিসেস্ তায়া জিন্‌কিন্-ও গোয়াতে গিয়া গোয়াবাসীদের মনে তীব্র বিক্ষোভ লক্ষ্য করেন।

"On one thing all Goans are agreed"—মিসেস্ জিন্‌কিন্ লিখিতেছেন—"to be ruled by undeveloped whites, in this atomic age, is intolerable".

(গোয়াবাসীরা সকলে একটি বিষয়ে একমত যে, এই আণবিক শক্তির যুগে পর্তুগীজদের মতো একটি অনগ্রসর সাদা চামড়ার জাতির শাসনে থাকা অসহ্য)। এ বিষয়ে গোয়ার ভিতরে ক্রিশ্চিয়ান ও হিন্দুতে মতভেদ নাই। সুব্ শেফ্ '—' পুলিসের লোক হইলেও সাধারণ গোয়াবাসীদের এই পর্তুগীজ-বিরোধী মনোভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। সুব্ শেফ্ র‍্যাঙ্কের নীচে সাধারণ গোয়াবাসী পুলিস কনস্টেবলদের মধ্যে এই মনোভাব খুবই প্রবল দেখিয়াছি। অবশ্য একথা সকলেই আন্দাজ করিতে পারেন যে, বেতনভুক পুলিসের লোকের পক্ষে এই ধরনের বিরোধী মনোভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা আদৌ নিরাপদ ছিল না। জানাজানি হইলে শুধু চাকুরিই যাইবে না, জেলও খাটিতে হইবে। গোয়াতে আমার উনিশ মাস কারাবাসের মধ্যে সাত-আট জন পুলিসের লোককে রাজনৈতিক কারণে আমাদের সঙ্গে জেল খাটিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে সাধারণ কনস্টেবল ও কর্পোরাল র‍্যাঙ্কের লোক ভিন্ন একজন ভূতপূর্ব সুব্ শেফ্ও ছিলেন। সুতরাং গোয়াবাসী পর্তুগীজ পুলিসের লোকদের পক্ষে পর্তুগীজ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করা যে নিতান্ত বিপজ্জনক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের ভিতর এই ধরনের মনোভাবের কোনো অপ্রতুল দেখি নাই। বিশেষ করিয়া লিসবন হইতে প্রায় ৫০০-র মতো গোরা পুলিস কনস্টেবল এবং পরে দলে দলে সালাজারের পেয়ারের 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিস ও সিকিউরিটি পুলিস গোয়ায় আমদানী হওয়ার পর হইতে এই পর্তুগীজ-বিরোধী মনোভাবের তীব্রতা একটু বেশি হয়। ইহা যে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের একেবারে অজানা ছিল তা নয়। গোরা পুলিস ও কালো পুলিসের বেতনের তারতম্য গোয়ার দেশী পুলিসের অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিল। ১৯৫৬ সালে সেইজন্য গভর্নর-জেনারেল বের্নার্দ গেদীস পুলিস সহ সমস্ত গোয়ানীজ সরকারী কর্মচারীদের বেতন ডবল করিয়া দেন।

এইসব কারণেই হোক্ বা অন্য যে কোনো কারণে হোক্, সুব্ শেফ্ '—' ভারতীয় ও গোয়ানীজ সত্যাগ্রহী রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বিশেষ করিয়া কুয়ার্তেল হাজতে থাকার সময় তিনি নানাভাবে যেরূপে আমাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন তাহা সহজে ভোলার নয়। অবশ্য তিনি রোজ ডিউটিতে থাকিতেন না। কিন্তু তিনি ডিউটিতে আসিলেই ভোরে মুখহাত ধুইতে কুয়াতলায় যাওয়ার সময় কয়দিনের মোটামুটি রেডিওর খবর আমায় বলিয়া যাইতেন। সে সময়ে আমরা যে হাজতে

কোনোপ্রকার সংবাদপত্র পাইতাম না তাহা বলাই বাহুল্য (চোরাইভাবে আনা 'ও য়েরাল্দো'—O Heraldo—নামক আধা সরকারী কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ ভিন্ন; অবশ্য তাহাতে আমরা যে ধরনের সংবাদ চাহিতাম তাহা যে পাওয়া যাইত না, তাহা সহজেই পাঠক আন্দাজ করিতে পারেন)। তাঁহার কাছ হইতেই শ্রীমান অজিত ভৌমিকের গ্রেপ্তার ও মুক্তির খবর পাই; য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত নেহরু গোয়া সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেন তাহার বিবরণও মোটামুটি তাঁহার নিকট হইতে পাই। এক নম্বর হাজতে অত লোকের ভিড়ের মধ্যে আমার অসুবিধা হইতেছে মনে করিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া মন্তেইরোর সহকারী জনৈক 'আজেন্ত' বা গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরের মারফত তদ্বির করাইয়া আমাকে দুই নম্বর ঘরে বদলী করান। দুই নম্বর ঘরটি অবশ্য 'অন্ধকূপ' হাজতঘর ছিল—অর্থাৎ তার লোহার দরজায় ছোট একটি ফুকর ভিন্ন বাহির হইতে আলো-হাওয়া আসার পথ ছিল না; দিবারাত্র ঘরে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইয়া না রাখিলে পাহারাওয়ালা সান্ত্রীদেরও ঘরের ভিতর কয়েদীরা কি করিতেছে না করিতেছে তাহা দেখা সম্ভব হইত না। কিন্তু অন্যপক্ষে, ঘরটি আকারে এক নম্বর হাজতঘরের সমান হইলেও সেখানে ভিড় আদৌ ছিল না। সেখানে বন্দী হিসাবে আটক ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনসঙ্ঘের মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক প্রদেশের নেতা শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও যোশী। আমার দুই সপ্তাহ আগে ২৫শে জুন তিনি একটি ভারতীয় সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব করিয়া গোয়াতে আসিয়া গ্রেপ্তার হন। তাঁহার সঙ্গে গোয়া প্রবাসী একজন হিন্দু পাঞ্জাবী যুবককে রাখা হইয়াছিল—সে পঞ্জিমে একটি ইলেক্ট্রিকাল কনট্রাক্টর ফার্মে চাকুরি করিত। রাজনীতির সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না। কিন্তু তাহাদের অফিসের ও গুদামের কাছে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের লোকেরা একটি বোমা ফাটাইয়া ফেলে। সেই সূত্রে হাতে-নাতে কেহই ধরা পড়েন নাই। কিন্তু পর্তুগীজ আইনে তাহার দরকার করে না। সন্দেহ হইলেই হয়। পুলিসের সন্দেহক্রমে তাহাদের অফিসের এবং আশেপাশের বহু লোক ধরা পড়ে, সেই পাড়ায় সে-ই একমাত্র ভারতীয় বলিয়া স্বভাবতই পুলিসের নজরে সে পড়ে এবং হাজতে আনীত হয়। অবশ্য তিন চার মাসের মধ্যেই সে রেহাই পায় (তাহার রেহাই পাওয়ার একটি কারণ সে খুব ভালো যন্ত্রপাতির কাজ জানিত বলিয়া তাহার ফার্মের কর্তৃপক্ষ তাহাকে ছাড়ানোর খুব বেশি রকম তদ্বির করেন এবং নিজেরা আসিয়া পুলিসের বড় কর্তাদের সঙ্গে কথা বলিয়া তাহাকে খালাস করানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন)। গোটা দুই নম্বর ঘরটির ভিতরে এই দুইজন ছাড়া আর কেহ ছিল না; ক'দিন আগে শ্রীমধু লিমায়াকে আনিয়া সেই ঘরে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আমাকে যেদিন এ ঘরে আনা হইল, মধুকে সেদিন আমার বদলে এক নম্বর হাজতে নিয়া যাওয়া হয়। অর্থাৎ আমার একটু প্রমোশন ঘটিল বন্ধুবর মধু লিমায়ের একটু 'ডিমোশন' বা অবনতি ঘটিল। যাই হোক, এই ঘরে ঢুকিয়া বহুদিন বাদে একটু হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া শোওয়ার সুযোগ পাই। এখানে কপাল আরও একটু খুলিয়া গেল। এই ঘরের পিছন দিকে প্রস্রাব ও পায়খানার মত একটি আলাদা কুঠুরী ছিল। তাহার একটি দরজার পাল্লা ভাঙিয়া সেই কুঠুরীর মেঝেয় অনেকদিন হইল পড়িয়া ছিল। আমি দুই নম্বর হাজতে আসার পর যোশী ও অমৃৎ সিং দু'জনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া আমার শোওয়ার বিছানার ব্যবস্থা করার জন্য সেইটি বাহিরের ঘরে আনিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পাতিয়া দিলেন। তাহাদের দুইজনের কাছেই একটি করিয়া কম্বল ও চাদর ছিল। আমি পাইলাম কবাটের তক্তা এবং

মধ্যুর রাখিয়া যাওয়া একটি অতিরিক্ত সূতী-কম্বল। এতদিন স্যাঁতসেঁতে খালি মেঝের উপর শুইয়া মাজায় প্রায় বাত ধরিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল—কাঠের তক্তা পাইয়া আমার প্রায় তক্তপোশ বা এমন কি তখৎ তাউস্ পাওয়ার সমতুল্য হইল।

আমার কপালে এ সুখ বেশিদিন সহিল না, আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যাশিত পনরোই আগস্ট তারিখের সত্যাগ্রহের অনাগত বন্দীদের জন্য কুয়ার্তেল হাজতের ঘরগুলি খালি করিয়া দিয়া আমরা মানিকোমের পাগলা গারদে বদলি হইয়া গেলাম।

মানিকোমের পাগলা গারদ বা মেণ্টাল হস্পিটাল কোনোদিনই 'মেণ্টাল হস্পিটাল' হিসাবে অর্থাৎ মানসিক চিকিৎসালয় বা উন্মাদাগার হিসাবে ব্যবহার হয় নাই, যদিও সেইজন্যই উহা তৈরি হইয়াছিল। অবশ্য সালাজারী শাসনে গোয়ার স্বাধীনতা কামনা করা বা গোয়ার জনসাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার চাওয়াটাই পাগলামি বা উন্মাদের লক্ষণ এরূপ মনে করিলে কোনো কথা নেই। শেষ পর্যন্ত সেই রাজনৈতিক 'উন্মাদ'-দের চিকিৎসার জন্য মানিকোমের হাসপাতাল কাজে লাগিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ উন্মাদাগার হিসাবে গোয়ার মত একটি ছোট জায়গায় এতবড় একটি মানসিক চিকিৎসালয়ের বাড়ি কেন তৈরি করা হইয়াছিল তাহা ভাবিলে একটু আশ্চর্য হইতে হয়। পঞ্জিমের উপকণ্ঠে পাহাড়ের বেশ একটু উঁচু টিলার উপর ফাঁকা জায়গায় পাগলা গারদের জায়গাটি। সেইজন্য এই জেলের অপর একটি নাম—'আল্তিন্যো'—Altinho; The High one; উঁচু জেল। কুয়ার্তেলের হাজত যেমন নদীর ধারে নীচু জায়গায় নীচু মেঝের উপর তৈরি, মানিকোমের পাগলা গারদের ব্যারাকগুলি মোটেই সেরকম নয়। বেশ উঁচু শুকনা জায়গায় উঁচু ভিতের মেঝের উপর তৈরি। তাছাড়া পাহাড়ের টিলার উপরে বলিয়া শুধু খোলামেলা নয়, হাওয়াও খেলে যথেষ্ট। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা যদি প্রত্যেকটি সেলের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বন্দীদের আটকাইয়া রাখা না হইত, তাহা হইলে মানিকোম জেল যে কুয়ার্তেলের চেয়ে শতগুণে ভালো ছিল তাহা না বলিলেও চলে। মানিকোমের পাহাড়ের টিলার দিকে নদীর ধার হইতে জমি দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে উঁচু হইয়া আসিয়াছে, তাহার ঢালু গা বরাবর রাস্তার দুই দিকে পঞ্জিমের অভিজাত মহলের ভালো ভালো বাংলো এবং ভিলা ও বাগান-বাড়ি সাজানো। অবশ্য পঞ্জিমের অভিজাত মহল মানে পর্তুগীজ উচ্চ সরকারী কর্মচারী মহল। ভারতের কন্সালেট-জেনারেল বা দূতাবাসও এই দিকটায়। প্রিজন্ ভ্যান্ বা জীপে করিয়া আমাদের মধ্যে মধ্যে যখন কুয়ার্তেলে কিংবা আদালতে নিয়া যাওয়া হইত, ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িতে দেখিয়া চিনিতে পারিতাম এই আমাদের কন্সালেটের দপ্তর। পথে যাইতে যাইতে আমরা দু-পাশের সুন্দর সুন্দর ভিলা ও বাংলোগুলি দেখিতে দেখিতে চোখ জুড়াইয়া নিতাম। কারণ একবার আমাদের নিজের আস্তানায় আসিয়া ঢুকিলে যদি বাহিরের দিকের জানালা খোলা থাকেও তাহা হইলে পাগলা গারদের উঁচু ঘেরা-দেওয়াল ছাড়া দেখার আর কিছু থাকিবে না। পঞ্জিমের এই অভিজাত পাড়ার শেষ প্রান্তে গোয়ার ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্কেট, অর্থাৎ গোয়াতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মযাজক যিনি তাঁহার প্রাসাদ। উঁচু দেওয়াল ঘেরা বিরাট কম্পাউণ্ডের ভিতর পুরাতন গাঁথুনির একটি বিরাট

প্রাসাদে প্যাট্রিয়ার্ক বাস করেন—এশিয়ার পর্তুগীজ ক্যাথলিক সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক অচলায়তনের প্রতিভূ হিসাবে।*

প্যাট্রিয়ার্কের পুরাতন এই প্রাসাদের পাশ দিয়া মাইলখানেক আসিলে মানিকোমের পাগলা গারদ, যেখানে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ হইতে আমাদের বসবাসের বন্দোবস্ত হইল। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ডাঃ হোমার জ্যাক্ গোয়াতে গিয়া মানিকোমের পাগলা গারদের জেল দেখিয়া গোয়ার মত ছোট জায়গায় এতবড় জেল কেন সে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন।

"From the Patriarch, I went just a mile behind his palace to the prison in a made over mental hospital. The officer accompanying me on this trip admitted that since the beginning of the satyagraha movement against Goa, the jails had been full and more prison space had to be obtained....And so the army took over the whole mental asylum, partly for a prison and partly to quarter the army."

(প্যাট্রিয়ার্কের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার প্রাসাদের পিছন দিকে মাইলখানেক দূরে যেখানে একটি পাগলা গারদকে জেল বানানো হইয়াছে সেখানে গেলাম। এত বড় জেল কেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিলে আমার সঙ্গে যে পর্তুগীজ অফিসারটি ছিলেন তিনি খোলাখুলি-ভাবে স্বীকার করিলেন যে, গোয়ার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে সমস্ত জেল ভর্তি হইয়া গিয়াছে এবং জেলের জায়গা বাড়াইতে হইয়াছে।...... সেইজন্য গোটা পাগলা গারদটিকে এখন মিলিটারীর লোকেরা হাতে নিয়াছে; কিছুটা জেল বানানোর জন্য আর কিছুটা সৈন্যদের বসবাসের জন্য)।

---

* মার্কিন সাংবাদিক ডাঃ হোমার জ্যাক্ ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহের খবর আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি সংবাদপত্রের তরফে গোয়াতে যান। সেই সময় গোয়ার প্যাট্রিয়ার্কের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদ সম্পর্কে তাঁহার এক লাইনের একটি সুন্দর বর্ণনা এখানে তুলিয়া দিতেছি :

"The diocese was established in 1533, and history oozes from the residence, from a picture of an old Patriach on the wall to the gorgeously carved wooden furniture with red velvet in the visiting room" ("Inside Goa", p. 20).

(গোয়ার ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার কেন্দ্রের স্থাপনা হয় ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে; গোয়ার প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদের দিকে চাহিয়া দেখিলে, তার ভিজিটিং রুমে যে সমস্ত প্রাচীন কারু-সমৃদ্ধ কাঠের আসবাবপত্র আছে তাহার দিকে, ভিজিটিং রুমের লাল ভেলভেটে মোড়া মেঝে কিংবা দেওয়াল হইতে যে এক প্রাচীন প্যাট্রিয়ার্কের প্রতিকৃতি টাঙানো আছে সেদিকে তাকাইলে মনে হয় যেন গোটা বাড়িটার গা দিয়া তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতীত ইতিহাস চোয়াইয়া নামিতেছে।)

গোয়ার প্যাট্রিয়ার্কেট এবং ক্যাথলিক চার্চ সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

ডাঃ হোমার জ্যাক্ পাট্রিয়ার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফরাসী সাংবাদিক রেনে ব্রেহের সঙ্গে মানিকোম জেলে গিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। মানিকোম পাগলা গারদ সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য উপরে দ্রষ্টব্য।

ডাঃ জ্যাকের এই বর্ণনা হইতে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন আমরা এই সময় কেন ও কোথায় বদলি হইয়াছিলাম। কুয়ার্তেল ছিল পুরা পুলিসের রাজত্ব; এখানে আমরা আইনত পুলিসের চার্জে আছি কিন্তু মিলিটারী পাহারায়। এই সময়ে বা কোনো সময়েই গোয়াতে ভারতীয় বন্দীর সংখ্যা বেশি ছিল না। ১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী জন পঁচিশেক সত্যাগ্রহী গোয়াতে প্রবেশ করে এবং তাহাদের সকলেরই লম্বা মেয়াদের সাজা হয়। ইহারা ছাড়া এবং পরবর্তী সময়ে গোরে, লিমায়ে, আমি নিজে ও আমাদের অন্যান্য কয়েকজনকে (মোট ৮।৯ জন) বাদ দিলে কোনো ভারতীয় সত্যাগ্রহী গোয়াতে জেলে ছিল না। গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীরাই গোয়ার সমস্ত জেল ভর্তি করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময় হইতেই ক্রমশ পর্তুগীজ সৈন্যদলকে বেশি করিয়া পুলিসের কাজে লাগানো হইতে থাকে। খাস পর্তুগাল হইতে দলে দলে পুলিস আমদানী করিয়াও তখন অবস্থা সামাল দেওয়া যাইতেছিল না। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে তাই তখন পুলিস ছাড়িয়া মিলিটারীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছিল বেশি। মানিকোমের 'আল্‌তিন্যো' জেল, পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে গোয়ার জনসাধারণের রাজনৈতিক সংগ্রাম এই সময় কোন স্তরে উঠিয়াছিল, তাহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। আমরা যখন 'আল্‌তিন্যো'তে আসি তার পূর্বেই সেখানে প্রায় একশ জন বন্দী দুইটি ব্যারাকের ২৮টি সেলে আটক ছিল। কুয়ার্তেল হইতে আমরা আসাতে (প্রায় ৭০।৭৫ জন) সেলের সংখ্যা বাড়িল না, সেল প্রতি আটক বন্দীর সংখ্যা বাড়িল মাত্র। আমি যে সেলে আসিয়া আটক হইলাম সেখানে ছয়জন আগে হইতেই ছিল; আমরা আরো চারজন আসিয়া সেখানে ঢুকিলাম। ১০ ফুট লম্বা, ৭ ফুট চওড়া একটি ছোট কুঠুরী, তাহার ভিতরে একধারে একটি উঁচু সিমেণ্টের ধাপের মতো পাকা বাঁধানো আছে, বোধহয় পাগলদের শোওয়ার জন্য। তাহার ভিতর দশজন বন্দীকে চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকিতে হইবে। সকালে একবার ছাড়া, প্রস্রাব পায়খানার কোনো আব্রু নাই। সামনের দরজা বন্ধ, পিছনের জানালা বন্ধ। প্রত্যেক ব্যারাকের মধ্যে দু' সারি সেল। তাহার ভিতর দিয়া করিডরে স্টীল হেলমেট পরা মিলিটারী সান্ত্রীরা বুট পায়ে টহল দিতেছে, প্রত্যেকটি ব্যারাকের চারিদিকে আবার বাইরের দিক দিয়া মিলিটারী চব্বিশ ঘণ্টা চলিতেছে। এ হেন মানিকোম বা 'আল্‌তিন্যো' জেল আমাদের পাঁচমাস সাড়ে পাঁচ মাসের আবাসস্থল হইল।

॥ ২৭ ॥

কেরুস ও ফের্নাণ্দের কাহিনী

মানিকোম জেলের আর একটি নাম ছিল বলিয়াছি—Prisao Altinho (প্রিঝাঁও আল্‌তিন্যো) অর্থাৎ উঁচু জেল বা উঁচু জায়গার জেল; কোঙ্কনীতে 'উপারিচা তুরুঙ্গ্'। তবে মোটামুটি 'আল্‌তিন্যো' বলিলেই সকলে চিনিত। আইনত এই আল্‌তিন্যো জেলের, জেল হিসাবে কি পর্যায় বা 'স্টেটাস' ছিল তা বলা কঠিন। উপরেই বলিয়াছি, ১৯৫৪ সালে গোয়ার ভিতরে ও ভারত হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইলে পর যখন দলে দলে রাজনৈতিক বন্দী গ্রেপ্তার হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল তখন পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জরুরী ফাটক বা এমার্জেন্সি পুলিস লক্ আপ্ হিসাবে

মানিকোম পাগলা গারদের এই দুইটি ব্যারাককে কাজে লাগানো হয়। পাগলা গারদের গোটা বাড়িটি তখন ইতিমধ্যেই মিলিটারীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, পর্তুগীজ ও নিগ্রো সৈন্যদের থাকার জায়গা হিসাবে। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ এই সময় একদিকে গোয়াতে তাঁহাদের সামরিক বাহিনীর লোকেদের থাকার জায়গা ঠিক করার জন্য, আর অন্যদিকে রাজনৈতিক আটক বন্দীদের সংখ্যা হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে তাহাদের আটক রাখার উপযুক্ত জায়গা খুঁজিয়া বাহির করার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছিলেন। গোয়াতে তখন বোধহয় বড় কম্পাউন্ডওয়ালা এমন একটিও খালি বাড়ি ছিল না যাহা গোরা বা নিগ্রো সৈন্যদের থাকার জন্য 'রিকুইজিশন' করা হয় নাই। সৈন্যদের থাকার ঘাঁটি হিসাবে চার্চ বা গির্জার কম্পাউন্ডও ব্যবহৃত হইয়াছে। আজও গোয়াতে সেই অবস্থাই আছে। অন্যপক্ষে নূতন নূতন জেল বা 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' সম্পর্কেও সেই একই মুশকিল ছিল বা আছে। অবশ্য রাজনৈতিক বন্দীদের মোট সংখ্যা গোয়াতে পর্তুগীজ সামরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার চেয়ে যে অনেক কম তাহা বোধহয় না বলিলেও চলিবে। সাজা-পাওয়া মেয়াদী বন্দী এবং বিচারাধীন বা সন্দেহভাজন আটক বন্দী, এই দুই ধরনের বন্দী মিলিয়া সে সময়ে এক বা দেড় হাজারের উপর যায় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস।* কিন্তু গোয়ার মত নিতান্ত ছোট একটি জায়গায় এই এক বা দেড় হাজারের মত লোককেও আটক রাখা কম হাঙ্গামার কথা নয়। পাকাপোক্ত রকমের কায়েমী জেলের ব্যবস্থা না থাকিলে একজন আটক বন্দীকে জেলে আটকাইয়া রাখার জন্য গড়পড়তা তিনজন পাহারাওয়ালা রাখার দরকার পড়ে। কাজে-কাজেই রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি করিয়া জেলের ব্যবস্থা করিতে গিয়া পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষ যে কিছুটা মুশকিলে পড়িবেন, তাহা আন্দাজ করা কঠিন নয়। সেই মুশকিলে পড়িয়াই তাঁহারা মিলিটারীর কাছে দুইটি বড় বড় ব্যারাক রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখার জন্য চাহিয়া নেন। ব্যারাক দুইটি ঘিরিয়া চারিদিক দিয়া সান্ত্রী-পাহারার বন্দোবস্ত ঠিক রাখার ভার মিলিটারীর হাতে। কিন্তু আমাদের চার্জে আছে পুলিস। পর্তুগীজ আইনে অসামরিক জেলের ব্যবস্থা যে নাই তাহা নয়। সাজা-পাওয়া রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সকল রকম অসামরিক বন্দীর জন্য 'Cadeia Civil' বা সিভিল জেল নামে এক রকম সাধারণ জেল পর্তুগীজ রাজত্বের অধীন অন্যান্য দেশের মত গোয়াতেও আছে। গোয়ার ভিতরে সবচেয়ে বড় এইরূপ জেল আছে রেইস্ মার্গুস্ দুর্গে। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজদের প্রথম গোয়া অভিযানের সময় সমুদ্র উপকূলবর্তী এই রেইস্ মাগুস্ গ্রামেই আল্‌বুকের্ক প্রথম অবতরণ করেন। সেখানে পরে একটি দুর্গ স্থাপিত হয়। আজ ইতিহাসের অন্য পর্যায়ে আসিয়া সেই দুর্গ সত্যাগ্রহীদের আটক রাখার জেলে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু খুব ঠাসাঠাসি করিয়াও সেখানে ৭০।৮০ জনের বেশি লোক রাখার মত জায়গা বা ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। মাড়গাঁও, বিচোলী, কেপেং প্রভৃতি আরও কয়েকটি

---

* তাহার অর্থ এই নয় যে, গোয়াতে মাত্র এক হাজারের মত লোকই রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হইয়াছে। আদালতের বিচারে যাহাদের সাজা হইয়াছে এমন বন্দীদের কথা বাদ দিলে (তাহাদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০০) সন্দেহভাজন আটক বন্দী হিসাবে যাহারা ৩।৪ মাস হইতে ৬।৭ মাস পর্যন্ত আটক থাকিয়া পুলিসের হাতে নিয়মিত 'তক্তা-পিটুনী' খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদের মোট সংখ্যা—১৯৫৪ হইতে ১৯৫৭ পর্যন্ত ছয় সাত হাজারের কম হইবে না।

জায়গায় এই রকমের 'কাদেইয়া সিভিল' বা জেল আছে, কিন্তু সে সব জেলে কোথাও ১০।১৫ বা কোথাও বড় জোর ২০ জন পর্যন্ত কয়েদী থাকার ব্যবস্থা হইতে পারে। সুতরাং গোয়াতে ১৯৫৪ সালে নূতন করিয়া রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে আরও বড় আকারের জেলের প্রয়োজন দেখা দিবে তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই; পুরনো কোনো জেলে এত লোক রাখার জায়গা ছিল না। তা ছাড়া আর একটু মুশকিল ছিল যে এই সব সিভিল জেলে সাজা বা মেয়াদ না হইলে কাহাকেও পাঠানো যাইবে না। পর্তুগীজ জেল ব্যবস্থায় জেলে কোনো 'আণ্ডার ট্রায়াল' ওয়ার্ড নাই। আণ্ডার ট্রায়াল বা বিচারাধীন বন্দী যারা, কিংবা পুলিস যাহাদের কেবলমাত্র সন্দেহের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহারা সকলেই পুলিস হাজতে পুলিসের চার্জে থাকিবে।* সে হিসাবে আল্‌তিন্যো জেলকে পুলিসের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জরুরী কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দীনিবাস বলা যাইতে পারে। যদিও তাহার পাহারাদারীর ভার মিলিটারীর হাতে ছিল, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল পুলিসের হাতেই। আমরা সেখানে যতদিন ছিলাম, সাসপেক্ট (বা সুস্‌পেইতো), আণ্ডার ট্রায়াল, সাজা-পাওয়া মেয়াদী কয়েদী (পর্তুগীজ ভাষায় 'Castigado') সব রকমের বন্দীকেই সেখানে থাকিতে দেখিয়াছি। আমরা যাওয়ার আগেও সেখানে সব রকমের রাজনৈতিক বন্দী থাকিত; আমি এবং গোরে প্রভৃতি সাত-আটজন ভারতীয় বন্দী আমরা যাহারা ছিলাম তাহারাও গোয়ার রাজনৈতিক বন্দী জীবনের তিন স্তরেই—অর্থাৎ 'সুস্‌পেইতো', আণ্ডার ট্রায়াল ও 'কাস্তিগাদু'—আল্‌তিন্যোতে থাকিয়া আসিয়াছি। সাজা হইয়া গেলেই যে পুলিসের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে তাহা মনে করার কোনো কারণ নাই।

এই ভূমিকা হইতেই আল্‌তিন্যো 'জেলের' স্বরূপ বোঝা কঠিন হইবে না। তবে

---

* মনে রাখা দরকার গোয়াতে পর্তুগীজ আইনে পুলিস সন্দেহ হইলেই যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আটক রাখিতে পারে। ভারতে অতীতে বৃটিশ আমলে বা বর্তমানে তো কথাই নাই কাহাকেও সন্দেহ হোক বা কোনো অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য হোক গ্রেপ্তার করিয়া আনিলে, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ নিয়া তবে তাহাকে আটক রাখিতে পারে; এবং তাহাও নিজেদের হেফাজতে নয় জেলের হেফাজতে। জেলের বা জেল বিভাগের উপর পুলিসের কোনো হাত বা দখল নাই। আইনত পুলিস কোনো লোককে গ্রেপ্তার করিয়া চব্বিশ ঘণ্টার বেশী সময় নিজেদের হেফাজতে রাখিলে পুলিসের বিরুদ্ধে 'হেবিয়াস কর্পাসে'র মামলা চলিবে। জেলের হেফাজতে থাকিলেও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো জামিন-যোগ্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে জামিন দিতে হইবে। না দিলে আদালতে আবেদন করিয়া সে ব্যক্তি বা তাহার আত্মীয়স্বজন বা তাহার পক্ষের উকিল তাহাকে উপযুক্ত জামিনে খালাস করিয়া নিতে পারে। পর্তুগীজ আইনে এসব কোনো বালাই নাই। পুলিস যে কোনো সময় যে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আনিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে। যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাকে আটক রাখিতে পারে। কাজে কাজেই কোনো জেলেই বিচারাধীন বন্দীদের বা বিনাবিচারে আটক বন্দীদের রাখার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নাই। তাহাদের হেফাজতের ব্যবস্থা পুলিসের চার্জে। তাই সাধারণ জেল বা 'কাদেইয়া সিভিল'গুলিতে আণ্ডার ট্রায়াল ওয়ার্ড রাখার কোনো দরকার সেখানে পড়ে না।

পর্তুগীজদের পুলিসী ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁহাদের বাস্তব পরিচয় নাই তাঁহাদের পক্ষে সবটা পুরাপুরি আন্দাজ করা সম্ভব হইবে না। কুয়ার্তেলে একটা সুবিধা ছিল এই যে, সেখানে সান্ত্রী পাহারাকে ডিঙ্গাইয়া দরকার হইলে সুব্ শেফ্, সুব্ শেফ্কে ডিঙ্গাইয়া কখনো সখনো কোনো 'আজেন্ত' বা এমনকি কমাণ্ডাণ্টের কাছেও বন্দীদের পক্ষে আবেদন-নিবেদন করা বা অভাব-অভিযোগ জানানো সম্ভব হইত। কিন্তু আল্তিন্যোতে সেসব কোনো সুযোগ সুবিধা আদৌ ছিল না। আল্তিন্যো জেলের সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে এক একটি ব্যারাকে একজন করিয়া গোরা পর্তুগীজ কনস্টেবল ও তাহার সহকারী একজন গোয়াবাসী কোঙ্কনী-ভাষী দেশী পুলিস কনস্টেবল। গোয়াবাসী কনস্টেবলটি থাকিত দোভাষীর কাজ করার জন্য এবং পর্তুগীজ গোরা কনস্টেবল, 'কাব্' বা 'কাবো' সেই ব্যারাকের ইনচার্জ। 'Cabo' কথার অর্থ Head or Chief, পদমর্যাদা সার্জেণ্টের নীচে অথচ সাধারণ কনস্টেবলের উপরে। লিসবন হইতে যাহাদের গোয়াতে আনা হইয়াছে তাহারা সকলেই সাধারণ পুলিস কনস্টেবল। পদ-মর্যাদায় তাহারা সাধারণ গোয়ানীজ কনস্টেবলদের চেয়ে উপরে নয়। কিন্তু কার্যত তাহাদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বেতন সব কিছুই গোয়ানীজ কনস্টেবলদের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। বেতন তাহারা সুব্ শেফ্দের চেয়ে বেশিই পাইত—গোয়ানীজ সুব্ শেফ্রা যেখানে ২৫০৲ টাকার মত বেতন পাইত পর্তুগীজ কনস্টেবলরা পাইত স্পেশাল এলাউন্স, বেতন সব মিলাইয়া প্রায় ৪০০৲ টাকার মত। কাজে কাজেই আসলে Cabo গ্রেডের লোক না হইলেও গোয়ানীজ কনস্টেবলদের কাছে লিসবনের গোরা কনস্টেবলরা Cabo—হাবিলদার বা হেড কনস্টেবল কিংবা কর্পোরালের মত খাতির-সম্মান বা মর্যাদা পাইত। তাহাদের সম্বোধন করা হইত 'Cabo' (উচ্চারণ ঃ কাব্)। সাধারণ গোয়ানীজ পুলিস কনস্টেবলরা এই সব গোরা কাব্দের ভয়ও করিত খুব বেশি। কোনো গোয়ানীজ পুলিস কনস্টেবল সত্যাগ্রহীদের প্রতি কোনোরূপ সহানুভূতি দেখাইতেছে বা তাহাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে চাহিতেছে না এই ধরনের রিপোর্ট হইলেই তাহার চাকুরি যাইবে, নয়ত শাস্তি হিসাবে কোনো পাহাড়-জঙ্গলের গার্ড ডিউটিতে তাহাকে দেওয়া হইবে ইহাই ব্যবস্থা ছিল। 'আল্তিন্যো' জেলে সত্যাগ্রহী বন্দীদের অভিভাবক এই দু'জন কনস্টেবলের উপরে জেলের তদ্বির তদারক করার জন্য উপরওয়ালা আর কেহ নাই। কুয়ার্তেল হইতে প্রায় দুই মাইলটাক দূরে লোকালয়ের বাহিরে বলিয়া পুলিসের কোনো আজেন্ত্, শেফ্ বা সুব্ শেফ্ বিশেষ কোনো কাজ না পড়িলে আসিতে চাহিত না। ঐ একজন করিয়া অর্ধ-শিক্ষিত পর্তুগীজ কনস্টেবল ও তাহার কোঙ্কনী-ভাষী সহকারীর নিয়ন্ত্রণে দুই ব্যারাকের দেড়শ' জন রাজনৈতিক বন্দীর দৈনন্দিন জীবন চলিতে দিতে পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষের কোনো দ্বিধা হয় নাই। গভর্নমেণ্ট যদি কাহাকেও কোনো সঙ্গত কারণেও গ্রেপ্তার করে বা আটক রাখে, তাহা হইলে আটক অবস্থায় তাহার জীবন সম্পর্কে যে গভর্নমেণ্টের কোনো নৈতিক দায়িত্ব আছে বা একটি জেল বা কন্সেণ্ট্রেশন ক্যাম্প খুলিলে তাহার তদ্বির-তদারকের জন্য কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা দরকার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে তাহা কখনো মনে করিতে দেখি নাই।

'আল্তিন্যো' জেলে আমরা যে সময় আসিলাম তখন আমাদের ব্যারাকের হর্তাকর্তা-বিধাতা কেরুস্ এবং ফের্নান্দ নামে দুইজন পর্তুগীজ কনস্টেবল*। একদিন কেরুসের

* কেরুস্ এবং ফের্নান্দের বিষয়ে এই কাহিনীর গোড়াতে একবার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

ডিউটি, আর একদিন ফের্নান্দের ডিউটি আর তাহাদের সঙ্গে একজন করিয়া দেশী গোয়ানীজ কনস্টেবল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কেরুস লোকটি লিসবন পুলিসের বেশ পুরানো অভিজ্ঞ কর্মচারী, দুই বিরলার কনস্টেবল। বেশ ধীর স্থির ও ভদ্রগোছের লোক। কড়া হওয়ার দরকার হইলে কড়া হইতে জানে। কিন্তু তাহার সেই কড়াকড়ি কখনো নিছক অত্যাচারে পরিণত হয় না, আর সবচেয়ে বড় কথা, সে কখনো কোনো রাজনৈতিক বন্দীর গায়ে হাত তুলিত না। অবশ্য ইহার কারণটা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। পরে কেরুসের সঙ্গে যখন আর একটু ঘনিষ্ট পরিচয় হয় তখন কথায় কথায় জানিতে পারি তাহার ব্যক্তিগত জীবনে দু'একটা ব্যাপারে ঘা খাইয়া সে মনে মনে স্থির করে যে পুলিসের কাজে থাকিলেও সে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত পারতপক্ষে অপর কাহারও অনিষ্ট করিবে না বা কাহারও মনে আঘাত দিবে না। সাধারণ য়ুরোপীয় রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে দেখিয়াছি পাপ-পুণ্য-ঈশ্বর-পুরোহিত বা সাধু-সন্ত সম্পর্কে ধারণা অনেকটা আমাদের দেশের সাধারণ লোকেদের মত। কেরুস বলিত—'সেনর, আমি নিজের জীবনে দেখিয়াছি অনাবশ্যকভাবে কাহারো অনিষ্ট করিলে বা মনে কষ্ট দিলে ঈশ্বর তাহা জানিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন।' কিন্তু কারণ যাহাই হোক কেরুস যেদিন ডিউটিতে থাকিত সেদিন আমাদের ব্যারাকের সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। তা ছাড়া কেরুসের মনে ভারতীয় বন্দীদের সম্পর্কে কিছুটা সম্ভ্রমবোধ ছিল। এই সময়ে গোরে ও শিরুভাই লিয়ামে—আমাদের একদিন পরেই—আল্তিন্যোর একটি সেলে আসেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় কন্সাল-জেনারেলের চেষ্টায় গোরে ও লিমায়ের ভাগ্যে একটি একটি করিয়া লোহার স্প্রিংয়ের খাট ও বিছানা জুটিয়াছিল। কেরুস ও ফের্নান্দ দুজনেই তাহা হইতে ধরিয়া নেয় যে ইহারা নিশ্চয়ই পদস্থ লোক। আমাদের আর কাহারো কপালে জোটে নাই; তাছাড়া আমার সম্পর্কে—আমাকে গোয়াবাসী বন্দীদের সঙ্গে রাখিয়া কিছুটা অপমান ও হেনস্থা করার নীতিও কিছুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সেই বছর ১৫ই আগস্টের কয়দিন আগে-পরে কুয়ার্তেলের কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে আসিয়া কিছু বৃটিশ, আমেরিকান ও ফরাসী সাংবাদিক গোরে, লিমায়ে ও আমার সঙ্গে দেখা করায় তাহার মনে এই ধারণা হয় যে, আমিও হয়ত একটা কেউ-কেটা ব্যক্তি হইব। মধু লিমায়ের সঙ্গে একদিন গোয়া সরকারের চীফ সেক্রেটারী (O Chefe da Gabinete=অ শেফ্ দা গাবিনেৎ= গভর্নর জেনারেলের পরামর্শ পরিষদের খাস মুন্সী) কাপ্তেন কার্মো ফেরেইরা হন্তদন্ত হইয়া দেখা করিতে আসেন। কারণ ভারতে মধু লিমায়ে সম্পর্কে পর্তুগীজ পুলিসের অত্যাচারে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ রটিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। কাজে কাজেই দিল্লীর পর্তুগীজ দূতাবাস হইতে এ সম্পর্কে খোঁজখবর করিয়া মধু কেমন আছেন তাহা জানানোর জন্য জরুরী তাগিদ আসে। স্বয়ং শেফ্ দা গাবিনেৎ যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে সে ব্যক্তিও নিশ্চয় কাহারো চেয়ে কম পদস্থ নয় কেরুস ও ফের্নান্দ সহজভাবেই সেটা ধরিয়া নেয়। জগন্নাথ রাওয়ের ধপধপে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ চেহারা এবং ধীর স্থির সম্ভ্রম জাগানোর মত চালচলন তাঁহাকে কিছুটা সাহায্য করে। এক কিছুটা মুশকিলে পড়িয়াছিলেন সাতারা জেলার কমুনিস্ট পার্টির কর্মী শ্রীযুত রাজারাম পাতিল।* রাজারাম একটু

* শ্রীযুক্ত রাজারাম পাতিল সাতারা জেলার করাদ মহকুমার কৃষক সমিতির অন্যতম কর্মী।

ফুর্তিবাজ ধরনের লোক, হৈ চৈ করিতে ভালোবাসেন। তাঁহাকে এক সেল হইতে অন্য সেলে বা সেখান হইতে তৃতীয় কোনো সেলে যেখানেই রাখা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে-ঘরে কিছুটা হৈ-হুল্লোড় হইবেই। কেরুস রাজারামের উপর কিছুটা অপ্রসন্ন ছিল; এবং শেষ পর্যন্ত সে রাজারামকে একা একা একটি সেলে আটক করে। মধুও সেইভাবে অনেক দিন আটক ছিলেন। রাজারামের উপর ফের্নান্দ কিছু প্রসন্ন ছিল; কারণ রাজারাম তাঁহার কাছে পর্তুগীজ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। গোরে শিখিতেন কেরুসের কাছে; ফের্নান্দ সেজন্য মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ ছিল। রাজারাম সলিটারী সেলে যাওয়ার পর তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাতে ফের্নান্দ খুব খুশী হয় এবং যেসব সুযোগ-সুবিধা সে আর কাহাকেও দিত না রাজারামের ভাগ্যে ফের্নান্দের কল্যাণে 'শিষ্য-দক্ষিণা' হিসাবে তাহা জুটিয়া যাইত।

কিন্তু ফের্নান্দ তাই বলিয়া লোক মোটেই সুবিধার ছিল না। তাহার বয়স ২৫।২৬-এর মতো; এক বিরলার নূতন রংরুট সিপাহী। পর্তুগাল হইতে গোয়াতে পাঠানোর জন্য তাড়াহুড়া করিয়া যেসব কনস্টেবল রিক্রুট করা হয় ফের্নান্দ তাহাদেরই একজন। গোয়াতে আসিলে তিনশ-চারশ টাকার মত মাহিনা পাওয়া যাইবে শুনিয়া সে লিসবনে যে হেয়ার কাটিং সেলুনে কাজ করিত, সেখান হইতে তাহার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কনস্টেবলের কাজ নিয়া গোয়াতে চলিয়া আসে। কতকটা ছেলেমানুষ বলিয়া, আর কতকটা সত্যাগ্রহী বন্দীরা তাহাকে তাহার প্রাপ্য সম্মান দিতেছে না বলিয়া মনে মনে নিজের সম্পর্কে একটি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থাকার দরুণ সে 'আল্‌তিন্যো'তে নিজের অবাধ কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়া গোয়াবাসী বন্দীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার ও মারধোর করিত এবং অন্যান্য নানাভাবে তাহাদের অসুবিধায় ফেলিতে চেষ্টা করিত। ভারতীয় বন্দীদের সম্পর্কেও তাহার অন্যরূপ ব্যবহার বা মনোভাব হওয়ার কোনো কারণ ছিল না বা হইতও না বোধহয়, যদি না তাহার মনে এ ধারণা না থাকিত যে ভারতীয় বন্দীদের সম্পর্কে কিছুটা সংযত ও সাবধান না থাকিলে মুশকিল হইতে পারে। কেরুস তাহাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে প্রতি পদে পদে যেভাবে পারে আমাদের অসুবিধা ঘটাইতে চেষ্টা করিত। সবচেয়ে অসুবিধা এই ছিল, খুব সামান্য সামান্য অভিযোগের জন্য রোজ রোজ অভিযোগ করাও সম্ভব হইত না আর অভিযোগ করিতে চাহিলেও তাহার কোন ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত ছিল না। কারণ 'আল্‌তিন্যো' জেলের তদ্বির তদারকের জন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অফিসার কোনো সময়ে কেহ আসিতেন না। একমাত্র উপায় ছিল অনশন বা হাঙ্গার স্ট্রাইক করা; কিন্তু 'সত্যাগ্রহী' হিসাবে জেলখানার এই সমস্ত ছোটোখাটো অসুবিধার জন্য হাঙ্গার স্ট্রাইক করা উচিত কিনা তাহা মনে মনে স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের অসুবিধা ছিল সবচেয়ে বেশি—অনেক সময় একথা ভাবিয়াছি যে, আমরা সকলে মিলিয়া ব্যাপকভাবে অনশন করিতে শুরু করি। কিন্তু তাহার কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অসুবিধা ছিল। গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীরা সত্যাগ্রহী হইলেও জেলের বাহিরে বা জেলের ভিতরে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোর মত অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা তাহাদের কম। অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দী শুধু জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি সাধারণ আগ্রহ নিয়া

তিনি নানা সাহেব গোরে ও শিরুভাই লিমায়ের পরে গোয়াতে সত্যাগ্রহী হিসাবে প্রবেশ করেন।

আন্দোলনে যোগ দিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে। অনেকের আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতি থাকিলেও কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; পুলিস তাহাদের সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া আসিয়াছে। এমতাবস্থায় সামনাসামনি আলোচনা না করিয়া অনশন ধর্মঘটের মত একটি বিপজ্জনক সম্ভবনাপূর্ণ সংগ্রামে সকলকে টানিয়া আনা উচিত হইবে বলিয়া মনে করি নাই। পরে আমরা নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ আমি, শিরুভাই, গোরে, জগন্নাথ রাও প্রভৃতি চোরাই বিধির মাধ্যমে নিজেদের ভিতর এ বিষয়ে কিছুটা আলাপ-আলোচনা চালাই এবং অনশন ধর্মঘটের পরিকল্পনা ছাড়িয়া দিই।

॥ ২৮ ॥

আল্‌তিন্যোর দৈনন্দিন

'আল্‌তিন্যো' জেল বা মানিকোমের ভূতপূর্ব পাগলা গারদে কেরুস্‌ ও ফের্নান্দের তদারকে আমাদের দৈনিন্দন জীবন কিভাবে কাটিতেছিল, তাহা এদেশের পাঠকদের প্রধানত দুইটি কারণে লিখিয়া বোঝানো কিছুটা শক্ত। প্রথমত, রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার হইয়া জেলে গেলে কিছুটা কষ্ট করিতে হইবে, ইহা প্রত্যাশিতই থাকে; আমাদের দেশেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সময় হাজারে হাজারে লোক কারাবরণ করিয়াছিল। সুতরাং আমরা ধরিয়া লই গোয়াতেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইতেছে; সেখানকার জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অল্পবিস্তর নির্যাতন বা অত্যাচার হইলে স্বভাবতই মনে হয়, ইহাতে এত আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

ভারতে ইংরেজ আমলের জেলের সঙ্গে গোয়ার পর্তুগীজ জলের যে বিশেষ কোনো তফাৎ আছে বা থাকিতে পারে, সেটা আমাদের মনে সাধারণত ওঠে না। দ্বিতীয়ত সালাজারী আমলের পর্তুগীজ আইন-কানুন, কারা-ব্যবস্থা এসব সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ ধারণা এত কম যে, তাহার ভিতরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর কি ধরনের অত্যাচার চলে বা চলিতে পারে, তাহা আমরা সব সময় পুরাপুরি আন্দাজ করিয়া উঠিতেও পারি না। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিস হাজতে কি ধরনের মারধোর করা হয়, তাহার কিছু বর্ণনা ইতিপূর্বে দিয়াছি। কিন্তু মারধোর বা শারীরিক অত্যাচারের নৃশংসতাটাই পর্তুগীজ কারাজীবনের ক্লেশের সবটা নয়। জেলখানায় যাহাকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আটক থাকিতে হয়, তাহার পক্ষে দৈনন্দিন জেল-জীবনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, সেখানকার বিধি-নিষেধ, সেখানকার জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ এসব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আমি কিছুটা সৌভাগ্যবান; পর্তুগীজ জেল এবং বৃটিশ জেল দুয়েরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ আমার হইয়াছে। উভয় ব্যবস্থার একের অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখার সুযোগ আমি যেভাবে পাইয়াছি, সকলের পক্ষে তাহা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বৃটিশ আমলে আমি যতদিনই জেলে থাকিয়াছি, তাহার বেশির ভাগই গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহক্রমে। সুতরাং বৃটিশ জেলের বা বৃটিশ আমলের পুলিসী নির্যাতন সম্পর্কে আমার যে কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, পাঠক সেটা সহজেই ধরিয়া লইতে পারেন। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ পুলিস

বা তাহাদের বেতনভোগী এ-দেশী গোয়েন্দা পুলিস রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যেসব অত্যাচার করিত বা জেলে তাহাদের যেভাবে রাখিত, তাহা আমার চোখে দেখা ও দৈহিক ভাবে আস্বাদ করা আছে। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে গোয়াতে, বিশেষ করিয়া 'আল্‌তিন্যো'তে আমাদের জীবনের খানিকটা তুলনা করা যাইতে পারে। গোয়ার মুক্তি-যোদ্ধারা কি ধরনের অত্যাচার ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে লড়িতেছে, কি অবস্থায় তাহারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জেলে আটক থাকে এবং আজও আটক আছে, ইহা হইতে সে সম্পর্কে ধারণা করা পাঠকদের পক্ষে কিছুটা হয়ত সম্ভবপর হইবে।

বেশি পিছনে যাওয়ার দরকার নাই; যুদ্ধের সময়কার কথা বলিলেই হইবে। ১৯৪০ সালে যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার সন্দেহক্রমে, বিশেষ করিয়া বৃটিশের বিপদের দিনে জেলের বাহিরে থাকিলে বৃটিশের শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলাইয়া হয়ত আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বৃটিশরাজ উচ্ছেদের চেষ্টা করিব, এইজন্য অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ১৯৪০ সালের মে মাসে আমিও হঠাৎ একদিন গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসি। তাহার ভিতরে আমাদের চৌদ্দ-পনরো জনকে অন্যান্যদের হইতে ভিন্ন করিয়া আলিপুর জেলের 'প্রসিদ্ধ' 13-Cells ও 14-Cells-এ আটক রাখা হয়। ইতিপূর্বে আমার জেল-জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি কখনো একা একা একটি সেলে আটক থাকি নাই। কিন্তু আলিপুর জেলে আমাদের সেলে আটক থাকার অর্থ 'সলিটারী কনফাইনমেণ্ট' ছিল না; সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত—অর্থাৎ খালি রাত্রিবেলায় আমরা নিজের নিজের সেলে আটক থাকিতাম। অবশ্য ১৯৪০ সালের আগেই রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকার নিয়া অতীতের বহু সংগ্রামের ফলে—বিশেষ করিয়া ১৯২৯ সালে লাহোর জেলে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ যতীন দাসের আত্মবলি দেওয়ার ফলে—জেলের ভিতর বন্দী-জীবনের বহু অধিকার আইনত স্বীকৃত ও বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের গোড়ার দিকে বাঙলা দেশের হোম ও জেল ডিপার্টমেণ্টের মন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব, আর তাঁহার মাথার উপরে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হোম সেক্রেটারী দুর্দান্ত ক্রেইগ সাহেব। ক্রেইগের নির্দেশে ও প্ররোচনায় নাজিমুদ্দীন তখন বাঙলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের কারাজীবনের সুযোগ-সুবিধা যতটা পারেন সঙ্কুচিত করিয়া আনার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলে বিনা বিচারে আটক বন্দী হিসাবে আমরা আগেকার আটক বন্দীদের তুলনায় বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধাই পাইতেছিলাম না। ক্রেইগের পরামর্শক্রমে নাজিমুদ্দীন আমাদের জেল-কর্মচারীদের খেয়ালখুশীমতন কাহাকেও প্রথম শ্রেণীর ও কাহাকেও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারাধীন বন্দী হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্রেইগের মত ছিল গ্রেটবৃটেন যে সময় নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, সে সময় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যাহাদের আটক রাখিতে হয়, তাহারা বৃটেনের শত্রু বা শত্রুর চর ছাড়া আর কিছু নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা নাৎসী জার্মানীর পঞ্চম বাহিনী। সুতরাং জেলে তাহাদের বন্দী হিসাবে সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে বেশি কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দরকার নাই। তাহাদের জেলে রাখিয়া বেশ ভাল করিয়া সমঝাইয়া দিতে হইবে, আটক থাকিতে কেমন লাগে।* কাজে কাজেই আলিপুরের তেরো বা চৌদ্দ ইয়ার্ডের সেলগুলিতে আমাদের বসবাসের ব্যবস্থা সেদিন যে বিশেষ সুখকর ছিল না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

---

* বলাই বাহুল্য, আমরা ক্রেইগ এবং নাজিমুদ্দিন কোম্পানীর এই ব্যবস্থা বিনা প্রতিবাদে

কিন্তু পনেরো বছর পরে গোয়াতে ডাঃ সালাজারের জেলে আসিয়া বৃটিশ আমলের সেই "খারাপ" ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নিজের অজ্ঞাতেও হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি। সেই আমলের কোন ইংরাজ রাজকর্মচারীর চোখে যদি আমার এই লেখা পড়ে বা আমার এই মন্তব্যের কথা যদি তাঁহারা কেউ কোনোমতে শোনেন, তাহা হইলে কৌতুকবোধ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যের খাতিরে বৃটিশ পুলিসী ব্যবস্থা বা জেল ব্যবস্থাকে এটুকু গুড্ সার্টিফিকেট না দিয়া উপায় নাই। বলা বাহুল্য, ইংরেজ আমলে জেলের ভিতর রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন লইয়া বহুদিন বছরের পর বছর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে; বিনা সংগ্রামে কোন অধিকার পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বৃটিশ আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থার ভিতরে, পুলিসের অত্যাচার হোক আর কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্নে হোক, শাসকদের স্বেচ্ছাচার ও ক্ষমতার উপর যে সীমারেখা টানা ছিল, পর্তুগীজ ব্যবস্থায় তাহার কোন অস্তিত্বই কোনোদিন ছিল না। এসব ব্যাপারে বৃটেনে বা এদেশেও জনমতের প্রভাব বা চাপ বৃটিশ শাসনব্যবস্থার উপরে যতটুকু কার্যকরী হইত, সালাজারের ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছা-শাসনের ভিতরে তাহা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। খাস পর্তুগালে হোক, আর আংগোলা বা মোজাম্বিকে হোক, কিংবা গোয়াতে হোক, সালাজারী ব্যবস্থায় পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বা কারাজীবনের দুঃসহ অপব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানবিকতার নামেও প্রতিকারের কোন পথ খোলা নাই।

যুদ্ধের সময় আলিপুর জেলে ক্রেইগ আর নাজিমুদ্দীনের আমলে যে ব্যবস্থার প্রতিবাদে আমরা শেষ পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট বা হাঙ্গার স্ট্রাইক অবধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—সেখানে প্রত্যেক সেলে আমাদের একটি করিয়া লোহার খাট, নারিকেলের ছোবড়া ও টিকিন কাপড় দিয়া তৈরি গদী বা তোষক, একটি করিয়া বালিশ, দুটি করিয়া বিছানার চাদর কম্বল এসব দেওয়া হইত। প্রত্যেক ঘরে আমাদের পড়ার জন্য বই বা অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার জন্য একটি করিয়া টেবিল থাকিত, বসার জন্য চেয়ার থাকিত।

মানিয়া লই নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং ভারতবর্ষে বিপ্লবী সমাজবাদের অন্যতম পুরোধা—অনুশীলন সমিতি ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত প্রতুল গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখেরা এই সময় প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। আলিপুর জেলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেতা ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, কুমিল্লার অনুশীলন সমিতির প্রবীণ বিপ্লবী নেতা শ্রীঅতীন্দ্রমোহন রায়, দিল্লীর ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা লালা শঙ্করলাল প্রভৃতি। বিনা বিচারে আটক সিকিউরিটি বন্দীদের সাধারণ কয়েদীদের পর্যায়ে রাখার প্রতিবাদে নেতাজীর নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সী ও আলিপুর জেলের রাজবন্দীরা একসঙ্গে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন। এই অনশনের ফলে জীবন বিপন্ন হইয়া ওঠায় নেতাজী ও প্রতুলচন্দ্রকে একসঙ্গে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, ইহার অল্প দিনের মধ্যে নেতাজী চমকপ্রদভাবে ভারত হইতে অন্তর্হিত হন। নেতাজী ও প্রতুলচন্দ্রকে বোধহয় অনশন ধর্মঘটের নবম বা দশম দিবসে মুক্তি দেওয়া হয়; তাহার পরেও আমাদের এই অনশন ধর্মঘট প্রায় ২০।২১ দিন চালাইয়া যাইতে হয় এবং তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দিন গভর্নমেণ্ট বিনা বিচারে আটক বন্দী হিসাবে আমাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবী আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হন।

সকাল ৫টায় সেলের লক্‌ আপ্‌ খুলিয়া যাইত এবং সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আমরা আমাদের ইচ্ছামতন সেলের বাহিরে আসিয়া সেলের ইয়ার্ডে বেড়াইতে, বসিতে, খেলাধুলা করিতে কিংবা ব্যায়াম করিতে পারিতাম; ইচ্ছামতন যে কোন সেলে গিয়া গল্পগুজব করার কোন বাধা ছিল না। খাওয়ার জন্য আমরা পাইতাম তখনকার দিনের 'ডিভিশন টু' বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট খাবার। অর্থাৎ সকালে মাখন রুটি চা, দুপুরে ভাত ডাল তরকারী, মাছ বা মাংস ও দই। বিকালে এক কাপ গরম চা বা চকোলেট জাতীয় গরম পানীয়; রাত্রে আবার দিনের মত খাবার (ভাতের বদলে চাহিলে রুটি বা পাঁউরুটি পাওয়া যাইত)। অবশ্য এই সময় রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী বা 'ডিভিশন থ্রি' প্রিজনার (অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্ডার ট্রায়াল) বলিয়া গণ্য হইতেন, তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ইহার তুলনায় কিছুটা নিকৃষ্ট দরের হইত; তাঁহারা খাট পাইতেন না এবং তাঁহাদের কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরিতে হইত; অর্থাৎ ধুতি-শার্টের বদলে তাঁহাদের পাজামা বা জাঙ্গিয়া এবং ফতুয়া পরিতে হইত। কিন্তু মোটামুটিভাবে তাঁহাদেরও কাজের সময় ভিন্ন পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করা, কথাবার্তা বলা এসবের উপর বিশেষ কোন বাধানিষেধ ছিল না। তাছাড়া রাত্রে ভিন্ন কোনো সেলের বা কয়েদীদের এসোসিয়েশন ব্যারাকের ভিতর প্রস্রাব বা পায়খানার কোন ব্যবস্থা করা হইত না; প্রত্যেক সেলের বা ব্যারাকের ইয়ার্ডের এক কোণায় নিয়মিত পায়খানা থাকিত। জেলখানায় একত্র বহু লোক থাকে বলিয়া এবং সে সময় সাধারণত প্রত্যেক জেলায় জেলার সিভিল সার্জনেরা জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়াও জেলের স্বাস্থ্যবিধির রুটিনেও অত্যন্ত কড়াক্কড়ি করা হইত। মোটামুটি ইংরেজ আমলের জেল-জীবনের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কথা মনে রাখিয়া গোয়াতে 'আল্‌তিন্যো' কয়েদখানার অবস্থার কথা বিচার করিলে ইংরেজ আমলের 'খারাপের' সঙ্গে মিলাইয়া সালাজারী ব্যবস্থার 'ভালো' সম্পর্কে পাঠকদের পক্ষে একটা ধারণা করা হয়ত কিছুটা সম্ভব হইবে।

'আল্‌তিন্যো' জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের যে দুইটি ব্যারাকে রাখা হইয়াছিল, তাহা বন্ধ সেলুলার ব্যারাক। মস্ত বড় একটি ব্যারাকের দু'পাশে ছোট ছোট সব সেল, মধ্য দিয়া যাতায়াতের সরু করিডর; ব্যারাকে যেখানে সেলের সারি শেষ হইয়া গিয়াছে, সেখানে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলে একটু নীচুতে দুটি পায়খানা ও দুটি স্নানের ঘর (তাহাও অবশ্য ব্যারাকেরই ভিতরে, ব্যারাকেরই একটি অংশ বিশেষ)। অর্থাৎ এই ব্যারাকের কোন সেলে একবার ঢুকিলে আর বাহিরের আলো-হাওয়া রৌদ্র গায়ে লাগিবে না—এমন কি স্নান বা প্রাতঃকৃত্যের জন্যও কয়েদীদের কখনো ব্যারাকের বাহিরে আনার দরকার করিবে না। অবশ্য স্নানের বেশি হাঙ্গামাও পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য রাখেন নাই। আল্‌তিন্যো জেলে নিয়ম ছিল সপ্তাহে দুবার স্নান ও কাপড় কাচা। বলা বাহুল্য, এটা 'নিয়ম' মাত্র। কেরুস এবং ফের্নান্দের অনুগ্রহে আমাদের এমন সময়ও গিয়াছে, যখন একাদিক্রমে আমরা পুরা এক সপ্তাহ বা দশ দিনেও একবার স্নান করিতে পাই নাই। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন উপায় ছিল না, কেননা 'আল্‌তিন্যো'তে কেরুস ও ফের্নান্দের উপরে উপরওয়ালা কেহ ছিল না। আমি নিজে বারবার আমাদের জেল ভিজিটর পাদ্রী কারিনোর মারফৎ, কিংবা কদাচিৎ কখনও পুলিসের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হইলেই অভিযোগ করিয়াছি। কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। ফাদার কারিনো আমাদের স্নানের ব্যাপার নিয়া এবং প্রত্যহ বিকালবেলায় মিলিটারী পাহারায় ব্যারাকের বাহিরে

আমাদের একটুখানি ঘোরার সুবিধা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে দরবার করার জন্য পর্তুগীজ ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাছে পর্যন্ত গিয়াছেন। কিন্তু তিনিও কিছু করিতে পারেন নাই। ফলে একথা বলিতে পারা যায়, আমরা পাঁচ মাস ধরিয়া একেবারে অসূর্যম্পশ্য ছিলাম; আর আমাদের স্নানের সুযোগ ঘটিয়াছে 'আল্তিন্যো' জেলের এই পাঁচ মাসের ভিতর সর্বসাকুল্যে বোধহয় চৌদ্দ পনরো বারের বেশি নয়। ব্যারাকের বাহিরে যাইতে না দিবার তবু একটা কারণ ছিল। 'আল্তিন্যো'র এত মিলিটারী পাহারার কড়াক্কড়ি সত্ত্বেও ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে 'আলতিন্যো' জেল হইতে প্রাচীর টপ্কাইয়া শ্রীশিবাজী দেশাই ও শ্রীগজানন রায়কত* নামে দুইজন রাজবন্দী পলাতক হন এবং পলাতক অবস্থাতেই তাঁহারা পঞ্জিম হইতে অরণ্যপথে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে চলিয়া আসেন। তাহার পর হইতে বন্দীদের চব্বিশ ঘণ্টা নিজের নিজের সেলের ভিতর আটকাইয়া রাখার আদেশ হয়। কিন্তু স্নান না করিতে দিবার কোন সংগত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই, এক কেরুস ও ফের্নান্দের খামখেয়ালী ছাড়া। কেরুস যে মানুষ হিসাবে খুব খারাপ ছিল না, সেকথা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু দৈনন্দিন কাজকর্মে কিছুটা অলস প্রকৃতির লোক ছিল। কয়েদীদের প্রত্যেক ঘর খুলিয়া আলাদা আলাদাভাবে স্নান করাইতে হইলেও অন্ততপক্ষে দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় লাগিবে, প্রত্যেককে পাহারা দিতে হইবে, প্রত্যেক ঘর খুলিতে এবং বন্ধ করিতে হইবে। কাজে কাজেই কেরুস পারতপক্ষে এ-কাজ এড়াইয়া চলিতে চাহিত। ফলে এইভাবে কোন সপ্তাহের একদিন হয়ত বাদ গেল। পরের দিন ফের্নান্দ আসিলে, তাহাকে স্নানের কথা বলিলে সে বলিবে আজ স্নানের দিন নয়, এইভাবে সেদিনও বাদ যাইবে। পরের দিন কেরুস মিথ্যা অজুহাত দিবে আজ কলে 'আগুয়া' (agua বা জল) আসে নাই। তাহার পরের দিন ফের্নান্দ বলিবে খাতায় দেখিতেছি লেখা আছে তোমাদের স্নান করানো হইয়াছে, আজ আর বাড়তি স্নান করানো হইবে না। এইভাবে সপ্তাহভোর কাটিয়া গেল। কোনো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সুপারভাইজর বা ইন্সপেক্টর কষ্ট করিয়া কুয়ার্তেল হইতে 'আল্তিন্যো' পর্যন্ত টিলার উপরে আসিয়া জেল-গারদে কি ঘটিতেছে বা না ঘটিতেছে, তাহা দেখিত না। কাজেই ইহার বিরুদ্ধে নালিশ করার কোন উপায় ছিল না বলিলেই হয়।

এক ডাক্তারের কাছে বলা যাইত। সে ভদ্রলোক, ডাঃ লোবো, একদিন অন্তর ভিজিটে আসিতেন। তাঁহাকে বলা নিরর্থক ছিল। বলিলে ধমক দিয়া বলিতেন, তোমাদের স্নান করানো আমার ডিউটি নয়। নয়ত বলিতেন স্নান না করিলে কি হয়। আসল ব্যাপার পর্তুগীজ পুলিস কনস্টেবলদের কথার উপর এই ভদ্রলোকের কথা বলার কোনোরকম অধিকার ছিল না। বলিলেও ফের্নান্দ বা কেরুস যে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তা'ছাড়া স্নান না করিয়া থাকা আমাদের পক্ষে যে কতটা কষ্টকর, পর্তুগীজদের তাহা ধারণা ছিল না। শীতের দেশের লোক বলিয়া য়ুরোপীয়েরা আমাদের মত প্রত্যহ স্নান করিতে অভ্যস্ত নয়। তার উপরে বিশেষ করিয়া সাধারণ পর্তুগীজদের ব্যক্তিগত বা দৈহিক পরিচ্ছন্নতা-বোধ অত্যন্ত কম বলিয়া আমার ধারণা। কেরুস্ মানুষটা ভালো এবং ধীর, স্থির ও বিচক্ষণ ধরনের হইলেও, স্নান করার বদলে একটু হাতমুখ

---

* গজানন রায়কত কৃষক ঘরের সন্তান ও গোয়ার জাতীয় কবি। 'আজ্লা ত্রিবার', 'পুঢ়ে চলা' প্রভৃতি জনপ্রিয় জাতীয় সংগীতের রচয়িতা তিনিই।

ধুইয়া নিলেই কাজ চলে এরূপ মনে করিত। গোয়ার মত ভ্যাপ্‌সা গরম জায়গাতেও কেরুস্‌ এবং ফের্নান্দের মত আরো অনেক পর্তুগীজকে আমরা দিনের পর দিন স্নান না করিয়া খালি একটু মুখ-হাত ধুইয়া, চুল আঁচড়াইয়া নিয়া কাজ সারিয়া নিতে দেখিয়াছি। কিন্তু স্নানের অভাবে আমাদের যে অবস্থা হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমার নিজের শরীর এই পাঁচ মাসে চুলকানি, হাজা এবং চামড়ার ঘায়ে ভরিয়া উঠিয়াছিল এবং আমার সহবন্দীদের অবস্থাও ভিন্ন রকমের ছিল না। তফাৎ এইটুকু যে, আমাকে এই দুর্গতি পাঁচ মাসের বেশি ভোগ করিতে হয় নাই; আমরা 'আল্‌তিন্যো' গারদে ঢোকার আগে হইতে যাহারা সেখানে ছিল, তাহারা একাদিক্রমে প্রায় ৮।৯ মাস ধরিয়া এই অবস্থায় ছিল।

চুলকানি বা ঘায়ের জন্য বা অন্য কোনো অসুখের জন্য ডাঃ লোবোর কাছে ওষুধ চাহিলেই তাঁহার দু'তিনটি পেটেণ্ট প্রেস্‌কৃপশন বাঁধাধরা ছিল—একটা ভেসেলীন মলম, টিঞ্চার আয়োডাইন, মারক্যুরো ক্রোম পেটেণ্ট আর জ্বর-জারি কোষ্ঠবদ্ধতা, সর্দি-কাশি সব কিছুর জন্য অ্যাব্‌সিনথ সল্ট (অর্থাৎ ম্যাগ্‌নেসিয়াম সলফেট্‌ বা ম্যাগ্‌ সাল্‌ফ্‌) সহ একটি সর্বরোগহর মিক্সচার। ডাঃ লোবো পাঞ্জিম মিউনিসিপ্যালিটির সরকারী হেল্‌থ অফিসার হিসাবে পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজত এবং 'আল্‌তিন্যো' জেল দুয়েরই ডাক্তার। ভদ্রলোক পাঞ্জিমের পর্তুগীজ স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া একটি মার্চেণ্ট অফিসে চিঠিপত্র লেখার কেরানীর কাজ করিতেছিলেন, এমন সময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইয়া যাইতে তাঁহার সরকারী ডাক্তার হওয়ার সুযোগ আসে। পুলিস কুয়ার্তেলে এবং 'আল্‌তিন্যো' জেলে কয়েদীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পাঞ্জিমে যখন একজন সহকারী হেল্‌থ অফিসারের প্রয়োজন হইল, তখন উপরে কিছু তদ্বির-তদারক করিয়া তিনি এই কাজে ঢোকেন। ডাক্তারী বা চিকিৎসাবিদ্যা তাঁহার কতদূর অধিগত ছিল, তাহা জানার কোনো সুযোগ আমার হয় নাই। কিন্তু বেচারী একদিন আমার কাছে খোলাখুলি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, (অবশ্য চারিদিকে তাকাইয়া—কাছে কোন ইংরাজী জানা লোক নাই, তাহা দেখিয়া নিয়া) তাঁহার কোনোই ক্ষমতা নাই। 'আল্‌তিন্যো' জেলে আমার সহবন্দী একজন গোয়াবাসী সত্যাগ্রহী কয়েকদিন ধরিয়া জোলাপের জন্য তাঁহার নিকট হইতে ম্যাগ্‌ সালফ্‌ বা অ্যাব্‌সিনথ্‌ সল্ট চাহিতেছিল; ডাঃ লোবো রোজই তাহাকে জবাব দিতেন—"তুমি তো গোয়ার লোক, তোমার বাড়ির লোকের কাছে চাহিয়া পাঠাও; আমাকে বিরক্ত করিও না।" অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বেচারী আমাকে আসিয়া ধরে, আমি যেন ডাক্তার লোবোকে ইংরেজীতে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই, তাহার জোলাপ নেওয়া কেন দরকার। পরেরবার ডাঃ লোবো সেলের সামনে আসিতে আমি গিয়া তাঁহাকে বলি—"আমাদের ঘরের এই বন্ধুটি কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটের ব্যথায় খুবই কষ্ট পাইতেছে, আপনি যদি দয়া করিয়া ইহার জন্য একটুখানি এ্যাব্‌সিনথ্‌ সল্টের ব্যবস্থা করেন তো খুবই ভাল হয়। আমি কয়দিন ধরিয়া দেখিতেছি এ খুবই কষ্ট পাইতেছে। বন্দী হিসাবে ইহাকে দেখিবেন না, মানুষ হিসাবে, ডাক্তার হিসাবে আমি আপনার নিকট ইহার জন্য আবেদন জানাইতেছি। আশা করি, অতটুকু দয়া আপনার হইবে।" ডাঃ লোবো তখন বলেন—"মিঃ চৌধুরী, কুয়ার্তেলে আমার মেডিকেল স্টকে অ্যাব্‌সিন্‌থ সল্ট থাকিলে কি আমি ইহাকে আউন্সটাক দিতে পারিতাম না, কিন্তু বিশ্বাস করুন আজ দু-সপ্তাহ হইল স্টক শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি রিকুইজিশন করিয়াছি, কিন্তু সত্বর তাহা পাওয়ার কোনোই আশা নাই। সেইজন্যই উহাকে বাড়ি হইতে আনাইয়া নিতে বলিয়াছি।" আমি উত্তরে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"পাঞ্জিমের হেল্‌থ

অফিসারের ঔষধের স্টক ফুরাইয়া গেলে একটুখানি অ্যাব্‌সিন্‌থ সল্ট কিনিয়া নিবার ক্ষমতা নাই, ইহা আমাকে বিশ্বাস করিতে বলেন?" আমার হাসিতে এবং কথার স্বরে বোধহয় শ্লেষের ভাব থাকিয়া থাকিবে। ডাঃ লোবো একটু দুঃখের সুরে আমায় বলেন—"মিঃ চৌধুরী, আমি পঞ্জিমের হেল্‌থ অফিসার বটে। কিন্তু সত্যই বিশ্বাস করুন আমার কোনো ক্ষমতা নাই। আমি পলিটিকস্‌ বুঝি না, চাকুরী হিসাবে চাকুরী করিতে আসিয়াছি। আমার কথায় এখানে ঔষধ আসিবে না। আল্‌তিন্যো জেল পুলিস কুয়ার্তেলের অধীন, পুলিস কমাণ্ডাণ্ট যা খুশী তাই এখানে করিতে পারেন। ঔষধপত্রও তাঁহার মারফতেই কিনিতে হয়। ইহার বেশি আর কিছু দয়া করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।" জানি না, নিজের এই ক্ষমতালেশহীন অসহায় অবস্থার কথা লোবো কতটা তীব্রভাবে অনুভব করিতেন এবং হঠাৎ সেদিন এত কথা কেন বলিয়া ফেলিলেন। সাধারণত তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপারে পুলিসের সঙ্গে—বিশেষ করিয়া গোরা পর্তুগীজ পুলিস হইলে তো কথাই নাই—সায় দিয়া চলিতেই দেখিয়াছি। ডাক্তার হইয়াও বেচারী বহুদিন বেকার ছিলেন, সে কথাটা ভদ্রলোক ভোলেন নাই। কাজে কাজেই অ্যাব্‌সিন্‌থ সল্ট স্টকে থাকুক বা না থাকুক, চাকুরী করিতে গেলে যে কর্তৃপক্ষের সকল কাজে সায় দিয়া চলিতে হইবে, সে বিষয়ে তিনি খুবই হুঁশিয়ার ছিলেন। বলাই বাহুল্য, 'আল্‌তিন্যো' জেলে একদিন অন্তর যখন তিনি তাঁহার কনস্টেবল, কম্পাউণ্ডার ও চতুর্বিধ দাওয়াইয়ের ব্যাগসহ আমাদের সেলের সম্মুখে আসিয়া কোঙ্কনী ভাষায় প্রশ্ন করিতেন—"কসাঁ অস্‌সোঁ রে, বরঁ?" (কেমন আছো সব? ভালো?)। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বন্দীদের মনে বিশেষ প্রীতির উদ্রেক হইত না।

কথায় কথায় স্নানের অভাব ও ডাক্তারের কথা উঠিয়া পড়িল। যে প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম অর্থাৎ 'আল্‌তিন্যো' জেলের সেলগুলিতে আমাদের দৈনন্দিন থাকার ব্যবস্থা আলিপুর জেলের তুলনায় কেমন ছিল, সেখানে ফিরিয়া যাওয়া ভালো। আলিপুর জেলে যুদ্ধের সময় ক্রেইগ্‌-নাজিমুদ্দীনের শক্ত ব্যবস্থায় আমরা এক একটি আলাদা সেলে কিভাবে থাকিতাম, পাঠক তাহা শুনিয়াছেন। 'আল্‌তিন্যো'-তে সালাজারী ব্যবস্থায় আমাদের সেল-বাসের ব্যবস্থা কি ছিল, এখন তাহা শুনুন। এখানে খালি আমার সেলের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আমাদের ব্যারাকের ভিতরে—করিডরের দুপাশে ষোলটি সেল সারি সারি পাশাপাশি চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে দুটি, ব্যারাকের মিলিটারী গার্ডদের রেস্টরুম; অন্য চৌদ্দটিতে আমরা থাকি। আমার জায়গাও ইহারই একটার ভিতরে হইয়াছে। প্রত্যেকটি সেল মাপে একরকম, লম্বায় ৯ ফুট, চওড়ায় ৭ ফুট অর্থাৎ মোট ৬৩ স্কোয়ার ফুট জায়গা। তাহার মধ্যে আবার কোনো কোনো সেলে পাগলদের শুইবার জন্য দেওয়াল ঘেঁষিয়া সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো একটা উঁচু রোয়াক বা ধারি-র মতো আছে। তাহাতে মাত্র একজন লোক শুইতে পারে। আর তাহার আশ-পাশ দিয়া নীচু মেঝেতে বাকী যেটুকু জায়গা তাহাতে বাকী লোকের ব্যবস্থা। আমি যে যে সেলে ছিলাম, সেগুলিতে আমার সঙ্গে কখনও আরও পাঁচজন, ছয়জন বা সাত-আটজন লোক আটক থাকিয়াছে। আমাদের বিছানাপত্র বলিতে কিছুই ছিল না; জেল বা গারদ কর্তৃপক্ষের তরফ হইতেও কোনো বিছানা সরবরাহ করা হয় নাই। বন্ধুবর রাজারাম পাতিলের কাছে শুনিয়াছি, কুয়ার্তেল হাজতে আসিয়া পুলিস কমাণ্ডাণ্টের কাছে তিনি অন্তত একটি শোয়ার কম্বল চান। কমাণ্ডাণ্ট তাহার উত্তরে বলেন—'এই হোটেলে যাত্রীদের বিছানা দেওয়া হয় না।'

'আল্‌তিন্যো' জেলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। সুতরাং 'আল্‌তিন্যো'র সেলে আমাদের শয্যা-বিহারের কথা সহজেই অনুমেয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সেলে পূর্ববর্তী বন্দীদের ফেলিয়া যাওয়া কয়েকটি ছেঁড়া মাদুর আমরা পাইয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে আমাদের দু'একজনের সঙ্গের বাড়্‌তি ধুতিগুলিকে চাদর করিয়া এবং ছোট ছোট চটের বা কাপড়ের থলের ভিতর জামাকাপড় ভরিয়া তাহা দিয়া বালিস বানাইয়া আমরা আমাদের বিছানার বন্দোবস্ত কোনোমতে একরকম করিয়া নিয়াছিলাম। কিন্তু মুশকিল হইত শোওয়ার জায়গা নিয়া। গোয়ার বন্ধুরা আমি কতকটা বয়সে বড় বলিয়া এবং কতকটা ভারত হইতে আগত সত্যাগ্রহী নেতা এবং তাঁহাদের 'অতিথি' বলিয়া আমার শোওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন—উপরে যে সিমেন্টের রোয়াকের কথা বলিয়াছি, তাহার উপর, নীচে, মেঝেতে এপাশে-ওপাশে ঠাসাঠাসি করিয়া বাকি ৭।৮ জন কিভাবে শুইতেন, তাহা শুধু অনুমানের বিষয়, বর্ণনার বিষয় নয়।

আমরা ২৪ ঘণ্টা এই সেলের ভিতর আটক থাকিব। রোজ সকালবেলায় একবার প্রাতঃকৃত্যের জন্য আধ ঘণ্টা আমাদের কল-ঘরে ও পায়খানায় যাইতে দেওয়া হইবে, আর বেলা ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে খাওয়াদাওয়ার আগে একবার হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (কারণ প্রত্যহ স্নান করানোর কোনো ব্যবস্থা নাই)। এছাড়া সমস্ত সময়ে ঐ ৮´× ৯´ ফুট কুঠুরীতে আমাদের তালাবন্ধ থাকিতে হইবে। অবশ্য ইহার ভিতরে সকালে একবার চা-রুটি দিবার জন্য, দুপুরে খাওয়ার ভাত দিবার জন্য ও খাওয়া হইয়া গেলে থালা বাহির করিয়া নিবার জন্য এবং রাত্রেও সেইভাবে একবার তালা খোলা হইত বটে। কিন্তু সে সব সময় আমাদের সেলের বাহিরে পা দিবার হুকুম ছিল না। বিনা হুকুমে বাহিরে পা দিলেই কেরুসের ডিউটি হইলে কেরুসের জোর গলার ধমক খাইতে হইত, আর ফের্নান্দের ডিউটি হইলে ফের্নান্দের হাতের বিরাশী শিক্কা ওজনের একটি চপেটাঘাত খাইতে হইবে। কাজে কাজেই সহজে কেহ বে-নিয়মে সেলের বাহিরে পা বাড়াইতে চাহিত না।

॥ ২৯ ॥

পর্তুগীজ সৈন্য ও পর্তুগীজ সাধারণ মানুষ

'আল্‌তিন্যো' জেলের প্রতিদিনের সাধারণ রুটিন—এক ফের্নান্দের খামখেয়ালী অত্যাচার ভিন্ন কুয়ার্তেল হাজতের চেয়ে ইতরবিশেষ রকমের কিছু ছিল না। এখানেও আমাদের তিন বেলা খাওয়ানোর চার্জে ছিল কুয়ার্তেলের সেই পেটমোটা পর্তুগীজ কনস্টেবলটি; 'অন্নমন্ত্রী' হিসাবে তাহার পরিচয় আগেই দিয়াছি। কুয়ার্তেলের হাজত-গুলিতে এবং আল্‌তিন্যো জেলেও আটক বন্দীদের খাবার জোগানোর ভার ছিল ধোন্দ নামীয় জনৈক হোটেলওয়ালার উপর। পুলিস ও মিলিটারী পাহারায় ধোন্দের হোটেল হইতে হোটেলের লোকজন ট্রাকে করিয়া খাবার নিয়া আসিত। তাহারাই সেই খাবার থালায় থালায় বাড়িয়া প্রত্যেক সেলের সামনে রাখিয়া দিয়া গেলে পর এক একটি সেলের দরজা খুলিয়া দিবে এবং কয়েদীরা প্রত্যেকে আসিয়া নিজের থালা নিয়া সেলের ভিতরে গিয়া

খাওয়াদাওয়া করিবে। মিনিট পনর কুড়ি পরে আবার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে; তখন থালা বাহিরে রাখিয়া দিয়া আসিতে হইবে। তাহার পর সারি বাঁধিয়া কল-ঘরে হাত ধুইতে যাওয়ার পালা। সন্ধ্যাবেলা ৬টা হইতে ৭টার ভিতর আবার সেই একই পালার পুনরভিনয়। প্রতিদিন দুই বেলার খাওয়াদাওয়ার সময় কি পরিমাণ ধমক-টমক বা মারধোর খাইতে হইবে বা কি পরিমাণ হাঁকডাক ও হুংকার শুনিতে হইবে সেটা নির্ভর করিত সেদিনকার গার্ড ডিউটিতে কে আছে ফের্নান্দ না কেরুস তাহার উপর।

আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে অনেকের মনে কৌতূহল থাকিতে পারে। আমাদের এদেশে জেলখানার খাদ্য সম্পর্কে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদেরকে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে আমাদের যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহা আমাদের জেলের সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের চেয়ে একটু ভালো। সকালে লপসি বা মাড়-ভাতের বদলে আমরা এক গেলাস চা ও দুটি ছোট ছোট গোল পাঁউরুটি পাইতাম। দুপুর এবং রাত্রের খাবার ভাত, ডাল, একটি তরকারি বা 'ভাজি' (মহারাষ্ট্র এবং কোঙ্কনীতে আমরা যাহাকে তরকারি বলি, তাহার সাধারণ নাম 'ভাজি'—তাহা ভাজা হোক বা না হোক) এবং টক 'কড়ি' (আমসোল নামীয় একপ্রকার কোঙ্কনী শুকনা টক ফলের ভিজানো জল, তাহার সংগে একটু হিং এবং কাঁচা লঙ্কা কুচা দেওয়া; এই জলের কোঙ্কনী বা মারাঠী নাম 'কড়ি')। কেহ কোনো কারণে ভাত না খাইলে বা খাবার বদলাইতে চাহিলে সে পাঁউরুটি, দুটি কলা বা একটি নারিকেল, অসুস্থ থাকিলে দুধ বা কঞ্জি পাইবে। যাহারা মাছ খায়, কোঙ্কনে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-ক্রিশ্চিয়ান নির্বিশেষে বেশির ভাগ লোকই মাছ মাংস খাইতে অভ্যস্ত*—তাহারা তরকারি বা ভাজির বদলে মাছ পাইবে। কিন্তু নারিকেলের তেলে রান্না মাছের গন্ধ আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না বলিয়া আমি 'আল্‌তিন্যো' জেলে থাকার সময় মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

কিন্তু খাওয়াদাওয়া যেরকম হোক, 'আল্‌তিন্যো'তে যে অবস্থায় আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সেলে আটক করিয়া রাখা হইত, তাহাতে আমাদের জীবন প্রায় দুঃসহ হইয়া উঠিত, যদি একটা খুব অপ্রত্যাশিত দিক হইতে আমরা কিছু সাহায্য না পাইতাম। সে সাহায্য আমরা পাই পর্তুগীজ গোরা সৈন্যদের কাছ হইতে। আল্‌তিন্যো জেলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শান্ত্রী পাহারার ব্যবস্থা যে মিলিটারীর উপর ছিল, সে-কথা আগেই বলিয়াছি। আমাদের ব্যারাকটি ছিল মানিকোম পাগলা গারদের ভিতরে একপাশে একেবারে দেওয়ালের ধারে। জেলের বাহিরের দেওয়াল আর আমাদের ব্যারাকের ভিতরকার ব্যবধান বোধ হয় ১৫—২০ গজের বেশি ছিল না। প্রত্যেক ব্যারাকের ভিতরে তো সশস্ত্র মিলিটারী পাহারা

---

* কোঙ্কন অঞ্চলের সারস্বত ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বলেন, 'গৌড় সারস্বত'। তাঁহাদের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা বাংলা দেশ হইতে কোঙ্কনে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের মাছ খাওয়ার রীতিও তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের সংগে সংগে বাংলা দেশ হইতে আসিয়াছে। ঐতিহাসিক কারণ যাহাই হোক, তাঁহারা মাছ মাংস খাইতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত। গোয়াতে এবং কোঙ্কনে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট প্রভাবশালীও বটে; কিন্তু মহারাষ্ট্রের অন্যত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদা কম। সমুদ্রের একেবারে ধারে বলিয়া কোঙ্কনে ও গোয়াতে মাছ খুব সহজে পাওয়া যায় এবং খুবই সস্তা। মাছ খাওয়া প্রচলনের সেইটিই সবচেয়ে বড় কারণ।

থাকিতই; তাছাড়া বাহিরেও সামনে, পিছনে, চারিপাশেই মিলিটারী পাহারা থাকিত। সম্মুখের দিকে যেসব সৈন্য পাহারায় থাকিত, তাহারা অবশ্য সব সময়েই যতটা পারে পুরা মিলিটারী কড়াকড়ি ও সতর্কতা দেখাইয়া তাহাদের ডিউটি সম্পন্ন করিত। জানালা দিয়া বন্দীদের সঙ্গে গল্পগুজব করা বা আড্ডা দেওয়া সম্মুখের দিকের শান্ত্রী পাহারারা একেবারেই করিত না। কোন উপরওয়ালা গাফিলতি দেখিয়া ফেলিলে শাস্তি পাইতে হইবে সে ভয়ও তাহাদের মনে ছিল। আর সে উপরওয়ালা মিলিটারীর লোক না হইয়া পুলিসের লোক হইলে তো কথাই নাই; বিশেষ করিয়া 'পিদে' বা 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিস। 'ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের' লোকজনও মধ্যে মধ্যে যে 'আল্তিন্যো'-তে আসিত না, তাহা নয়। সৈন্যদের উপর কড়া হুকুম ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত তাহারা কখনও কোনো কথাবার্তা বলিবে না। সালাজার গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের সৈন্যদলকেও যে রাজনৈতিকভাবে খুব বিশ্বাস করেন তাহা নয়। তাছাড়া গোয়াতে শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মাথায় কি 'আইডিয়া' ঢুকিয়া যায় তাই বা কে জানে? সুতরাং সৈন্যদেরকে ব্যারাকগুলি পাহারা দেওয়া ছাড়া রাজনৈতিক বন্দীদের কোনোরূপ সংস্পর্শে আসিতে না দেওয়াই পর্তুগীজ সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ছিল। আগুয়াদা দুর্গে যখন আমাদের বদলি করা হয়, সেখানেও সেই একই আদেশ বহাল দেখিয়াছি। 'আল্তিন্যো'-তে তাই ব্যরাকের সম্মুখের দিকের মিলিটারী পাহারাওয়ালারা যতটা পারে হুঁশিয়ার হইয়া নিজের নিজের নির্দিষ্ট 'বিটে' টহল দিত এবং পারতপক্ষে বন্দীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে চাহিত না। কিন্তু এটা পর্তুগীজ জাতীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। দিনের পর দিন কাহাকেও কাছাকাছি দেখিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না বা তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহিবে না—এটা পর্তুগীজদের স্বভাববিরুদ্ধ, বিশেষ করিয়া পর্তুগীজ সাধারণ মানুষের। অভিজাত শ্রেণীর লোকেদের কথা অবশ্য আলাদা। তাহাদের কথা না ধরিলে সমগ্র ইউরোপে পর্তুগীজদের মত দিলখোলা, ফুর্তিবাজ, ইনফর্মাল এবং বন্ধুভাবাপন্ন জাতি খুব কম আছে। সাধারণত দক্ষিণ ইউরোপের ল্যাটিন দেশগুলির লোকেরা—ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ইত্যাদি এবং ফরাসীরাও সাধারণত ফুর্তিবাজ (ফরাসীদের ভাষা ল্যাটিন বংশজ হইলেও জাতি হিসাবে তাহারা ইতালী, স্পেন ও পর্তুগালের অধিবাসীদের কতখানি কাছাকাছির লোক তাহা বলা শক্ত; রক্তের দিক দিয়া ফরাসীরা বোধহয় জার্মানদের নিকটতর আত্মীয়)। ইংরেজ বা ডাচ বা উত্তর ইউরোপীয় লোকেদের মত ল্যাটিনরা অতটা গম্ভীর প্রকৃতির নয় বা অন্যদের সঙ্গে যতটা পারে দূরত্ব বজায় রাখিয়া, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়া আলাদাভাবে চলিতে চায় না। আমার ধারণা, দক্ষিণ ইউরোপীয় তিনটি ল্যাটিন জাতির ভিতরে সবচেয়ে বেশি মানবিকতাবোধসম্পন্ন সভ্য ও ভদ্র জাতি বোধহয় পর্তুগীজরা। ফাদার কারিনো (যিনি গোয়াতে ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর হইতে স্বতপ্রবৃত্তভাবে আমাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন) নিজে স্প্যানিশ—তিনি নিজে আমার কাছে বহুবার স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময়কার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আমরা স্প্যানিশরা সময়ে সময়ে ভীষণ নিষ্ঠুর ও নৃশংস হইতে পারি; নৃশংসতার একটা ধারা আমাদের রক্তের মধ্যে মিশিয়া আছে। পর্তুগীজরা সেই তুলনায় অনেক ভালো; অনেক বেশি মানবিক মমতাবোধ ও বন্ধুভাবসম্পন্ন জাতি।"* স্প্যানিশদের

---

* পর্তুগীজ আইনে প্রাণদণ্ড নাই; সশ্রম কারাদণ্ড নাই। পর্তুগালে স্পেনের মত বুল-

কথা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, পর্তুগীজ সাধারণ লোক যত বেশি ভদ্র, মার্জিত ও বন্ধুভাবসম্পন্ন হয় বা যত বেশি সহজ হিউমার জ্ঞানসম্পন্ন ফুর্তিবাজ চরিত্রের লোক তাহাদের ভিতর দেখা যায় অন্যান্য ইউরোপীয়দের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ইংরেজ বা উত্তর ইউরোপীয়দের মধ্যে, সেরূপ কখনো দেখি নাই। তাহার অর্থ এই নয় যে, অন্যেরা অভদ্র ও নৃশংস। তাহা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু বিদেশীদের সম্পর্কে বা যাহারা তাহাদের দেশের শত্রু বা রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের সম্পর্কে, এক পুলিসের কথা বাদ দিলে, পর্তুগীজ সাধারণ সৈন্য, নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী প্রভৃতির সাধারণ ব্যবহার দেখিয়া, পর্তুগীজ জনসাধারণ সম্পর্কে আমি সত্যই অন্য ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক ভালো ধারণা নিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

ভাস্কো দা-গামা, আল বুর্কের্ক ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের নৃশংসতা ও অত্যাচার সম্পর্কে পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনী হইতে আমাদের মনে পর্তুগীজ জাতি সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে ভারতীয় সত্যাগ্রহী ও গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পর্তুগীজ পুলিস ও সালাজার গভর্নমেণ্ট যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহার কথা সেই পূর্ব-ধারণার সঙ্গে যুক্ত হইয়া সমগ্র পর্তুগীজ জাতি সম্পর্কে আমাদের মনে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ভুল ধারণাকে কিছুটা বেশি রকম বদ্ধমূল করিয়াছে।

সেজন্য এখানে বিশেষভাবে বলা দরকার মনে করিতেছি যে, সালাজার গভর্নমেণ্ট এবং সালাজারের 'পিদে' বাহিনী আর পর্তুগালের জনসাধারণ এক জিনিস নয়। এক মনে করিলে আমরা পর্তুগালের সাধারণ মানুষের প্রতি খুবই অবিচার করিব। পর্তুগীজ সাধারণ মানুষদের একটি অংশের সঙ্গে অর্থাৎ সৈন্যদলের মধ্যে যাহারা 'আলৃতিন্যো'-তে এবং পরবর্তী কালে 'আগুয়াদা'-তে আমাদের শান্ত্রী পাহারা হিসাবে কাজ করিত, তাহাদের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহারা সকলেই সাধারণ পদাতিক সৈন্য বাহিনীর লোক, যাহাদের প্রাইভেট্স বলা হয়। পর্তুগালে স্থায়ী পেশাদার সৈন্য বাহিনীর মোট লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু পর্তুগাল বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের আইন প্রচলিত আছে। এটা ডাঃ সালাজারের খরচা বাঁচানোর আইন, কারণ কনস্ক্রিপসন থাকার ফলে যাহারা কাজ করিতে আসে, তাহাদের জন্য তত বেশি খরচপত্র করার দরকার হয় না অথচ দরকারের সময় তাহাদের দিয়া কাজ পাওয়া যায়। পর্তুগালে যে কোনো নাগরিকের ২১ বছর বয়স পূর্ণ হইলেই তাহাকে দুই বছর করিয়া সামরিক বাহিনীতে কাজ করিতে হয়। সাধারণ সময়ে এই নিয়ম প্রতিপালন সম্পর্কে তত কড়াকড়ি করা হয় না, কোনো না কোনো অজুহাতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু গোয়াতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে 'সাম্রাজ্য বিপন্ন' ধুয়া তুলিয়া এই 'ন্যাশনাল সার্ভিস কনস্ক্রিপসন' আইনের প্রয়োগে পর্তুগাল হইতে দলে দলে গোয়াতে সৈন্য আনা হইয়াছে। দু একটি রেজিমেণ্ট ভিন্ন গোয়াতে যত পর্তুগীজ সৈন্য আছে বেশির ভাগই দুই বছরের জন্য কনস্ক্রিপটেড হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে

ফাইটিং (যাহার সঙ্গে তুলনীয় নৃশংস ক্রীড়ামোদ আধুনিক কালে পাওয়া শক্ত) নাই; বহু পূর্বে বিগত শতকে রাজতন্ত্রের আমলে তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

গ্রাম্য চাষী আছে, জেলে আছে, কফি বাগিচার গ্রাম্য মজুর আছে; কলেজের ছাত্র আছে; মিস্ত্রী, মেকানিক, ছোট দোকানদার প্রভৃতি সবরকম পেশার লোক আছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু লোক আছে। এছাড়া অনেক বেকার যুবক কাজকর্মের অন্য কোনো পথ খুঁজিয়া না পাইয়া আপাতত দুই বছরের মিলিটারীর চাকুরী নিয়া সৈন্য হিসাবে গোয়াতে আসিয়াছে। অধিকাংশেরই দেশ ছাড়ার আগে গোয়া সম্পর্কে বা সালাজারের সাধের পর্তুগীজ ভারত সাম্রাজ্য—'ইন্দিয়া পর্তুগেজা' সম্পর্কে কোনো বাস্তব ধারণা ছিল না। ইহাদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানে, তাহারা স্কুল পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়া আসিয়াছে, ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের যে সাম্রাজ্য আছে তাহার কেন্দ্র বা মধ্যমণি গোয়া। পর্তুগীজ শিক্ষিত অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনায় গোয়ার সঙ্গে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের ঐতিহ্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে। গোয়া তাহাদের কাছে, আধুনিক কালের ঐতিহাসিক উপক্রমণিকায় পর্তুগাল যে সময় ইউরোপের অগ্রদূত হিসাবে অজানা সাগর-মহাসাগর পারে পাড়ি দিয়া সারা পৃথিবীকে ইউরোপের কাছে খুলিয়া ধরিয়েছিল—প্রিন্স হেনরী দি নেভিগেটর, কাব্রাল, ভাস্কো দা-গামা-র সময়কার সেই 'এজ অফ ডিসকভারিজ', বা মহা-পৃথিবী আবিষ্কারের যুগের স্মৃতিচিহ্ন। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্ন বা প্রতীক। একথা বলাই বাহুল্য, সালাজারের আমলে পর্তুগীজ জাতির মনকে যতটা পারা যায় একান্তভাবে জাতীয় গৌরবের সেই অতীত স্মৃতির দিকে স্থির নিবদ্ধ করিয়া রাখার চেষ্টা ব্যাপকভাবে চলিয়াছে। স্কুল পাঠ্য বা কলেজ পাঠ্য ইতিহাসের বইয়ে সেই অতীত ইতিহাসের কথা খুব ফলাওভাবে বর্ণনা করিয়া লেখা হয়।* সেই হিসাবে সৈন্যদের অনেকের মনেই গোয়াতে আসার আগে 'সুবর্ণ ভূমি' গোয়ার ('golden Goa' বা 'Goa aurea') সমৃদ্ধি বা জাঁকজমক সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট অথচ অতিরঞ্জিত কাল্পনিক ধারণা থাকিয়া গিয়াছিল। তাহাদের সেই ধারণায় প্রথম ধাক্কা লাগে গোয়ায় আসিয়া। সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ছাত্র সম্প্রদায়ের লোক হইলে তো কথাই নাই, তাহাদের অনেকেই আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নয় বা তাহাদের মন ডাঃ সালাজারের 'Estado Novo' (নয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা!) ও তাঁহার মধ্যযুগীয় আদর্শ ও ভাবধারার প্রভাবে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। এইরূপ শিক্ষিত সৈনিকদের অনেককেই নিজেদের মধ্যে বা কখনো-সখনো আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সালাজার গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে মত প্রকাশ করিতেও শুনিয়াছি। অবশ্য অনেককে আবার গোয়ার জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে বা গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেও যে শুনি নাই তাহা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যেও নিতান্ত এক আধজন ছিল আমাদের প্রতি বা গোয়ার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের মত বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেও কখনো দেখি নাই। তাহারাও অনেক সময় সুযোগ পাইলে আমাদের সাহায্য করিয়াছে।

---

* পর্তুগালে বা গোয়াতে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বা যে কোনো স্কুলপাঠ্য বই সরকারী শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন ও কড়া সেন্সরশিপের ভিতর দিয়া পাশ করানো ছাড়া ছাপাইতে বা স্কুল-কলেজে পড়াইতে দেওয়া হয় না। সুতরাং গোয়া সম্পর্কে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের মনেই এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব কি সহজেই অনুমেয়।

আমাদের ব্যারাকের সামনের দিকে যাহারা পাহারায় থাকিত, আগেই বলিয়াছি তাহারা আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত ভাব দেখাইত। কিন্তু সেই একই লোক আবার ব্যারাকের পিছনের দিকে পাহারা দিতে আসিলে অল্প সময়ের ভিতরেই আমাদের সঙ্গে আসিয়া অযাচিতভাবে ভাব করিতে চাহিত, কথাবার্তা বলিতে চাহিত এবং আমরা চাহিলে তাহাদের সাধ্যমতন আমাদের সাহায্য করিত। এই সময়েই আমরা আংগোলা ও মোজাম্বিক হইতে আনীত নিগ্রো সৈনিকদের সংস্পর্শেও আসি। 'আল্‌তিন্যো'-তে নিয়ম ছিল একদিন গোরা সৈন্যেরা ব্যারাক পাহারা দিবে, পরের দিন নিগ্রো সৈন্যেরা পাহারা দিবে। নিগ্রোরা সামূহিকভাবে ধরিলে গোয়ার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি সহানুভূতিশীল ছিল। তাহাদের উপর 'পিদে' ও সিকিউরিটি পুলিসের কড়া নজর থাকিত, তাহারাও সেজন্য ভয়ে ভয়ে থাকিত একটু বেশি। ফলে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বা আমাদের কাছাকাছি আসিতে তাহারা একটু দ্বিধাবোধ করিত। পর্তুগীজ ইস্ট বা ওয়েস্ট আফ্রিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র এলাকার মতো বা আফ্রিকার অন্যান্য ইংরেজ এলাকার মতো, সাদা কালোর বর্ণবৈষম্য নাই। কিন্তু তাহা হইলেও পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকদের শোষণ ও অত্যাচার সেখানে মোটেই কম নয়; বরং বেশি। পর্তুগীজ এলাকার আফ্রিকানরা সাধারণত অত্যন্ত দরিদ্র ও অনগ্রসর। তাহার সুযোগে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকেরা যেভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করে, তাহাতে সাধারণ নিগ্রোদের অধিকাংশের মনে সব সময় ভয় ও সাদা চামড়ার লোকেদের সম্পর্কে নিজেদের 'ইনফিরিয়রিটি'-র ভাবটাই প্রবল থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদেরকে দিয়া গোয়ার সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালানো বা অন্যভাবে অত্যাচার করানো কোনো সময় সম্ভবপর হয় নাই। বার বার তাহারা সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালাইতে অস্বীকার করিয়াছে। পর্তুগীজ গোরা সৈন্যরাও কয়েকটি ক্ষেত্রে যে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালাইতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাও আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি।

'আল্‌তিন্যো'-তে আসার প্রথম দিনেই পর্তুগীজ একজন সৈন্যের একটি ভারতীয় সত্যাগ্রহী ছেলের প্রতি অযাচিত মমত্বপূর্ণ ব্যবহারে কিছুটা আশ্চর্য হই। কুয়ার্তেল হইতে আমাদের সঙ্গে গজেন্দ্রবাবুরাও নামে একেবারে একটি বাচ্চা তেলেগু ছেলেও আসিয়া আমাদের সেলে ঢুকিয়াছিল। মাদ্রাজে ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমের একটি অন্ধ্র গ্রামে তাহার বাড়ি। সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ পরিবারের একমাত্র ছেলে; লেখাপড়ায় বেশ ভালো। অল্প অল্প ইংরাজী ও হিন্দী জানে, তেলেগু-তামিল দুইই সে জানে, সত্যাগ্রহ করিতে বাড়ি হইতে পালাইয়া বোম্বে হইতে স্টীমারে করিয়া পঞ্জিম আসিয়া পেঁছায় এবং সেখানে কিছু স্কুলের ছেলেপিলে ভলান্টিয়ার যোগাড় করিয়া সত্যাগ্রহ করে। স্থলপথে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে আসিলে পুলিস হয়ত মারধোর করিয়া তাহাকে এক দিনেই বর্ডার পার করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিত। কিন্তু গোয়ার ভিতরে আসিয়া একসঙ্গে কয়েকটি স্কুলে ও গ্রামে ঘুরিয়া বালখিল্য-বাহিনী গড়িয়া সত্যাগ্রহ সংগঠন করায় 'ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস' এবং ইন্সপেক্টর মন্তেইরো তাহাকে সহজে ছাড়িতে চায় নাই। 'আল্‌তিন্যো' জেলে ঐটুক একটি বাচ্চা ছেলে সত্যাগ্রহী আসিতে দেখিয়া আমাদের প্রহরীরা খুব কৌতুক বোধ করিতেছিল। খানিকবাদে দেখি, একজন পর্তুগীজ সৈনিক আমাদের সেলের পিছনের দিকের জানালা খুলিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। আমাদের সেলের বিষ্ণু ঘনশ্যাম কামাথ গ্রেপ্তারের আগে গোয়াতে পুলিস কনস্টেবল ছিল। দাদরা নগর হাভেলীর

হাঙ্গামার সময় সে দাদরা থানায় কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্ত ছিল। দাদরায় গণ-অভ্যুত্থানের পথে পর্তুগীজ শাসনের উচ্ছেদের পর সে বোম্বাই হইয়া গোয়াতে চলিয়া আসে। গোয়াতে আসার পর মন্তেইরোর তাহার উপর সন্দেহ হয়, ইহাকে ভারতীয় পুলিস অত সহজে আসিতে দিল কেন? বলাই বাহুল্য, সেই সন্দেহক্রমে কামাথ বেচারীকে জেলে ঢুকিতে হয়। কামাথ আমাদের কিছু আগে 'আল্‌তিন্যো' জেলে বদলী হইয়া আসে। তাহাকে এই পর্তুগীজ সৈন্যটি তাই আগে হইতেই চিনিত। স্টীল হেলমেট পরা, স্টেন গান হাতে রুক্ষ চেহারার এই সৈন্যটিকে ওভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতে দেখিয়া আমি যে খুব আশ্বস্ত বোধ করিতেছিলাম তাহা নয়। একটু পরে সে ইশারায় কামাথকে জানালায় ডাকিল। কামাথ তাহার কাছে গেলে পর আঙ্গুল দিয়া বাবুরাওকে দেখাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—'ও ছেলেটি কে? ও কি তোমাদের মত সত্যাগ্রহী? ইন্দিয়ানো না গোয়ান? অতটুকু ছেলে জেলে আসিয়াছে কেন? উহাকে ছাড়িয়া দিল না কেন?' কামাথ বলিল—'ও ইন্দিয়ানো, সত্যাগ্রহী। তবে উহাকে ছাড়িয়া দিল না কেন, সে কথা আমি কি বলিব? আজেন্ত মন্তেইরোকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।' সে তাহার উত্তরে কিছু বলিতে পারিল না—খালি বলিতে থাকিল—'আহা হা! Ai de mim! Ai de mim! অত ছোট ছেলে, শিশু menino, Creanca, ওকে কেন জেলে আনিল, ওর বাবা মা হয়ত কত ভাবিতেছে?' তারপর সে কামাথকে দিয়া বাবুরাওকে জানালার কাছে ডাকিয়া কামাথকে বলিল—'উহাকে বলো এখানে ওর কোনো ভয় নাই। এখানে খুব খাকদাক আর ঘুমাক, তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে।'

আমি তখনও পর্তুগীজ ভাষার কথাবার্তা বুঝিতাম না। কামাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলাম মিগুয়েল (পরে জানিয়াছিলাম সৈনিকটির নাম অর্লান্দো মিগুয়েল পেরেইরা) কি বলিতেছিল, পর্তুগীজদের সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণায় কিছুটা নূতন আলোকপাত হইল। কামাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পর্তুগীজ মিলিটারী সেপাইরা লোক কেমন? কামাথ বলিল—"বাবুজী, পর্তুগীজরা, নিগ্রোরা সকলেই মানুষ হিসাবে খুবই ভালো, কিন্তু পুলিস সামনে থাকিলে উহারা দূরে দূরে থাকে। আমরা জেলের কয়েদী কিংবা রাজনৈতিক আসামী বলিয়া আমাদের উপর উহাদের কোনো রাগ বা বিদ্বেষ নাই। আপনি এখানে ক'দিন থাকুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন ইহারা কত রকমে আমাদের সাহায্য করে। অনেকে দেখিবেন আপনার কাছে আসিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে।" সত্যই কামাথ আমার কাছে অত্যুক্তি করে নাই। আল্‌তিন্যো জেলে পাঁচ ছয় মাস এবং তাহার পর আগুয়াদা দুর্গে এক বছরের কিছু বেশি, অর্থাৎ মোট দেড় বছর সময়ের ভিতর পর্তুগীজ সাধারণ সৈন্য এবং সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ আমার হইয়াছে, তাহাতে ভিন্ন কোনো রকম ধারণা মনে পোষণ করার কারণ হয় নাই।

পর্তুগীজরা এককালে সমুদ্র যাত্রা ও নাবিক-বিজ্ঞানে কৌশলী ও অভিজ্ঞ জাতি বলিয়া পরিচিত থাকিলেও বর্তমানে তাহারা প্রধানত কৃষিজীবী জাতি। পর্তুগালে আজ পর্যন্ত শিল্প বাণিজ্যের সেরূপ প্রসার হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পর্তুগাল নামে স্বাধীন হইলেও কার্যত একটি বৃটিশ উপনিবেশের পর্যায়ে ছিল। লেনিন তাঁর 'ইম্পিরিয়ালিজম' বইয়ে ১৯১৬ সালে সেই হিসাবেই পর্তুগালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তারপর হইতে এই চল্লিশ বছরে পৃথিবীর বহু পরিবর্তন হইলেও পর্তুগালের আভ্যন্তরীণ

আর্থিক বা সামাজিক অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নাই—আজও তাই পর্তুগাল প্রধানত কৃষিজীবী জাতি হিসাবে থাকিয়া গিয়াছে। পর্তুগালে ব্যবসা বা প্রধান শিল্প হিসাবে আঙ্গুর চাষ, আঙ্গুর হইতে মদ চোলাই, অলিভ অয়েল পেশাই, কর্ক গাছের ছাল হইতে কর্ক তৈরির ব্যবসা আর সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া টিনের কৌটায় মাছ ভর্তি করিয়া চালান দেওয়ার ব্যবসা—এই চারটি সবচেয়ে প্রধান ব্যবসা। গ্রাম্য জীবন ও কৃষির সঙ্গে বা চাষবাসের সঙ্গে এ-কয়টি ব্যবসাই খুব বেশিরকম জড়িত। আজও পর্তুগালকে প্রধানত কৃষিজীবী দেশ বলিলে সেইজন্য মোটেই ভুল বলা হয় না। এই গ্রাম্য কৃষিনির্ভর সমাজের রক্ষণশীলতাই পর্তুগালে ডাঃ সালাজারের ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় প্রভাব। ইহার ফলে, গোয়ায় আনীত সৈন্যদলের ভিতর কৃষক, বা গ্রামের অলিভ প্রেসের (জলপাইয়ের তেল পিষিয়া বাহির করার ঘানি) শ্রমিক, কর্ক বাগিচার শ্রমিক বা সাধারণ মাছধরা জেলে বা মৎস্য-জীবীদের সংখ্যা বেশি। কোনো দেশেই এই শ্রেণীর সাধারণ লোক খারাপ হয় না। মনের দিক দিয়া সহজ সরল হয়। তাহাদের মনের ভিতর সহজ মানবিকতাবোধের কোনো সময় অপ্রতুল হয় না। শিক্ষার প্রসার পর্তুগালে আজও নিতান্ত কম। যদিও পর্তুগীজ সরকার কাগজেপত্রে পর্তুগালে শতকরা ৬০ জনের মতো লোক লিখিতে পড়িতে জানে বলিয়া দাবী করেন, গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রসার কতটুকু সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে। আগুয়াদা দুর্গে থাকিতে পর্তুগীজ সরকারের তরফ হইতে সাধারণ সৈনিকদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অভিযান শুরু হইতে দেখিয়াছি। অনেক সৈন্য আমাদের কাছে আসিয়া ইংরাজী শেখার প্রাইমার এবং পর্তুগীজ স্কুলপাঠ্য পুস্তক চাহিয়া নিয়াছে। মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট হইতে তাহাদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্লেট পেন্সিল কেনা হইত ইহাও দেখিয়াছি। শিক্ষার এই অনগ্রসরতার জন্য জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনার গভীরতা ও প্রসার দুই-ই অত্যন্ত কম। সৈনিকদের মধ্যে বেশির ভাগ লোককেই দেখিয়াছি রাজনীতি নিরপেক্ষ। একটু বেশি শিক্ষিত যারা, কলেজ পর্যন্ত হয়ত যায় নাই কিন্তু Lyceum বা হাই স্কুলের লেখাপড়া কিছুদূর পর্যন্ত শিখিয়াছে, খবরের কাগজ পড়ে, কিছুটা বাহিরের দুনিয়ার খবর রাখে, সৈন্যদের ভিতর এই রকম লোকেদের ছাড়া সচরাচর রাজনীতির আলোচনা কাহাকেও করিতে দেখি নাই। আগুয়াদা দুর্গে থাকিতে ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে একবার ডাঃ মার্তিনস এবং আমরা কয়জন চোখ পরীক্ষার জন্য পাঞ্জিমে আসি। প্রিজন ভ্যানে আমাদের সঙ্গে সশস্ত্র মিলিটারী পাহারা। গাড়ির ভিতরে আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত সৈন্য প্রহরী হিসাবে আসে, তাহাদের একজন খুবই অল্প বয়সী ছেলে একুশ-বাইশের চেয়ে বেশি কিছুতেই হইবে না—কথায় কথায় সাহস করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"আর সিনর, আমাদের কথা বলেন কেন? আপনারা এখানে এইসব হৈচৈ করিতেছেন আর আমরা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া এখানে আসিয়া বেঘোরে মরিতেছি।" মার্তিনস উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি মনে কর আমরা শখ করিয়া জেলে আসিয়াছি।" ছেলেটি তাহার উত্তর দিল—"আপনারা পর্তুগালের বিরুদ্ধে বলিয়াই তো পুলিস আপনাদের ধরিয়া আনিয়াছে, এমনিতে তো আনে নাই।" মার্তিনস—"তোমাক কে বলিল আমরা পর্তুগালের বিরুদ্ধে? আমরা পর্তুগাল এবং পর্তুগীজদের সম্মান করি। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের নিজেদের দেশের লোকের বিরুদ্ধে থাকিব বা নিজেদের দেশ হইতে

আলাদা থাকিব।" ছেলেটি উত্তর দিল—"ও বুঝিয়াছি আপনারা ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের পক্ষে।" ডাঃ মার্তিনস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কতদূর লেখাপড়া করিয়াছ?" "লাইসিয়ুমের প্রথম তিন ফর্ম পর্যন্ত।" "আচ্ছা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি এই সিনরের দিকে (আমাকে দেখাইয়া) চাহিয়া ভালো করিয়া দেখো; এই সিনর একজন ইন্দিয়ানো। তারপর আমার দিকে তাকাইয়া দেখো। তুমি তো তোমার দেশের লোক, তোমার দেশের লোকের কথা জানো। তোমার দেশের লোকের কেমন চেহারা, কেমন কথাবার্তা তুমি সবই জানো। এখন বলতো আমি এই সিনরের কাছাকাছি লোক, না তোমার দেশের কাছাকাছি?" ছেলেটি সরল মনে উত্তর দিল "তা কেন হইবে, আপনারা দুজনেই যে এক দেশের লোক!" মার্তিনস—"কিন্তু সাবধান! একথা যদি 'পিদে'-র লোকেরা তোমার মুখে শুনিতে পায়, তাহা হইলে তোমাকে জেলে আসিতে হইবে। দেখো, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই ঝগড়া নাই, কিন্তু আমরা যদি আমাদের দেশ ইণ্ডিয়া-র সঙ্গে থাকিতে চাই, তাহা হইলেই তোমাদের গভর্নমেণ্ট জেলে পুরিবে।" ছেলেটির মাথা তখন প্রায় গুলাইয়া যাবার উপক্রম। সে বলিল, "কি জানি সিনর, এসব পলিটিকসের কথা আমি বুঝি না। আমি 'পলিতিকো' (রাজনৈতিক নেতা বা রাজনীতির লোক) নই; এখানকার গণ্ডগোল মিটিয়া যাক, আপনারাও বাড়ি ফিরিয়া যান, আমরাও দেশে ফিরিয়া যাই এই আমি চাই।"

একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, এই মনোভাবকে পর্তুগীজ সাধারণ সৈনিকদের বেশির ভাগের 'টিপিকাল' মনোভাব বলা চলে। সৈনিকদের মধ্যে যাহারা কিছুটা রাজনীতি সচেতন, তাহাদের দুই ভাগে ভাগ করা চলে। তাহারা হয় নিজেদের গভর্নমেণ্টের উপর বিরক্ত এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপদ্ধতির সমর্থক। ডাঃ সালাজারের গভর্নমেণ্টকে তারা পছন্দ করে না। বৃটেন এবং আমেরিকা তাহাদের আদর্শ, নিজেদের দেশকে তারা তুলনায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ বলিয়া মনে করে। গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তাহারা মনে মনে সহানুভূতিসম্পন্ন। এছাড়া অন্যেরা সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী মনোভাবসম্পন্ন হইলেও রাজনীতির খুব বেশি খবর রাখে না। কিন্তু এটুকু জানে যে, গোয়া পাঁচ শ বছর ধরিয়া পর্তুগালের দখলে আছে এবং ভারতবর্ষ এখন অন্যায়ভাবে জোর করিয়া তাহাদের হাত হইতে গোয়া কাড়িয়া নিতে চাহিতেছে। বলা বাহুল্য, গোয়ার ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দেশের গভর্নমেণ্টের সমর্থক এবং সত্যাগ্রহী আন্দোলনকে পর্তুগাল বিরোধী আন্দোলন বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাজনীতির খবর রাখুক বা না রাখুক, বা আমাদের সম্পর্কে রাজনৈতিক দিক দিয়া তাহাদের মনোভাব যাই হোক, আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সৈনিকদের কাছ হইতেও অযাচিত বন্ধুত্ব ও সাহায্য পাইয়াছি। ইহারাই দরকার মতন আল্‌তিন্যো ও আগুয়াদা জেলের এক সেল হইতে অন্য সেলে বন্দীদের চোরাই চিঠি চালানে সাহায্য করিয়াছে, এক সেল হইতে অন্য সেলে লুকাইয়া বই দিয়া আসিয়াছে, বাহির হইতে আমাদের জন্য খবরের কাগজ লুকাইয়া আনিয়া দিয়াছে, অনেক সময় গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসী বন্দীদের আত্মীয়স্বজনকে প্রয়োজনীয় খবর দিয়া আসিয়াছে। বাহিরের রেডিয়োর খবর পাওয়ার আমাদের প্রধান উৎস ছিল এই পর্তুগীজ সৈনিকেরা।

॥ ৩০ ॥

পনরই আগস্ট

'আল্‌তিন্যো' জেলে থাকার সময়েই আমরা ১৫ই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহের অভিযান এবং বান্দা ও কাস্‌ল রক্‌ সীমান্তে ভয়াবহ গুলীকাণ্ডের খবর পাই। ১৫ই আগস্টের হাঙ্গামার খবর আমাদের কাছে প্রথম পৌঁছায় গোপনে একজন পর্তুগীজ সৈনিকের মুখে। ১৫ই আগস্ট তারিখে যে গোয়া সত্যাগ্রহকে গণ-সত্যাগ্রহের আকার দেওয়ার আয়োজন হইতেছিল, তাহা আমরা আমাদের গোয়াতে ঢোকার পূর্বেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম। ১৫ই আগস্ট খালি বাছাই করা সত্যাগ্রহীদেরই গোয়া পাঠান হইবে না, ভারত-গোয়া সীমান্তের বিভিন্ন দিক হইতে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গোয়ায় প্রবেশের জন্য ভারতীয় জনতাকে আহ্বান জানানো হইবে—ইহা গোয়া-বিমোচন সমিতির পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগে হইতেই স্থির করা ছিল। গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ সরকারও সে খবর রাখিতেন এবং তাহার জন্য আগে হইতেই সব রকমে তোড়জোড় করিতেছিলেন। পর্তুগীজ সরকারের তোড়জোড় মানে গোয়ার ভিতরে ব্যাপক খানাতল্লাসী চালানো এবং ধরপাকড় ও মারধোর করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রত্যাশিত ধরপাকড়ের জন্যই কুয়ার্তেল খালি করিয়া আমাদের 'আল্‌তিন্যো'-তে বদলি করা হয়, যাহাতে নূতন যাহারা বন্দী হইয়া আসিবে তাহাদের জন্য কুয়ার্তেলের হাজতে জায়গা করা যায়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ হইতেই নির্বিচারে গোয়ার প্রত্যেকটি অঞ্চল হইতে দলে দলে সন্দেহভাজন লোকেদের গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া কুয়ার্তেলে জমা করা হইতে থাকে; সুতরাং গোয়ার ভিতরে জেলে বসিয়াও আমাদের মনে ১৫ই আগস্ট তারিখ আসিলে কি হয় না-হয়, সে সম্পর্কে প্রত্যাশা ও জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। এ সম্পর্কে পর্তুগীজ সরকারের দুশ্চিন্তা একটিই মাত্র ছিল—গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীরা ভারত হইতে সংগঠিত এই সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় নাই, বরঞ্চ সর্বপ্রকারে বিরোধিতা করিয়াছে সারা পৃথিবীর লোককে সেটা বোঝানো। ১৫ই আগস্ট গোয়ার ভিতরেও হয়ত বড় রকমের একটা সত্যাগ্রহের বা পর্তুগীজ-বিরোধী রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা হইবে, এটা পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ মোটামুটি ধরিয়া নিয়াছিলেন এবং তাহা যাহাতে কোনো মতে না হয় সে সম্পর্কে ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি তাঁহারা রাখেন নাই। শুধু তাই নয়, লিস্‌বন হইতে গোয়া কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশ ছিল যে, গোয়ার ভিতরে কোনো সত্যাগ্রহ বা পর্তুগীজ-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুষ্ঠান না হইতে দিলেই খালি চলিবে না। বিদেশের, বিশেষ করিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার সাংবাদিকদের সেদিন আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেখাইতে হইবে যে, গোয়ার ভিতরে পর্তুগালের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিম্বা পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে কোনোই আন্দোলন নাই। আন্দোলন ও বিক্ষোভ যা কিছু আছে, তাহা সবই গোয়া সীমান্তের ওপারে ভারতবর্ষে; এবং সে সবই ভারত সরকারের প্রচার ও প্ররোচনার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেকাজেই গোয়ার ভিতরে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ও পরিমাণ ১লা-২রা আগস্ট হইতে হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতে থাকে। একদিকে মন্তেইরো আর অন্যদিকে 'পিদে'র অলিভেইরা পাল্লা দিয়া কে কত গ্রেপ্তার করিতে পারে তার প্রতিযোগিতায় নামে। শত্রুর শেষ রাখিলে চলিবে না। কুয়ার্তেল হইতে আমরা 'আল্‌তিন্যো'-তে বদ্‌লি হইয়া আসি ৩রা আগস্ট। কিন্তু তাহার বেশ কয়েক দিন আগেই

আমি কুয়ার্তেলের এক নম্বর হাজতে থাকিতেই গ্রেপ্তারের হিড়িকটা কি ধরনের হইবে তাহার একটা আভাস পাইয়া আসি।

আমাদের বদ্‌লির দিন তিন চারেক আগে হঠাৎ একদিন বিকাল বেলায় আমাদের ঘরে আরো সাতজন বন্দীকে আনিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইল (সেই ছোট ঘরটিতে আমরা তখন ২৯ জন আছি; ঘরের বর্ণনা তো আগেই দিয়াছি)। নবাগত বন্দীরা একটু সাব্যস্ত হইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসার পর জিজ্ঞাসা-বাদে বোঝা গেল, তাঁহারা সকলেই নূতন গ্রেপ্তার হওয়া রাজনৈতিক আসামী, ১৫ই আগস্টের সত্যাগ্রহ উপলক্ষে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সাতজনেই সাঁক্‌লি' তালুকের লোক। তার মধ্যে একজন আছেন পলাতক বন্দী শিবাজী দেশাই-এর বাবা; তাঁহার বয়েস ষাটের উপর। ভদ্রলোক বহুদিন আগে ভূতপূর্ব বোম্বে-বরোদা সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে নিযুক্ত স্টেশন মাস্টার ছিলেন। পেন্সন নেওয়ার পর হইতে গোয়ার ভিতর সাঁক্‌লি'তে দেশের বাড়িতে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার অপরাধ দুই রকমের; প্রথমত তিনি এককালে (ইংরেজ আমলে হইলেও) ভারত গভর্নমেণ্টের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন। দ্বিতীয়ত তাঁর ছেলে শিবাজী রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার হইয়া প্রায় ছয় মাস হইল 'আল্‌তিন্যো' জেলের প্রাচীর টপ্‌কাইয়া ভারতে পলাতক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে কোনোকালে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কে জানে? সামনে পনরই আগস্ট; যদি ভদ্রলোক কোনোক্রমে নিজের পলাতক পুত্রের প্রভাবে পড়িয়া যান? ফলে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তাঁহাকে হাজতে ঢুকিতে হইয়াছে। ভদ্রলোক মোটেই দমেন নাই। হাসিয়া আমায় বলিলেন—"এতদিন দেশের জন্য কিছু করি নাই, খালি চাকুরী করিয়াছি, এবার বোধহয় দেশের ঋণ শোধ করার পালা আসিল। ঈশ্বর যখন অদৃষ্টে পর্তুগীজ সরকারের ভাত মাপিয়া রাখিয়াছেন, কিছুদিন এখানে থাকিতেই হইবে, উপায় নাই; তার উপরে শিবাজী আমার ছেলে। উহারা আমাকে ছাড়িবে কেন?" মাধো রাও সাঁক্‌লি'করের বিরুদ্ধে অন্য কোনো অভিযোগ নাই: নিতান্ত নিরীহ গরীব কেরানী; একটি কাজু বাদামের কারখানায় কাজ করেন। তাঁর অপরাধ, তিনি স্কুলে গোয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ পুরুষোত্তম কাকোড়করের ভাই শ্রীরাম কাকোড়করের সহপাঠী ছিলেন এবং তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় ভারত গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সুতরাং মাধো রাওয়ের পক্ষে পর্তুগীজ পুলিসের চোখে সন্দেহভাজন না হইয়া উপায় কি? কৃষ্ণা কাঁসার—সাঁক্‌লি' বাজারে পিতল কাঁসার বাসন বানায়। কিছুদিন আগে সে বোম্বে গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল? তাহাকে ধরিয়া আনো! কে জানে বোম্বে গিয়া কাহার কাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছে? যদি পনরই আগস্ট সে কিছু করিয়া বসে? সাঁক্‌লি'র নেউগী পরিবার মিঠাইয়ের এবং স্টেশনারীর ব্যবসা করে। তাহাদের বাড়িতে একটা নূতন অল্‌ ওয়েভ রেডিও কেনা হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে তাহাদের সেই রেডিও হইতে অল্‌ ইণ্ডিয়া রেডিও-র গানের আওয়াজ শোনা যায়। কে জানে তাহারা লুকাইয়া মৃদু আওয়াজে 'আজাদ গোয়া রেডিও'-র* খবর শোনে কিনা? তাহার উপরে নেউগীদের বাড়ি

* 'আজাদ গোয়া রেডিও' গোয়ার ভিতরে গোয়া জাতীয়তাবাদের গোপন বেতার প্রচার কেন্দ্রের নাম। পর্তুগীজ পুলিশ এখনও এই কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই—যদিও মধ্যে মধ্যে তাহারা এজন্য ভারতকে দায়ী করে; কিন্তু গোয়ার ভিতরকার সকল খবর এত তাড়াতাড়ি এই রেডিও মারফৎ প্রচারিত হইত যে, ইহা গোয়ার ভিতরে অবস্থিত নয় সে কথা

খানা-তল্লাসী করিয়া পুণার "কেশরী" কাগজের ৩।৪ বছর পুরানো একটি কপি পাওয়া গিয়াছে। পুণার "কেশরী" কাগজের অফিসেই না 'গোয়া বিমোচন সমিতি'-র অফিস? নেউগীদের বাপ বেটা চারজনকেই আটকাইয়া রাখো! আন্দোলনের মুখে হঠাৎ রেডিও কেনা; বাড়িতে পুরাতন "কেশরী" রাখা (হোক না তাহা তিন চার বছরের পুরাতন একটি সংখ্যা) এ সবই ঘোরতর সন্দেহজনক। পর্তুগীজ আইনে এইসব সাক্ষ্য প্রমাণের ভিতর দিয়া অপরাধ-প্রবণতার মানসিক ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় (Pre-disposi cao criminale—বা criminal pre-disposition)। এরূপ অবস্থায় সন্দেহভাজন লোকেদের বাহিরে ছাড়িয়া রাখিয়া অপরাধ করিতে দেওয়ার চেয়ে জেলে আটকাইয়া রাখিয়া যাহাতে তাহারা কোনো অপরাধই না করিতে পারে সে ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। এইভাবে এ সময় দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসে। সাঁক্‌লি'র উপর পর্তুগীজ পুলিসের কড়া নজর পড়ার বড় কারণ—সাঁক্‌লি' অঞ্চলেই গোয়া মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রখ্যাত নেতা পুরুষোত্তম কাকোড়করের বাড়ি। তাছাড়া, সাঁক্‌লি' 'রানে' বংশের একটা প্রধান কেন্দ্র এবং ১৯১৩ সালের 'রানে'-দের বিদ্রোহে সাঁকলি'র অনেক 'রানে'-ই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও সাঁক্‌লি'র 'রানে'-দের মধ্যে এসময় যিনি প্রধান ছিলেন তিনি রাজভক্ত প্রজা হিসাবে পর্তুগালের প্রতি আনুগত্য জানান, তাহা হইলেও ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী এই সাঁক্‌লি' পরগণার রাজদ্রোহের একটা ঐতিহ্য আছে। সাঁক্‌লি' ভারত সীমান্ত হইতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। পর্তুগীজ পুলিসের সন্দেহ, সাঁক্‌লি' ভারত হইতে গোয়ার ভিতরকার সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ও খবরাখবর দেওয়া-নেওয়ার গোপন পথ। সুতরাং সাঁকলি'র উপর পুলিসের নজর খুবই বেশি; ধর-পাকড়ের সংখ্যাও সেখানে সেই অনুপাতে বেশি। তবে খালি সাঁক্‌লি' বলিয়া নয়, গোয়ার ছোট বড় প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে এই সময় ঢালাওভাবে ক্ষীণতম সন্দেহের উপর বা গোয়েন্দাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলিতে থাকে। আর পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইলেই মার যে খাইতেই হইবে তাহাও অবধারিত। সাঁক্‌লি'র যে সাতজনের কথা বলিলাম তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রীযুত দেশাই ভিন্ন সকলেই পুলিসের হাতে বেদম ও বেধড়ক্ রকম মার খাইয়াছেন। অথচ কেহই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই। ছাড়া পাইতেও ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রায় এক বছরের মত সময় লাগিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে হাজতের ভিতরে তক্তা-পিটুনী খাইতে হইয়াছে।

কুয়ার্তেলে থাকিতে এইসব গ্রেপ্তার ও ধর-পাকড়ের ভিতর দিয়া এবং অন্যদিকে সাঁজোয়া-পুলিস-বাহিনী, মিলিটারী বাহিনী, বড় বড় পুলিস অফিসারের অবিরাম আনাগোনা, পরামর্শ—এসব দেখিয়া আসন্ন পনরই আগস্ট সম্পর্কে পর্তুগীজ প্রস্তুতির ধরন-ধারণ কিছুটা টের পাইতেছিলাম। নবাগত বন্দীদের মুখেও কিছু কিছু খবর পাইতাম। বলা বাহুল্য, পর্তুগীজ পুলিসের মনে বা সাধারণ গোয়াবাসীদের মনে এবং এইসব নবাগত রাজনৈতিক বন্দীদের মনেও, পনরই আগস্ট ভারত হইতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে খুব বড় রকমের একটা কিছু করা হইবে এই ধরনের একটা প্রত্যাশা ছিল। ভারত গভর্নমেণ্ট যে নীতি হিসাবে ১৫ই আগস্টের প্রস্তাবিত গণ-সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা সমর্থন

কেহ বিশ্বাস করে না। গোয়া জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রামের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল এই 'আজাদ গোয়া বেতার প্রচার কেন্দ্র'।

করেন নাই গোয়ার সাধারণ লোক সে-কথা জানিতেন না। সুতরাং সেদিনকার ঘটনাবলী শুধুমাত্র নিরস্ত্র সত্যাগ্রহের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, গোয়ার ভিতরে কেহ সেরূপ ধারণা করেন নাই। সেইজন্য গোয়াতে সকলের মনেই—বন্দীদের তো কথাই নাই—পনরই আগস্টের প্রত্যাসন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে একটা উন্মুখ আগ্রহ ও কৌতূহলের ভাব প্রবল ছিল।

আমরা কুয়ার্তেল হইতে 'আল্‌তিন্যো'-র পাগ্‌লা গারদে বদ্‌লি হওয়ার পর হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য 'পনরই আগস্টে'র প্রস্তুতির সেই জমজমাট আবহাওয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি। তাহার কারণ সহজ; 'আল্‌তিন্যো' জেলে বাহির হইতে নিত্য নূতন রাজনৈতিক বন্দী গ্রেপ্তার হইয়া আসে না। কাজে কাজেই সেভাবে নিত্য নূতন বাহিরের খবর পাওয়াও সম্ভব হয় না। কিন্তু সেটা মাত্র অল্প কয়দিনের জন্য। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের ব্যারাকের খিড়্‌কীর জানলাগুলি দিয়া পর্তুগীজ সৈনিকদের মারফৎ আমরা রেডিও-র সমস্ত খবরই অল্প-বিস্তর পাইতে আরম্ভ করি। একটু অনিয়মিতভাবে হইলেও গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ ভাষার খবরের কাগজ পাইতেও আমাদের বেশী অসুবিধা হইত না। ভারতীয় কাগজ অবশ্য আমরা পাইতাম না। কারণ, গোয়ার ভিতরে কোনো ভারতীয় খবরের কাগজ তখন আর আসিতে দেওয়া হইত না; এখনও আসিতে দেওয়া হয় না। আমাদের 'আল্‌তিন্যো' জেলে আসার আগে হইতে যে সমস্ত বন্দী সেখানে ছিলেন তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই সেখানকার পর্তুগীজ সৈনিক প্রহরীদের ভাবসাব হইয়া গিয়াছিল। এইসব সৈনিকের মধ্যে যাহারা গোয়া মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহাদের সম্পর্কে তো কথাই নাই; যাহাদের সেরূপ কোনো রাজনৈতিক সহানুভূতি নাই তাহারাও নিছক বন্ধুত্বতা বা বন্দী বলিয়া আমাদের প্রতি মানসিক সহানুভূতির বশবর্তী হইয়া এসব ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করিতে দ্বিধা করিত না। দু' একটি ক্ষেত্রে এমনও দেখিয়াছি, কোনো সৈনিক হয়ত মনে করে যে, আমরা রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত; পর্তুগীজ শাসন হইতে গোয়াবাসীদের মুক্তির দাবী করা আদৌ সংগত নয়; কিন্তু এরূপ লোককে দিয়াও আমরা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সেলে বই, চিঠিপত্র, কাগজ এসব চালান দিয়াছি। অনেক সময় এরকম লোকও অযাচিত-ভাবে আসিয়া আমাদের বাহিরের খবর দিয়াছে। বাহিরের সঙ্গে খবর আদান প্রদান করার আরো কিছু উপায় ছিল; কিন্তু কিভাবে তাহা এখানে বর্ণনা না করাই সংগত।

পনেরোই আগস্ট ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর যে গুলী চলিয়াছে তাহা সেইদিন রাত্রেই একজন পর্তুগীজ সৈনিক আসিয়া আমাদের পার্শ্ববর্তী সেলের একজন বন্দীকে বলে। এই গুলী চালনার খবরে পর্তুগীজ সৈনিকরা খুব আশ্বস্ত হয় নাই। তাহাদের ধারণা হয়, এইভাবে নিরস্ত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালানোর ফলে ভারতবর্ষ এখন পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গোয়া আক্রমণ করিবে এবং তাহাদের সকলকে এখন নিরর্থক এই যুদ্ধে গিয়া মরিতে হইবে। কিন্তু প্রথম দিন গোয়ার ভিতরেও এই গুলীকাণ্ড সম্পর্কে সমস্ত খবর জানাজানি হয় নাই। গোয়া রেডিওতে এ-সম্পর্কে সামান্য একটু উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু যে-ভাবেই হোক, পর্তুগীজ সৈন্যদের মধ্যে খবরটি খুবই ছড়াইয়া পড়ে। পরের দিন সকালে ১৬ই আগস্ট দুইজন বিদেশী সাংবাদিক 'আল্‌তিন্যো' জেলে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন—তাঁহাদের একজন মার্কিন সাংবাদিক ডাঃ হোমার জ্যাক, অন্যজন মঁসিয়ে রেনে ব্রেহে। ইহার দুইদিন আগে ১৩ই

আগস্ট তারিখে সাত-আট জন বৃটিশ ও মার্কিন সাংবাদিক আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। সুতরাং আমরা জানিতাম যে, ১৫ই আগস্ট উপলক্ষে পর্তুগীজ তরফ হইতেও বিদেশী সাংবাদিকদের আনিয়া গোয়ার ভিতরে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে তাহা দেখানোর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহার আগের দিন দু-একজন গোয়াবাসী ও পর্তুগীজ সাংবাদিক আমাদের জেলে ঘুরিয়া যান। অবশ্য প্রত্যেক সময়েই সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংরাজী জানা একজন পর্তুগীজ গোয়েন্দা আজেন্ত্ (Agente = এজেন্ট বা ইন্‌স্পেক্টর) এবং পুলিস কমাণ্ডাণ্ট নিজে থাকিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও সেই ইংরাজী-জানা আজেন্তের সাময়িক অন্যমনস্কতার সুযোগে ডাঃ জ্যাক্ ও মঁসিয়ে ব্রেহে আমাদের সংক্ষেপে গত দিনের গুলী চলার খবরটুকু দিয়া যাইতে পারেন। অবশ্য তাঁহারা হতাহতের যে সংখ্যার কথা বলিয়াছিলেন তাহার সামান্য কিছু ইতরবিশেষ হইয়াছে। ১৬ই আগস্টের ভিতর গোয়ার ভিতরে যেসব অভিজ্ঞ সাংবাদিক ছিলেন, তাঁহারাও চেষ্টা করিয়া সমস্ত খবর জানিতে পারেন নাই। গোয়ার ভিতরে কোন রাজনৈতিক খবর সংগ্রহ করা— বিশেষ করিয়া সে সংবাদ যদি পর্তুগীজ-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংক্রান্ত হয়—খুব সহজ নয়। ১৫ই আগস্ট উপলক্ষে যেসব বিদেশী সাংবাদিক গোয়াতে যান, তাঁহাদের চোখে কোনো অসুবিধাজনক তথ্য যেন উদ্ঘাটিত না হইয়া যায়, সে সম্পর্কে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। শুধু তাই নয়, উপরেই একথা উল্লেখ করিয়াছি যে, গোয়ার ভিতরে, বিশেষ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে যে কোনো উত্তেজনা নাই বা সত্যাগ্রহের পিছনে গোয়াবাসীদের লেশমাত্র সমর্থন নাই, সেকথা পৃথিবীর কাছে প্রচার করার উদ্দেশ্যেও পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ এই সময় বিদেশী সাংবাদিকদের যাচিয়া গোয়াতে আমন্ত্রণ করেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই সময় সবেমাত্র চীন-রুশিয়া ঘুরিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। বৃটেন এবং আমেরিকার সাংবাদিকদের সকলের মনে সেই সময় ভারত সম্পর্কে খুব সম্প্রীতির ভাব ছিল না। তাছাড়া গোয়া সম্পর্কে সাধারণ ইউরোপীয়দের মনে (বোম্বাই বা পূর্ব আফ্রিকা প্রবাসী গোয়াবাসীদের দেখিয়া) একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, গোয়ার লোকেরা আধা-ইউরোপীয় দো-আঁশ্লা জাতের এবং তাহারা বেশীর ভাগই রোমান ক্যাথলিক। সুতরাং তাহাদের মনে ভারত সম্পর্কে কোনোপ্রকার স্বজাতীয়তাবোধ বা রাজনৈতিক আনুগত্যবোধ নাই।* আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগ বিদেশী সাংবাদিকদের মনে এই

---

*শুধু সাংবাদিকদের মধ্যেই নয় শিক্ষিত ইউরোপীয়দের মধ্যে, যাঁহারা গোয়া সম্পর্কে কিছু খবরাখবর রাখেন, অনেকের মনেই এই ধরণের ধারণা প্রবল ভাবে গাঁথিয়া আছে। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক অধ্যাপক টয়নবীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। টয়নবী তাঁর বিখ্যাত "Study of History"—গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে এক জায়গায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন (১৯৫১-৫২ সালে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেন) ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমে ফরাসী উপনিবেশগুলি এবং পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি সর্বশেষে ভারতের সঙ্গে মিলিত হইবে। পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি আদৌ ভারতের সঙ্গে মিলিত হইবে কিনা সে বিষয়েও তিনি খুবই সন্দিহান। তাঁহার ধারণা ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাবের দরুন এবং গোয়াতে দেশীয় গোয়া-বাসীদের সঙ্গে পর্তুগীজদের মেলামেশা—সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তত আগ্রহশীল নয়। টয়নবীর ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক ভাবে সফল হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার কারণ বলিয়া তিনি যাহা মনে করিয়াছেন, খুব জোর করিয়াই বলা চলে তাহার

ধরনের পূর্ব-ধারণা কাটানোর জন্য বা গোয়া সম্পর্কে—বিশেষ করিয়া গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের যে মুক্তিকামী আন্দোলন চলিতেছিল সে সম্পর্কে—তাঁহাদের সর্বরকমে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য কি করিতেছিলেন জানি না। কিন্তু নতুন দিল্লীতে বসিয়া পর্তুগীজ রাষ্ট্রদূত ডাঃ ভাস্কো গারীন‡ এই সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদের সংগে সকল প্রকারে মেলামেশা করিয়া গোয়া সত্যাগ্রহ সম্পর্কে পর্তুগীজ বক্তব্য ভালো করিয়া শুনাইয়া, শিখাইয়া-পড়াইয়া রাখিতেছিলেন। ফলে যে সমস্ত মার্কিন বা বৃটিশ সাংবাদিক এই সময় পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে গোয়াতে যান, দু' একজন ভিন্ন তাঁহাদের সকলের মনে এই ধারণাই কাজ করিতে দেখিয়াছি যে, গোয়ার জনসাধারণের কোনো ব্যাপক সমর্থন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পিছনে নাই; এই সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণভাবে না হোক প্রধানত ভারত হইতে প্ররোচিত ও সংগঠিত। এই সমস্ত সাংবাদিকদের নূতন দিল্লী এবং করাচী হইতে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের খরচায় গোয়াতে আনা হয়। গোয়ার ভিতরে তাঁহাদের ঘোরাফেরার ও যান-বাহনের বন্দোবস্ত সবকিছু সরকারী খরচে করা হয়। গাইড দোভাষী সবকিছু সরকারী। অবশ্য যে কোনো সাংবাদিক ইচ্ছা করিলে যেখানে খুশী সেখানে যাইতে পারিতেন—সে বিষয়ে কোনো বাধা নিষেধ ছিল না। কিন্তু গোয়ার মত অচেনা জায়গায় ভাষার অসুবিধা, পথ ঘাট না জানা থাকার অসুবিধা এত বেশী যে, সরকারী গাইড দোভাষী না থাকিলে মাত্র তিন দিনে—১৪ই হইতে ১৬ই আগস্টের ভিতর সর্বত্র যাওয়া বা সব বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। বোধহয় এক গ্রেট বৃটেনের "অবজার্ভার" কাগজের প্রতিনিধি ফিলিপ ডীন, যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ হোমার জ্যাক ও ফরাসী সাংবাদিক রেনে ব্রেহে ভিন্ন সরকারী রাস্তা ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে গোয়ার ভিতরে জনসাধারণের সত্যকার অবস্থা বা মনোভাব কি তাহা খোঁজ নিবার আগ্রহও খুব বেশী লোকের ছিল না।*

কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই। এখানে টয়নবীর সংগে বাদানুবাদে প্রবেশ করা খুব প্রাসঙ্গিক হইবে না; কিন্তু গোয়া সম্পর্কে টয়নবীর মতো ধারণা যে শিক্ষিত ইউরোপীয়দের অনেকেরই আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই সমস্ত ইউরোপীয়েরা—পশ্চিম ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিদের কথা এখানে বলিতেছি—আর সব ব্যাপারেই ওয়াকিবহাল, এক সারা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে—সেটা গোয়াতে হোক, আর পর্তুগালে হোক—সালাজারী ডিক্টেটরশিপ আজ সাতাশ আটাশ বছর ধরিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তার রাজনৈতিক ফলাফল কি, বা তার তাৎপর্য কি, তাহা ছাড়া।

‡ ডাঃ ভাস্কো গারীন ইহার কিছু দিন বাদে জাতি সংঘে পর্তুগালের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৫ই আগস্টের ঘটনার পর যখন ভারত-পর্তুগাল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় তখন তাঁহাকে দিল্লী পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার পরের বৎসর পর্তুগাল জাতিসংঘের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়। জাতি সংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে বা বিভিন্ন কমিটিতে গোয়া সম্পর্কে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা তাঁহার নিয়মিত কাজ হইয়া দাঁড়ায়। সেখানেও গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ তরফে তাঁহার লবী মহলের তদ্বির-তদারক কম কার্যকরী হয় নাই।

* ডাঃ জ্যাকের "Inside Goa" বইখানি এদেশে বেশি প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু ১৫ই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহ উপলক্ষে তাঁহার ও অন্যান্য বিদেশী সাংবাদিকদের তিন দিনের 'গোয়া অভিযান' সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিবে:—

"....I went to Goa as a freelance journalist for several American

কিন্তু গোয়াবাসীদের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতি-সম্পন্ন এই দু' তিনজন সাংবাদিকের চোখেও যে জিনিসটা ধরা পড়ে নাই তাহা হইল গোয়ার ভিতরে পনরই আগস্ট সম্পর্কে পর্তুগীজ সরকারের নিজস্ব প্রস্তুতি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, গোয়ার ভিতরে ১৫ই আগস্ট কোনো ব্যাপক আকারে সত্যাগ্রহ বা পর্তুগীজ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুষ্ঠান হইতে পারে নাই। দু' এক জায়গায় এক আধটি জাতীয় পতাকা গোপনে টাঙগানো হইয়াছে। পোস্টার, গোপন প্রচারপত্র হ্যাণ্ডবিল এসব যথেষ্ট পরিমাণে বিলি হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ কোথাও রাস্তায় নামিয়া আসিয়া পুলিসের সঙ্গে লড়াই করে নাই। কেন, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, ১৫ই আগস্ট গোয়ায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সত্যাগ্রহের চরম মুহূর্ত হইলেও গোয়ার ভিতরে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে তাহা প্রায় শেষের স্তর বলিলেও চলে। আমার নিজের ধারণা, ভারত হইতে যাঁহারা এই সময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজদের সন্ত্রাসবাদী নীতির ফলে, দু' বছর ধরিয়া একটানা গ্রেপ্তার, মারধোর এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়ার দরুণ গোয়ার ভিতরকার আন্দোলনের ও সংগঠনের যে অবস্থা হয় সে বিষয়ে তাঁহাদের মনে কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না। অনেকেই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, ১৫ই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে গোয়ার ভিতরে ব্যাপক আকারে ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের মত গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়া যাইবে। সকলেই জানেন, সেরূপ কিছু হয় নাই। কিন্তু কেন হয় নাই তাহার খবর আমরা গোয়াতে জেলের ভিতর থাকিয়া যতটা বুঝিতেছিলাম গোয়ার বাহিরের লোকেদের পক্ষে ততটা বোঝা সম্ভব ছিল না; বহিরাগত সাংবাদিকের পক্ষেও না। বিশেষ করিয়া সাংবাদিকদের নিকট হইতে পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে গোয়ার ভিতরে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া যে ব্যাপক ধরপাকড় করা হয় সে কথাটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাওয়া হয়। ১৬ই আগস্ট গোয়াতে পর্তুগীজ সেনাদলের চীফ-অব-স্টাফ্ মেজর হর্মিস অলিভেইরা যে

---

and European periodicals. While some foreign journalists had their way paid from Karachi to Goa by the Portuguese Government and were their guests while there, I paid my own transportation from Bombay to Goa and return. However, I accepted their offers of free transportation inside Goa, but otherwise paid all my bills myself. While transportation facilities were thus put at my disposal —and also guide-translators—in fairness I must state that I was free to move about in Goa with or without transportation, with or without a guide-translator.

"However, the limitations of nature (jungle and roads) and of time made my tours fairly circumscribed. Also, since it is obvious inside Goa—as outside—that it is a police State. I chose not to place Goans in jeopardy by visiting them and thus I could not at all times use the freedom of the country which technically I and the other members of the Press were given at least on August 14-16."

প্রেস কন্‌ফারেন্স করেন সেখানে ডাঃ হোমার জ্যাক চেষ্টা করিয়াও এ সম্পর্কে কোনো খবর বাহির করিতে পারেন নাই। ডাঃ জ্যাক তাঁহার বইয়ে এ সম্পর্কে লিখিতেছেন"—

"প্রেস কন্‌ফারেন্সে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম—গোয়াতে গোয়াবাসী কতজনকে ১৪ই হইতে ১৫ই আগস্টের ভিতর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে? মেজর সাহেব প্রথমে কথাটা এড়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'যে কোনো দেশে যে কোনো শহরে প্রতিদিন কিছু না কিছু লোক তো গ্রেপ্তার হইবেই; কিন্তু আমি কি ধরনের গ্রেপ্তারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি?'

"আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—'রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তারের কথা ছাড়া অন্য গ্রেপ্তারের কথা নিশ্চয়ই নয়।'

"আমার প্রশ্ন শুনিয়া মেজর অলিভেইরা প্রথমে একটু হক্‌চকাইয়া গেলেন; তারপর একটু সাম্‌লাইয়া নিয়া খুব সাবধানে ধীরে ধীরে হাত পা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—'যখন এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে, তখন সব সময়েই সামান্য সংখ্যক কিছু লোককে পুলিস অপরাধ হইতে বাঁচানোর জন্য গ্রেপ্তার করে; তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম, হাতে গোনা যায়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা বা পৃথিবীর যে কোনো দেশেই এই ধরনের সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন মতো অবলম্বন করা হয়। এই রকম পাঁচ-দশজন মুষ্টিমেয় লোকেদের গ্রেপ্তার করিয়া না রাখিলে তাহারা অযথা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে পারে।'

"ইংলণ্ডে, আমেরিকায় বা অন্যান্য অনেক দেশেই যে এভাবে লোকজনকে গ্রেপ্তার করাটা নিয়মিত ব্যবস্থা নয় সেটা অলিভেইরা অবশ্য মনে রাখেন নাই।

"এই সময় আরেকজন সাংবাদিক সরাসরি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—'আপনি কি তাহা হইলে বলিতে চান যে, মাত্র দশজনকে—দুই হাতে যতটা আঙ্গুল আছে মাত্র সেই কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে?'

"মেজর বেগতিকে পড়িয়া উত্তর দিলেন—'না তা ঠিক নয়, ঠিক ঐভাবে তাঁহার কথার অর্থ ধরিলে চলিবে না; তবে খুব সামান্য কিছু লোক, যারা পুলিসের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারে নাই' (those who did not get the confidence of the police)।"

ডাঃ জ্যাক বলিতেছেন, তার পরের দিন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, মুর্মুগাঁও বন্দরে ১৪ই—১৫ই আগস্ট ত্রিশজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু মুর্মুগাঁও ভিন্ন, অন্যান্য শহরে এই দুইদিন আরো প্রায় একশ'র মতো লোক গ্রেপ্তার করা হয়। ২৫শে জুলাই হইতে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত গোয়ার ভিতরে গ্রেপ্তারের মোট সংখ্যা প্রায় ৪০০—৫০০ মত হইবে। গোয়ার মত ছোট জায়গায় এই ধরনের ঢালাও গ্রেপ্তার এবং গোয়েন্দা পুলিস ও মিলিটারী রাজত্বের সন্ত্রাসবাদের ভিতর গোয়ার জনসাধারণ যে প্রকাশ্যে সম্মুখে আসিয়া লড়ে নাই তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। ১৯৪২ সালে আগস্ট অভ্যুত্থানের তিন মাস পরে ভারতেও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের আর কোনো ব্যাপক স্ফুরণ দেখা যায় নাই। ভারতের মতই গোয়াতেও আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সংগঠন তখন জেলের ভিতরে ছিল, বাহিরে নয়; কিংবা পুলিসের হাত হইতে কায়ক্লেশে আত্মগোপন করিয়া। সে অবস্থায় কোনো প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন সম্ভব নয়।

॥ ৩১ ॥

পনরই আগস্টের রক্তস্নান

পনরই আগস্টের ঘটনাবলী গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজদের পক্ষে সে রকম মারাত্মক কোনো প্রতিক্রিয়া বা আলোড়নের সৃষ্টি না করিলেও, গোয়া মুক্তি আন্দোলনের নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী অভিযাত্রীদের উপর সেদিনকার নির্বিচারে গুলী চালনা এবং তাহার ফলে আঠারো-জন সত্যাগ্রহীর মৃত্যু সারা ভারতে জনসাধারণের ভিতর যে তুমুল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় তুলিবে তাহা আমরা গোয়ার ভিতরে জেলে থাকিয়াও সুনিশ্চিতভাবে ধারণা করিতে পারিতেছিলাম। পনরইয়ের অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই প্রায় সব খবরই ক্রমে ক্রমে 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের কাছে আসিয়া পেঁছায়। বলাই বাহুল্য, আমাদের খবর পাওয়ার প্রধান উৎস ছিল পর্তুগীজ সৈনিকরা; খবর আদান-প্রদানের রাস্তা ছিল 'আল্‌তিন্যো' জেলের ব্যারাকের পিছনের সেলগুলির জানালা দিয়া। আঠারোজন নিরস্ত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র জানিয়া শুনিয়াও পর্তুগীজ সামরিক কর্তৃপক্ষ এভাবে গুলী করিয়া হত্যা করিবে আর স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকদের এভাবে নিহত হইতে দেখিয়া ভারত গভর্নমেণ্ট খালি মৌখিক তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিবেন এরূপ কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, নাগপুর, ও অন্যান্য শহরে যে ধরনের গণ-প্রতিবাদ উত্তাল হইয়া ওঠে তাহার চাপে ভারত গভর্নমেণ্ট পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন—গোয়ার ভিতরে সকলের মনে—গোয়াবাসীদের ভিতরে তো বটেই এবং সাধারণ পর্তুগীজ সৈনিকদের ভিতরে যাহারা কিছুটা রাজনীতির খবর রাখে তাহাদের মনেও—এই সময় ধারণা হইয়াছিল ভারত গভর্নমেণ্ট এবার নিশ্চয়ই গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে চরমপত্র দিয়া কোনো সামরিক বা আধা সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, যেরূপ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল।

গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মনে এই ধরনের আশংকা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের দু' একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সংগে কথাবার্তায় এই সময় খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। পরে শুনিয়াছি পর্তুগীজ-ভারতের গভর্নর জেনারেল, জেনারেল পাউলো বের্নার্দ গেদীস এই ধরনের গুলী চালনা পছন্দ করেন নাই। কাপ্তেন কার্মো ফেরেইরা যিনি এই সময় গোয়াতে পর্তুগীজ সরকারের চীফ সেক্রেটারী বা 'শেফ দা গাবিনেত' ছিলেন, তিনিও নাকি এই গুলী চালনা সমর্থন করেন নাই। এইভাবে গুলী চালনার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি হইবে বা ভারত গভর্নমেণ্ট এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন সে বিষয়ে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের মনে যে কিছুটা ভয় ছিল—মুখে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন—তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। 'আল্‌তিন্যো'-তে যে সমস্ত গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, পনরই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ফলে তাঁহাদের মনে দুঃখ, বিক্ষোভ ও বেদনা থাকিলেও, ভারতে জনসাধারণের ভিতর ইহাতে যে তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার ফলে ভারত গভর্নমেণ্ট নিশ্চয়ই গোয়াতে পর্তুগীজদের সম্পর্কে কিছু না কিছু জোরালো রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেনই, এই ধরনের বিশ্বাস ছিল। সেই হিসাবে এই গুলীকাণ্ড এবং ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের আত্মদান ব্যর্থ হইবে না সকলের মনে অন্তত সেটুকু সান্ত্বনা ছিল। আমার নিজের মনে

কোনো সময় অবশ্য সেরূপ কোনো প্রত্যাশা ছিল না। গোয়া সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের অবলম্বিত নীতি বা সাধারণভাবে ভারত গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আমার মতামত যাহাই হোক না কেন, বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক শক্তিসমাবেশ যে ধরনের, পূর্ব পশ্চিমের দুই বিবদমান প্রধান শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দুনিয়ার কূটনীতি আজ যে আকার নিয়াছে এবং সেই পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহিতেছে তাহার গতি লক্ষ্য করিয়া আমার স্থির বিশ্বাস ছিল গোয়াতে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের মত সামরিক "পুলিসী ব্যবস্থা" (বা Police Action—গোয়ার ব্যাপারে এইরূপ Police Action অবলম্বনের দাবী ১৯৫৫ সালেও ছিল আজও আছে) অবলম্বন করা সহজ বা সম্ভব হইবে না। তাছাড়া হায়দরাবাদের পরিস্থিতির সঙ্গে গোয়ার পুরাপুরি তুলনা করাও চলে না। আন্তর্জাতিক আইনে পর্তুগীজ শাসিত গোয়ার বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের মত পুলিসী ব্যবস্থা বা সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার অর্থ পর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া—আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করি বা না করি, বা গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাকে যে নামই দিই না কেন, পর্তুগীজরা ইহাকে যুদ্ধ হিসাবেই গ্রহণ করিবে। অবশ্য ভারত যদি গোয়া আক্রমণ করে বা সেখানে কোনো সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে যুদ্ধের সামরিক ফলাফল কি হইবে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের মনেও সে সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা নাই বা ছিল না। পর্তুগাল হইতে লড়িয়া গোয়া-দমন-দিউ রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে—ইহা তাঁহারা ভুল করিয়াও মনে করিতেন না। কিন্তু ফলাফল যাহাই হোক বা এ যুদ্ধের পরিসর যত সীমাবদ্ধ হোক, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে কার্যত ইহা যুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত হইবে। পর্তুগালের সঙ্গে গোয়া সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় যুদ্ধের পথ বা কোনো সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে বাস্তবে সম্ভব হইবে না; চীন বা রুশিয়ার সমর্থনে বা সাহায্যেও তাহা সম্ভবপর নয়। (অবশ্য ভারত গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক নীতির কাঠামো পরিবর্তিত হইলে স্বতন্ত্র কথা)।

এখানে এ আলোচনা খুব প্রাসঙ্গিক নয়। যাহা প্রাসঙ্গিক, তাহা হইল ১৫ই আগস্টের সত্যাগ্রহীদের হত্যাকাণ্ডের পর ভারতবর্ষে জনসাধারণের ভিতর যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহার আশু ফলাফল কি হইবে সে সম্পর্কে গোয়াবাসী ও পর্তুগীজ সৈনিকদের মনের ধারণা। 'আল্‌তিন্যো' জেল কুয়ার্তেলের তুলনায় পাঞ্জিম শহর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং শহর হইতে কিছুটা দূরে অবস্থিত হইলেও রোজই আমরা কিছু না কিছু খবর পাইতাম। এই সময় 'আল্‌তিন্যো'-তেও বাহিরের লোকের আসা-যাওয়া সম্পর্কে খুব কড়াক্কড়ি করা হয়। অবশ্য বাহিরের লোক বলিতে আমাদের ব্যারাকের ভিতরে আসিত এক হোটেলের লোকেরা, আমাদের সেলে খাবার দিবার জন্য। তাহারা আমাদের সেই পেটমোটা পর্তুগীজ "অন্নমন্ত্রী"র তদারকে পুলিস ও মিলিটারী পাহারায় আসিত। পুলিস সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে যে খাবার দিতে আসিয়া হোটেলের চাকর বাকরেরা—হিন্দু হোটেল বলিয়া ইহারা সকলেই হিন্দু—বোধ হয় আমাদের কিছু খবর দিয়া যায় বা যাইতে পারে। ১৫ই আগস্টের ঘটনার কয়েক দিন আগে হইতে তাহারা হোটেলের চাকরবাকরদের বদলে নিজেদের গোয়েন্দা পুলিসের লোকদের উপর সেলে সেলে খাবার পরিবেশন করার ভার দেয়। হোটেলের লোকেরা ব্যারাকে খাবার আনিয়া থালায় তাহা সাজাইয়া দিবে। ঘরে ঘরে সেই খাবার দিয়া যাইবে মন্তেইরোর চরেরা, যাহাতে হোটেলের লোকেদের সঙ্গে আমরা সামনা-সামনি

কোনোই সংস্পর্শে না আসিতে পারি। ইহাতে অবশ্য আমাদের বাহিরের খবর পাওয়ার কোনোই অসুবিধা হয় নাই। কারণ হোটেলের লোকেদের মারফৎ আমরা খবরাখবর খুব বেশি কিছু পাইতাম না। পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা বেশির ভাগ খবরাখবর কোন পথ দিয়া পাইতাম। পর্তুগীজ পুলিসের, এমন কি মন্তেইরো বা 'পিদে'-র দৃষ্টিও সৌভাগ্যবশত কোনো সময় সেদিকে পড়ে নাই।

পনরই তারিখেই যে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চলিয়াছে এবং তাহার ফলে বহু সংখ্যক ভারতীয় সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসৈনিক হতাহত হইয়াছে এ খবর আমরা সেই রাত্রেই একজন পর্তুগীজ সৈনিকের কাছে পাই এবং পরের দিন আরও পাকাপাকি খবর পাই ডাঃ হোমার জ্যাক ও মঁশিয় ব্রেহের মুখে সে কথা বলিয়াছি। ইহার পরে, সতরোই বা আঠারোই আমার ঠিক মনে নাই আমাদের ব্যারাকের পিছনের দিকে গার্ড-ডিউটীতে একজন পর্তুগীজ সৈনিক আসে যে নিজে ভারত-গোয়া সীমান্তের বান্দা অঞ্চলে গোয়ার উত্তর দিকে পেড়নে' গ্রামের কাছাকাছি সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালনার সময় উপস্থিত ছিল। (ডাঃ হোমার জ্যাক-ও ১৫ই আগস্ট এই অঞ্চলে ছিলেন)। সে ডিউটীতে আসিয়া ......নং সেলের গোয়াবাসী বন্দী শ্রী......র কাছে যে খবর দেয় তাহার মোটামুটি সার মর্ম এই—

এই গুলী চালানোর জন্য কতকগুলি উদ্ধত ধরনের ছোকরা আর্মি অফিসার বা "তেনেন্ত" (পর্তুগীজ ভাষায় Tenente কথা ইংরাজী 'লেফ্‌টেনান্ট' কথার সমার্থক) দায়ী; বহু জায়গায় সাধারণ সৈনিকরা গুলী করিতে চায় নাই। সে নিজের কথা বলিল— "আমিও নিরস্ত্র লোকেদের উপর গুলী করিতে রাজী না হওয়ায় আমাকে আবার এখানে গার্ড ডিউটীতে ফেরৎ পাঠাইয়াছে" (এই লোকটি স্থানীয় বন্দীদের পূর্ব পরিচিত, পূর্বেও সে 'আল্‌তিন্যো'-তে গার্ড ডিউটীতে নিযুক্ত ছিল)। বান্দা এবং বান্দার আশেপাশে জন ৫।৬ সত্যাগ্রহী মারা গিয়াছে। 'আজাদ গোয়া রেডিও'তে তাহাদের নাম বলিয়াছে। আমাদেরকে সে পরে নামগুলি জানাইবে; তাহার এখন মনে নাই। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে সকলের বিশ্বাস এবার ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে পর্তুগালের লড়াই হইবে এবং তাহারা সকলে এই বিদেশে আসিয়া মিছামিছি এই যুদ্ধে মারা যাইবে।

শ্রী.........তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"যুদ্ধ যে হইবে তাহা তুমি মনে করিতেছ কেন? ভারত গভর্নমেণ্ট বা পণ্ডিত নেহরু আমরা যতদূর জানি, গোয়ার ব্যাপার নিয়া পর্তুগালের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চান না। তা ছাড়া আমাদের অহিংস নীতি; আমরা যুদ্ধে বিশ্বাস করি না।"

"এখন ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে অবস্থা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ খেপিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় এবং বোম্বাইয়ে আমাদের কন্‌সালেটে চড়াও হইয়া কনসালেট অফিসে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সিনর নেহরু কি এখন জনসাধারণের দাবীর কাছে মাথা না নোয়াইয়া পারিবেন। আমরা রেডিয়োতে সিনর নেহরুর বক্তৃতার রিপোর্টও শুনিয়াছি; মনে হয় তিনিও যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতেছেন।"*

---

*পণ্ডিত নেহরু কোনো সময়েই গোয়া সমস্যার সমাধানের জন্য যুদ্ধ বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার কথা বলেন নাই, কিন্তু ১৬ই আগস্ট তিনি পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন—"Yesterday's happenings in Goa might not be the end of the story. Other

শ্রী.........—"তাহাতে তোমাদের ভয় কি? তোমাদের গভর্নমেণ্ট তোমাদের পিছনে আছে। ধর ভারত যদি গোয়া আক্রমণ করেও গোয়া রক্ষার জন্য তোমাদের গভর্নমেণ্ট লড়িবে।"

পর্তুগীজ সৈনিক—"আরে সিনর! গভর্নমেণ্ট লড়িবে! দ্যুতোর সালাজার (ডাঃ সালাজার; দ্যুতোর মানে ডক্টর) তো আর নিজে বন্দুক কাঁধে এখানে লড়িতে আসিবেন না! লড়িতে হইবে আমাদের! মরিতে হইবে আমাদের! গোয়ার জন্য এভাবে বিদেশে আসিয়া মরিতে রাজী নই।"

অবশ্য এই ধরনের মনোভাব যে সকল পর্তুগীজ সৈনিকের ছিল তাহা নয়। কিন্তু সাধারণভাবে যে কোনো সময়ে ভারতের সংগে যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে এই রকম একটা আশংকা এই সময় শুধু পর্তুগীজ সৈনিকদের মধ্যে নয়, গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের মধ্যেও কিছুটা ছিল। গোয়ার ব্যাপারে পর্তুগালের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন এই গুলীকাণ্ডের ফলে অনেকখানি কমিয়া যায় এবং তাহা বুঝিয়া লিস্‌বন গভর্নমেণ্ট প্রাণপণে ভারতের বিরুদ্ধে একটা কূটনৈতিক জোট পাকানোর চেষ্টা করিতে থাকেন। বলাই বাহুল্য, এ ব্যাপারে তাঁহারা অযাচিত সমর্থন পান পাকিস্থানের নিকট হইতে। পাকিস্থানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী (বর্তমানে প্রাক্তন) সোহরাবর্দী সাহেব ইহার অল্প কিছুদিন পরে গোয়াতে আসিয়া করাচী-লিস্‌বন এক্সিসের গোড়া পত্তন করেন। ভারত যে কোনো দিন গোয়া আক্রমণ করিয়া পর্তুগীজদের বিতাড়িত করিবে এই রকমের প্রত্যাশার আবহাওয়ায় নানা রকম গুজব এই সময় গোয়াতে শোনা যাইত। এই সব গুজবের মধ্যে একটি ছিল এই যে, পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ গোপনে পুরাতন গোয়ার সেণ্ট জেভিয়ার ক্যাথিড্রাল হইতে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সংরক্ষিত দেহ সরাইয়া ফেলিয়াছে। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ও গোয়ার ক্যাথলিক চার্চের কর্তারা নিজেরাও কতকটা এই সব গুজব প্রচারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেন। গোয়াতে ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্কের নির্দেশে এই সময় গোয়াকে রক্ষার জন্য নানা চার্চে চার্চে নানা রকমের প্রার্থনা, 'হাই মাস্' (সংঘবদ্ধ উপাসনা), ভজন, কীর্তন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করে। গোয়াতে ক্যাথলিক পাদ্রীদের মধ্যে একটি পুরাতন কাহিনী প্রচলিত আছে যে শিবাজীর পুত্র শম্ভাজী যখন গোয়া আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছিলেন, সে সময় নাকি কয়েকদিন ধরিয়া সেণ্ট জেভিয়ার ক্যাথিড্রালে একাদিক্রমে চব্বিশ-প্রহর প্রার্থনা চালানোর পর সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের প্রত্যাদিশ শোনা যায় যে, গোয়ার উপর কোনো আক্রমণ হইবে না। শম্ভাজীর সৈন্যদল গোয়া অভিযানের জন্য তৈরি হইয়া যাত্রা শুরু করিবে, এমন সময় নাকি শম্ভাজী মত পরিবর্তন করেন এবং পর্তুগীজদের বিপক্ষে কোনো

---

things are likely to happen. The story will not end till our objective is achieved." ("গতকাল যাহা ঘটিয়াছে তাহাই গোয়া কাহিনীর শেষ কথা নয়। অন্য ধরনের আরও ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। আমাদের লক্ষ্যে না পেঁছানো পর্যন্ত এ কাহিনীর সমাপ্তি নাই।") গোয়ার গুলীকাণ্ডের পর দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে পণ্ডিত নেহরুর এই ঘোষণাতে গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ অ-পর্তুগীজ সকলের মনেই ধারণা হয় যে ভারত গভর্নমেণ্ট এবার হয়ত গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র বা সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা ভাবিতেছেন।

ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলেও আপাতত চলিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন।* এই সময় যিনি গোয়ার ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্ক ছিলেন, সে ভদ্রলোক গোয়া-ভারত রাজনীতিতে খুবই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, অবশ্য যতটা চার্চের মারফৎ তিনি পারেন। চার্চ ও পাদ্রী পুরোহিতদের মারফৎ তিনি যতটা পারেন গোয়ার ক্রিশ্চিয়ানদের ভিতরে ভারতবিরোধী মনোভাব প্রচারে খুবই তৎপর। কাজে কাজেই অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া গোয়া রক্ষার ব্যাপারে ঈশ্বরের কাছে ও সেণ্টদের কাছে প্রার্থনা জানাইতে ও সেই তদ্বির-তদারকের জন্য সমারোহের সঙ্গে পূজা-প্রার্থনার অনুষ্ঠানেও তিনি খুব অগ্রণী ছিলেন। বলা বাহুল্য, পর্তুগীজ সরকার এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক প্রভাবের কথা মনে রাখিয়া সক্রিয়ভাবে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন এবং স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল, পর্তুগীজ সেনাপতি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী হোমরা-চোমরারা এই সব অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ইহার ফল সাধারণ সৈনিকদের মনে কি হইতেছে এবং সাম্রাজ্য রক্ষার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য তাহারা কি পরিমাণে প্রেরণা পাইতেছে, তাহা তাঁহারা কোনো সময় খতাইয়া দেখেন নাই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, সাধারণ পর্তুগীজ সৈনিকদের মধ্যেও পর্তুগীজ দেশাত্মবোধের অভাব নাই। কিন্তু কনস্ক্রিপশন করিয়া যেভাবে পর্তুগীজ সৈনিকদের গোয়াতে আনা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের নৈতিক মনোবল খুব উঁচু গ্রামে থাকার কথা নয়। গোয়া সীমান্ত হইতে এই কয় বৎসর যত পর্তুগীজ সৈনিক পালাইয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে, তাহার কথা মনে রাখিলেই সাধারণ পর্তুগীজ সৈনিকেরা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে খুব প্রীতির চোখে দেখিতেছিল না, সেকথা বোঝা যাইবে।

এইভাবে, ক্রমে ক্রমে কিছুটা পর্তুগীজ সৈনিকদের মারফৎ, কিছুটা অন্যান্য সূত্রে পনরই আগস্টের ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি আমরা জানিতে পারি। 'আল্‌তিন্যো' জেলে আমরা দৈনিক খবরের কাগজ—অর্থাৎ গোয়াতে যেসব পর্তুগীজ ভাষার কাগজ প্রকাশিত হয় —পাইতাম না; কাগজ পড়ার অনুমতি আমাদের ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু কাগজ গোপনে আমাদের হাতে আসিত। আর একটি খবর পাওয়ার উৎস ছিল 'আজাদ গোয়া রেডিয়ো'র ব্রডকাস্ট। কখনো পর্তুগীজ সৈনিকরা, কখনো-সখনো অন্যেরা সেই সব খবর শুনিয়া আমাদের কিছু কিছু শুনাইত, কখনো কখনো গোয়ার পর্তুগীজ কাগজে 'আজাদ গোয়া রেডিয়ো'র প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইত। সেই সূত্রেও কিছু খবর জানা যাইত। মুক্তি পাওয়ার পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া যতটা মিলাইয়া দেখিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে, পুরাপুরি সকল খবর না পাইলেও কোনো বড় বা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমাদের একেবারে অজানা থাকে নাই।

---

*অবশ্য ইহা খালি প্রার্থনা দ্বারা বা প্রার্থনার ফলেই হইয়াছিল কি না বলা শক্ত। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন খালি প্রার্থনার উপর ভরসা না রাখিয়া পর্তুগীজরা শম্ভাজীর একজন অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতাকে ও সাবন্ত বাড়ির রাজাকে প্রচুর টাকা পয়সা ঘুষ দিয়া তাঁহাদের মারফৎ শম্ভাজীর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেন। তাঁহারা রিপোর্ট দেন পর্তুগীজরা যখন মারাঠাদের সঙ্গে সদ্ভাবে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তখন তাহাদের বিরুদ্ধে আর সামরিক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন নাই।

'আল্‌তিন্যো'তে বসিয়া আমরা যতটা জানিতে পারি, তাহাতে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, পনরই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহে উত্তরে পেড়্‌নে' ও টেরেখোলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (ভারত সীমান্তের বান্দার কাছাকাছি) ও পূর্ব সীমান্তে কোল্লামের নিকটবর্তী অঞ্চলে (ভারত সীমান্তের কাস্‌ল রক্‌ রেলওয়ে স্টেশনের সম্মুখস্থ অঞ্চলে) হতাহত বেশি হয়। আহতের প্রকৃত সংখ্যা কত ছিল এখন বলা শক্ত; কিন্তু পর্তুগীজদের গুলীতে সেদিন প্রাণ উৎসর্গ করেন মোট আঠারো জন। ইহার মধ্যে নয়জনের মৃতদেহ ভারতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয়; আর বাকী নয়জনের মৃতদেহের উপর পর্তুগীজরা পেট্রল ঢালিয়া পোড়াইয়া দেয়। দমনে মাত্র একজন সত্যাগ্রহী নিহত হন। বাদ-বাকী সকলেই গোয়াতে। পনরই আগস্টে গোয়া সত্যাগ্রহ অভিযানে নিম্নলিখিত সত্যাগ্রহীরা শহীদ হনঃ

ক। মৃত্যুর পরে যাঁহাদের মৃতদেহ ভারতে ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর হইয়াছিলঃ

১। হিরভে গুরুজী (মহারাষ্ট্র), ২। কর্নেইল সিং (পাঞ্জাব), ৩। রাজাভাউ মহাকাল (মধ্য ভারত), ৪। মধুকর চৌধুরী (মহারাষ্ট্র), ৫। এস এস বামরাও (অন্ধ্র), ৬। বাপুলাল হোটেলওয়ালা (মধ্য ভারত), ৭। নাথুজী কাম্বালে (মধ্য ভারত), ৮। রামগির সাধু (কাশী, উত্তর প্রদেশ), ৯। ব্যাস অমৃত নাথুরাম (সুরাট)।

খ। মৃত্যুর পরে যাঁহাদের দেহ গোয়ার ভিতরে পোড়াইয়া দেওয়া হয়ঃ

১০। হনুমন্তাইয়া তেনগুটে (মহীশূর), ১১। আন্দনাইয়া গজেন্দ্রাগড় (মহীশূর), ১২। পান্নালাল যাদব (রাজস্থান) [ডাঃ হোমার জ্যাক ইঁহার মৃতদেহ পালায়ে গ্রামে দেখিয়া আসেন], ১৩। সি এইচ জগমোহন রাও, ১৪। এস এইচ সুব্বারাও গুরু (অন্ধ্র), ১৫। বৃজমোহন শর্মা (উত্তর প্রদেশ), ১৬। জে শ্যাম খরসারে (মধ্য ভারত), ১৭। কল্যাণ শর্মা (মধ্য ভারত), ১৮। শেষনাথ বাড়েকর (মহারাষ্ট্র)।

ইহা ভিন্ন ১৫ই আগস্টের পূর্বে ২৫শে জুন উত্তর প্রদেশের শ্রীআমীরচান্দ গুপ্তকে প্রহার করিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাহাড় হইতে ফেলিয়া দিয়া এবং ৩রা জুলাই মহারাষ্ট্রের বাবুরাও থোরাট ও বাঙালী যুবক নিত্যানন্দ সাহা সিকিউরিটি পুলিসের গুলীতে নিহত হন।

পেড়্‌নে'-টেরেখোল-বান্দা সীমান্তে বা কোল্লম্‌-কাস্‌ল রক্‌ সীমান্তে ব্যাপকভাবে গুলী চালানোর জন্য কে দায়ী বলা শক্ত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব ঘটনা নির্ভর করে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের খেয়াল-খুশির উপর। ডাঃ হোমার জ্যাক তাঁর "ইনসাইড গোয়া" বইয়ে সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালানো সম্পর্কে পর্তুগীজ সামরিক কর্তৃপক্ষের যে গোপনীয় নির্দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দুইবার মৌখিক ওয়ার্নিং দিয়া তারপর প্রথমবার আকাশের দিকে গুলী ছুঁড়িয়া, দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহীদের পায়ের কাছে মাটিতে গুলী ছুঁড়িয়া সত্যাগ্রহীদের সতর্ক করিয়া দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু কোথাও সেভাবে সত্যাগ্রহীদের হুঁশিয়ার করিয়া, নোটিশ দিয়া গুলী চালানো হয় নাই। বান্দা-সীমান্তে বান্দা হইতে সত্যাগ্রহীদের অভিযান যখন আরম্ভ হয়, তখন তাঁহাদের সঙ্গে একেবারে বর্ডারে 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' পর্যন্ত পার্লামেন্টের সর্বদলীয় গোয়া কমিটির সম্পাদক ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম, কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী ডাঙ্গে, শ্রী অধিকারী, রনদিভে, মিরাজকর প্রভৃতি, পুনার কংগ্রেস নেতা শ্রীজবৈ এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রী খাডিলকর সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা কেহই অবশ্য সীমান্ত লঙ্ঘন করেন নাই। পুনার কম্যুনিস্ট নেতা চিতড়ে-র এই সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব করার

কথা ছিল। আমেরিকান প্রেস ফোটোগ্রাফার মিঃ আর্থার বনের ও আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের রিপোর্টার মিঃ লাভাচেক ও আরও কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকও এই সীমান্তে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, সত্যাগ্রহীরা পর্তুগীজ সীমান্তে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বিনা ওয়ার্নিং-এ গুলী চলিতে আরম্ভ করে। গুলীর ঝাপ্টা লাগিয়া চিতড়ে-র চোখের পাতা ঝলসাইয়া যায়, তিনি ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পাশে পাঞ্জাবের কর্নেইল সিং গুলী লাগিয়া পড়িয়া যান। সত্যাগ্রহীরা তবু আগাইতে থাকেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মধুকর চৌধুরী, রাজাভাউ মহাকাল পড়িয়া যান ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন বীরাঙ্গনা শ্রীমতী সহোদরা দেবী* চিতড়ে-র হাতের জাতীয় পতাকা কুড়াইয়া নিয়া সম্মুখে দৌড়াইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার গায়ে ও হাতে গুলী লাগে, তিনি পড়িয়া যান। মিঃ বনের ও লাভাচেক সাহসের সঙ্গে গুলী অগ্রাহ্য করিয়া কয়েকজন আহত ও মৃত সত্যাগ্রহীর দেহ বহন করিয়া ভারত সীমান্তে ফিরাইয়া আনেন। গুলী অন্যত্রও সেইভাবেই চলে; কোনো কোনো জায়গায় সৈন্যরা বহুদূর হইতে সত্যাগ্রহীদের দেখিবামাত্র গুলী চালায়। সেসব ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহীরা নিজেরাই তাহাদের মৃত সাথীদের দেহ বহন করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসে। আবার অনেক ক্ষেত্রে গুলী চালানো হয় নাই—এরূপও হইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা গোয়া সীমান্তের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সাতটি কেন্দ্র হইতে অভিযান আরম্ভ করে। তাহার মধ্যে বান্দা ও কাস্‌ল রক্ হইতে যাহারা যাত্রা করে, একমাত্র তাহাদের উপরেই ব্যাপকভাবে গুলী চালানো হয়। অন্যান্য সীমান্তে দু-এক জায়গায় যে গুলী চলে নাই, তা নয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করিয়া অল্পবিস্তর মারধোর করার পর বর্ডার পার করিয়া ভারতে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাজে কাজেই আমি নিজে আমাদের পূর্বোক্ত পর্তুগীজ সৈন্য-বন্ধুটির কথায় কতকটা বিশ্বাস করি যে, যেখানে যেখানে গুলী চলিয়াছে, তাহা কিছুটা মাথাগরম ছোকরা মিলিটারী লেফটেনান্ট বা 'তেনেন্ত' জাতীয় অফিসারের বীরত্ব দেখানোর আগ্রহেই ঘটে। খুব সম্ভব পর্তুগীজ শাসন-কর্তৃপক্ষ ঠিক এই ধরনের গুলী চালানো হইবে, তাহা আগে হইতে আন্দাজ করেন নাই।

ভারতে ইহার প্রতিবাদে সাময়িকভাবে জনসাধারণের ভিতর যে উত্তেজনা ও বিক্ষোভ ছিল, গভর্নমেণ্টের ও জাতীয় নেতাদের দেওয়া আশ্বাসে তাহা এই ধরনের উত্তেজনার স্বাভাবিকক্রমে প্রশমিত হইয়া আসে। পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের গোয়া নিয়া যুদ্ধ যে বাধে নাই, তাহা সকলেই জানেন। খালি এই ঘটনার পরে পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের সকল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পূর্বে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে গোয়ার সঙ্গে রেলপথের যোগাযোগও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারতের কন্সালেট যে বন্ধ হইয়া যাইবে, সে খবরও আমরা বোধহয় ২০শে কিংবা ২১শে আগস্টের মধ্যে পর্তুগীজ সৈনিকদের নিকট হইতে জানিতে পারি। এখন হইতে গোয়ায় আমাদের জেল-জীবনে নূতন অধ্যায় শুরু হইবে।

এই অধ্যায়ে আমাদের পরম লাভ ফাদার জোসে কারিনোর সঙ্গে পরিচয়। ভারতের

---

* বীরাঙ্গনা শ্রীমতী সহোদরা বাঈ বর্তমানে লোকসভা সদস্যা। তিনি ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হন। ১৫ই আগস্টের গুলী কাণ্ডে তাঁহার একটি হাত চিরকালের মত জখম হইয়া যায়।

কন্সাল-জেনারেল মিঃ মনি দূতাবাস বন্ধ করিয়া চলিয়া আসার সময় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারে ফাদার জোসে কারিনোকে ভারতীয় রাজবন্দী হিসাবে গোয়াতে আমাদের জেল-জীবনের সুযোগ-সুবিধা তদারকের জন্য নিযুক্ত করিয়া আসেন। ফাদার কারিনো কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের ডম্ বস্কো মিশনে ছিলেন। জাতিতে স্প্যানিশ হইলেও ইতালিয়ান মিশনের সংগে সংশ্লিষ্ট বলিয়া যুদ্ধের সময় এদেশে কিছুকাল ইংরেজদের যুদ্ধবন্দী হিসাবেও তিনি কাটাইয়া গিয়াছেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। মিঃ মনির অনুরোধে তিনি, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে, তাঁহার অন্যান্য বহু দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও জেলখানায় আমাদের খোঁজখবর করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

॥ ৩২ ॥

পাদ্রী কারিনোর সংগে সাক্ষাৎ

পনেরোই আগস্টের উত্তেজনা ভারতে যেমনই থাকিয়া থাকুক না কেন, 'আল্তিন্যো' জেলে আমাদের দৈনন্দিন রুটিন তাহার জন্য মোটেই ব্যাহত হয় নাই। কেরুস্ এবং ফের্নান্দের কড়া তত্ত্বাবধানে তাহা যথারীতি চলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর ফের্নান্দের হুকুম পাইলাম—'Prepara! de Presse!' ('জলদি তৈরি হইয়া নাও') অর্থাৎ কাপড়চোপড় পরিয়া বাহিরে যাবার জন্য তৈরি হইয়া নিতে হইবে। 'আল্তিন্যো' জেল হইতে আসামীদের মিলিটারী ট্রাইব্যুনালে হোক, আর পুলিস হেড কোয়ার্টারে হোক, নিতে হইলেই, মিনিট পাঁচেক আগে কেরুস বা ফের্নান্দ, যে দিন যে ডিউটিতে থাকে, আসিয়া এইভাবে নোটিশ দিয়া যাইত এবং হুকুম পাওয়ার সংগে সংগে তাড়াতাড়ি পরনের জাঙ্গিয়া গেঞ্জি ছাড়িয়া, ধুতি-কামিজ বা যাহারা পাজামা প্যাণ্ট কোট পরে, তাহারা সেভাবে বেশভূষা করিয়া তৈরি হইয়া নিত। সেদিন ঠিক এই সময়টা বাহিরে কোথাও যাওয়ার ডাক পড়িবে, তাহা আমরা কেহ প্রত্যাশা করিতেছিলাম না। আমার সেল খুলিয়া আমাকে বাহিরে আনার পর দেখি গোরে, শিরুভাই লিমায়ে, মধু লিমায়ে এবং জগন্নাথ রাওকেও বাহিরে আনা হইয়াছে। এক রাজারাম পাতিল ভিন্ন ভারতীয় সত্যাগ্রহী দলের নেতা হিসাবে আমরা যে কয়জন সেখানে আটক ছিলাম, সকলকেই একসাথে কোথাও নিয়া যাওয়ার জন্য প্রিজন ভ্যান, সশস্ত্র পুলিস ও মিলিটারী গার্ড আসিয়াছে। সাধারণত, কোর্টে বা পুলিস হেড কোয়ার্টারে ডাক পড়িলে তাহার সময় ছিল সকাল বেলা। বিকাল বেলায় এক কন্সাল জেনারেলের সংগে বা উকীলের সংগে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য বলাই বাহুল্য, সে সুযোগ সচরাচর ঘটিত না। তবুও আমার মনে কিরকম যেন অনুমান হইল যে, হয়ত এবার গোয়াতে ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কন্সাল জেনারেল মিঃ মনি গোয়া ছাড়িয়া যাওয়ার আগে একবার শেষবারের মত আমাদের সংগে দেখা করিয়া বিদায় লইয়া যাইতে চান, সেইজন্য ডাক পড়িয়াছে। ইতিপূর্বে মিঃ মনির সংগে একবার মাত্র আমার দেখা হইয়াছিল। ভদ্রলোক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও জেলে আমার ভাগ্যের কোনো উন্নতিবিধান করিতে পারেন

নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কন্সাল জেনারেল চলিয়া যাওয়ার আগে তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করার আগ্রহ আমাদের মনেও কিছুটা ছিল। কারণ আমরা বেশ বুঝিতেছিলাম, আমাদের এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য গোয়াতে পর্তুগীজ জেলে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। 'পিদে'-র অফিসারদের জেরার এবং কথাবার্তার ধরন হইতে আন্দাজ করিতে কষ্ট হয় নাই যে, আমাদেরকে যথাসম্ভব শীঘ্র মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের কাছে বিচারের জন্য হাজির করিয়া লম্বা মেয়াদের সাজা দেওয়া হইবে। তাহার পর দেশের সঙ্গে আর আমাদের কোনো সম্পর্ক রাখাই হয়ত সম্ভব হইবে না। সে অবস্থায় কন্সাল গোয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার আগে তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা হইলে তাঁহার মারফত দেশে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে শেষবারের মত কিছু খবরাখবর পাঠানো যাইবে বলিয়া আমরা সকলেই মনে মনে কন্সাল জেনারেলের সাক্ষাৎকারের একটা সুযোগ চাহিতেছিলাম। যাহা হউক, আমাদের প্রিজন ভ্যান যখন আমাদের নিয়া মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বাড়ির সামনে হাজির করিল, তখন বুঝিলাম যে, আমার আন্দাজ ভুল হয় নাই; কন্সালের সঙ্গেই দেখা করার জন্য আমাদের নিশ্চয় আনা হইয়াছে। কারণ কন্সালের সঙ্গে দেখা করার জায়গা হিসাবে এইখানেই আমাদের আনা হইত।

ট্রাইব্যুনাল দপ্তরে একটি ঘরে মিলিটারী পাহারায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন আমার কন্সাল জেনারেলের কাছে যাওয়ার ডাক আসিল, জজেদের খাস-কামরায় যেখানে সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দিষ্ট ছিল, সে ঘরে ঢুকিয়া দেখি মিঃ মনির পাশে চেয়ারে একজন সৌম্যদর্শন ইউরোপীয় ক্যাথলিক ধর্মযাজক বসিয়া আছেন। তাঁর পরনে সাদা ক্যাসক (পাদ্রীদের আলখাল্লা) দেখিয়া তাঁহাকে পাদ্রী বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয় নাই। মুখ ক্যাথলিক পাদ্রীদের ধরনে গোঁফ দাড়িতে সমাচ্ছন্ন; চোখে দুষ্টুমিভরা চাপা হাসির ভাব; ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে খুব সহজেই তাঁহার সম্পর্কে মনে একটা আস্থা ও বিশ্বাসের ভাব জাগায়। পাঠক বোধহয় আন্দাজ করিতে পারেন ইনিই ফাদার কারিনো। কন্সাল জেনারেল গোয়া হইতে চলিয়া আসার পূর্বে পর্তুগীজ সরকারের কাছে গোয়াতে ভারতীয় বন্দীদের তত্ত্বাবধান করার জন্য তাঁহার নাম সুপারিশ করেন। পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টও তাহাতে আপত্তি করেন নাই। মিঃ মনি আজ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে আসিয়াছেন; এখন হইতে কন্সালের বদলে পাদ্রী কারিনো* গোয়াতে বন্দী ভারতীয় নাগরিকদের দেখাশোনা করিবেন।

আমাদের গোয়া হইতে মুক্তি পাওয়ার পর ফাদার কারিনোকে নিয়া পশ্চিম ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে কিছুটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। তিনি 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' কাগজের সম্পাদকের নামে নাকি একটি চিঠি দেন যে, গোয়াতে জেলে ভারতীয় বন্দীদের উপর কোনো অত্যাচার হয় নাই। আমার যতদূর বিশ্বাস, একথা বলার সময় তাঁহার মনে আগুয়াদা জেলে আমাদের যেভাবে রাখা হইয়াছিল, তাহার কথাটাই বেশি কাজ করিয়াছিল। আগুয়াদাতে আনার পর আমাদের উপরে যে মারধোর আর হয় নাই তাহাও ঠিক। তাছাড়া এবিষয়ে কারিনোর সঙ্গে ভারতীয়দের মতভেদেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে।

---

* 'পাদ্রী' কথাটা চলতি বাংলার অন্যান্য আরও অনেক কথার মত পর্তুগীজ ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় চলিয়া আসিয়াছে। 'কেদারা', 'কামিজ', 'জানালা' (পর্তুগীজ 'Janela') এসব কথাও পর্তুগীজ। 'পাদ্রী' ও ইংরাজী 'ফাদার' কথার অর্থ একই—ধর্মযাজক পিতা।

বোম্বাই কাগজগুলিতে এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে এই সময় যেভাবে গালাগালি করা হয় তাহাতে তাঁহার সম্পর্কে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্য এখানে একথা বলা দরকার মনে করিতেছি যে, পাদ্রী কারিনো গোয়া জেলে আটক ভারতীয় বন্দীদের যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা মেলা ভার। একথা বলিতে আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই যে, ফাদার কারিনোর সাহায্য না পাইলে গোয়াতে ভারতীয় বন্দীদের যে পরিমাণ দুর্গতি হইত, তাহা গোয়ার ভিতরের অবস্থার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে বোঝা কষ্টকর। এখানে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় কন্সাল জেনারেল গোয়াতে থাকার সময় আমাদের যেসব ব্যাপারে কখনো কোনোই সাহায্য করিতে পারেন নাই, আমরা ফাদার কারিনোর চেষ্টায় নানানভাবে জেল কর্তৃপক্ষ ও পর্তুগীজ সরকারের কাছ হইতে সেসব ব্যাপারেও যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য ও উপকার পাইয়াছি। অবশ্য ফাদার কারিনোর এই--ব্যাপারে একটি সুবিধা ছিল, যাহা ভারতের কন্সাল জেনারেলের ছিল না—ভারতীয় বন্দীদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে ফাদার কারিনো সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক লোক হওয়াতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মযাজক হওয়াতে পর্তুগীজ রাজকর্মচারীদের কাছে অনুরোধ উপরোধ করিয়া তিনি যেসব কাজ করাইয়া নিতে পারিতেন, তাহা সরকারীভাবে ভারতীয় দূতাবাসের দ্বারা সকল সময় সম্ভবপর হইত না। অবশ্য গোয়ার আপামর সাধারণের প্রতি তাঁহার সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং ডম্ বস্কো মিশনের অধ্যক্ষ হিসাবে সমগ্র গোয়াতে তাঁহার মর্যাদা ও সম্মানের প্রভাবও হয়ত ইহার পিছনে কাজ করিয়া থাকিবে। কিন্তু মোটের উপর আমাদের নিতান্ত অসহায় অবস্থার দুর্গতির দিনে এই রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে আমরা যে উপকার পাইয়াছি, সে ঋণ সহজে শোধ হইবার নয়, ভোলারও নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি কারিনো জাতিতে স্প্যানিশ এবং তিনি জেসুইট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু যুদ্ধের পর তিনি ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করিবেন স্থির করিয়া ভারতীয় নাগরিক অধিকার গ্রহণ করেন। সেই হিসাবে তিনি আমাদের দেশের লোক। ভারতবর্ষে তিনি আছেনও প্রায় ২৫ বছর কাল—বিগত যুদ্ধের বহুপূর্ব হইতে। ইতালিতে সেণ্ট ডম্ বস্কোর নামে দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের জন্য যে ক্যাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে (বাংলা দেশে লিলুয়াতে, কৃষ্ণনগরে এবং কার্সিয়ং-দার্জিলিংয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে ডম্ বস্কো প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত আশ্রম ও স্কুল আছে) অতি অল্প বয়সে কারিনো সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে যুক্ত হন। এপর্যন্ত তাঁহার জীবন কাটিয়াছে স্কুল এবং অনাথালয়ের ছোট শিশুদের মধ্যে। লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া, কাজ শিখাইয়া মানুষ করিয়া তোলার চেষ্টার ভিতর দিয়া। বোধহয় শিশুদের কাছ হইতে শিশুসুলভ সরলতা ও সহজ আনন্দময় স্বভাবের কিছুটা তিনি নিজের জন্যও আহরণ করিয়া নিয়াছেন। আর তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ বহুদর্শিতা ও মানব প্রেম। মিঃ মনি তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর প্রথম দিন হইতেই তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়া তাঁহার সম্পর্কে যে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা মনে জাগিয়াছিল, আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক মতের বা জীবনাদর্শের বিভিন্নতা সত্ত্বেও, তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। "One of God's good men"—বলিয়া তাঁহাকে সেই প্রথম দিনেই মনে মনে স্বীকার করিয়া নিয়াছিলাম; আজও তাঁহাকে আমি সেইভাবে জানি।

মিঃ মনি চলিয়া যাইবেন। আমার নামে জেল গেটে তখন এক পয়সাও জমা নাই।

মিঃ মনি প্রথমবার আমার জন্য পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে যে কুড়িটি টাকা জমা দিয়াছিলেন তাহা টুথব্রাশ, মাজন, সাবান, গেঞ্জী-চাদর—এসব কিনিতেই খরচ হইয়া গিয়াছে। আমার অবশ্য তখন অন্য কোনো জিনিসের বেশি দরকার নাই। কিন্তু সেলের ভিতরে একা একা সময় কাটানোর জন্য পড়ার বই বা লেখার কাগজ-কলম কিছুই নাই। আর তাছাড়া কিছু সাবান থাকিলে স্নান ও কাপড় কাচার সুবিধা হয়। সে সব বিষয় মিঃ মনিকে জানাইতেছি—গোয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার আগে, তিনি কি আমাদের জন্য এসব জিনিসের কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিবেন? মিঃ মনি কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই কারিনো বলিলেন—"সে কি? আপনার কাছে লেখার জন্য কাগজ-কলম পর্যন্ত নাই! আচ্ছা এই নিন—আমার কলমটি এখন হইতে আপনি ব্যবহার করুন।" মিঃ মনিও কিছুটা হক্-চকাইয়া গেলেন; আর তাঁহার চেয়েও বেশি হক্-চকাইয়া গেল যে-পর্তুগীজ দোভাষীটি পর্তুগীজ সরকারের তরফে সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিল সে ব্যক্তি। কোনো বন্দীকে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়া তাহার হাতে সরাসরি কিছু দেওয়া নিয়ম নয়। কিন্তু মিঃ মনি বা সেই লোকটি কিছু বলার আগে—"কি কষ্ট! কি পরিতাপ! একটি লেখার কলম পর্যন্ত নাই!"—এই বলিতে বলিতে তিনি কলমটি আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। আমিও সুযোগ বুঝিয়া কলমটি তাঁহার হাত হইতে নিয়া পকেটের ভিতরে আটকাইয়া রাখিলাম—সামনে যে পুলিস কর্মচারী ছিলেন, পাদ্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া আর কিছু বলিলেন না। এইভাবে ফাদার কারিনোর কল্যাণে আমি প্রথম সেলের ভিতর লেখন-সামগ্রী অর্থাৎ কলম, কাগজ এসব রাখার অনুমতি আপনা-আপনি পাইয়া গেলাম। আমি খালি পুলিস কর্মচারীকে বলিলাম—"আপনি দয়া করিয়া আমাদের জেলের কাব্‌কে (Cab—কর্পোরাল) একটু এই কলম সম্পর্কে বলিয়া দিবেন।" সে বেচারী আবার একবার পাদ্রীর দিকে তাকাইয়া রাজী হইয়া গেল। ইহার আগে সেলের ভিতর একটি পেন্সিল পর্যন্ত দেখিলে কেরুস্ বা ফের্নান্দের হাতে আর রক্ষা ছিল না, সমগ্র সেল তল্লাসী করিয়া পেন্সিল তো পেন্সিল, কাগজে দাগ কাটা যাইতে পারে এমন যে কোনো সামগ্রী তাহারা কাড়িয়া নিয়া চলিয়া যাইত। অবশ্য একথার অর্থ এ নয় যে, গোপনে এ সব জিনিস আমরা রাখিতাম না। পিছনের জানালা দিয়া পর্তুগীজ সৈনিকদের কল্যাণে আমরা কাগজ পেন্সিল কিছু যে সংগ্রহ করি নাই তাহা নয়। গোরে এবং শিরুভাই তাঁহাদের সেলে আগেই কাগজ কলম রাখার অনুমতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিলাম। আমাদের চোরাই কাগজ পেন্সিল খুব সন্তর্পণে কেরুস্ এবং ফের্নান্দের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইত। ফাদার কারিনোর কলমটি আধা-সরকারীভাবে আমার হাতে আসায় এবং প্রিজন ভ্যানের প্রহরী মারফত কলম রাখার অনুমতি আমাদের জেল-কোটাল দুইজনের কাছে পৌঁছানোয় আমিও গোরে এবং শিরুভাইয়ের মত সেলে লেখন-সামগ্রী রাখার অধিকারী হইলাম। ইহার পরে অবশ্য 'আল্‌তিন্যো'তে থাকিতে থাকিতে আমরা—অর্থাৎ ভারতীয় বন্দী যে পাঁচজন ছিলাম—সকলেই ক্রমশ কাগজ কলম রাখার অধিকারী হই।

কন্সাল এবং ফাদার কারিনোর সঙ্গে সাক্ষাতের দিনেই আমরা জানিতে পারি সুরাতের প্রজা-সমাজবাদী নেতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরভাই ছোটুভাই দেশাইকে দমন হইতে গ্রেপ্তার করিয়া পাঞ্জিমে আনা হইয়াছে। ১৫ই আগস্ট দমন ও দিউ হইতে কিছু ভারতীয় ও স্থানীয় দমন-দিউ-বাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঞ্জিম আনা হইয়াছে সেকথা 'আল্‌তিন্যো'-তে বসিয়া আমরা অস্পষ্টভাবে শুনিয়াছিলাম বটে। কিন্তু এই বন্দীরা কে বা কাহারা, তাহা আদৌ

জানিতে পারি নাই, কিংবা আমাদের বন্ধু ঈশ্বরভাই যে তাহাদের মধ্যে আছেন সে খবরও আমাদের কানে পোঁছায় নাই। আমাদের মতই মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের দপ্তরে তাঁহাকেও মিঃ মনি ও ফাদার কারিনোর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আনা হয়। সে দিন তাঁহার সঙ্গেও আমাদের দেখা হয় এবং আমরা চলিয়া আসার পর ভারতে গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন কোন দিকে মোড় নিতেছে বা না নিতেছে সে সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদ তাঁহার নিকট হইতে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। দমন সীমান্তে গ্রেপ্তারের পর ঈশ্বরভাইয়ের উপর অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার এবং মারধোর ইত্যাদি করা হয়—প্রায় পনর দিন বাদে আমাদের সঙ্গে যখন তাঁহার অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হইয়া গেল, তখনও তাঁহার দেহে সে সব চিহ্ন মিলায় নাই। আর পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে থাকিয়া তাহা মিলানো সম্ভবও ছিল না। 'আল্‌তিন্যো' জেলে আর যাই হোক ঘরে কিছুটা আলো-হাওয়া আসিত। কুয়ার্তেলের অন্ধকূপ সেলে তাহার বালাই ছিল না। যাই হোক ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরভাইও 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের পাশের একটি সেলে বদলী হইয়া আসেন।

ভারতীয় দূতাবাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর গোয়াতে বেসরকারী ভাবে ভারতীয় বন্দী-দের তত্ত্বাবধায়ক বা 'অভিভাবক' হিসাবে থাকিলেন খালি পাদ্রী কারিনো। অবশ্য সরকারীভাবে এ কাজ করার দায়িত্ব ইজিপ্ত সরকারের। কারণ ভারত ও পর্তুগালের ভিতর সর্বপ্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় পর্তুগীজ এলাকায় সকল প্রকার ভারতীয় স্বার্থের তত্ত্বাবধান ও খোঁজখবর করার ভার ভারত গভর্নমেণ্ট ন্যস্ত করেন মিত্ররাষ্ট্র ইজিপ্তের উপর। পর্তুগাল তাহার তরফে পর্তুগীজ স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেয় ব্রাজিলের উপর। কিন্তু ভারতীয় বন্দীরা এই ব্যবস্থা হইতে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের আগে পর্যন্ত কোনই কার্যকরী সাহায্য পান নাই। পরে অবশ্য ইজিপ্‌শিয়ান্‌ প্রতিনিধি মিঃ আহমদ খলিল আমাদের সঙ্গে দুইবার দেখা করেন। কিন্তু গোয়া হইতে চলিয়া আসার শেষ দিন পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের জেল-জীবনের বিপদ-আপদে ভরসাস্থল বা অবলম্বন বলিতে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন এই শিক্ষাব্রতী ক্রিশ্চিয়ান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী-পাদ্রী জোসে কারিনো।

॥ ৩৩ ॥

কাজীর বিচার ঃ উপক্রমণিকা

ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে সেই দিনই আমাদের শেষবারের মত দেখা; কারণ আমাদের কন্সালেট (দূতাবাস) বন্ধ হইয়া যাইবে এবং মিঃ মনি গোয়া হইতে পাকাপাকিভাবে চলিয়া যাইবেন বলিয়াই ফাদার কারিনোর সঙ্গে সেদিন আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। কন্সালেট বন্ধ হইয়া যাওয়ার মাস তিনেকের ভিতরেই আমাদের কয়জনের মধ্যে এক মধু লিমায়ে ভিন্ন অন্য সকলেরই মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচার শেষ হইয়া যায় এবং প্রত্যেকের দশ বছর করিয়া মূল সাজা এবং তাহার উপর আরও দুই বছর করিয়া ফাউ সাজা, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে বারো বছর সাজা হইয়া যায়। অবশ্য সাড়ে বারো হাজার 'রুপিয়া' (পর্তুগীজ ভারতের টাকার নাম; এক 'রুপিয়া' আমাদের এক টাকার সমান) খেসারত বা মুক্তিপণ গুনিয়া দিলে দশ বছর বাদে এই ফাউ সাজা মাফ পাওয়ার ব্যবস্থাও

এই সঙ্গে ছিল। এ সবই আমরা 'আল্তিনো' জেলে থাকিতে থাকিতেই চুকিয়া যায়। বিচার এবং সাজা হওয়ার পরেও আমরা কিন্তু আমাদের পুরাতন আবাসস্থল 'আল্তিনো' জেলেই থাকিয়া যাই। মনে রাখিতে হইবে, পর্তুগীজ আইনে 'পুলিস হেফাজত', 'জেল হেফাজত', 'বিচারাধীন বন্দী' আর আদালতে 'দণ্ডিত' মেয়াদ প্রাপ্ত বন্দী—এ সবের ভিতরে কোনো তফাত করা হয় না। গোয়াতে জেলের উপরেও পুলিসের কর্তৃত্ব অব্যাহত, বিশেষত সে জেলে যদি রাজনৈতিক বন্দী থাকে। সালাজারী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে 'পুলিস হেফাজত' ছাড়া অন্য কোন রকম 'হেফাজত' নাই।

আমাদের 'আল্তিনো' জেল তাই আসলে পুলিস 'লক্-আপ' বা 'হাজত' গোছের জায়গা হইলেও বিচারের আগে এবং পরে ঐ একই জায়গায় আমাদের স্থিতি ঘটিল। মাস পাঁচ ছয় পরে ভারত গভর্নমেণ্ট যদি ইজিপ্ট গভর্নমেণ্টের মারফৎ আমাদের খোঁজ-খবর করার চেষ্টা না করিতেন এবং ইজিপ্ট গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি মিঃ খলিল যদি সেই সূত্রে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের খোঁজে গোয়া পর্যন্ত না আসিতেন, তাহা হইলে আমরা কতদিনে যে 'আল্তিনো' জেলে কেরুস এবং ফের্নান্দের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তি পাইতাম তাহা বলা শক্ত।

মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে আমাদের যে বিচার হয় নানা দিক দিয়া তাহা বেশ কৌতুকাবহ ও কৌতূহল জাগানোর মত ঘটনা। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালে বিচারের অর্থ বিচারের আন্দাজ একমাসকাল আগে একবার আপনাকে আপনার জবানবন্দীর জন্য ট্রাইব্যুনালের একজন জজের সামনে একদিন একঘণ্টা বা আধঘণ্টার জন্য হাজির করা হইবে। এই জজের সরকারী নাম অডিটর জজ—পর্তুগীজ ভাষায়—'O Juiz Auditor do Tribunal Militar'। ইহার পর আসল বিচারের দিন দুইজন মিলিটারী অফিসার এবং একজন আইনজ্ঞ সিভিল জজ লইয়া গঠিত পুরা ট্রাইব্যুনালের সামনে এক-আধ ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা, কিম্বা কখনো সখনো কেস-বিশেষে, তিন-চার ঘণ্টার জন্য হাজির করা হইবে (নানা সাহেব গোরের বিচার আমাদের মধ্যে সবার আগে হয়, কারণ তিনি সবার আগে সত্যাগ্রহী দল নিয়া গোয়াতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচারে প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল)। কিন্তু যা কিছু বিচার ঐ এক দিনেই খতম হইয়া যায়। সালাজারী কাজীর বিচারে আট হইতে আঠাশ বছর পর্যন্ত মেয়াদের সাজা দিবার জন্য একদিনের ঐ এক ঘণ্টার বিচারই যথেষ্টও। আর বন্দীদের পক্ষে, সাজা পাওয়ার আগেও যে অবস্থা, পরেও সেই অবস্থা। সে দিক দিয়া গোয়াতে আমাদের বন্দী জীবনে মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের এই বিচার-প্রহসনের তেমন কোনো গুরুত্ব নাই। কিন্তু সালাজারী ব্যবস্থায় সালাজারের বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দলের লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার কিভাবে করা হয়, কিভাবে তাহাদের আদালতে হাজির করা হয় বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ কতটুকু দেওয়া হয় বা না হয়, বাদী-প্রতিবাদী পক্ষে সওয়াল জবাব কি ভাবে হয়—এই ট্রাইব্যুনালের বিচারের ভিতর গিয়া নিজে না গেলে তাহা জানার সৌভাগ্য আমার হইত না। তা ছাড়া যে রকম সামন্ততান্ত্রিক জাঁকজমক ও সমারোহের ভিতর দিয়া এই বিচারের অভিনয় করা হয় নিজের চোখে তাহা না দেখিলে পর্তুগালে ও গোয়াতে সালাজারী রাজনীতির পিছনে ঠিক কি ধরনের মানসিকতা কাজ করিতেছে সেটাও ভালোভাবে বোঝা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

পনরই আগস্টের গুলীকাণ্ডের পর আমাদের ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য হাজির

না করিয়া মুক্তি দিয়া ভারতে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হোক—এই ধরনের একটা কথা বোধ হয় গোয়ার পর্তুগীজ শাসক মহলে উঠিয়া থাকিবে। পনেরোই আগস্টের ঘটনাবলী ভারতবর্ষে যতই উত্তেজনা বা বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়া থাকুক না কেন, গোয়াতে পর্তুগীজ শাসন কর্তৃপক্ষের অনেকের মনে তাহাতে যে কিছুটা আশংকা ও ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নিরস্ত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর এইভাবে গুলী চলার পর বা ১৯।২০ জন ভারতীয় নাগরিক পর্তুগীজদের গুলীতে এভাবে নিহত হওয়ার পর, ভারত সরকার যে খালি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া এবং পর্তুগালের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াই চুপচাপ বসিয়া থাকিবেন—পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ সেটা কোনোক্রমেই আশা করেন নাই। তাঁহাদের মনে বরাবর ভয় ছিল যে, কোনো না কোনো অজুহাতে ভারত গভর্নমেণ্ট গোয়ার উপর সশস্ত্র হামলা করিয়া গোয়া দখল করিয়া নিবেন। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট সে রকম কিছু করার আগেই কূটনৈতিক দাবার চাল হিসাবে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট যদি বন্দী ভারতীয় সত্যাগ্রহী নেতাদের বিনা শর্তে মুক্তি দেয়, তাহা হইলে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব হইবে। কারণ ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইলে পৃথিবীর জনমতের কাছে তাহার অর্থ হইবে—পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট গোয়ার ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আপোস মীমাংসা চায়। সে অবস্থায় গোয়ার উপর সশস্ত্র হামলা করিতে যাওয়াটা ভারতের আন্তর্জাতিক শান্তির নীতির সঙ্গে খুব খাপ খাইবে না। আমরা অবশ্য এ সম্পর্কে সরকারী সূত্রে কোনো খবরই পাই নাই। তবে এই ধরনের একটা আলাপ-আলোচনা যে তখন গোয়াতে সরকারী মহলে চলিতেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের পর্তুগীজ সৈনিক-বন্ধুরা অনেকেই এই সময়ে চুপিসারে আমাদের পিছনের জানালার ধারে আসিয়া আমাদের জানাইয়া গিয়াছে—"খুব সম্ভব তোমাদের শীঘ্রই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; তোমাদের ছাড়িয়া দেওয়ার কথা আজ আমাদের কুয়ার্তেলে (মিলিটারী হেড কোয়ার্টার) শুনিয়া আসিলাম।" এ বিষয়ে কিছু আনুষঙ্গিক প্রমাণও ছিল। আগস্ট মাসের শেষ দিকে গোরের বিচারের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু সেদিন গোরেকে আদালতে হাজির করা হয় নাই। তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রথমে কিছু বলা হয় নাই। কদিন বাদে জানাইয়া দেওয়া হয় কিছু পরে আবার বিচারের তারিখ ধার্য হইবে। গোরের বিচার ও সাজা হয় পূর্ব নির্ধারিত তারিখের প্রায় মাসাবধিকাল বাদে। আমার বিচারের কিছুদিন আগে আমার জগন্নাথ রাওয়ের ও রাজারাম পাতিলের পুলিস কুয়ার্তেলে একদিন এক সঙ্গে জনৈক উচ্চপদস্থ পর্তুগীজ গোয়েন্দা অফিসারের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। এই অফিসারটির সঙ্গে কথায় কথায় আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ১৫ই আগস্টের পর আমাদের মুক্তি দেওয়ার কোনো প্রস্তাব উঠিয়া থাকিলেও গভর্নর জেনারেল পাউলো বের্নার্দ গেদীস ইহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করায় সে প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ধামা চাপা পড়িয়া যায় ও নাকচ হইয়া যায়। জেনারেল বের্নার্দ গেদীসের মত ছিল—পর্তুগীজ আইন যাহারা জানিয়া শুনিয়া ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদের পর্তুগীজ আইন অনুযায়ী সাজা পাইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যদি তাহাদের শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিতেও হয় তাহা হইলে একেবারে কোনো সাজা না দিয়া রেহাই দেওয়া উচিত নয়। তাহা দিলে পৃথিবীর কাছে পর্তুগীজ রাষ্ট্রের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হইবে। কারণ যাহাই হোক, কিছুদিন বাদে আমাদের ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করিয়া সাজা দেওয়াই স্থির হয় এবং গোরে হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে আমাদের সকলের

সাজা হইয়া যায়। ইহার আগে যে সমস্ত ভারতীয় সত্যাগ্রহী ১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী সত্যাগ্রহ করার জন্য গোয়াতে প্রবেশ করেন খালি তাহাদেরই সাজা হইয়াছিল। তাহারা ভিন্ন আমাদের আগে অন্য কোনো ভারতীয়ের (বোধ হয় একমাত্র পর্তুগালে নির্বাসিত দত্তাত্রেয় দেশপাণ্ডে ছাড়া; তাঁহার বিচার ও সাজা হয় ১৯৪৬ সালে, কিন্তু তাঁহার বিচার মিলিটারী ট্রাইব্যুনালে হয় নাই) পর্তুগীজ মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচার বা সাজা হয় নাই।

বিচারের পদ্ধতিটা সাধারণত এই রকমঃ

যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে পুলিস মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের নিকট চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করার পর তাহাকে একদিন ট্রাইব্যুনালের অডিটর জজের সম্মুখে জবানবন্দীর জন্য হাজির করা হইবে। অডিটর জজের কাজ সাধারণত করেন, ট্রাইব্যুনালের জজেদের ভিতর অসামরিক বা সিভিল জজ যিনি সেই ব্যক্তি। আমাদের অডিটর জজ ছিলেন কুয়াদ্রস নামে জনৈক গোয়ানীজ জজ। অডিটর জজের এজলাসে পুলিসের কোনো লোক উপস্থিত থাকিবে না। সেখানে জজ আসামীকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি পুলিসের কাছে যাহা বলিয়াছ, তাহার অতিরিক্ত তোমার কিছু বলার আছে কি না।' তা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে পুলিসের অভিযোগের সারমর্মও এই সময়ে তাহাকে জানানো হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে যদি তাহার কিছু বলার থাকে সে কথা বলার সুযোগও তাহাকে এই সময় দেওয়া হয়। যদি আসামী তাহার উকীল মারফৎ জবানবন্দী দিতে চায় কিম্বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজের তরফে কোনো সাফাই সাক্ষী খাড়া করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার উকীল ও সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ সব কিছু হাজির করিতে হইবে। যদি সে তাহা না পারে তাহা হইলে এ বিষয়ে তাহাকে দ্বিতীয় কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। অবশ্য জজ অডিটরের কাছে সে নির্ভয়ে যাহা খুশি বলিতে পারে, আদালতের ব্যবহারের জন্যই সে বক্তব্য ব্যবহার করা হয়। পুলিসের হাতে সাধারণত তাহা যায় না। কিন্তু পুরা ট্রাইব্যুনালের সামনে যখন আসল বিচারের পালা আসে তখন ট্রাইব্যুনালের জজেরা আসামীকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করিলে তাহার নূতন করিয়া কোনো বিবৃতি বা জবানবন্দী দিবার কোনো অধিকার নাই। সেখানে তাহার পক্ষে কোনো কথা বলিতে হইলে তাহা বলিবেন, হয় তার নিজের পক্ষের নিযুক্ত উকীল কিংবা আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত সরকারী উকীল। আসামীর নিজের উকীল না থাকিলে আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকার পক্ষ হইতে নিযুক্ত একজন উকীল থাকেন। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন মিলিটারী অফিসারই নিযুক্ত থাকেন। আমাদের সকলেরই পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন কাপ্তেন মিরান্দা নামে জনৈক মিলিটারী অফিসার; যদিও আমাদের তরফে তাঁহাকে কোনো ওকালতি করিতে হয় নাই। তাহা করিয়াছিলেন গোয়ার প্রবীণ অ্যাডভোকেট শ্রীবিনায়ক রাও কৈস্রো। কিন্তু আসামী পক্ষে ওকালতীর অর্থ মিনিট বিশ পঁচিশেকের বয়ান। ইহার বেশী কিছু করিবার কোনো ক্ষমতা আসামী পক্ষের উকীলের নাই। তা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক আসামীর পক্ষ সমর্থন করা উকীলদের পক্ষে নিরাপদও নয়। পুলিসের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িবে এবং পরে কোনো-না-কোনো অজুহাতে পুলিস তাঁহাকে কায়দায় ফেলিবেই ফেলিবে। আমাদের পক্ষের সিনিয়র অ্যাডভোকেট সিনর কৈস্রো নিতান্ত বয়স্ক বৃদ্ধ লোক বলিয়া বোধহয় অব্যাহতি পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জুনিয়ার শ্রীতাম্বাকে আমরা গোয়া হইতে চলিয়া আসার

পর পুলিস আটক করে।* শুনিয়াছি লিস্‌বনে সুপ্রীম কোর্টে যিনি আমাদের তরফে আপীল দায়ের করিয়াছিলেন সেই পর্তুগীজ অ্যাডভোকেট ভদ্রলোককেও পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া দু বছরের সাজা দিয়াছে।

বিচারের তারিখ কবে, বা অডিটর জজের কাছে কবে কাহাকে হাজির করা হইবে সে সম্পর্কে আসামীকে বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্বে কোনো নোটিশ দেওয়া হয় না। হাজতে থাকিতে থাকিতে যে কোনো একদিন সকালে গোটা নয়েকের সময় হুকুম আসিবে—'জলদী তৈরী হও, অডিটর জজের কাছে কিংবা ট্রাইবুনালে যাইতে হইবে।' একটা পরোক্ষ আগাম নোটিশ অনেক সময় পাওয়া যাইত ক্ষৌরকর্মের তোড়জোড়ে। 'আল্‌তিন্যো'তে সাধারণত পনর দিনে একবার দাড়ি কামানোর এবং মাসে একবার চুল কাটার পালা ছিল। কিন্তু আদালতে বা অডিটর জজের কাছে হাজির করিতে হইলে ক্ষৌরী-র দিন ধার্য না থাকিলেও আসামীদের দাড়ি কামাইয়া ভদ্র চেহারা করিয়া নিয়া তবে আদালতে নেওয়া হইত। সুতরাং বে-টাইমে হঠাৎ কোনো দিন নাপিত আসিয়া কাহারও দাড়ি কামাইয়া বা ক্ষৌরী করিয়া দিলে বোঝা যাইত আদালতে বা জজের কাছে যাওয়ার সমন আসিবে।

গোরের বিচার শেষ হয় সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে, তার কদিন বাদে শিরুভাউ লিমায়ের তাহার পর রাজারাম পাতিলের বিচার হইয়া যায়। তাহার পর জগন্নাথ রাওয়ের পালা। আমার বিচার ও সাজা হয় নভেম্বরের শেষ দিকে। তবে মোটের উপর এটুকু বলা যায় যে আমাদের বিচার গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়। গোয়াবাসী বন্দীদের বেলায় নয় মাস বা দশ মাসের আগে বিচার শেষ হইতে বড় একটা দেখা যাইত না। ডাক্তার দুভাসী ১৯৫৫ সালের মার্চ-এপ্রিলে গ্রেপ্তার হন; তাঁর বিচার হয় প্রায় এক বছর পরে ১৯৫৬ সালে। সে হিসাবে আমাদের সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে, কারণ আমাদের গ্রেপ্তারের চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই আমাদের বিচার শেষ হইয়া যায়। বিচারে অবশ্য কাহারো বেলাতেই সময় এক দিনের বা দু দিনের বেশী লাগে না—এক দিন অডিটর জজের সামনে জবানবন্দী আর একদিন ট্রাইবুনালের সামনে পেশ হইয়া আসল বিচার। কিন্তু তাহার জন্যই আট মাস হইতে এক বছর বা তাহার চেয়ে বেশী সময় অপেক্ষা করিতে হয়। আদালতে বিচার হইয়া সাজা পাওয়ার অন্য কোনো বিশেষ অর্থ বা তাৎপর্য নাই, এক এ ছাড়া যে কতদিন জেলে থাকিতে হইবে, তাহার একটা হদিস পাওয়া যায়; আর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হয় না। তা ছাড়া বিচারাধীন অবস্থায় বা পুলিসের তদন্তের সময় নিয়মিত যে তক্তা-প্রহার রাজনৈতিক বন্দীদের সহ্য করিতে হয়, তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সেও একটা কম বড় কথা নয়—অন্তত গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে সে এক পরম অব্যাহতি। ভারতীয় সত্যাগ্রহী নেতাদের কাহাকেও যদিও এ ভাবে (অর্থাৎ গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের মতন নিয়মিত রুটিন-বাঁধা হিসাবে) তক্তা-পিটুনী খাইতে হয় নাই, তবুও বিচার হইয়া গেলেই যেন মনে হইত যাহা হউক এবার একটা হিল্লে হইল। সে হিসাবে আমিও কিছুটা আগ্রহের সঙ্গে আমার বিচারের দিন গুনিতে ছিলাম।

অবশেষে একদিন আমারো জজ অডিটরের এজলাসে ডাক পড়িল। আমার ভাগে কেন জানি না, সেদিন নাপিত জোটে নাই; হঠাৎ সকাল বেলায় ফের্নান্দ আসিয়া জানাইল—

---

* এ্যাডভোকেট তাম্বার গত বৎসর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হইয়াছে।

"জামা-কাপড় পড়িয়া তৈরী হইয়া নাও, জজ অডিটারের কাছে তোমাকে যাইতে হইবে।" আমি গালে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "Nao Barbeiro" (no barber? নাপিত নাই?)। তখন দুটো-একটা পর্তুগীজ কথা শিখিয়াছি। ফের্নান্দ ধমক দিয়া উঠিল "—Nao sei, de presse! de presse!" (জানি না, জলদি কর। জলদি কর।) কি করি, কোনো মতে জলদি কাপড় চোপড় পড়িয়া তৈরী হইয়া নিলাম। কিন্তু জজের কাছে হাজির করার আগে গাড়ি ঘুরাইয়া পুলিস কুয়ার্তেলের পুলিস সেলুনে আমাকে নিয়া গিয়া আমাকে যথারীতি ক্ষৌরী করাইয়া দাড়ি গোঁফ চাঁছিয়া তবে কাজী কুয়াদ্রুসের সামনে পেশ করা হইল। সালাজারী আমলে আর যাই হোক বা না হোক জাতীয় ঐতিহ্য বা 'ট্রাডিশান' বিগড়ানোর যো নাই; তাহা কোনো সময় সালাজার বরদাস্ত করেন না। ফলে আমার একটু লাভ হইয়া গেল প্রায় চার-পাঁচ মাস পরে পাথরে শান দেওয়া ভালো ক্ষুরে দাড়ি কামানোর স্বর্গীয় আরাম উপভোগ করিলাম। 'আল্তিন্যো'তে পনের দিন অন্তর জাবেদা ভাবে কোদালচাঁছা ক্ষৌরকর্মের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যাঁহাদের নাই, আমার সেদিনকার দাড়ি কামানোর স্বর্গ-সুখ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কাজী কুয়াদ্রুসের কাছে গিয়া আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। সেদিন আমার সঙ্গে আরও দুইজন আসামীকে তাঁহার কাছে হাজির করার দিন ছিল। তাঁহারা দুজনেই আমার সাথে 'আল্তিন্যো' হইতে আসিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কুয়াদ্রুসের কাছে হাজির হওয়ার ডাক পড়িল আমারই প্রথম। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের দপ্তরেই জজ অডিটরের এজলাস। আমরা আরো দুইবার এই বাড়িতে এবং এজলাস ঘরে আসিয়া গিয়াছি, কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার উপলক্ষে। কুয়াদ্রুস সঙ্গে ইংরাজী জানা দোভাষী এবং মিলিটারী প্রসিকিউটর ও কোর্ট ডিফেন্ডর বা আসামী পক্ষের সরকারী উকীল কাপ্তেন মিরান্দাকে সঙ্গে নিয়া এজলাসে বসিয়াছেন। সংগীন উঁচানো রাইফেল কাঁধে সান্ত্রী পাহারা পিছনে খাড়া আছে। ঘরে ঢুকিতেই দোভাষী প্রশ্ন করিল—'ইংরেজী না হিন্দী'। আমি জবাব দিলাম—'ইংরেজী'। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জবানবন্দীর নিয়মের বয়ান ইংরাজীতে পড়িয়া শোনাইয়া দেওয়া হইল; আমি নিজের কোনো উকীল বা সাক্ষীপ্রমাণ দিতে চাই কিনা, সে সব কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। আমি যখন হাসিয়া জানাইলাম আমার সেরূপ কোনো কু-মতলব নাই, তখন কুয়াদ্রুস পর্তুগীজ ভাষায় দোভাষীকে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করার আদেশ দিলেন। প্রশ্নটি এইরূপঃ

"মিঃ চৌধুরী! আপনার বিরুদ্ধে পুলিসের অভিযোগ এই যে, আপনি বিগত দশই জুলাই তারিখে ৫১জন লোক সঙ্গে নিয়া আইনসম্মত পাসপোর্ট বা অনুমতিপত্র না নিয়া গোয়াতে পর্তুগীজ এলাকায় প্রবেশ করিয়াছেন; শুধু তাই নয় উক্ত তারিখে আপনি পর্তুগীজ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে গোয়াবাসী পর্তুগীজদের মনে রাজদ্রোহের চিন্তা জাগানোর জন্য এবং তাহাদের সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রদ্রোহে প্রবৃত্ত করার জন্য চীৎকার করিয়া পর্তুগীজ বিরোধী রাজদ্রোহকর স্লোগান দিতে দিতে ওয়াল্পইয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?"

আমিঃ—"না মহাশয়, আমার বিশেষ কিছু বলার নাই একমাত্র এ ছাড়া যে পর্তুগীজদের মনে কোনো রাজদ্রোহকর চিন্তা জাগানোর কোনো চেষ্টা আমি করি নাই। গোয়াবাসীরা ভারতীয়; তাহাদের আমরা সর্বরকমে ভারতীয় বলিয়া মনে করি, জাতিগতভাবে, ধর্মগতভাবে, কৃষ্টিগতভাবে। আমরা মনে করি বিদেশী পর্তুগীজদের গোয়াতে জোর

করিয়া থাকার কোনো অধিকার নাই। পর্তুগীজদের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নাই, কিন্তু ভারতের কোনো অংশে পর্তুগীজদের থাকার কোনো অধিকার নাই, সেই কথাটা পর্তুগীজ শাসন কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিবার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে আমি আমার পঞ্চাশজন সহকর্মীর সঙ্গে গোয়ায় প্রবেশ করি। এজন্য কোনো অনুমতিপত্র প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না বা আমি কোনো অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহাও মনে করি না।"

কুয়াদ্রস আমার এই কথায় উত্তেজিত হইয়া এবার নিজেই দোভাষীকে কোনো কথা বলিতে না দিয়া ইংরাজীতে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া একসঙ্গে প্রশ্ন ও ধমক বর্ষণ করিলেন:— "আপনি কিভাবে একথা বলিতেছেন? ভারত ভারত হওয়ার আগে হইতে আমরা গোয়াতে আছি, সেকথা কি আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন? আপনার মত শিক্ষিত লোকের একথা জানা উচিত যে, ইংরেজরা ভারতে আসার বহু আগে হইতে আমরা পর্তুগীজরা ভারতে আছি!"

বুঝিলাম ভদ্রলোক ভালোই ইংরাজী জানেন, অধিকাংশ শিক্ষিত গোয়াবাসীর মতো ইংরাজীতে কথাবার্তা বলিতে পারেন, সম্ভবত লিখিতেও পারেন। কিন্তু তবু নিজেকে রাজভক্ত 'পর্তুগীজ' প্রমাণ করার জন্য আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য দোভাষী রাখিয়াছেন। সালাজারের মতে গোয়া খাস পর্তুগালেরই একটা অংশ এবং গোয়াবাসীরা সকলেই জাতিতে ও কৃষ্টিতে পর্তুগীজ। সেই সালাজারী রাজত্বে বাস করিয়া অন্যরকম মত পোষণ করিলে কুয়াদ্রস্‌কে "মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের" জজ বনিতে হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই জবাব দিলাম—"এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ থাকা স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস হইতে আমরা এক এক জনে এক এক রকমের শিক্ষা গ্রহণ করি; আমি আপনার আদালতের আসামী। আশা করি আমাকে আপনার সঙ্গে ইতিহাসের বিতর্কে প্রবেশ করিতে হইবে না।"

কুয়াদ্রস্‌ একথায় হঠাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া আবার ইংরাজী হইতে পর্তুগীজ ভাষাতে ফিরিয়া গেলেন; তবে ইতিহাসের প্রশ্নে আর প্রবেশ করিলেন না।

॥ ৩৪ ॥

জজ কুয়াদ্রসের জেরা

জজ কুয়াদ্রসের সঙ্গে আমার বাদানুবাদের বিশদ কোনো বিবরণ এখানে দেওয়ার দরকার নাই। অডিটর জজের সামনে জবানবন্দী হইয়া যাওয়ার পর কয়েকদিন বাদে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করা হয়। আমরা জানিতাম আমাদের বিরুদ্ধে কি চার্জ ফ্রেম করা হইবে। সুতরাং সে সম্পর্কে মনে বিশেষ কৌতূহল ছিল না। কুয়াদ্রসের সামনে বাকী ৪০-৫০ মিনিট সময় সেদিন আমার কাটিয়াছিল তাহার সঙ্গে গোয়ার ব্যাপার নিয়া রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে। কুয়াদ্রস খাঁটী রাজভক্ত 'পর্তুগীজ' (গোয়াতে গোয়াবাসীদের খালি রাজভক্ত হইলেই চলে না। সালাজার যেদিন হইতে গোয়াকে খাস পর্তুগালের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তখন হইতে পুলিসের নেকনজর হইতে বাঁচিতে হইলে গোয়াবাসীদের নিজেদেরকে 'পর্তুগীজ' বলিয়া জাহির করিতে হয়। আর কুয়াদ্রস্‌

জাতীয় লোকদের তো কথাই নাই; সালাজারের হুকুমনামা জারী হওয়ার বহু আগে হইতে কুয়াদ্রুসরা নিজেদের মনেপ্রাণে 'পর্তুগীজ' বলিয়া মনে করে। ইংরেজ আমলে এরূপ 'বাঙগালী ইংরেজ' বা 'ভারতীয় ইংরেজ' এদেশেও বিরল ছিল না); তাই ভারতীয় পার্লামেণ্টের মেম্বার আমার কাছে গোয়ার ব্যাপারে ভারতের, বিশেষ করিয়া পণ্ডিত নেহরুর, কি মারাত্মক রকমের ভুল হইতেছে সেটা প্রমাণ করার জন্য কুয়াদ্রুস ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কুয়াদ্রুসের বক্তব্য গোয়াতে কোনো আন্দোলন নাই। গোয়ার লোক কোনোমতেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে চায় না, তাহারা পর্তুগালকেই নিজের দেশ ও বেশী আপনার বলিয়া মনে করে। তাঁহার ধারণা পণ্ডিত নেহরু মিছামিছি গোয়া দখল করার জন্য একটা অজুহাত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আমাদের গোয়াতে পাঠাইয়াছেন। আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি আন্দোলন নাই বলিতেছেন, তাহা হইলে আপনাদের সব জেলে এত লোক সব গ্রেপ্তার করিয়া রাখিয়াছেন কেন? গোয়ার মতো এতটুকু জায়গায় যদি এভাবে প্রত্যহ শ'য়ে শ'য়ে লোক জেলে থাকে, তাহা হইলে কি করিয়া বুঝিব যে এখানে কোনো আন্দোলন নাই?" কুয়াদ্রুস খুব উত্তেজিতভাবে একবার ইংরাজীতে একবার পর্তুগীজ ভাষায় দ্রুতবেগে বলিতে লাগিলেন—"ওঃ ওরা। ওরা আর কয়জন। গোয়ার ছয় লাখ লোকের মধ্যে কয়েক শ' লোক যদি "Traicao contra soberania"-তে (ত্রায়সাঁও কঁত্রা সোবেরানিয়া—অর্থাৎ রাজদ্রোহে) লিপ্ত হইয়া থাকেও তাহা দিয়া একথা কখনো বলা চলে না যে, গোয়ার সব লোক পর্তুগালের বিরুদ্ধে। কখনো নয়! এই তো আমার কথাই ধরুন না কেন, আমি তো গোয়ারই লোক, কিন্তু আমি নিজেকে পর্তুগীজ বলিয়া মনে করি!" আমি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলাম—"আপনি তাহা মনে না করিলে আপনি পর্তুগীজ মিলিটারী আদালতের জজ হইয়া আমাদের বিচার করিতে আসিতেন না! কিন্তু দেখুন আপনার মত এত পর্তুগীজ ভক্ত রাজকর্মচারীরা থাকা সত্ত্বেও এত পুলিস ও সৈন্য-সামন্ত গোয়াতে মজুদ থাকা সত্ত্বেও জেলে বন্দী রাজদ্রোহীদের সংখ্যাই দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে!" কুয়াদ্রুস্—"এ তো আপনাদের দেশ হইতে সিনর নেহরুর হুকুমে যে মিথ্যা রেডিও প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয় তাহার ফল।" আমি—"যাই হোক লোকে আমাদের মিথ্যা রেডিও প্রোপাগাণ্ডা শোনে তাহা হইলে এবং তাহার দ্বারা প্রভাবিত হয়? আপনি যে কথা বলিতেছেন তাহা ঠিক হইলে, ভারতের মিথ্যা রেডিয়ো প্রোপাগাণ্ডাতে এখানকার লোকে কিছুতেই প্রভাবিত হইত না, তাই নয় কি?" কুয়াদ্রুস্ ইহার উত্তরে খুব লাগ্‌সই গোছের কোনো জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া খালি আমাকে শাসাইয়া বলিলেন—"আপনি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়া পর্তুগীজ সরকারের আইন ভঙগ করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে আমাদের আইন অনুযায়ী কঠোর সাজা পাইতে হইবে?" আমি আর কি উত্তর দিব? খালি বলিলাম—"সাজা পাইব জানিয়াই আসিয়াছি। আপনার যেরূপ অভিরুচি আমায় সাজা দিতে পারেন।"

ইহার পরে আমাকে কুয়াদ্রুসের হুকুমে তাঁহার সম্মুখ হইতে সরাইয়া নিয়া যাওয়া হইল। আমার সঙেগ আরও দুইজনের জবানবন্দী তখনও বাকী ছিল বলিয়া পাশের একটি ঘরে গিয়া আমাকে আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার পরে যথাসময়ে আবার আমরা পুলিস পাহারায় 'আল্‌তিন্যো'তে ফিরিয়া নিজের কুঠুরীজাত হইলাম।

জজ অডিটরের সামনে গোয়াবাসী যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে হাজির করা হয়, একটি প্রশ্ন বিনা ব্যতিক্রমে তাহাদের প্রায় প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করা হয়—'তুমি ভারতের সঙেগ গোয়ার অন্তর্ভুক্তি চাও, না পর্তুগালের সঙেগ থাকতে চাও?' যত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া

একথার জবাব কেহ দিক না কেন,—'পর্তুগালের সঙ্গে থাকিতে চাই না, বা গোয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই'— একথা কেহ বলিলেই হইল। তাহার ভাগ্য সেই কথাতেই ১০।১২ বছরের মত নির্ধারিত হইয়া যাইবে! জজ অডিটরের সামনে জবানবন্দীর কোনো রেকর্ড রাখা হয় না। তবে জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া জজ অডিটর যদি কোনো মন্তব্য করেন কিম্বা কোনো অর্ডার দেন, তাহা হইলে সেইটুকু মাত্র একজন কেরানী লিখিয়া রাখে। তবে জজ অডিটরের এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করে আসামীর বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ ধারায় কি চার্জ গঠিত হইবে।

সমগ্র গোয়াতে জজ কুয়াদ্রুস্ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধি বা কুখ্যাতি, যাহাই বলা যাক, অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার একটি কারণ লোকের ধারণা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বন্দীদের দীর্ঘমেয়াদী সাজা দিবার পিছনে ছিল প্রধানত কুয়াদ্রুসের প্ররোচনা, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেহ হয়ত 'জয় হিন্দ' বলিয়া শ্লোগান দিয়াছে, কাহারো কাছে হয়ত ভারতীয় জাতীয় পতাকা কিম্বা পণ্ডিত নেহরুর ছবি পাওয়া গিয়াছে; কুয়াদ্রুসের কাছে জেরা ও জবানবন্দীর জন্য আসিলে এবং তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া সোজাসুজি হাতজোড় করিয়া মাফ না চাহিলে ১০।১২ বা ১৪।১৫ বছরের সাজা তাহার অবধারিত। গোয়ার অধিবাসী হইয়া নিজেকে সময়ে অসময়ে 'পর্তুগীজ' সাহেব বলিয়া জাহির করার উদগ্র আগ্রহের জন্যও কুয়াদ্রুস্ গোয়ার সাধারণ লোকের নিতান্ত অপ্রিয়ভাজন ছিলেন। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার উপর কয়েকবার গুপ্ত জাতীয়তাবাদী দলের সশস্ত্র হামলা হয়। দু' একবার তিনি অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান; কিন্তু তৃতীয়বার তাঁর কাছে ডাকযোগে বইয়ের পার্সেলের আকারে বোমা পাঠানো হয়। সেই পার্সেল খুলিতে গিয়া বিস্ফোরণে তাঁহার মুখ সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া যায় ও দুই হাতের কয়েকটি আঙ্গুল উড়িয়া যায়। এই সময় মারাত্মকভাবে আহত হইয়া ভদ্রলোক বহুদিন হাসপাতালে ছিলেন। পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট অবশ্য তাঁহাকে নানা সরকারী পদবীভূষিত করিয়া সম্মান দিয়াছেন। হাসপাতাল হইতে সুস্থ হইয়া বাহির হওয়ার পর তিনি আরও কিছুকাল মিলিটারী আদালতে অডিটর জজের কাজ করেন। ইহার কিছু পরে তিনি পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের কোথাও হাইকোর্টের জজ হিসাবে প্রমোশন পাইয়া গোয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি, ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কোনোরূপ অভদ্র ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী না জানার ভান করিয়া দোভাষী নিয়া পর্তুগীজ ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলা এবং নিজেকে 'পর্তুগীজ' বলিয়া জাহির করার চেষ্টা আমার কাছে বেশ কিছুটা হাস্যকর বলিয়া মনে হইয়াছিল। গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসী জাতীয়তাবাদীরা তাঁহাকে কেন এত ঘৃণার চোখে দেখেন তাহা বোঝা আমার পক্ষে কোনো রকম অসুবিধার কারণ হয় নাই।

ইহার কিছুদিন বাদেই আমি আমার বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগের ফিরিস্তি বা চার্জশীট পাই এবং তাহার সপ্তাহ তিনেকের ভিতর খাস মিলিটারী আদালতের সামনে আমার বিচার হয়। পর্তুগীজ মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচারের পদ্ধতি হইতেছে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তাহা প্রমাণ করার জন্য একজন মিলিটারী কোর্ট প্রসিকিউটর থাকিবেন তেমনি আসামীপক্ষে আসামীর নিজের কোন উকীল না থাকিলে একজন কোর্ট ডিফেণ্ডর থাকিবেন। প্রসিকিউটরের মত এই 'ডিফেণ্ডর'-ও একজন ক্যাপ্তেন র‍্যাঙ্কের অফিসার। আমাদের সকলের প্রসিকিউটর হিসাবে চার্জশীটে দস্তখত ছিল

ম্যাক্সিমো সিজার নামে জনৈক ভদ্রলোকের। কিন্তু কোর্টে সরকারী বয়ান করিয়াছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক; তাঁহার নামটি আমার মনে নাই। আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য যে মিলিটারী অফিসার নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার নাম কাপ্তেন মিরান্দা। তিনি পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস হইতে আমরা গোয়া হইতে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আগুয়াদা দুর্গের বন্দীশালায় আমাদের ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট হিসাবে কাজ করেন। তাঁহার কথা পরে আবার আসিবে। পর্তুগীজ মিলিটারী অফিসারদের মধ্যে এরূপ সজ্জন ও প্রকৃত ভদ্রলোক আমার চোখে খুব কম পড়িয়াছে।

জানি না কাপ্তেন মিরান্দাকে আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলিতে দিলে তিনি কি বলিতেন বা কি যুক্তি দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে আমাদের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় নাই; কারণ আমাদের পক্ষে আমাদের নিজেদের নিযুক্ত উকীল একজন ছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি গোয়ার প্রবীণতম অ্যাডভোকেটদের মধ্যে অন্যতম, শ্রীযুক্ত বিনায়ক রাও কৈস্‌রো। শ্রীযুত কৈস্‌রো এক সময়ে গোয়া ও পর্তুগীজ ভারতের সরকারী মহলেও যথেষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পর্তুগীজ ভারতের গভর্নর জেনারেলের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া তিনি বহু বৎসর কাজ করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্য তিনি পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া পড়িতে থাকেন; ফলে শাসন-পরিষদের সদস্যপদও আর তাঁহার থাকে নাই।। শেষদিকে তিনি গোয়াতে ভারতীয় দূতাবাসের পর্তুগীজ আইন উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। নিতান্ত বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়াই হয়ত পর্তুগীজ পুলিস তাঁহার গায়ে হাত দিতে সাহস পায় নাই। আর তাছাড়া, তিনি রাজনীতির সঙ্গে ইদানীং সক্রিয়ভাবে কোনো যোগাযোগ রাখিতেন না তাহাও তাঁহার গ্রেপ্তার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার একটা কারণ হইতে পারে। অবশ্য আমাদের সকলের পক্ষ সমর্থনের সময় তাঁহার সহকারী হিসাবে যিনি কাজ করিয়াছিলেন, সিনর তাম্বা—তিনি শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। ১৯৫৭ সালে একদিন কোর্ট হইতে কাজ সারিয়া বাহির হওয়ার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সত্যাগ্রহী হিসাবে অবশ্য আমরা কেহই আত্মসমর্পণ করিতে চাই নাই বা আমাদের দিক দিয়া তাহার এমন কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কিছুটা পর্তুগীজ আইনকানুনের ধরন-ধারণ জানার জন্য, অর্থাৎ কি ধরনের আইনে কোন বিধি বলে আমাদের সাজা হইতেছে তাহা বুঝিয়া নেওয়ার জন্য; আর কতকটা আমাদের বক্তব্য আদালতে যাহাতে যথাযথভাবে পেশ করা যায়, তাহার জন্যও আমরা ভারতের কন্সাল জেনারেল গোয়াতে থাকিতে থাকিতেই আমাদের পক্ষে আদালতে আমাদের বিচারের সময় পর্তুগীজ ভারতের আইন-কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক স্থানীয় উকীলের সাহায্য পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যতদূর মনে হয়, কন্সাল জেনারেল মিঃ মনি ফাদার কারিনোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে সিনর কৈস্‌রো ও সিনর তাম্বাকে আমাদের পক্ষে উকীল হিসাবে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং দুজনেই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার জন্য তাঁহারা যে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করেন নাই শুধু তাই নয়; গোয়া হইতে লিস্‌বন পর্যন্ত আমাদের মোকদ্দমা চালাইতে যাহা কিছু আনুষঙ্গিক খরচপত্র হইয়াছে তাহাও তাঁহারাই বহন করিয়াছিলেন।

আমাদের ক'জনের মধ্যে এক মধু লিমায়ে আদালতে বিচারের কাজে কোনোরূপ

অংশ গ্রহণ করিতে চান নাই বা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো উকীলের সাহায্য নিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহার বা আমাদের মধ্যে সাজার ব্যাপারে কোনোরূপ তারতম্য হয় নাই। ভারতীয় সত্যাগ্রহী দলের নেতা হিসাবে গোয়ায় প্রবেশ করার জন্য আমাদের যে কয়জনকে গ্রেপ্তার করিয়া গোয়াতে রাখা হইয়াছিল, তাহাদের সকলের জন্যই দশ বছর ও দু' বছর ফাউ সাজা (বা ফাউ সাজার বদলে সাড়ে বারো হাজার টাকা খেসারত বা মুক্তিপণ) নির্ধারিত ছিল। শ্রীযুত কৈস্‌রো আদালতে আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদের সাজা কিছু হাল্কা করিয়া দিতে পারেন নাই। অবশ্য পারিবেন বলিয়া তাঁহার বা আমাদের মনে কোনো রকম ভুল ধারণাও ছিল না। কিন্তু আদালতে আমাদের বক্তব্য যাহাতে গুছাইয়া বলা যায় এবং পর্তুগীজ সরকারী প্রচার বিভাগের লোকেরা আমাদের জবানীতে যাহাতে আমরা যে কথা বলিতে চাহি নাই এরূপ কোনো কথা বসাইয়া আমাদের বিরুদ্ধে বা ভারতের বিরুদ্ধে কোনোরূপ মিথ্যা কথা প্রচার করার সুযোগ না পায়, প্রধানত সেজন্যই আমরা আদালতে বিচারের সময় একজন নিজেদের উকীল রাখার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। কৈস্‌রো এবং তাম্বা আমাদের পক্ষে উকীল থাকায় আরও একটু সুবিধা ছিল এই যে, দু'জনারই ইংরেজী ও পর্তুগীজ ভাষার উপর বিশেষ দখল ছিল। কাজে কাজেই প্রধানত যে সাহায্যের জন্য আমরা নিজেদের উকীল দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা আমরা পুরা মাত্রাতেই পাইয়াছিলাম। অর্থাৎ আমাদের ইংরেজী বক্তব্য পর্তুগীজ ভাষায় আদালতে পেশ করার কোনোই অসুবিধা হয় নাই।

তবে পর্তুগীজ আইনে ব্যবস্থা যেরূপ, বিশেষ করিয়া মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারে, এই ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনের সত্যকার কোনো সার্থকতা নাই। কারণ পর্তুগীজ আইনে পুলিস অভিযোগ করিয়াই খালাস। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিসের অভিযোগক্রমেই সরাসরি অপরাধী বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। নিজেকে নির্দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে সাফাই সাক্ষী হাজির করার দায়িত্ব অভিযুক্তের। জেলে পুলিসের হেফাজতে আটক থাকিয়া কোনো রাজনৈতিক বন্দীর পক্ষে সাক্ষী যোগাড় করা দূরে থাকুক, ভাল নির্ভর-যোগ্য উকীল যোগাড় করাও সম্ভব নয়। আমাদের অবশ্য সে প্রয়োজন ছিল না। আমরা আমাদের অপরাধ অস্বীকার করি নাই; আইনত আমাদের উপর যাহা কিছু শাস্তি ধার্য হইতে পারে তাহার জন্য মনে মনে তৈরী হইয়াই আমরা সত্যাগ্রহী হিসাবে পর্তুগীজ গভর্নমেন্টের আইন ভাঙিতে আসিয়াছিলাম। সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনের সত্যকার কোনো প্রয়োজন আমাদের ছিল না। কিন্তু যদি কোনো রাজনৈতিক বন্দী সত্য সত্যই আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চান মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে তাহার সুযোগ নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

মনে রাখিতে হইবে গোয়ার ভিতরে রাজবন্দীরা সকলেই সত্যাগ্রহী নন। অনেকের নামে মারাত্মক ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিযোগ পুলিসের তরফ থেকে দায়ের করা থাকে। কিন্তু গোয়াতে এবং খাস পর্তুগালেও সালাজারী আমলে আদালতে ও পুলিসের ব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে রাজনৈতিক কারণে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে আত্মসমর্থনের সত্যকার কোনো সুযোগ নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাছাড়া আসামী পক্ষের উকীলের মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে কথা বলার সময়ও বাঁধা থাকে। মিলিটারী আদালত বলিয়া, প্রসিকিউটর যে রকম অল্প সময়ে তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন, আসামী পক্ষের উকীলকেও তেমনি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার যা কিছু বলার আছে

তাহা বলিয়া শেষ করিতে হয়। সাধারণত এই সময় মিনিট পনর-কুড়ির বেশী দেওয়া হয় না। এই হাস্যকর রকমে পরিমিত ও সংকীর্ণ সময়ের ভিতর আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনে কি ধরনের সওয়াল-জবাব সম্ভব, তাহা সকলেই আন্দাজ করিতে পারেন। কিন্তু তবু আদালতে বিচারের একটা ঠাট্ বজায় রাখা হয়। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালে তাহার মধ্যে অবশ্য ঠাট্টাই আসল, বিচারটা গৌণ। বিচারের রায় কি হইবে তাহা পূর্ব হইতে নির্ধারিত থাকে। রায় দিতে সময় বেশী লাগে না; আসামী পক্ষের উকীলের বয়ানের ফলে তাহার বিশেষ কোনো রকম-ফের হয় না।

আমার বিচারের দিন আমাকে খুব সকাল সকাল নিয়মমাফিক দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া ভদ্র চেহারা করিয়া নিয়া আদালতে হাজির করা হয়। সেদিন আর নাপিতের কোনো গোলযোগ হয় নাই। ইহার পূর্বে (প্রায় মাস দুয়েক আগে) নানা সাহেব গোরের বিচারের সময় শ্রীমতী গোরেকে আদালতে বিচারের দিন উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সেই সময় পুণা হইতে আমার ব্যবহারের জন্য কিছু জামা-কাপড় আনিয়া দিয়াছিলেন; ইহার আগে আমার জামা-কাপড় বলিতে বেশী ছিল না। কাজে কাজেই সেদিন আমি একেবারে পাট-ভাংগা ধোপদস্ত জামা-কাপড় পরিয়া ভদ্রবেশে আদালতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলাম। এজলাসে উপস্থিত হইয়া দেখি, সে এক মহা-সমারোহের ব্যাপার। এজলাস ঘরের একদিকে মঞ্চের উপর একটি লাল কাপড়ে মোড়া লম্বা টেবিলের পিছনে ট্রাইব্যুনালের তিনজন জজের বসার জায়গা; সেখানে তিনটি উঁচু পিঠওয়ালা জমকালো রকমের কারুকার্য করা উঁচু চেয়ার রাখা আছে। তাহার উপরে পিছনে দেওয়ালে লাল ও সবুজ রংয়ের জাতীয় পতাকা এবং পর্তুগীজ 'কোট্-অফ-আর্মস্' বা রাষ্ট্র-প্রতীকচিহ্ন আঁকা সোনালী, সবুজ ও লালের জমকালো সমাবেশ। সম্মুখে জজেদের টেবিলের ডান দিকের দেওয়ালের কাছে কিছুটা নীচু আর একটি মঞ্চের উপর কোর্ট প্রসিকিউটর তাঁহার জরীর কাজ করা মিলিটারী ইউনিফর্ম পরিয়া নিজের দলবল নিয়া বসিয়া আছেন। বাঁ দিকে ঠিক সেইভাবে আসামী পক্ষের উকীলদের জায়গা নির্দিষ্ট আছে। সেখানে আমাদের কোর্ট-ডিফেণ্ডের কাপ্তেন মিরান্দা বসিয়া আছেন; তাঁহার পরনে খাকী মিলিটারী ইউনিফর্ম। তাঁহার পাশে আর দুটি চেয়ারে সিনর কৈস্‌রো ও তাম্বা দুজনে উপবিষ্ট। সিনর কৈস্‌রো-কে এজলাস ঘরের চাপা আলোয় যেন বিগত শতাব্দীর কোনো সম্ভ্রান্ত পর্তুগীজ মার্কুইসের মত দেখাইতেছে। তাঁর থুতনীর নীচে দুই দিকে আঁচড়াইয়া ভাগ করা ল্যাটিন ধরনের ছাঁটা কাঁচা-পাকা দাড়ি, ব্যাক-ব্রাশ করা মসৃণ চুল, কালো কোট সব কিছু মিলিয়া কৈস্‌রো-র চেহারাতেও যথেষ্ট 'স্টেজ-এফেক্ট' সৃষ্টি করিয়াছে। আদালতের মেঝেতে অনেকখানি জায়গা কাঠের রেলিং দিয়া ঘেরা আছে। তাহার মধ্যখানে সাধারণ একটি হাতলবিহীন চেয়ার। সেইটি আমার বসার জন্য নির্দিষ্ট আসন। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে সাধারণত আসামীদের বসিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক—আমি ভারত পার্লামেন্টের একজন সদস্য, ইহাও তাহার কারণ হইতে পারে—ট্রাইব্যুনাল বিচারের সময় আমার বসার জন্য একটি চেয়ার দিয়াছিলেন। সেই রেলিংয়ের পিছন দিকে দু সারি স্টীল হেল্‌মেট পরা রাইফেল-সঙ্গীন-ধারী মিলিটারী গার্ড দাঁড়াইয়া। আমাকে আমার প্রহরীরা এজলাস ঘরে নিয়া আসিতেই, আমার দুপাশে দুজন মিলিটারী প্রহরী দাঁড় করাইয়া ইশারায় আমাকে আমার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসার আদেশ দেওয়া হইল।

আমি আমার চেয়ারে আসিয়া বসিতেই কৈস্‌রো নিজের জায়গা হইতে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া আমাকে মৃদুস্বরে জানাইয়া দিয়া গেলেন ট্রাইব্যুনালের জজেরা ঘরে আসার সময় সকলে যখন উঠিয়া দাঁড়াইবে আমিও যেন উঠিয়া দাঁড়াই। জজেরা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যেন সে কথার জবাব দিই। এ ছাড়া আমার আদালতের সামনে যাহা কিছু বক্তব্য আছে বিনা দ্বিধায় যেন তাহা আমি বলিয়া যাই। তাঁহার যা কিছু বলার দরকার হইবে আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে তিনি তাঁহার বিতর্কের সময় তাহা বলিবেন। আমি যদি কোনো কথার জবাব না দিতে চাই, তাহা হইলে যেন বলি—'এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমার অ্যাড্‌ভোকেট পেশ করিবেন।' ইহার পূর্বে একদিন ওকালতনামা সই করার সময় ছাড়া, সিনর কৈস্‌রো-র সঙ্গে আমার কোনো দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনিও উকীল হিসাবে আমার সঙ্গে কথা বলার কোনো অনুমতি পান নাই। অবশ্য তাহার বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না; কারণ আমাদের বক্তব্য কি ধরনের হইবে, তাহা তিনি মোটামুটি জানিতেন।

কৈস্‌রো আমার সঙ্গে কথা শেষ করিয়া নিজের জায়গায় ফিরিয়া যাইতেই এজলাস ঘরের বাহিরের দরজায় যে শান্ত্রী ছিল, সে হঠাৎ নকীবের মত বাজখাই গলায় হাঁকিয়া পর্তুগীজ ভাষায় কি যেন বলিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে যে সব প্রহরীরা ছিল, তাহারা বুটের গোড়ালী খট্ খট্ করিয়া ঠুকিয়া অ্যাটেনশন্ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া গেল। মিলিটারী বিউগ্‌ল বাজিয়া উঠিল—ট্রাইব্যুনালের জজেরা এজলাসে প্রবেশ করিতেছেন। সবার আগে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট জমকালো রকমের সাদা মিলিটারী পোশাকের উপর লাল 'ইপোউলেৎ' ও তাহার সঙ্গে জরীর কাজ করা ঝালর, ব্যাজ ইত্যাদি। তাহার পিছনে দ্বিতীয় মিলিটারী জজ আর সবার শেষে সিভিলিয়ান পোশাকে আমাদের পুরাতন বন্ধু অডিটর জজ কুয়াদ্রুস্—একের পর এক আসিয়া নিজেদের আসন গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, জজেরা আসার সঙ্গে এজলাস ঘরের সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। পিছনের মিলিটারী গার্ডরা রাইফেল হাতে 'প্রেজেণ্ট আর্মস্' করিয়া জজদের সামরিক অভিবাদন জানাইল—এ সকলই আনুষঙ্গিক। জজেরা বসিতেই মিলিটারী গার্ডরা ছাড়া আর সকলেই আবার নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে জজ হুকুম দিলেন "কোর্ট আরম্ভ হইল; আসামীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বিচারের কাজ আরম্ভ হইয়া গেল।

॥ ৩৫ ॥

মেয়াদ বারো বছর!

পর্তুগীজ মিলিটারী কাজীর বিচারে বিচার-প্রকরণ খুব সংক্ষিপ্ত। জজ 'আসামীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ' তাহা জানিতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট প্রসিকিউটর উঠিয়া টাইপ করা চার্জশীটে লিখিত অভিযোগগুলি গড় গড় করিয়া পড়িয়া যান। তখন ট্রাইব্যুনালের জজেরা প্রয়োজন মনে করিলে আসামীদের দু' এক কথা জেরা করিতে পারেন। আমাদের ট্রাইব্যুনালের যিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন তিনি একজন বুড়ো কর্নেল; বেচারী

আইন-কানুনের বেশী ধার ধারিতেন বলিয়া মনে হয় নাই। তাঁর টাক-পড়া মাথার উপরের স্কাই-লাইট হইতে আলো আসিয়া পড়িয়া টাক চিক্‌চিক্ করিতেছে। চোখ প্রায় আধ-বোঁজা, কিন্তু মুখে খুব একটা রাসভারী ভাব। তিনি একবার খালি কুয়াদ্রসের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইলেন। দ্বিতীয় মিলিটারী জজ একজন ছোকরা গোছের মেজর; তাঁহার ট্রাইব্যুনালের কাজকর্মের দিকে নজর বা মনোযোগ দেওয়ার মত কোনো ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হইল না। তিনি চেয়ারে বসা অবধি টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজ নিয়া মনে হইল ছবি আঁকার কাজে গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিবিষ্ট আছেন। ট্রাইব্যুনালের তরফে জেরার কাজ করেন সাধারণত কুয়াদ্রস্; তিনি প্রেসিডেন্টের ইশারা পাইয়া জেরা আরম্ভ করিয়া দিলেন ঃ

"আসামী শাউদ্যুরি (চৌধুরী শব্দের পর্তুগীজ উচ্চারণ), তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তাহা তোমাকে জানানো হইয়াছে। তুমি বে-আইনীভাবে পর্তুগীজ প্রজাদের পর্তুগীজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করার জন্য পর্তুগীজ সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া গোয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলে। কেন তুমি এ কাজ করিয়াছিলে? আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কিছু বলার আছে?"

আমি ঃ "এক এছাড়া আমার বলার কিছু নাই যে, গোয়াতে ভারত ও গোয়াবাসী জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের জোর করিয়া থাকার কোনো ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না। আমি জানি গোয়ার জনসাধারণ পর্তুগালের শাসন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য বহুদিন ধরিয়া আন্দোলন চালাইতেছে। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমি ইহাও জানি, পর্তুগাল জোর করিয়া গোয়াতে থাকার জন্য এবং গোয়ার স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে নির্বিচার দমন চালাইয়া যাওয়ার জন্য ভারতীয় জনমত বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত আছে। এ সবের ফলে যাহাতে ভারত ও পর্তুগালের ভিতর কোনো অশান্তি বা তিক্ততার অবস্থার সৃষ্টি না হয় বা অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে না যায়, সেজন্য আমি ও আমার সহযাত্রী স্বেচ্ছাসেবকের দল পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাছে এ দাবি জানাইতে আসিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন গোয়াবাসী জনসাধারণের মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া গোয়া ছাড়িয়া চলিয়া যান। আমি কোনো অপরাধ করিয়াছি বলিয়া আমি নিজে মনে করি না; যাহারা গোয়ার ও ভারতের জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া গোয়ায় আছে তাহারাই অপরাধী।"

কুয়াদ্রস্ ঃ "আসামী শাউদ্যুরি! তুমি জানিতে না যে, পর্তুগীজ রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী তোমার এই কাজ মারাত্মক রকমের অপরাধ? তুমি ভারত পার্লামেন্টের একজন সদস্য, তুমি নিশ্চয়ই আইন-কানুন জানো। তোমার এই কাজের ফলে জনসাধারণের সামনে অপরাধ অনুষ্ঠানের এক নিতান্ত কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইতেছে তাহা কি তুমি বোঝ নাই?"

আমি ঃ "আমি মনে করি, পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য নিরস্ত্র প্রতিবাদের পথ নিয়া আমি জনসাধারণকে ন্যায় ও শান্তির পথে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কথা বলিয়াছি; ইহার মধ্যে অন্যায় কিছু নাই। আমরা ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্য অনুযায়ী এ কাজ করিয়াছি; ইহাই ভারতের নীতি।"

কুয়াদ্রস্ ঃ "ইহা তোমাদের নীতি হইতে পারে। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে পর্তুগীজ

রাষ্ট্রের আইন অমান্য করিলে সেই আইন অনুযায়ী তোমার সাজা হইতে বাধ্য—তাহা তুমি জানো?"

আমি ঃ "শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের আছে এটুকু আমি জানি। ট্রাইব্যুনাল তাহাদের কর্তব্য পালনের জন্য যেরূপ অভিরুচি শাস্তি আমাকে দিতে পারেন। সে বিষয়ে আমার বলার কিছু নাই।"

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ সওয়াল জবাবের পর প্রসিকিউটর কাপ্তেন সাহেব একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

"আসামী! তুমি বলিতেছ ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে যাহাতে কোন অশান্তি বা তিক্ততার সৃষ্টি না হয়, তাহার জন্য তুমি গোয়ায় আসিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে তোমার কথা জানাইতে চাহিয়াছিলে। তুমি ভারত পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে নিশ্চয়ই জানো যে, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট গোয়া প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য বার বার একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা গোয়ার রেলপথ, মর্মুগাঁও বন্দর, শুল্কনীতি পরিচালনা এ সমস্ত ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু ভারত সরকার গোয়ার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করায় পর্তুগাল সে দাবী মানিতে পারে নাই। সুতরাং শান্তি বিঘ্নিত হইলে তাহার দায়িত্ব ভারতের, পর্তুগালের নয়।"

আমি উত্তর দিলাম—"ভারত গভর্নমেণ্ট কি দাবী করিয়াছেন বা না করিয়াছেন সে সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নাই। আমার দাবী আপনারা গোয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করুন।"

এই কথা বলিতে প্রসিকিটর চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খেয়াল ছিল না কখন অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম। হঠাৎ দেখি, ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট খুব বিরক্ত হইয়া বিড় বিড় করিয়া দোভাষীকে কি বলিতেছেন; বুঝিলাম, তাঁর বক্তব্যের উপলক্ষ্য আমি বা আমার কোনো আচরণ; দোভাষী বলিল,—

"আসামী শাউদ্যুরি! ট্রাইব্যুনালের মহামান্য প্রেসিডেণ্ট মহোদয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভারত ইউনিয়নের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কি রীতি এই যে, ট্রাইব্যুনালের সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলার সময় তাহারা পকেটে হাত দিয়া কথা বলে?"

অন্য সময় হইলে হয়ত এ কথায় হো হো করিয়া জোরে হাসিয়া উঠিতাম। সমস্ত বিচার পদ্ধতির যাত্রার ধরনে নাটকীয় ভাব-ভঙ্গী ইতিমধ্যেই আমার মনে যথেষ্ট চাপা হাসি জমাইয়া তুলিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট বুড়ো কর্নেল সাহেবের দিকে তাকাইয়া কেমন যেন কৌতুকমিশ্রিত করুণার ভাব মনে জাগিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পর্তুগীজ-দের অন্যান্যদের মতো পর্তুগালের অতীত সাম্রাজ্য গৌরবের ঐতিহ্যকে আঁকড়াইয়া বেচারীরা ইতিহাসের দুর্বার বন্যার স্রোতের সামনে আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছে। নিজের মিলিটারী ক্লাস, পর্তুগীজ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতাপ জাহির করার একটা উপলক্ষ্য জুটিয়াছে আমার পকেটে হাত দেওয়াতে। প্রেসিডেণ্টের বিরক্তিপূর্ণ প্রশ্নে চকিত হইয়া তখন সমস্ত কোর্টের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। আমি মনে মনে খুব কৌতুক অনুভব করিয়াও পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া নিয়া বলিলাম—"মহামান্য কোর্টের মর্যাদা হানি করার লেশমাত্র উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি সামরিক আদব-কায়দায় ততটা অভ্যস্ত নই। আমার অন্যমনস্কতার জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি ও মার্জনা

ভিক্ষা করিতেছি। মহামান্য ট্রাইব্যুনাল যেন দয়া করিয়া আমার এই ত্রুটির জন্য আমায় ক্ষমা করেন।"

আমার একথা শুনিয়া মনে হইল বৃদ্ধ কর্নেল খুব খুশী হইয়াছেন। প্রসন্নমুখে তিনি দোভাষীকে বলিলেন—"আসামীকে বল, সে তাহার আসন গ্রহণ করিতে পারে।"

ইহার পরে আরম্ভ হইল বাদী-প্রতিবাদী পক্ষে উকীলের বয়ান। উভয় পক্ষে সাত-আট মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, তাহার পর কোর্ট মিনিট কুড়ির জন্য মুলতুবী থাকে। সেই সময় জজেরা তাঁহাদের খাস কামরায় গিয়া রায় লেখেন। পাঠক আন্দাজ করিতে পারেন, এই লেখার কাজটুকু করেন কুয়াদ্রুস্, কারণ আইন-কানুনের বাঁধা বুলিতে রায় কিভাবে লিখিতে হইবে জজেদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাহা জানেন।

মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে জজেরা ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিবেন। রায় পড়ার আগে আবার আগের মতো মিলিটারী গার্ডের বিউগ্‌ল বাজিয়া উঠিবে, দুইজন মিলিটারী জজ তাঁহাদের খাপ হইতে কিরীচ খুলিয়া কিরীচ খাড়া করিয়া দাঁড়াইবেন, গার্ডরা 'প্রেজেণ্ট আর্মস্' করিয়া কুর্নিশের ভঙ্গীতে দাঁড়াইবে, কোর্টের উপস্থিত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইবে—তাহার ভিতর কোর্টের কেরানী রায় পড়িয়া দিবে, রায় সংক্ষিপ্ত, পড়িতে মিনিট দুয়েকের বেশী সময় লাগে না। রায় পড়া শেষ হইতে দোভাষী জানাইয়া দিল ঃ

"আসামী শাউদ্যুরি! মহামান্য ট্রাইব্যুনালের আদেশ তোমাকে দশ বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। দশ বৎসর শেষ হইলে তোমাকে আরও দুই বৎসর কারাগারে থাকিতে হইবে; তবে তোমার তরফে যদি কেহ সাড়ে বারো হাজার রুপিয়া সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেয়, তাহা হইলে তুমি দশ বৎসর পরেই মুক্তি পাইবে। মুক্তির পর তোমাকে পর্তুগীজ এলাকায় থাকিতে দেওয়া হইবে না; পর্তুগীজ সীমান্তের ভিতর হইতে তোমাকে বিতাড়িত করা হইবে।"

কাজীর বিচার চুকিয়া গেল। জজেরা আবার ফাইল করিয়া এজলাস হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিচারের দিন সর্বসাকুল্যে ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েকের বেশী কোর্টে থাকিতে হয় নাই। বারো বছরের সাজা মাথায় নিয়া কোর্ট হইতে আবার আমাদের পুরানো আবাসস্থল 'আল্‌তিন্যো'-তেই ফিরিয়া আসিলাম। আবার 'সেই ঘাস, সেই দড়ি, সেই জল'; সেই কেরুস ও ফের্নান্দের অভিভাবকত্ব। পরিবর্তনের মধ্যে এইটুকু হইল যে, সাজা পাওয়ার পর আমাকে, জগন্নাথ রাও জোশী এবং রাজারাম পাতিলকে একটি সেলে একত্র আনিয়া জমা করা হইল। আমাদের নিজেদের দিক দিয়া এটি একটি পরম লাভের ব্যাপার হয়—আমার তো কথাই নাই। রাজারাম এতদিন একা আটক ছিলেন—"Incommunicado"। প্রায় চার মাস বাদে আমাদের সঙ্গে একত্রে আসিয়া তিনিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

॥ ৩৬ ॥

'আল্‌তিন্যো' জেলের মেয়াদী কয়েদী

আমার বিচার ও সাজা হয় ১৯৫৫ সালের এগারোই নভেম্বর। ইহার আগে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে নানা সাহেব গোরে এবং শিরুভাউ লিমায়ের সাজা হইয়া যায়। তাঁহারা দুজনে একত্র এক সেলে ছিলেন। তাঁহাদের পর বিচার ও সাজার পালা আসে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও যোশী এবং রাজারাম পাতিলের। সাজার পর তাঁহাদের দুজনকেও আর একটি সেলে আনিয়া একত্র রাখা হয়। ইহার আগে রাজারাম 'Incommunicavel' অর্থাৎ 'সলিটারী সেলে' বন্দী ছিলেন। 'Incommunicavel' কথার অর্থ ইংরাজীতে Incommunicable। যাহাকে জেলে 'ইন্‌কমিউনিকাভেল' বলিয়া হুকুম জারী হইল তাহার সঙ্গে কেহ কথা বলিতে পারিবে না বা তাকেও কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে দেওয়া হইবে না। 'আল্‌তিন্যো'-তে রাজারামকে একা একা একটি সেলে প্রায় ৪।৫ মাসকাল সময় দিনের পর দিন কাটাইতে হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার কথা বলার সঙ্গী ছিল ফের্নান্দ। ফের্নান্দ 'আল্‌তিন্যো'-র অন্যান্য বন্দীদের উপর খামখেয়ালী ধরনের নানারকম জুলুম করিলেও রাজারামের উপর যে কিছুটা প্রসন্ন ছিল, সে কথা উপরে একবার উল্লেখ করিয়াছি। রাজারাম তাহার কাছে পর্তুগীজ ভাষা শিখিতেন। ফের্নান্দ অবশ্য ইংরেজী বা মারাঠী কি কোঙ্কনী কিছুই জানিত না। দু'জনের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের কোনো সাধারণ ভাষার মাধ্যম ছিল না। কাজ চলিত আকারে ইঙ্গিতে ও 'মুদ্রা'র সাহায্যে। আমরা আশেপাশের সেল হইতে শুনিতাম, রাজারাম মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ও মারাঠীতে ফের্নান্দকে নিজের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করিতেছেন; আর ফের্নান্দ পর্তুগীজ ভাষায় জোরে চিৎকার করিতেছে। রাজারাম এইভাবেই কিছু কিছু পর্তুগীজ কথা আয়ত্তও করিয়াছিলেন। রাজারাম হয়ত বই বা ঘরের অন্য কোনো জিনিস দেখাইয়া বলিতেন— "Nos falamos 'book', what tu falas?" ("নস্‌ ফালামুস্‌ 'বুক', হোয়াট তু ফালাস্‌"। ভাবার্থ "বোল্‌তা হ্যায় বই, তোরা কেয়া বলিস্‌?) ইহার মধ্যে 'book' এবং 'what' কথা ইংরেজী; পর্তুগীজ ফালার অর্থাৎ 'বলা' ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের ধাতুরূপ রাজারাম কোনোমতে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফের্নান্দ শুনিতাম উত্তর দিতেছে "ও লিভ্‌রু" (O livro=বই)। আকার ইঙ্গিতে দুজনের মধ্যে যে অভিনয় চলিত তাহা অবশ্য আমরা দেখিতে পাইতাম না; কিছুটা কানে শুনিয়া এবং বাকীটা কল্পনায় উপভোগ করিতাম মাত্র। এইভাবে রাজারামের পর্তুগীজ জ্ঞান খুব বেশী অগ্রসর হোক বা না হোক, ফের্নান্দের সঙ্গে রাজারামের কিছুটা হৃদ্যতা হইয়াছিল। শিষ্য হিসাবে ফের্নান্দ রাজারামকে অল্প-বিস্তর সুযোগ-সুবিধা দিত। যেমন এক আধ দিন অন্তর স্নান করিতে দেওয়া (আমরা সপ্তাহে একবার স্নান করিতে পাইলে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতাম); হাতমুখ ধোয়া, কাপড় কাচা এ সবের জন্য বেশী সময় দেওয়া বা নানা সাহেবদের সেল হইতে কাগজ-কলম বই আনিয়া দেওয়া ইত্যাদি। নানা সাহেব ও শিরুভাউয়ের কাছে এসব জিনিস কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও একা একা থাকিয়া রাজারাম হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। বেচারী খুবই ফূর্তিবাজ লোক, হৈ চৈ ভালবাসেন; হৈ চৈ করিতে যথেষ্ট

অভ্যস্তও বটে। তাঁহার মত লোকের পক্ষে একা সারাদিন একটি সেলের ভিতর বন্দী অবস্থায় একা একা কাটানো যে কি কষ্টকর তাহা সহজেই আন্দাজ করা চলে। রাজারাম ছাড়া আমাদের মধ্যে মধু লিমায়েকেও 'ইন্‌কমিউনিকাডেল' করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার কারণ, পুলিস কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে, মধু লিমায়ে এবং রাজারাম গোয়াবাসী আটক বন্দীদের জেলের ভিতর গণ্ডগোল সৃষ্টি করার বুদ্ধি দিতেছেন। ঠিক সেরূপ যে তাঁহারা কিছু করিয়াছিলেন তাহা নয়; কিন্তু দু' একদিন তাঁহারা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়া কিছুটা জোরে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাহার পরের দিন হইতে তাঁহাদের আলাদা আলাদা সেলে 'সলিটারী সেল'-এর বন্দী বা 'ইন্‌কমিউনিকাডেল' হিসাবে রাখা হয়। শ্রীজগন্নাথ রাও, আমি বা সুরাতের ঈশ্বরভাই দেশাই—আমরা এই তিনজন কোনো সময় একা আটক থাকি নাই। নানা সাহেব এবং শিরুভাউকে গোড়া হইতেই একত্র এক সেলে রাখা হইয়াছিল। ভারতীয় কন্সালের চেষ্টায় তাঁহারা দুজনে অন্যান্য ভারতীয় বন্দীদের তুলনায় আটক অবস্থাতে কিছুটা বেশী সুযোগ-সুবিধাও পাইয়াছিলেন। পরে যখন দলে দলে ভারতীয় সত্যাগ্রহী গোয়াতে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন আর কাহাকেও সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। আমাদের সাজা না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত তাই আমাদেরকে অন্যান্য গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে গাদাগাদি করিয়া এক একটি সেলে আট-নয়-দশজন করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমাদের অবশ্য কোনো সময়ে এক সেলে পরস্পরের সঙ্গে মিলিতে দেওয়া হইত না; আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সেলে ছিলাম। কিন্তু আমরা কেহই একা একা 'ইন্‌কমিউনিকাডেল' হিসাবে থাকি নাই। ফলে সলিটারী সেলে আটক বন্দীর একঘেয়ে জীবনের যে কষ্ট তাহা কোনো সময় আমাদের ভোগ করিতে হয় নাই। তাহা ছাড়া, গোয়াবাসী রাজবন্দীদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সেলে একসাথে থাকায় গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজবিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন ও তাহার সংগঠন সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে গোয়ার ভিতরকার অবস্থা সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় যাহা হয়ত এই ধরনের সুযোগ না পাইলে আমরা আদৌ জানিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের সাজা হইয়া যাওয়ার পর, মধু লিমায়ে ও ঈশ্বরভাই ছাড়া, আমরা অন্য তিনজন খুব তাড়াতাড়ি এক সেলে আসিয়া পড়িলাম। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, আমাদের সত্যকার বন্দী-জীবন এই সময় হইতে আরম্ভ হয়।

আগেই বলিয়াছি, সাজা হওয়ার পূর্বে বা পরে 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ রুটিন বা খাওয়া-থাকার ব্যবস্থার কোনো রকম তারতম্য হয় নাই। কিন্তু এই প্রথম আমরা আমাদের সঙ্গী গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সাহচর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহির্জগতের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্করহিত কারাজীবনের সত্যকার অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলাম। গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে একত্র থাকার একটা বড় সুবিধা এই ছিল যে, কিছুটা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাপ্তাহিক দেখা-সাক্ষাতের মারফৎ আর কিছুটা পর্তুগীজ সৈন্যদের সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া বাহিরের টুকরা-টাকরা রাজনীতির খবর, বিশেষ করিয়া গোয়া-ভারত কূটনীতি সম্পর্কিত খবর অনেক কিছু পাইতাম। গোয়ার ভিতরে কোথাও কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন সংক্রান্ত ঘটনা ঘটিলে তাহার খবর পরের দিনই প্রায় আমরা পাইয়া যাইতাম। ইহার কিছুকাল আগে হইতে গোয়ার ভিতরে জাতীয়তাবাদী রাজ-

নৈতিক আন্দোলন প্রকাশ্য পথে চলিতে না পারিয়া পর্তুগীজ পুলিসের অত্যাচারের পাল্টা উত্তর হিসাবে গোপন সন্ত্রাসবাদের পথে চলিতে আরম্ভ করে। গোয়া খুবই ছোট জায়গা। তাই সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কোথাও কোনো ঘটনা অনুষ্ঠিত হইলে সে খবর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে কিম্বা জেলের প্রাচীর পার হইয়া আমাদের কাছে পর্যন্ত তাহার খবর আসিয়া পেঁাছাইতে দেরী হইত না। আমাদের বন্ধু গোয়াবাসী রাজবন্দীদের মধ্যে দু' একজন পর্তুগীজ ভাষায় বেশ কথাবার্তা বলিতে পারিতেন এবং অনেকে ভালো কথা বলিতে না পারিলেও অল্পবিস্তর পর্তুগীজ ভাষা বুঝিতেন। পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর মত কিম্বা তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া বাহিরের রাজনৈতিক খবরাখবর সংগ্রহ করার মত পর্তুগীজ ভাষাজ্ঞান আমাদের তিনজনের কেহই অর্জন করিতে পারি নাই; এমন কি ফের্নান্দের ছাত্র রাজারামও নয়। আমাদের ক'জনের পর্তুগীজ ভাষার উপর দখল তখনও 'গুড্‌ মর্নিং', 'ইয়েস-নো-ভেরি গুড্‌' স্তরের উপরে বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। পর্তুগীজ ভাষায় এই সব কথার প্রতিশব্দ—'বং দিয়ং' বা শুভদিন, 'সিং সিং', 'নাও', 'ত্রে বং' ইত্যাদি। খালি এই কটি কথাই নয়, জেলখানায় আমাদের দৈনন্দিন কাজ চালানোর দরকার হয়, এই জাতীয় আরও কয়েকটি কথা যে আমরা শিখি নাই তাহা নয়; যেমন কেহ কোনো কাজ করিয়া দিলে—'ওব্রিগাদু'=বাধিত, ধন্যবাদ। খাবার জল চাহিতে হইলে—'কেরু আগুয়া বেবের', পায়খানায় যাওয়ার অনুমতি চাহিতে হইলে—'কেরু ইর্‌ আ লাত্রিন্‌'; পর্তুগীজ ভাষা জানি না ইংরাজী বলিতে পারি একথা বুঝাইতে হইলে—'নাও ফালোউ পর্তুগেস্‌, ফালোউ এংলেস্‌'—এই রকম দুই-চারিটি টুকরা পর্তুগীজ বুলি আমরা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলাম। সকালে প্রথম কাহারো সঙ্গে দেখা হইলে 'বং দিয়ং'=গুড্‌ ডে, বা শুভ দিন, বলিয়া অভিনন্দন জানানো, বিকালে বা সন্ধ্যায় 'বং তার্দং', রাত্রে কেরুস বা ফের্নান্দ যখন রাতের গুন্‌তি শেষ করিয়া সেল বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে তখন 'বং নোইৎ' বলিয়া বিদায় সম্ভাষণ করার পর্তুগীজ কায়দাও আমরা কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম।

বলাই বাহুল্য, এই ধরনের খুচরা ভাষাজ্ঞান নিয়া অন্য ভাষাভাষী বিদেশী লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বেশীদূর অগ্রসর হয় না। ফলে পর্তুগীজ সৈনিকদের মারফৎ যেসব বাহিরের খবরাখবর এতদিন পাওয়া যাইত আমাদের তাহা একরকম বন্ধ হইয়া গেল। আমরা তখন ভারত হইতে কোনো চিঠিপত্র পাই না। কন্সালের চেষ্টায় আমি জুলাই মাসে বাংলা দেশে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কছে একটি চিঠি লেখার অনুমতি পাই। কিন্তু জুলাই মাসের সেই চিঠি তিনি পান সেপ্টেম্বরে এবং তাঁহার উত্তর এবং তাঁহার লেখা বিজয়ার অভিনন্দন আমার হাতে পেঁাছায় অক্টোবরের শেষে। এ ছাড়া, কোনো চিঠিপত্র আমরা কেহই তখনো পাইতে আরম্ভ করি নাই।* খবরের কাগজ কিছুই আমরা তখনো

---

* জুলাই মাসের শেষ দিকে ভারতের সঙ্গে গোয়ার রেলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস হইতে আবার সাধারণ চিঠিপত্রের ডাক চলাচল আরম্ভ হয়। উভয় দেশের ভিতর কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকিলেও একটা ডাক চলাচলের ইন্‌ফর্মাল ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশ হইতে গোয়ার চিঠিপত্র আমাদের ডাক হরকরা পর্তুগীজ সীমান্তের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মেলব্যাগে ভর্তি করিয়া ফেলিয়া দিয়া আসে এবং সেই জায়গাতেই গোয়া হইতে ভারতের চিঠিপত্র আর একটি মেলব্যাগে রাখা থাকে তাহা কুড়াইয়া নিয়া আসে। গোয়ার

পাই না; সময় কাটানোর বা পড়ার মত কোনো বই সঙ্গে নাই। বাহিরে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে বিশেষ কিছুই জানি না। বাহিরের পৃথিবীর কথা তো কিছুই জানিতে পারিতেছি না, এমন কি ভারতে ভারত-গোয়া প্রশ্নে জনসাধারণ বা আমাদের গভর্নমেণ্ট কি করিবেন, কিভাবে, কোন পথে তাঁহাদের চিন্তাধারা অগ্রসর হইতেছে কিছুই আমরা তখন জানি না। দেশ কালের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্যুত হইয়া নিরালম্ব হইয়া বসিয়া আছি। এইটুকু মাত্র জানিতে পারিতেছি, গোয়াতে এখনো পর্তুগীজদের দখল আছে, আমরা বাঁচিয়া আছি এবং পর্তুগীজদের জেলে আছি। খাওয়া-দাওয়া যাই হোক একরকম কপালে জুটিয়া যাইতেছে। কিন্তু দিবারাত্রি এই ৯ ফুট লম্বা আর ৭।৮ ফুট চওড়া কুঠুরী-বন্ধ হইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাইতে হইবে—আমরা তিনজন একত্র হইয়া হঠাৎ যেন সেই কঠোর সত্যের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইলাম।

এতদিন গোয়ার বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব, রাজনীতির আলোচনায়, বাহিরের আন্দোলনের অল্পবিস্তর খবরা-খবরের ভিতর দিয়া সেই আন্দোলনের সঙ্গে একটা মানসিক যোগ রাখিয়া দিন কাটিতেছিল। কিন্তু সাজা হইয়া যাওয়ার পর আমরা তিনজন একত্র হইলাম বটে, কিন্তু বাহিরের সঙ্গে পরোক্ষভাবে খুব ক্ষীণ যা একটু যোগসূত্র ছিল তাহা একেবারেই কাটিয়া গেল। অবশ্য ইহাতে প্রথম ৩।৪ দিন খুব অসুবিধা কিছু মনে হয় নাই। রাজারামের সঙ্গে ইতিপূর্বে জেলে আমার দেখাই হয় নাই। জগন্নাথ রাওয়ের সঙ্গে একবার ক'দিনের জন্য দেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরেই 'আল্‌তিন্যো'-তে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। সুতরাং প্রথম কয়দিন পরস্পরের খবরা-খবর নিতে ও দিতে এবং পরস্পরকে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করিতে করিতেই সময় কাটিয়া গেল। কিন্তু প্রথম সেই কয়েকটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর হঠাৎ আমরা তিনজনেই উপলব্ধি করিলাম, পরস্পরকে বলার মত নূতন কোনো খবর আমাদের কাহারো কাছে নাই। অথচ আমাদের লম্বা মেয়াদের সাজা হইয়া গিয়াছে। কে জানে, দশ বারো বছর আমাদের হয়ত এই অবস্থার ভিতরেই থাকিতে হইবে! হয়ত 'আল্‌তিন্যো'-তে থাকিতে হইবে না; কারণ 'আল্‌তিন্যো'-তে থাকার ব্যবস্থাটা যে একটা সাময়িক এমার্জেন্সি ব্যবস্থার মত ছিল তাহা জানিতাম। খুব অস্পষ্টভাবে এই সময় আমরা 'আগুয়াদা' এবং 'রেইস মাগুস্‌' দুর্গের কথা শুনিয়াছিলাম। সেখানে অনেক বন্দীকে চালান দেওয়া হইয়াছে। কে জানে, কবে আমাদের সেখানে নিবে? কখনও মনে হইয়াছে, হয়ত আমাদের পর্তুগীজ আফ্রিকায় কিম্বা পর্তুগালে বা আটলাণ্টিকে কোনো পর্তুগীজ দ্বীপের উপনিবেশে চালান দিবে। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ আমাদের নিয়া কি করিবেন সে সম্পর্কে আমাদের কোনোই ধারণা ছিল না। সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো আভাস ইঙ্গিত কোনো সময়ে তাঁহারা আমাদের পাইতে দেন নাই। জেলেই যদি থাকিতে হয়, কোনো একটা জেলে পাকাপাকি রকম গিয়া আস্তানা নিতে পারিলে তখন দেখা যাইবে। তখন দশ বছর হোক, আর বারো বছর হোক, যতদিন

ভিতর হইতেও তাহাদের ডাক-হরকরা সেই ভাবেই তাহাদের মেলব্যাগ দিয়া ও নিয়া যায়। অবশ্য তাহার পরে উভয় পক্ষেই পুলিস ও কাস্টমস্‌ কর্তৃপক্ষ যথারীতি সে সব চিঠিপত্র সেন্সার করিয়া তারপর নিজ নিজ এলাকায় বিলি করিতে দেন। কিন্তু তাহা হইলেও এদেশ হইতে গোয়ায় বা গোয়া হইতে এদেশে চিঠিপত্র নিয়মিত আসে যায়।

থাকিতে হয় তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া জীবন সেই ছাঁচে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আপাতত দিন ও সময় কাটাই কি করিয়া? পড়ার বই নাই; লিখিয়া যে সময় কাটাইব সে রকম কাগজ-কলম কিছুই নাই। ফাদার কারিনো একটি কলম দিয়াছিলেন বটে। কিন্তু কাগজ ছিল না। সেল হইতে বাহিরে যাওয়ার কোনো হুকুম নাই।

নূতন সেলে লোক মাত্র আমরা তিনজন থাকায় কিছুটা হাত পা ছড়ানো যাইত। পালা করিয়া কিছুটা পায়চারিও করা যাইত। রাজারাম ও জগন্নাথ রাও দুজনেই দৈনিক ব্যায়াম ও কসরৎ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের রোজ ঘণ্টা খানেক করিয়া সময় যাইত। জগন্নাথ রাও কর্ণাটকের লোক হইলেও শিক্ষায়-দীক্ষায় মহারাষ্ট্রীয়। তাহার উপরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লোক। স্বয়ংসেবক সংঘের নিয়ম অনুসারে তিনি রোজ কিছুটা শারীরিক কসরৎ না করিয়া পারেন না—সূর্য নমস্কার, শীর্ষাসন ও অন্যান্য নানারকম যৌগিক আসনের অনুশীলনে তাঁর ও রাজারামের বেশ কিছুটা সময় যাইত। আমিও তাঁহাদের দেখাদেখি দড়ি ছাড়া স্কিপিং ও অল্পসল্প ডন-বৈঠক আরম্ভ করিয়া দিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের সময় কাটানোর সমস্যার পুরা সমাধান হইল না। সৌভাগ্যক্রমে জগন্নাথ রাওয়ের কাছে লোকমান্য তিলকের "গীতা রহস্যে"র একটি পুরাতন বাঁধানো মূল মহারাষ্ট্রীয় সংস্করণের বই ছিল। গীতা স্বদেশী যুগ হইতে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের ও রাজনৈতিক কর্মীদের পুরাতন সঙ্গী। অনেক দিন মার্ক্স-লেনিন-ট্রটস্কী-স্টালিন কপচাইয়া গোয়াতে আসিয়া বন্ধুবর জগন্নাথ রাওয়ের কল্যাণে আবার শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় প্রবেশ করিয়া মুখ বদলানো গেল। উপায় ছিল না। কে জানে, এও হয়ত ভগবৎ কৃপা! কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই "গীতা রহস্যে"র এই মহারাষ্ট্রীয় সংস্করণটি নানা দিক দিয়া আমার পরম উপকার করে। বহু পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত বাংলা "গীতা রহস্য" আমার ভালো করিয়া পড়া ছিল। তাই মহারাষ্ট্রীয় ভাষা না জানিলেও জগন্নাথ রাওয়ের সাহায্যে এবার মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "গীতা রহস্য" পড়িতে শুরু করিলাম। মহারাষ্ট্রীয় ভাষার শব্দার্থ ও ব্যাকরণের সঙ্গে এইভাবে পরিচয় শুরু হইল। গীতার মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার তিলককৃত মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদ অনুসরণ করিয়াও মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা কিছুটা সহজ হয়। কোনো কথার শব্দার্থ না বুঝিলেই জগন্নাথ রাও বুঝাইয়া দিতেন। ইহাতে বেশ কিছুটা সময় কাটিত। "গীতা রহস্যে"র ভূমিকা ও 'বহিরঙ্গ প্রকরণে'র সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন ভারতীয় দর্শনের ও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের এমন মননশীল ও তুলনামূলক গভীর আলোচনা গ্রন্থ কম আছে। সুতরাং সময় কাটানোর এবং মনের খোরাকের দিক দিয়া বেশ ভালো রকম রসদের একটা যোগান পাইয়া গেলাম।

এ ছাড়া, আমাদের সময় কাটানোর আর একটি অবলম্বন ছিল দাবা খেলা। পূর্বেই বলিয়াছি সেলের ভিতরে আমাদের কাগজপত্র রাখার অনুমতি না থাকিলেও বাহির হইতে পর্তুগীজ সৈনিকের মারফৎ কিছু কাগজপত্র আমরা যোগাড় করিয়াছিলাম। জগন্নাথ রাও বেশ ভালো দাবা খেলা জানিতেন। তিনি যে সেলে আগে থাকিতেন, সেখান হইতে একটি মোটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের শীটে দাবার একটি ছক আঁকিয়া আনিয়াছিলেন। তার সঙ্গে সিগারেট প্যাকেটের রাংতা, বাজে কাগজের মোড়ক, দেশলাই বাক্সের টুকরা এই সব

দিয়া তিনি বুদ্ধি করিয়া দাবার সব রকমের ঘুঁটি—রাজা, মন্ত্রী, হাতী, ঘোড়া, নৌকা, বোড়ে সব কিছু—দু' সেট করিয়া বানাইয়া নিয়াছিলেন। দাবা খেলার আইনত অনুমতি ছিল না। তবু কেরুস দেখিয়াও দেখিত না। কেরুস ইহাতে কিছু বলিত না দেখিয়া ফের্নান্দও বিশেষ কিছু বলে নাই। তা ছাড়া একটা বাঁচোয়া ছিল যে, আমাদের সেলের সমুখ দিকের দরজাগুলি সাধারণত বন্ধই থাকিত। এইসব সুযোগ-সুবিধা থাকায় গীতা পাঠে অরুচি ধরিলেই আমরা দাবা খেলিতে বসিতাম। আমি প্রথমে দাবা খেলা জানিতাম না। ইংরাজ আমলে বেশ লম্বা সময় জেলে থাকিয়াও দাবা খেলা আয়ত্ত করিতে পারি নাই। কোনো রকম 'ইনডোর' খেলাতেই আমি মন বসাইতে পারি না। কিন্তু গোয়াতে না বসাইয়া বাঁচোয়া ছিল না। শেষ পর্যন্ত জগন্নাথ রাওয়ের চেষ্টায় কাজ চালানো এবং সময় কাটানোর মত দাবা খেলা আমিও শিখিয়া যাই। সে সময় এই খেলাতে আমার যেন খানিকটা নেশাও পাইয়া বসিয়াছিল।

আমাদের সেলে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন জনসংঘ ও আর এস এস প্রতিষ্ঠানের লোক, একজন কম্যুনিস্ট আর আমি গোত্র ছাড়া অকুলীন-কম্যুনিস্ট আর এস পি বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের লোক। বহু রাজা-উজীর বধ করিয়া, যে যার বিশ্বাস, আদর্শ ও মতানুযায়ী 'হিন্দু রাষ্ট্র', 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'মার্ক্স-লেনিন-স্টালিন জিন্দাবাদ' ইত্যাকার বহু বুলি কপচাইয়া শেষ পর্যন্ত পর্তুগালের খুদে ডিক্‌টেটর সালাজারের সঙ্গে গোয়াতে লড়িতে আসিয়া সকলে এক গোয়ালে আটকা পড়িয়াছি। সেই গোয়ালে ঘাস-জল যাই হোক একরকম জুটিয়া যাইতেছে; সালাজার সে সব যোগাইতেছেন। কিন্তু মানুষ-গরুর খালি ঘাস-জলে চলে না। সেলের ভিতরে সারাটা দিন সময় যেন মনের উপর বোঝা হইয়া চাপিয়া থাকে। সেই বোঝা হাল্কা করার জন্য ও সময় কাটানোর জন্য কখনো আমরা ডন-বৈঠকের কসরৎ বা শীর্ষাসন করি, কখনো বা গীতা পাঠ করি, আর কিছুই যখন ভালো লাগে না, তখন তৃতীয় ব্যক্তিকে দর্শক বানাইয়া অন্য দুজনে মিলিয়া দাবা খেলি। এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতেছে; কিম্বা কাটিতেছে কি না, তাহাও ঠিক অনুভব করিতেছি না। কারণ এক দিনের সঙ্গে অপর দিনের রং বা রূপরেখার কোনো তফাৎ নাই।

আমরা জুলাই মাসে যখন গোয়ার ভিতরে আসি তখন কোঙ্কন উপকূলের ঘনঘোর বর্ষার দিন ছিল। এখন সেই বর্ষা কাটিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের সেলের কোণা দিয়া দেওয়ালের ওপারে প্যাট্রিয়ার্ক-এর প্রাসাদের বাড়ির কাছেকার ঘন সবুজ নারিকেল নীর ফনস্‌ ও আম গাছের মাথাগুলি একটু একটু দেখা যায়। সকালবেলায় পর্তুগীজদের 'সোনালী গোয়া'র আকাশে হেমন্তের শিশু-সূর্য মুঠা মুঠা সোনালী আবীর ছড়াইয়া দেয়; সারাদিন আকাশে, গাছের মাথায়, জানালা দিয়া যতটুক দেখিতে পাই, সোনালী রংয়ের মিঠে রোদ সব কিছুকে যেন সোনা-মোড়া করিয়া রাখে। গোয়া বোম্বাইয়ের অনেক দক্ষিণে আর সমুদ্রের ধারে বলিয়া হেমন্ত বা শীতের দিনেও ঠান্ডার কোনো আমেজ নাই। সে দিক দিয়া আবহাওয়া বেশ আরামপ্রদ। কিন্তু সালাজারের কয়েদী আমরা। সালাজার আর সব দিক দিয়া আমাদের দেশ-কালের অতীত করিয়া রাখিয়াছেন। এখন আমাদের জীবনে কোনো খবর নাই, দৈনিক খবরের কাগজ নাই, কোনো হৈ চৈ গন্ডগোল নাই। আছে ফের্নান্দ এবং কেরুস, আছে সকাল বেলায় কল-ঘর ও পায়খানার দিকে নিজের নিজের জলের বোতল ও প্রস্রাবের টিন নিয়া প্যারেড। আছে সকাল সন্ধ্যায় হোঁৎকা 'অন্নমন্ত্রী'র চীৎকার, হাঁক-ডাক। সেই হাঁক-ডাক

ও কড়া তদারকের ভিতর নিয়মিত খাবার রেশন পরিবেশন হইয়া যায়। স্নান বেশীর ভাগ দিন জোটে না (যদিও রাজারামের ঘরে আমরা এখন আসিয়া পড়ায় এবং ফের্নান্দ রাজারামের উপর কতকটা প্রসন্ন থাকায় এখন প্রায় একদিন বা দু' দিন অন্তর অন্তরই আমরা স্নান করিতে পাইতেছি)। প্রকৃতির নিয়মে এক একটি করিয়া দিন আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। ঘরে আমাদের তারিখ দেখার মত কোনো ছাপানো দিন-পঞ্জী নাই। রাজারাম পেন্সিল দিয়া দেওয়ালের এক কোণায় একটি দিন-পঞ্জী আঁকিয়া রাখিয়াছেন। এক একটি দিন চলিয়া যায় আর তিনি তাহার এক একটা তারিখ মুছিয়া দেন; মাসান্তে আবার নূতন করিয়া নূতন মাস-পঞ্জীর ছক আঁকেন। মধ্যে মধ্যে ভাবি, এইভাবেই কি বারো বছর কাল কাটানোর জন্য মনে তৈরী হইতে হইবে? চলতি ইতিহাসের চাকার শব্দ 'আল্‌তিন্যো'-র প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আমাদের সেল পর্যন্ত আসিয়া আর পৌঁছায় না। আমাদের জন্য আছে আমাদের অতীত; আমাদের দৈনিক রুটিন, ডন-বৈঠক-শীর্ষাসন, 'গীতা-রহস্য' উদ্ধার আর দাবা খেলা। কোনো কোনো দিন রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত গীতা-রহস্য পড়ি। কিম্বা কোনোদিন তিনজনে পালা করিয়া দাবা খেলি। বেশী রাত হইয়া গেলে, কিম্বা আমাদের কথার সাড়াশব্দ পাইলে, শান্ত্রী পাহারাদারেরা আসিয়া ধমক দেয়—"দুরমে! দুরমে! তেম্পো দুরমির!" (ঘুমের সময় হইয়াছে, ঘুমাইয়া পড়! Dorme! Dorme! Tempo Dormir!)। কিন্তু বিছানায় শুইয়া পড়িলেও ঘুম আসে না। শেষ হেমন্তের স্তব্ধ রাতে সমুদ্র-গর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি—দুম্‌, দুম্‌, দুম্‌—মনের গহনতম অন্তস্থলে গিয়া যেন আমায় ধাক্কা দিয়া কোন রহস্যময় চেতনার স্তরে জাগাইতে চাহিতেছে। এই রকম রাত্রে বহু দিন আগে পড়া জার্মান একটি কবিতার দুটি কলি ফিরিয়া ফিরিয়া মনে আসিত—

"Aus des meeres, tiefem, tiefem grunde
Klingen abendglocken dumpf and matt,
Uns zu geben wunderbare Kunde
Von der liebe die geliebt es hat!"

মহাসিন্ধুর গভীর অতল হইতে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথা হইতে যেন চাপা গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতেছে। যেন আমাদের হৃদয়ের অতলে কোনো গভীর প্রেমের মর্মকাহিনী সেই ধ্বনি আমাদের মনের কাছে বহন করিয়া আনিতেছে! অবশ্য আফসোস এইটুকু যে, হৃদয়ের অতলে ডুব দিয়াও কোনো প্রেমের মর্মকাহিনী খুঁজিয়া পাই না। এই সব সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে 'আল্‌তিন্যো'-তে সালাজারের কয়েদীদের চোখেও ঘুম জড়াইয়া আসে। সে ঘুম ভাঙিলেই গতকালের মতই আর একদিন।

'আল্‌তিন্যো'তে বাকী দুই মাস

'আল্‌তিন্যো' জেলে এইভাবে আমাদের বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। নভেম্বর-ডিসেম্বর দুই মাস কাটিয়া জানুয়ারী পড়িতে না পড়িতেই আমরা হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় খবর পাইলাম, আমাদের সেই রাত্রিতেই জিনিসপত্র বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া তৈয়ারী হইয়া নিতে হইবে; ভোর রাত্রে আমাদের এই জেল ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। এ অর্ডার শুধু আমাদের ক'জনের জন্যই নয়; 'আল্‌তিন্যো'-তে আটক সমস্ত বন্দীই অজ্ঞাত কোনো জেলে চালান যাইবে। পরের দিনের ভিতর পুলিসকে 'আল্‌তিন্যো' জেলের সবটা মিলিটারীর হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু সে আরও দুই মাস পরের কথা। মাঝের এই দুই মাসে 'আল্‌তিন্যো'-র সেই ছোট্ট খুপ্‌রি সেলে থাকিতে থাকিতে আমরা হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলাম বলিলে কম বলা হয়। তিলক মহারাজের 'গীতা-রহস্য' এই সময় আমাদের একটা মস্ত বড় অবলম্বন ছিল সন্দেহ নাই। দর্শন-চর্চা বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন এবং বিভিন্ন ধর্মমতের ইতিহাস সম্পর্কে গভীর তুলনামূলক সমালোচনার এরূপ একটি প্রামাণ্য-গ্রন্থ সঙ্গে থাকা নিশ্চয়ই একটা বড় সৌভাগ্য। আর কিছু না হোক, নিছক সময় কাটানোর পক্ষে বা মনকে একটা কাজে ব্যাপৃত রাখার পক্ষেও 'গীতা-রহস্য' কম রসদ যোগায় না। কিন্তু আমাদের মত রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে, গীতাকার যাহাকে 'কর্মসঙ্গ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই আসক্তির বন্ধন বড় কম নয়। চব্বিশ ঘণ্টা সেই নয় ফুট লম্বা আর আট ফুট চওড়া সেলের মধ্যে আমরা খালি ডন-বৈঠক বা শীর্ষাসন করিতে থাকিব এবং গীতা পাঠ করিয়া মনকে যোগযুক্ত করিয়া অধ্যাত্মে নিবিষ্ট রাখিব এত বড় মহাপুরুষ, আর কাহারো কথা বলিতে পারিব না, অন্ততপক্ষে আমি হইয়া উঠি নাই। দুইটি দিক দিয়া শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ক্লেশ একটু বেশী বলিয়া মনে হইত। প্রথমটি ছিল চব্বিশ ঘণ্টা ঐ একটি সেলের ভিতর আটক থাকা। সাজা ও মেয়াদ হইয়া যাওয়ার পর আমরা তিনজন (অর্থাৎ যোশী, রাজারাম ও আমি) এই সেলে আসিয়া কিছুটা হাত-পা মেলার জায়গা পাইলাম বটে। কিন্তু হাত-পা যেদিকেই মেলিতেই চাই, আর পায়চারি করিতেই চাই—জায়গা দৈর্ঘ্যে ছয় হাত আর পাশে পাঁচ হাত। সময় সময় ভয় হইত, কে জানে, সামনের দশ-বারো বছর এমনিভাবে এই সেলে জীবন্তে সমাধির অবস্থায় থাকিতে হইবে কিনা? দ্বিতীয়ত পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া বহির্জগতের কোনো খবরা-খবর পাই না। খবরের কাগজ বলিয়া জিনিস একটা কিছু আছে, তাহাও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি (মধ্যে মধ্যে চোরাইভাবে আনা পর্তুগীজ কাগজ ছাড়া) এ অবস্থাটাও অসহ্য বলিয়া মনে হইত। মনে মনে ভাবিতাম—'বেটারা ভারতীয় খবরের কাগজ না হয় নাই দিল; কিন্তু বৃটিশ, মার্কিন, পাকিস্তানী বা অন্য যে কোনো দেশের খবরের কাগজ দেয় না কেন?' কোনো ভারতীয় সংবাদপত্র এই সময় ভারত হইতে গোয়ায় আসিতে দেওয়া হইত না। সরকারী কাজে অবশ্য বোম্বাইয়ের 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া', মান্দ্রাজের 'হিন্দু' প্রভৃতি দৈনিক কাগজ আনানোর ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ভারতীয় কাগজের মধ্যে এক বোম্বাইয়ের শ্রী ডি, এফ, কারাক সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কারেণ্ট' কাগজটি গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের খুবই

মনঃপূত ছিল। কারণ সে সময় বহুদিন পর্যন্ত শ্রী কারাকা ও তাঁর 'কারেন্ট' কাগজ গোয়ার ভারতভুক্তির প্রশ্নে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালানোর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং গোয়ার জনসাধারণের ভিতরে এই সত্যাগ্রহের সমর্থক যে বিশেষ কেউ নাই, তাহা প্রমাণ করার জন্য খুবই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই 'কারেন্ট' কাগজও আমাদের পাওয়ার উপায় ছিল না। তাহার কারণ, প্রথমত 'আল্‌তিন্যো'-তে কোনো কাগজ পর্তুগীজ সরকারের সমর্থক বা অসমর্থক, সেসব কিছু বিচার না করিয়া যে কোনো খবরের কাগজেরই প্রবেশ নিষেধ ছিল। পর্তুগীজ ভাষায় ছাপা কাগজ পর্যন্ত 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের দেওয়া হইত না। দ্বিতীয়ত, ভারত গভর্নমেণ্টের দিক দিয়াও ভারত হইতে গোয়াতে বই বা কাগজপত্র পাঠানো সম্পর্কে নানা রকমের বিধি-নিষেধ জারী ছিল। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যদি বা কোন কাগজের আসা সম্পর্কে আপত্তি না-ও করেন, ভারত হইতে সে কাগজ আনিতে গেলে ভারত গভর্নমেণ্টের এক্সপোর্ট লাইসেন্স ও বিশেষ পারমিট দরকার হইবে। তাহা ছাড়া কোনো কাগজ বা কোনো জিনিসপত্রই ভারত হইতে গোয়ায় যাওয়ার বা চালান দেওয়ার হুকুম নাই। ইহার ফলে অন্য কোনো জিনিস অবশ্য ভারত হইতে গোয়া যাওয়া বন্ধ হয় নাই। বোম্বাই হইতে এডেন ঘুরিয়া সকল জিনিসই গোয়াতে যায়। কিন্তু কোনো দৈনিক বা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ এভাবে গোয়াতে চালান দেওয়ার কোনো গরজ কারো ছিল না বা নাই। ফলে ভারতের সঙ্গে বা ভারতীয় সংবাদের সঙ্গে গোয়া-বাসীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এই সময় খুবই কম ছিল।* এক রেডিয়ো ছাড়া কোনো ভারতীয় সংবাদ গোয়াতে বসিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা একরকম নাই বলিলেও চলে। ফলে গোয়াতে বসিয়া 'কারেন্ট' বা মান্দ্রাজের 'হিন্দু' (গোয়া সম্পর্কে 'হিন্দু'র মতামত অবশ্য কোনো সময়ে 'কারেণ্টে'র মত ছিল না; কিন্তু নরমপন্থী মডারেট কাগজ বলিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ 'হিন্দু' কাগজের সম্পর্কে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারী করেন নাই) কাগজ পাওয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের তত আপত্তি না থাকিলেও ভারত গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে গোয়াতে যে কোনো জিনিস আসা সম্পর্কে নানারকমের নিষেধাজ্ঞা থাকাতে এসব কাগজ 'আল্‌তিন্যো'-তে হোক বা পরেই হোক, আমাদের পাওয়া সম্ভব হয় নাই।†

আমরা এই সময় ফাদার কারিনোর মারফত গভর্নর জেনারেলের কাছে এই দুই

---

* গত দেড় বৎসর যাবৎ ভারত হইতে গোয়াবাসীদের গোয়ায় আসা-যাওয়া করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, এখন তাহা কিছুটা শিথিল হওয়াতে গোয়া এখন আর ততটা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই।

† গোয়া হইতে পর্তুগীজ ভাষাতে কয়েকটি দৈনিক কাগজ বাহির হয়—যেমন মাড়গাঁও হইতে 'দিয়ারিয়ো দা গোয়া' ('গোয়া ডায়েরী' বা 'গোয়া দৈনিক') এবং পাঞ্জিম হইতে 'এ্যারাল্‌দো' এবং 'ও এ্যারাল্‌দো' ('Heraldo' এবং 'O Heraldo'—'হেরাল্ড' আর 'দি হেরাল্ড') এ্যারাল্‌দো' কাগজের একটি সাপ্তাহিক ইংরেজী সংস্করণ আছে। কিন্তু এসব কাগজে খবর বলিতে কিছু থাকে না। থাকে সালাজার রাজত্বের প্রশংসা-মুখর লম্বা লম্বা সামাজিক বা সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রচার এবং তা না হইলে সরকারী ইস্তাহার। তবে তিনটি কাগজেই রয়টার, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং, অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো এবং রেডিয়ো পাকিস্তানের প্রচারিত খবরের সংক্ষিপ্ত সার হিসাবে এক কলম পরিসরের ভিতর সর্ব-সংবাদ সংগ্রহের একটি চুম্বক সারের মত দেওয়া থাকে। দৈনন্দিন সরকারী সেন্সরের অনুমোদন ভিন্ন কোনো খবরের কাগজে এক লাইনও কিছু ছাপা হইতে পারে না।

বিষয়ে আমাদের উপর পুলিসের বিধি-নিষেধ কিছুটা শিথিল করার জন্য—অর্থাৎ দৈনন্দিন সেলের বাহিরে জেলের খোলা কম্পাউণ্ডে পুলিস পাহারায় কিছুক্ষণ করিয়া পায়চারি করার এবং দু' একটি ভারতীয় না হোক, বিদেশী খবরের কাগজ আমাদের পাইতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। ফাদার কারিনোর অনুরোধ সত্ত্বেও প্রথম ব্যাপারে পুলিসের ঘোরতর আপত্তির জন্য গভর্নর জেনারেল আমাদের জন্য কিছু করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় ব্যাপারেও 'আল্‌তিনো্যা' জেলে আমরা যতদিন ছিলাম ফাদার কারিনো আমাদের খুব বেশী কিছু সুবিধা আদায় করিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু পুলিস কম্যাণ্ডাণ্টের অনুমতিক্রমে তিনি বহু পুরাতন ক্যাথলিক মাসিক ও সাপ্তাহিকের সঙ্গে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হইতে শুরু করিয়া কয় সংখ্যা 'রীডার্স ডাইজেস্ট' ও 'ক্যাথলিক ডাইজেস্ট' মাসিক এবং আমাদের পক্ষে তখন যাহা প্রায় অপ্রত্যাশিত ভোজের মত সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, জুলাই হইতে অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকার 'টাইম' সাপ্তাহিক এবং লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'ইকনমিস্ট' কাগজের প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যা আমাদের জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহার চেষ্টাতেই পুলিস কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত কাগজ ভারতীয় বন্দীদের নিজেদের ভিতর হাত বদল করিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে পাঠানোর অনুমতি পাই। কেরুস্‌ ও ফের্নান্দের উপর হুকুম হয় যদি আমরা আমাদের কয়জনের ভিতর একে অন্যের কাছে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে বই বা কাগজপত্র পাঠাইতে চাই, তাহা হইলে তাহাদের কাছে দিলে তাহারা তাহা আমরা যাহাকে বলিব তাহার কাছে দিয়া আসিবে। কতবার করিয়া এই সময় এক একটি কাগজের প্রতিটি সংখ্যা যে আমরা পড়িয়াছি এবং কি আগ্রহ নিয়া পড়িয়াছি, তাহা যাঁহারা আমাদের অবস্থায় না পড়িয়াছেন, তাঁহাদের বলিয়া বোঝানর নয়। আমার নিজের রীতি ছিল, খান কয়েক যে কাগজই হোক, বিশেষ করিয়া 'টাইম' সাপ্তাহিক বা 'ইকনমিস্ট' হইলে তো কথাই নাই, তাহা হাতে আসিলে প্রথমে খুব লোভী বা পেটুক ছোট ছেলের মত এক ঝলক তাড়াতাড়ি প্রত্যেকটি কাগজের প্রত্যেকটি পাতা উল্টাইয়া তাহাতে কোথায় কতটুকু কি খোরাক আছে দেখিয়া নিতাম। তারপর অল্প অল্প করিয়া, এক একদিন হিসাব করিয়া—এক দিনে এতটুকু পড়িব, সবটুক একেবারে পড়িয়া ফেলিয়া শেষ করিব না ইহা মনে রাখিয়া—অর্থাৎ নিজের উপর কড়া রকম রেশনের হুকুম জারী করিয়া যত বেশী সময় ধরিয়া সেগুলি পড়িতে পারি, তাহার সংকল্প করিতাম। কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিলে প্রায়ই আর সে কথা মনে থাকিত না।; এক নিঃশ্বাসে পাঠ্য-খোরাক যেটুকু হাতে থাকিত, শেষ করিয়া আবার নূতন করিয়া গোড়া হইতে পৃষ্ঠা উল্টাইতাম। কিন্তু মোটের

গোয়ার শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সাধারণত আজকাল করাচী হইতে আগত 'ডন' বা 'টাইমস্‌ অব করাচী' কাগজ পড়েন এবং এ ছাড়া, আমেরিকার 'টাইম', 'লাইফ' ও 'নিউজ উইক' প্রভৃতি সাপ্তাহিক এবং বিলাতী লণ্ডন টাইমসের সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রভৃতির সাহায্যে নিজেদের খবরের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' বা 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান' জাতীয় কাগজ গোয়াতে নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু ইহাদের গ্রাহক হইলে পুলিসের খাতায় নাম ওঠে। ফলে এসব কাগজের বেশী কোনো চাহিদা গোয়াতে নাই।

গোয়াতে করাচী হইতে সপ্তাহে দুবার এরোপ্লেনে ডাক আসে; সুতরাং বাহির হইতে উপরে উল্লিখিত সাপ্তাহিক খবরের কাগজগুলির নিয়মিত যোগান পাইতে খুব বেশী অসুবিধা হয় না।

উপর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এবং ডিসেম্বরের প্রথমে এই দুইটি স্বল্প-পুরাতন সাপ্তাহিক কাগজের মাধ্যমে আমরা আমাদের পুরাতন পরিচিত রাজনীতির জগতে আবার প্রবেশ করিতে বা তাহার সঙ্গে নূতন করিয়া মানস যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারি। ফাদার কারিনো সারা গোয়া খুঁজিয়া আমাদের জন্য যেখান হইতে যাহা পারেন ইংরেজী বই ও কাগজ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু গোয়াতে ইংরাজী বই বা কাগজ খুব বেশী পাওয়া যায় না। আমাদের দেশেও কয়টি মফঃস্বল শহরেই বা তাহা পাওয়া যায়? তবু গোয়াতে কারিনোর মত বহু শিক্ষিত ইউরোপীয় ক্যাথলিক পাদ্রী ও নানা ধরনের মিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষাব্রতী খৃষ্টান সন্ন্যাসী থাকেন বলিয়া 'লণ্ডন টাইমস্‌', 'টাইম' ও 'লাইফ' এসব ধরনের কাগজ কিছু কিছু আসে। গোয়ার মধ্যযুগীয় পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা আধুনিক জগৎ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নন। ফাদার কারিনো নিজে স্প্যানিয়ার্ড হইলেও বাংলা দেশে থাকার সময় হইতেই বোধ হয় ভারতে আসা অবধি ইংরাজ পাদ্রীদের মত 'লণ্ডন টাইমস্‌' নিয়মিত পড়িতে অভ্যস্ত ছিলেন। তা ছাড়া আমেরিকার 'টাইম', 'আটলাণ্টিক মন্থলি', বৃটেনের 'ইকনমিস্ট', 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রের তিনি গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ইংরাজী ও আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যেও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল এবং এ বিষয়ে তাঁহার পড়াশোনার পরিধি বেশ বিস্তৃত ছিল। যাই হোক, তাঁহার সাধ্যমতন তিনি আমাদের জন্য পাঠ্য-রশদ সংগ্রহ করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে আমাদের জন্য 'আল্‌তিন্যো'-তে জমা করিয়া দিয়া যাইতেন। অবশ্য তাহার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে বহু ক্যাথলিক কাগজ পুস্তিকা বা ট্র্যাক্টও থাকিত। কারিনো যে শিক্ষা-মিশনের লোক, ইতালীর 'সালেশিয়ান মিশন', তাহার প্রতিষ্ঠাতা সন্ত ডম্‌ বস্কো-র জীবন-চরিত বা 'সালেশিয়ান মিশনে'র কার্যবিবরণী প্রভৃতিও ইহার সঙ্গে অনেক থাকিত। ইহার কারণ এ নয় যে, পাদ্রী কারিনো 'সুগার কোটেড' কুইনিনের মত আমাদেরকে কোনোমতে ক্যাথলিক ধর্মে অনুরাগী করিয়া তোলার চেষ্টা করিতেছিলেন বা সালেশিয়ান ডম্‌ বস্কো মিশনে ভর্তি করার চেষ্টা করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, সে রকম কোনো মতলব তাঁহার ছিল না বা থাকিলেও আমাদের মত ঘাগী 'অবিশ্বাসী'-দের যে চট্‌ করিয়া খৃষ্টান কেন, কোন ধর্মমতেরই অনুরাগী করিয়া তোলা যাইবে না, সেটুকু বোঝার মত সহজ বুদ্ধি তাঁহার ছিল। কিন্তু বেচারী কি করিবেন, আমাদের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইলেই বই চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাকে আমরা বিব্রত করিয়া তুলিতাম। ভদ্রলোক উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার নিজের সংগ্রহ হইতে এবং পরিচিত লোকেদের সংগ্রহ হইতে যেখানে যা কিছু পাইতেন খুঁজিয়া-পাতিয়া ঝাড়িয়া বুড়িয়া আমাদের পড়ার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। নিতান্ত বইয়ের অভাবেই তিনি ক্যাথলিক প্রচার-পত্র বা পুস্তিকা পর্যন্ত বাদ দিতেন না। অনেক সময় একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিয়াছেনও—"দেখুন, আপনাদের জন্য এসব দিতে চাই না। কিন্তু একেবারে যেখানে কোনোই বই নাই, সেখানে হয়ত এসব বই এবং কাগজও হয়ত আপনাদের কোনো না কোনো কাজে আসিবে মনে করিয়া এগুলিও দিয়া দিই।" আমার কিন্তু বলিতে কোনো সঙ্কোচ নাই, নিছক প্রচার-সাহিত্য জাতের হইলেও এ যুগের পৃথিবীতে সাম্প্রতিক ক্যাথলিক চিন্তাধারা কোথায় কোন পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে এই সব বই ও পুস্তিকার সাহায্যে তাহা জানার কিছুটা সুযোগ আমার হয়। বিরাট ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের পৃথিবী জোড়া মানব-সেবার কাজের কিছুটা পরিচয়ও এই সময়ে এই সব সাহিত্যের মারফৎ অর্জন করি।

কিন্তু বলাই বাহুল্য, এইভাবে আমরা যে সব খবরের কাগজ সাময়িক পত্র বা বই-পত্রাদি পাইতাম, তাহাতে দুধের স্বাদ কোনো মতে ঘোলে মিটিত। কারণ যে সব সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বা সাময়িকপত্র ফাদার কারিনোর কল্যাণে আমাদের হাতে পেঁছাইত, তাহাও খুব কম হইলে দেড়-দুই মাসের পুরাতন। পৃথিবীর সদ্য-সংঘটিত দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রবাহের সঙ্গে তাই আমাদের কোনোই যোগাযোগ ছিল না। তাহার জন্য আমরা প্রায় চাতকের মত ফাদার কারিনো কবে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কারণ তিনি আসিলে পৃথিবীতে বা ভারতবর্ষে নূতন কিছু কোথাও ঘটিতেছে কি না, তাহার খবরা-খবর শোনার কিছুটা সুযোগ পাইতাম।

ফাদার কারিনোর আমাদের সঙ্গে দেখা করার কোন নির্দিষ্ট দিন ছিল না, কিন্তু পুলিসের কাছে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি চাহিলে যে কোনো দিন তিনি অনুমতি পাইতেন। পর্তুগীজ জনসাধারণের ভিতর যেমন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরেও তেমনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের যথেষ্ট মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রম আছে। তাছাড়া ফাদার কারিনোর পরিচালনায় ডম্ বস্কো মিশন বা সালেশিয়ান মিশনের শিক্ষা প্রচারের কাজ গোয়াতে খুব প্রসিদ্ধ বলিয়া ফাদার কারিনোর নিজের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও গোয়াতে বড় কম নয়। সকলেই জানিত তিনি খুবই কর্মব্যস্ত লোক। সেই কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার পুরাতন মোটর-সাইকেলটিতে চড়িয়া শহরের এক প্রান্ত হইতে চড়াই উতরাই ভাঙ্গিয়া অপর প্রান্তে মানিকোমের টিলার উপর 'আল্তিন্যো' জেলে এই প্রৌঢ় শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসীকে আমাদের জন্য তাঁহার সাইকেলের কেরিয়ারে করিয়া বিরাট বই-কাগজের বোঝা নিয়া আসিতে দেখিলে পুলিস কর্মচারীরাও তাঁহাকে ফিরাইতে চাহিতেন না। অল্প সময়ের ভিতর খুব সহজেই বই কাগজ সেন্সর করাইয়া, তিনি ঐ সঙ্গে আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও গল্প-গুজব করিয়া যাইতেন। আমাদের সাবান, টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ এ সবের যোগানও মাসে মাসে তিনিই দিতেন। আমাদের কন্সাল জেনারেল মিঃ মনি গোয়া ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার হাতে এই সব খরচের জন্য কয়েক শ' টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র গোয়াতে তখন ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীর মোট সংখ্যা ছিল চল্লিশজনের মত। বলা বাহুল্য, এই টাকায় বেশীদিন চলে নাই। পরে তিনি গোয়াতে নিজের পরিচিত লোকেদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আমাদের জন্য চাহিয়া চিন্তিয়া টাকা আনিয়াছেন—নিতান্ত পুরোহিত পাদ্রী বলিয়া এবং গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত বলিয়া পুলিস তাঁহার এসব কাজে বাধা দেয় নাই। কিন্তু আমরা এসব কারণে তাঁহার প্রতি নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইলেও তাঁহার আসার পথে আমরা বিশেষ আগ্রহভরে চাহিয়া থাকিতাম একটি কারণেই যে, তাঁহার কাছে আমরা পৃথিবীর হালচাল কিছুটা জানিতে পারিব। তাঁহার কাছেই আমরা প্রথম শুনি যে, ক্রুশ্চোভ এবং বুলগানিন ভারতে আসিতেছেন। বর্মাতে শিউদাগন প্যাগোদা দেখিয়া বৃটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চোভের চোখা চোখা বক্তৃতার খবর দিয়া পাদ্রী কারিনো একদিন আমাদের কাছে হাসিয়া কুটি কুটি—"Oh! Mr. Chaudhuri! How I love that man! As a Catholic I am opposed to his ideology; but oh my!....how frank and out spoken he is!" শুধু বাহিরের পৃথিবীর খবরা-খবরই নয়, এই সঙ্গে আমাদের সকলের বাড়ির খবর,

আত্মীয়স্বজনের খবর, ভারতবর্ষে আমাদের জানার মত যা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিতেছে, সময় পাইলেই তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের দিয়া যাইতেন। কেরুস্ এবং ফের্নান্দ দুজনেই তাঁহাকে বেশ কিছুটা সমীহ করিত। তা ছাড়া তাহারা ইংরাজী বুঝিত না। কাজে কাজেই আমাদের সঙ্গে কারিনোর কোনো কথায় তাহারা কোনো সময় কোনো বাধা দিতেও আসিত না। তা ছাড়া, এই প্রশান্ত-দর্শন পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া কে তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিবে? ভদ্রলোক নিজেই রসিকতা করিয়া কোনো কথা বলিয়া হয়ত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন, এই হয়ত গম্ভীরভাবে যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্য বা অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোচনা করিতেছেন, কিম্বা হয়ত আমাদের কাহারো শরীর একটু রুগ্ন দেখিয়াছেন—উদ্বিগ্ন হইয়া বার বার সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোনো ঔষধপত্র চাই কি না; আর এইভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া সকলের মনকে একটু প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়া একটু আশা ও উৎসাহ দিয়া, তার পরে সেদিনকার মত বিদায় নিতেছেন, দু' হাত তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া আমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন—"God bless you all! God bless you all!" বলাই বাহুল্য, তাঁহার সেই স্মৃতি সহজে মন হইতে মোছার নয়।

সম্মানিত পাদ্রী কারিনোকে এভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে ফের্নান্দ এবং কেরুসও আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে অনেক "মেলোড্ ডাউন" বা নমনীয় হইয়া আসে। সেও আমাদের একটা কম লাভ ছিল না। কেরুস্ স্বভাবতই কিছুটা ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক ছিল; কিন্তু উগ্র প্রকৃতির ফের্নান্দও ক্রমশ আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে ভদ্রতর হইয়া আসে। অবশ্য সে কৃতিত্ব কিছুটা আমাদের কমরেড রাজারামের প্রাপ্য। আগেই বলিয়াছি পর্তুগীজ ভাষা শিক্ষায় রাজারাম তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় সে রাজারামের উপর প্রসন্ন ছিল। আমরা রাজারামের ঘরে আসায় ক্রমে তাহার সে প্রসন্নতা আমাদের উপরেও বর্তায়।

॥ ৩৮ ॥

'নাতাল' উৎসব

বড়দিনের হৈ-হুল্লোড়ের কয়েকটা দিন বাদেই আমাদের 'আল্‌তিন্যো' হইতে আগুয়াদা দুর্গে চালান দেওয়া হয়। আগুয়াদা দুর্গ পাঞ্জিম বা নোভা গোয়া হইতে প্রায় বারো মাইল দূরে মাণ্ডভী নদীর অপর পারে কান্ডোলীঁ তালুকে অবস্থিত। নদীর এপার-ওপার সোজা লাইন টানিলে ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'স্ট্রেইট অ্যাজ এ ক্রো ফ্লাইজ,' —পাঞ্জিম হইতে আগুয়াদার দূরত্ব বোধ হয় মাইল তিনেকের বেশী হইবে না। আগুয়াদার দুর্গে আমাদের সেলে বসিয়া মাণ্ডভীর পারে পাঞ্জিমের স্টীমার জেটী এবং সরকারী ইমারত সব দেখা যাইত। 'আল্‌তিন্যো'-র পাশে একটা উঁচু জলের গম্বুজ ছিল; সেল হইতে বাহির হইয়া উঠানে দাঁড়াইলে তাহাও দেখা যাইত। কিন্তু বেতি'র খেয়াঘাটে মাণ্ডভী নদী পার হইয়া পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া আঁকা-বাঁকা রাস্তায় আসিতে হইলে মাইল বারো দূরত্ব পড়িয়া যায়।

আমাদের সাত তাড়াতাড়ি করিয়া আগুয়াদা দুর্গে চালান দেওয়ার কারণ, আমাদের

সন্ধানে মিশর সরকারের প্রতিনিধি ম'শিয়ে আহমেদ খলিলের আসন্ন গোয়া আগমন। ফাদার কারিনো বড়দিনের কিছু আগে আমাদের বলিয়া গিয়াছিলেন যে, গোয়াতে আমরা কিভাবে আছি, তাহা দেখাশোনা করিবার জন্য ইজিপ্‌শিয়ান (মিশরীয়) গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের নূতন দিল্লীর দূতাবাস হইতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে শীঘ্রই গোয়ায় পাঠাইতেছেন। অবশ্য সে ভদ্রলোক কবে বা কখন আসিবেন, সে সব কিছু তিনি জানিতেন না। আমরাও আর তাহা নিয়া বিশেষ মাথা ঘামাই নাই। ভারত গভর্নমেণ্টের নিজস্ব কোনো কূটনৈতিক প্রতিনিধি যখন লিস্‌বনে বা গোয়াতে নাই, এবং পর্তুগীজ এলাকায় ভারত সরকারের তরফে সমস্ত কাজকর্ম তদারকের ভার এখন যেহেতু মিশর সরকারের উপর ন্যস্ত আছে, তখন মিশর সরকার ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে হয়ত আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য কাহাকেও পাঠাইলে পাঠাইতেও পারেন। কিন্তু তিনি আসিয়া আমাদের জন্য কি আর কতটুকু করিতে পারিবেন? ভারত গভর্নমেণ্টের নিজস্ব প্রতিনিধি যখন গোয়াতে ছিলেন, তখন আমাদের বন্দীদশায় খুব সাধারণ রকমের সুযোগ-সুবিধাও তিনি আমাদের জন্য আদায় করিয়া দিতে পারেন নাই। কাজে কাজেই ফাদার কারিনোর দেওয়া খবরে আমরা তত কিছু উৎসাহিত বোধ করি নাই। কিন্তু এও ঠিক, নূতন দিল্লী হইতে মিশর দূতাবাসের প্রধান সচিব (ফার্স্ট সেক্রেটারী) ম'শিয়ে খলিলের আসার তোড়জোড় না হইলে আমাদের 'আল্‌তিন্যো' হইতে 'আগুয়াদা'-য় এত তাড়াতাড়ি বদলি করা হইত না। আমাদের পাহারাওলা পর্তুগীজ সৈনিকদের কথায়-বার্তায় অবশ্য আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতে-ছিলাম, পর্তুগীজ সামরিক কর্তৃপক্ষ 'আল্‌তিন্যো'-র এই দুইটি ব্যারাক খালি করিয়া দেওয়ার জন্য পুলিসের উপর ইদানীং ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজ জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে যাঁহাদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন, কাল যাহা করা যাইবে, ঢিলা-ঢালা মন্থরগতি পর্তুগীজদের দিয়া, আজ তাহা কিছুতেই করানো যায় না। মার্কিন লেখক জন গান্থার পর্তুগীজ স্বভাবসুলভ এই দীর্ঘসূত্রতার নাম দিয়াছেন—"do-it-tomorrowism"। সাধারণভাবে দৈনন্দিন কাজে নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেও পর্তুগীজদের মাসাধিককাল সময় লাগে। আর এ' তো প্রায় দুই শ' বন্দীকে পঞ্জিম হইতে সশস্ত্র পুলিস পাহারায় মোটর-বাসে করিয়া কিম্বা লঞ্চে করিয়া অন্য জেলে পাঠানোর মত হাঙ্গামার ব্যাপার! সুতরাং খালি মিলিটারীর তাগাদাতেই যে আমাদের চট্‌ করিয়া অন্যত্র কোথাও সরানো হইবে না সে বিষয়ে আমরা একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে আমাদের সরাইতে হয় মিশরীয় প্রতিনিধি ম'শিয়ে খলিল আমাদের অবস্থা তদারক করিতে আসিতেছেন বলিয়া।

যে কোনো কারণেই হোক, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট ইজিপ্টের জাতীয় গভর্নমেণ্টকে সে সময় কিছুটা খাতির-সমীহ করিয়া চলিতেন এবং এখনো চলেন।* তা ছাড়া, পর্তুগীজ

---

* আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি—**১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে**—তখনো সুয়েজ ক্যানাল লইয়া ইজিপ্টের সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের গণ্ডগোল বাধিয়া ওঠে নাই। কিন্তু ইজিপ্ট সুয়েজ খাল দখল করার পরেও, পর্তুগাল প্রকাশ্যভাবে সুয়েজ খাল জাতীয়করণের অধিকার ইজিপ্টের আছে একথা স্বীকার করে ও ঘোষণা করে। ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে সুয়েজ খাল নিয়া লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হয়, সেখানে পর্তুগীজ সরকার মোটামুটিভাবে পশ্চিমী জোটের সাথে থাকিলেও ইজিপ্টের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশে খুবই সংযত ছিলেন।

শাসক সম্প্রদায় পৃথিবীতে নিজেদের আন্তর্জাতিক মান-মর্যাদা সম্পর্কে একটু অতিরিক্ত রকমের সচেতন বলিয়া, অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে খুব আদব-কায়দা-দুরস্তভাবে চলেন। ভারতের সঙ্গে তাঁহাদের যত খারাপ সম্পর্কই থাকিয়া থাকুক, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মিশরের প্রতিনিধি মঃ খলিল গোয়াতে আসিয়া 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের যেভাবে রাখা হইয়াছিল, তাহা যদি দেখেন (তিনি দেখিতে চাহিলেও প্রত্যাখ্যান করা মুশকিল) এবং যদি প্রকাশ্যে পৃথিবীর জনমতের সামনে সে সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেন, তাহা হইলে পর্তুগালকে কিছুটা বিব্রত হইতে হইবে এ বোধ পর্তুগীজ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও তাঁহার মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যদের ছিল। বিশেষ করিয়া মঃ খলিল মিশরের প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহাকে একটু বেশীরকম খাতির দেখানো দরকার হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিতেন। 'আল্‌তিন্যো'-তে বিদেশী সাংবাদিকরা আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে অনেক কিছু লুকাইয়া ছাপাইয়া রাখা সম্ভব হইত। বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের দেখা করাইতে হইলে আমাদের আনা হইত আমাদের ব্যারাকের গার্ড রুমে, অর্থাৎ কেরুস্‌ ও ফের্নান্দের অফিসে; আর না হয় তাঁহাদেরকে গোরে এবং শিরুভাউয়ের সেলে লইয়া যাওয়া হইত। কারণ সে ঘরে তাঁহাদের দুজনেরই স্প্রিংয়ের লোহার খাট ছিল, ভদ্রগোছের বিছানাপত্র ছিল। আমাকেও আমার সেল হইতে সে সময় সেখানেই আনা হইত; অন্তত যাহাতে এই সব সাংবাদিকদের মনে আমাদের সকলকেই গোরে এবং শিরুভাউয়ের মত অবস্থায় রাখা হইয়াছে সেই ধারণা হয়। কিন্তু মঃ খলিলকে এভাবে ভুলানো যাইবে না। তা ছাড়া, এই সময় আমাদের বিষয় নিয়া বেশ কিছুটা আন্দোলন চলিতেছিল। ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে মঃ খলিল আমাদের কি অবস্থায় রাখা হইয়াছে হয়ত নিজ চোখে তাহা দেখিয়া যাইতে চাহিবেন। কাজে কাজেই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মঃ খলিল গোয়ায় আসিয়া পেঁছানোর আগে কোনো ভদ্রতর বন্দিশালায় পাঠাইয়া, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে কিছুটা সুখ-সুবিধা দিয়া ইংরাজীতে যাহাকে 'প্রেজেণ্টেব্‌ল' করা বলে—অর্থাৎ বাহিরের লোকের সামনে ধরিবার মত অবস্থায় রাখার বন্দোবস্ত করাই বুদ্ধির কাজ হইবে। এই সব নানা কারণে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ আমাদের শেষ পর্যন্ত 'আল্‌তিন্যো' হইতে আগুয়াদা দুর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু ইহার কিছু আগে হইতে, বিশেষ করিয়া সে বছরের 'বড়দিনে'র কাছাকাছি আসিয়া কর্তৃপক্ষের ভাবে গতিকে আমাদেরও কেমন জানি মনে হইতেছিল, আমাদের উপর সত্য সত্যই এবার তাঁহাদের নেক নজর পড়িয়াছে। আমাদের সাজা হওয়ার সময় হইতে আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার 'মেনু'-তে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করিলাম। গোয়াতে আলু দুষ্প্রাপ্য। শুধু আলু নয়, সকল রকমের শাকসব্জি বা তরিতরকারীই গোয়াতে কম পাওয়া যায়। ভারত সীমান্ত বন্ধ হইবার আগে এ সমস্ত জিনিস আসিত প্রধানত বেলগাঁও অঞ্চল হইতে। এখন শাকসব্জি তরিতরকারী প্রায় পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। আলু আসে বেশীরভাগ হল্যাণ্ড হইতে জাহাজে ক্রেটে করিয়া। আমরা যতদিন গোয়াতে ছিলাম, আলুর দর ছিল ছয় আনা পাউণ্ড। হঠাৎ একদিন সেলে আমাদের খাবার দিবার পর লক্ষ্য করিলাম, আমাদের তিনজনের পাতেই রোজ যা থাকে, তাহার উপরে একটা 'এক্সট্রা' আলুর তরকারী জাতীয় যেন কি একটা দেখা যাইতেছে আর তা ছাড়া, আর একটি অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে কিছুটা 'তাক্‌' (ঘোলের মারাঠী-কোঙ্কনী

প্রতিশব্দ)। মাস ছয়েক আমরা আলুর মুখ দেখি নাই। হঠাৎ আলুর দমের আকারে পাতে আলুর উদয় দেখিয়া আমাদের মানসিক অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা সকলেই আন্দাজ করিতে পারেন। ইহার পর হইতে, কোনোদিন আলুভাজা, কোনোদিন আর কোনো একটা বাড়তি তরকারী এবং তাক্ রোজ রোজ দেখা যাইতে লাগিল। পরে আমরা কন্ট্রাক্টরের হোটেল হইতে যাহারা খাবার দিতে আসিত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি, ভারতীয় রাজবন্দীদের জন্য কিছুটা ভালো খাবার দিবার জন্য হোটেলের মালিকের উপর হুকুম হইয়াছে—তাই এই ব্যবস্থা।

ইহার কিছুদিন পরে আসিল 'বড়দিন'। ইংরেজদের দেখাদেখি আমরা মহাপ্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মদিনের উৎসবকে 'ক্রিস্‌মাস্' বা 'এক্সমাস্' বলিয়া অভিহিত করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি; দেশী ভাষায় 'বড়দিন'। গোয়াতে পর্তুগীজ রীতিনীতি প্রচলিত; গোয়াতে তাই বড়দিন বলিলে কেহ বোঝে না। বড়দিনের সরকারী নাম সেখানে 'নাতাল' ('natal' বা জন্মদিন)। নাতালের কয়েকদিন আগে দেখি, ফাদার কারিনো আমাদের জন্য খুব বড় বড় কার্ডবোর্ডের বাক্সে বাঁধিয়া সারা গোয়া খুঁজিয়া যেখান হইতে যা কিছু পুরানো ইংরাজী মাসিকপত্র বা বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, আমাদের এক একজনের নামে পাঠাইয়া দিয়াছেন আর তাহার সঙ্গে কিছু পেস্ট্রী ও টফি। ইহাতে আমরা আনন্দিত হইলেও (কারণ জেলে বসিয়া পড়ার মত কিছু পাইলেও তাহা আমাদের পক্ষে আনন্দ করার কারণ হইত) তত বেশী আশ্চর্য হই নাই বা একেবারে অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে করি নাই। ফাদার কারিনো-র কাছে টাকা থাকুক বা না থাকুক, আমরা জানিতাম তিনি বড়দিনের সময় আমাদের জন্য কিছু না পাঠাইয়া পারিবেন না। বই হোক, খাবার হোক, অন্য যে কোনো জিনিস হোক তিনি আমাদের জন্য এ সময় পাঠাইবেনই, এরকম একটা বিশ্বাস আমাদের মনে মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু আমাদের সত্য সত্যই আশ্চর্য হওয়ার কারণ ঘটিল, যখন একদিন দুপুরবেলায় দেখিলাম, জনকয়েক পর্তুগীজ ভদ্রমহিলা মোটর গাড়িতে করিয়া 'আল্‌তিন্যো' জেলে একেবারে আমাদের ব্যারাকের সম্মুখে আসিয়া নামিতেছেন এবং তাঁহাদের পিছনে পিছনে একটি ছোট কৌরিয়ার ট্রাক আসিয়া থামিল এবং সেই ট্রাক হইতে মিলিটারী সৈনিকরা নানারমের কাগজের বাক্স, রং-বেরংয়ের টিনের কৌটা, ফল এসব নামাইয়া রাখিতেছে। সেদিন কেরুস্ গার্ড ডিউটিতে ছিল; কিছুক্ষণ বাদে সে আসিয়া আমাদের দরজা খুলিয়া বাহির করিয়া তাহার ঘরে নিয়া গেল। আমরা সেখানে গিয়া দেখি, ঘরের টেবিলের উপর, মেঝেতে ট্রাক হইতে নামানো সেই সব জিনিস উঁচু করিয়া সাজানো আছে এবং সেই ভদ্রমহিলারা গোয়াবাসী বা ভারতীয় নির্বিশেষে প্রত্যেক বন্দীকে কিছু কেক্, ফল, কৌটায় ভর্তি জ্যাম বা জেলী, কৌটার মাছ, প্রত্যেককে এক সের করিয়া চিনি, কৌটার দুধ, গুঁড়া দুধ, পাঁচ ছয় বাক্স করিয়া সিগারেট এসব দিতেছেন। আমরা সেই ঘরে গিয়া ঢোকার আগে আর একদল বন্দী তাহাদের বরাদ্দ জিনিসপত্র হাতে নিয়া বাহির হইয়া আসিল; আমরা কিছু আশ্চর্য হইলাম—ইঁহারা কে? কেন জেলখানায় আসিয়া এই সব জিনিস বন্দীদের মধ্যে বিলি করিতেছেন? 'বড়দিন' উপলক্ষে নিশ্চয়; কিন্তু 'বড়দিন' বলিয়াই এই সমস্ত পর্তুগীজ মহিলাদের মনে পর্তুগীজবিরোধী রাজবন্দীদের সম্পর্কে হঠাৎ মমতা জাগিল কেন? —এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘরে পা দিতেই আমাদের প্রশ্নের আংশিক উত্তর পাইলাম। কেরুস্ আমাদের ঘরের ভিতরে আনিয়া 'বাও' করার ভাবে সামনে সামান্য একটু ঝুঁকিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিয়া ভদ্রমহিলাদের

আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল—"Senhoras do Cruz vermillho Portugues" (পর্তুগীজ রেড্ ক্রসের মহিলাবৃন্দ); তাহার পরে আমাদের দিকে দেখাইয়া—"O Doutour Chaudhuri, Parlamentar Indiano, O Senhor Joshi, O Senhor Patil, Chefes dos Satyagrahis, Politicos Indianos." (ইনি ডক্টর শাউদ্যুরি,* ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টের সদস্য, ইনি সিনর যোশী আর ইনি সিনর পাতিল, সত্যাগ্রহীদের নেতা, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ)। ভদ্রমহিলাদের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সকলেরই ডান হাতে রেড্ ক্রসের একটা করিয়া ব্যাজ বাঁধা আছে; তাঁহাদের বেশভূষা দেখিয়াও সকলকে বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা বলিয়া মনে হইল। আগেই বলিয়াছি, আমরা তখন পর্তুগীজ ভাষা খুব বেশী না শিখিলেও কেরুস্ ও ফের্নান্দের শিক্ষকতায় এবং পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়া পর্তুগীজ আদব-কায়দায় একটু একটু করিয়া অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলাম। আমরাও কেরুসের দেখাদেখি ভদ্রমহিলাদের একটু 'বাও' করিয়া অভিবাদন জানাইয়া 'ব' দিয়' বলিয়া অভিভাষণ করিলাম। ভদ্রমহিলাদের মধ্যে যাঁহাকে প্রধানা বলিয়া মনে হইল, তিনি পর্তুগীজ ভাষায় আমাদের কিছু বলিলেন; সে কথা বোঝার মত পর্তুগীজ ভাষাজ্ঞান আমাদের কাহারো ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত পুলিস কুয়ার্তেল হইতে একজন 'মিস্তী' বা ইউরেশিয়ান ইন্দো-পর্তুগীজ-গোয়ানীজ কনস্টেবল তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল; সে ইংরাজী জানিত। সে অনুবাদ করিয়া দিল—'আপনারা পর্তুগীজ রেড্ ক্রসের নাতালের অভিবাদন গ্রহণ করুন! শুভ নাতাল উপলক্ষে আমরা পর্তুগীজ রেড্ ক্রসের তরফ হইতে আপনাদের জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনাদের 'নাতাল' ও নববর্ষের দিনগুলি আনন্দের মধ্যে কাটুক; ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।'

কথাগুলি শুনিতে ভালো। তা ছাড়া, সেবাধর্মী রেড্ ক্রস প্রতিষ্ঠান—তাহা পর্তুগীজদের হোক কিম্বা অন্য যে কোনো দেশের হোক, তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযোগ করার বা তাহার সম্পর্কে কোনো রকম বিরূপ মনোভাব পোষণ করারও কোনো কারণ ছিল না। বিশেষ করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যখন কেক্, বিস্কুট, ফল এসব হাতে করিয়া বড়দিনের শুভেচ্ছা এবং অভিবাদন জানাইতে আসেন, সেক্ষেত্রে তো কোনো কথাই নাই। কিন্তু তবু হাত পাতিয়া ভদ্রমহিলাদের নিকট হইতে রেড্ ক্রসের দেওয়া বড়দিনের সওগাত নিবার সময় কিম্বা 'সুইতো ওব্রিগাদু' (বড়ই বাধিত হইলাম), তাঁহাদের

* পর্তুগীজদের মধ্যে কথাবার্তায় একটা সাধারণ রীতি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের 'দুতোর' বা 'ডক্টর' বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাহার জন্য পি. এইচ. ডি বা ডি. ফিল্ জাতীয় উপাধির দরকার করে না। তবে এটা খালি কথাবার্তা বলার সময়। কেরুস ফাদার কারিনোর কাছে শুনিয়াছিল যে, আমি ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য এবং সে হিসাবে পদস্থ ব্যক্তি। কাজে কাজেই আমাকে রেড ক্রসের ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার সময় তাহাদের অধীনেও যে একজন 'দুতোর' জাতীয় পদস্থ শিক্ষিত লোক আছে তাহা জানানোর লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। আর এসব ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া ভদ্রমহিলাদের সামনে কথায় কথায় 'বাও' করা গোছ আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার অভিনয় বা 'সেরিমনি' করাটা পর্তুগীজ জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেরুস কনস্টেবল হইলেও খাস লিস্বনের লোক; কাজে কাজেই মহিলাদের সামনে আদব-কায়দা বা কেতাদুরস্তপনায় কাহারো পিছনে থাকিতে প্রস্তুত নয়।

ধন্যবাদ জানাবার সময় আমাদের মনের মধ্যে অনবরত একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকিল, হঠাৎ বিশেষ করিয়া গোয়ার রাজবন্দীদের উপর এই অযাচিত দাক্ষিণ্য বর্ষিত হইল কেন? তাহার মধ্যেও আবার ভারতীয় রাজবন্দীদের উপর দাক্ষিণ্যের মাত্রাটা একটু বেশী ছিল, পরে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভারতীয় বন্দী আমরা আটজন ফল, দুধ, ওভালটীন কিছু মার্মালেড জাতীয় ফলের মোরব্বা এসব জিনিস বেশী পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের জন্য এত বেশী জিনিস ছিল যে, আমাদের পক্ষে সমস্ত একসঙ্গে বহিয়া নিজেদের সেলে নিয়া যাওয়া বেশ মুশকিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের কিছু জিনিস উপরোক্ত দোভাষী মিস্তী কনস্টেবলটি বহিয়া আমাদের সেলে দিয়া যায়। এই মিস্তী কনস্টেবলটিকে আমরা কুয়ার্তেলে হাজতে থাকিবার সময় হইতে চিনিতাম। যে কোনো কারণে হোক, সে মনে প্রাণে পর্তুগীজ বিরোধী ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাস, ইংরেজিতে ও পর্তুগীজ ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলিতে পারে, মারাঠী ও হিন্দীও বেশ ভালো জানে। সে আমাদের সঙ্গে আসিতে আসিতে ইংরাজিতে ও মারাঠীতে মিশাইয়া বলিল—'আশা করি এসব চালে আপনারা ভুলিবেন না; এসব খালি কাগজে প্রচারের জন্য। কালই 'এরাল্দো' 'ও এরাল্দো' এসব কাগজে ফলাও করিয়া বাহির হইবে রাজবন্দীদের সঙ্গে গভর্নমেন্ট কত ভদ্র ব্যবহার করিতেছে! 'নাতালের' সময় রাজনৈতিক বন্দীদের খাওয়ানোর জন্য পর্তুগীজ সরকার কত ভালো ভালো জিনিস বিতরণ করিতেছে! বেটাদের যত মিথ্যা চালবাজী।' লোকটি যে পর্তুগীজ বিরোধী, তাহা আমরা জানিতাম। তাই তাহার কথায় কিছুটা কৌতুক বোধ করিলেও তত আশ্চর্য হই নাই। আমরা জানিতাম, সুবিধা পাইলেই সে এই ধরনের পর্তুগীজ বিরোধী মন্তব্য করিবেই। কিন্তু ইহাতে আমাদের মনের প্রশ্নের পুরাপুরি নিরসন হয় নাই। পরে এখবরও আমরা নিয়াছিলাম যে, ১৯৫৪ সালের 'নাতাল' উৎসবের সময়, সে সময় যেসব রাজবন্দী গোয়ার বিভিন্ন জেলে ছিলেন, তাঁহাদের জন্য 'নাতাল' উপলক্ষ করিয়া এভাবে কেক, ফল বা বিশেষ কোনো খাবার জিনিস বিতরণ করা হয় নাই, কিংবা গোয়াতে সাধারণ কয়েদীদের জন্যও 'নাতালের' সময় হোক, বা অন্য কোনো পরব বা ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে হোক, এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। ইহার পরের বছর ১৯৫৬ সালেও আমাদের জন্য এরূপ কিছু করা হয় নাই বা কোনো বিশেষ দাক্ষিণ্য আমাদের উপর বর্ষিত হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটি পরে মনে মনে খতাইয়া দেখিয়া আমার ধারণা হয়, সে বৎসর আমাদের প্রতি এই দাক্ষিণ্য দেখানোর কারণ দুইটি। এই সময়ে ভারতীয় বন্দীদের এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের গোয়াতে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যেভাবে রাখিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে ভারতে কিছুটা আন্দোলন হইতে থাকে। ভারত সরকার এমনি প্রতিবাদ জানাইয়া এ বিষয়ে কোনো ফলাফল না পাইয়া এবং আমাদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো খবরাখবর সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আন্তর্জাতিক রেড্ ক্রসের শরণাপন্ন হওয়ার কথা ভাবিতেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে মিশর গভর্নমেণ্টের কাছেও তাঁহারা আমাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। ফলে যে কোনো সময় হয়ত আন্তর্জাতিক রেড্ ক্রস হইতে কোনো তদন্ত আসিয়া পড়িবে, কিংবা মিশর গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে কোনো প্রতিনিধি আসিয়া ভারতীয় বন্দীদের কিভাবে রাখা হইয়াছে, আমাদের সাজা হইয়া যাওয়ার পর আমরা জেলে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে কি ধরনের কতটা সুযোগ-সুবিধা পাইতেছি বা না পাইতেছি, তাহার তদ্বির তদারক করিতে আসিবেন—এই ধরনের আশঙ্কা গোয়াতে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের মনে ছিল। তাঁহাদের মনে সেই দুই

আশঙ্কার ফলেই সেবারকার 'নাতালে'র সময় রাজনৈতিক বন্দীদের ভাগ্য হঠাৎ ছপ্পর ফুঁড়িয়া কিছুটা ভালো-মন্দ খাইয়া মুখ বদলানোর একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়া যায়।

যে কারণেই হোক, সেবারকার 'নাতালে'র সময় আমাদের পড়তা কত ভালো ছিল, তাহার প্রমাণ মিলিল 'নাতালে'র দিন। সে দিন বিকালে হঠাৎ দেখি স্বয়ং 'অন্নমন্ত্রী' (আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকে নিযুক্ত পেটমোটা পর্তুগীজ কনস্টেবলটি) হোটেলের লোকজন নিয়া আমাদের জন্য বিকালের এক প্রস্থ খাবার নিয়া আসিয়াছে—পরটা, মাংস (যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের জন্য নিরামিষ তরকারী), ভালো মোহনভোগ, কিছু বাঁদিয়া জাতীয় মিষ্টি, কলা ও কফি। আমাদের 'অন্নমন্ত্রী' সালাজার গভর্নমেণ্টের ভালো প্রোপাগাণ্ডিস্ট—সে আমাদের সেলের সম্মুখে আসিয়া সেদিনকার ডিউটিতে যে গোয়ানীজ কনস্টেবলটি ছিল, তাহার মারফৎ আমাদের জানাইল—"আজ 'নাতাল' বলিয়া পুলিস কুয়ার্তেল হইতে তোমাদের জন্য এই স্পেশ্যাল খাবার পুলিস কমাণ্ডাণ্ট সাহেব বরাদ্দ করিয়াছেন। সিনর পাতিল (রাজারামের সঙ্গেই সে আলাপ জমাইত বেশী) তোমাদের নেহরু কখনও এরূপ ভালো ব্যবহার করিবে না জানিও! কিন্তু আমরা পর্তুগীজরা সে রকম নই। ডাঃ সালাজার আমাদের অন্যরকম শিক্ষা দিয়াছেন। তোমরা আমাদের গোয়া হইতে তাড়াইয়া দিতে চাও, আর আমরা 'নাতালে'র দিন তোমাদের ভালো ভালো খাবার খাইতে দিতেছি!" বেচারী রাজারাম ফের্নান্দের শিক্ষকতায় আমাদের মধ্যে পর্তুগীজ কথাবার্তায় সবচেয়ে সুদক্ষ হইলেও তাঁহার পর্তুগীজ ভাষাজ্ঞানও ইয়েস-নো-ভেরি গুড স্তরের বেশী উপরে ওঠে নাই। তিনি 'সুইতো ওব্রিগাদু'—'য়জে নাতাল! য়জে সালাজার বঁ, নেহরু বঁ, তোদুস্ বঁ (অনেক ধন্যবাদ! আজ যীশুখৃষ্টের জন্মদিন, আজ সালাজার ভালো, নেহরু ভালো, সবাই ভালো!) বলিয়া কোনোমতে অন্নমন্ত্রীর বক্তৃতা হইতে আত্মরক্ষা করিলেন।

'নাতালে'র দিন আমাদের জন্য এই সব বিশেষ খাবারের ব্যবস্থার পিছনে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের পরোক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাহাই থাকিয়া থাকুক না কেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই পর্তুগীজদের মধ্যে 'নাতাল' বা যীশুখৃষ্টের জন্মদিনই সবচেয়ে বড় উৎসব। আমার গোয়াতে পর্তুগীজ জেলে দুই দুইটি 'নাতাল' দেখার সুযোগ হইয়াছে এবং তাহা হইতে আমার মোটের উপর এই ধারণা হইয়াছে, 'নাতালে'র দিন সকলের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতে হইবে, সকলকে সাধ্যমত ফুর্তি করিতে দিতে হইবে, সে দিন কোনো বন্ধু-শত্রু ভেদ রাখিলে চলিবে না,—এটা পর্তুগীজদের চিরাচরিত ঐতিহ্য বা প্রথা। এই প্রথা অন্যান্য ক্রিশ্চিয়ান দেশেও আছে বটে। কিন্তু আমার মনে হইয়াছে, য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় পর্তুগীজ সাধারণ মানুষের মধ্যে 'নাতালে'র দিনের হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা অনেক বেশী। পর্তুগাল এখনও প্রধানত কৃষিজীবী ও পল্লীপ্রধান দেশ বলিয়া হয়ত বড়দিনের হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার পরিমাণটা একটু বেশী রকম হয়, যা য়ুরোপের অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ আধুনিক নগর-সমাজে বিরল। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের সামাজিক দুর্গাপূজা আর কলিকাতার নিয়ন লাইট-এর চোখ-ঝলসানো আলো দিয়া সাজানো, রেডিয়ো-মাইক মুখরিত সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মধ্যে যে তফাৎ, গোয়াতে পর্তুগীজদের 'নাতাল' আর লণ্ডন-প্যারিসের বড়দিনের মধ্যে কতকটা সেই ধরনের তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয়। তা ছাড়া, পর্তুগীজরা সাধারণভাবে খুবই মানবিকতা বোধসম্পন্ন, বন্ধুভাবাপন্ন জাতি বলিয়া এবং বর্ণবৈষম্য বা পরজাতি বিদ্বেষের প্রভাব তাহাদের ভিতর অত্যন্ত কম সেজন্য

নাতালে'র দিন জেলখানায় আমাদের সঙ্গে যতটা সম্ভব মিলিয়া মিশিয়া একসঙ্গে আনন্দ করায় তাহাদের বাধে নাই।

এমন কি 'নাতালে'র দুই তিনটা দিন 'আল্তিন্যো'তে, নিতান্ত উদ্ধত প্রকৃতির ফের্নান্দও নিতান্ত বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কেরুসের গাম্ভীর্যের মাত্রাও বহু কমিয়া ঢিলা-ঢালা আলগাগোছের হইয়া আসিয়াছিল। 'নাতালে'র দিন বিকাল বেলায় ছয় নম্বর সেলের আল্বের্ত, আল্ফোন্সো, জোয়াকিম পিণ্টো প্রভৃতি কয়েকজন ছেলে ফের্নান্দের কাছে দরবার করিল—"সিনর কাব্ (Cabo, হেড কনস্টেবল, কর্পোরাল) আজ নাতালের দিন রাত্রিতে আমরা গান-বাজনা করিতে চাই।" সিনর কাবের তখন মেজাজ খুব শরিফ (শুনিয়াছিলাম সেদিন প্রত্যেক সিপাহী ও কনস্টেবলের জন্য কুড়ি টাকা করিয়া 'নাতালে'র স্পেশ্যাল এলাউয়েন্স মঞ্জুর হয় 'নাতালে'র দিনের পানীয়ের জন্য)। সিনর বলিলেন, 'কুছ পরোয়া নাই! সন্ধ্যা সাতটা হইতে গান-বাজনা হইবে।" সন্ধ্যার খাওয়া শেষ হওয়ার পর ঘরে গান-বাজনা শুরু হইল। বাজনা মানে, গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্যে টিনের কৌটা বাজানো এবং তাহারই সঙ্গে কিছু তার, কিছু এটা-ওটা-সেটা জুড়িয়া যেমন-তেমন গোছের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করিয়া নিয়া তাহা দিয়া গানের সঙ্গে সঙ্গত রাখা। আর সে কি গান! আর বাজনা! দুই ব্যারাকের কুড়ি বাইশটি সেলে একসঙ্গে সবাই মিলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহারই মধ্যে কোথা হইতে ফের্নান্দ একটি ছোট গ্রামোফোন সংগ্রহ করিয়া নিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে সস্তা জাজ (Jazz) ব্যাণ্ডের নানা রকমের রাগ-রাগিণী নির্গত হইতেছে। কখন আমাদের জানালার ধারে, প্রত্যেক ব্যারাকের দু সারি সেলের মধ্যেকার করিডোরে পর্তুগীজ এবং নিগ্রো সৈনিকেরা আসিয়া মাজায় হাত দিয়া কিম্বা হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে-গাহিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। আমাদের ঘরে গান-বাজনা নাই, গোরেদের ঘরে নাই। মধ্যে মধ্যে ফের্নান্দ কিম্বা সৈনিকরা আসিয়া আমাদের ধমকাইতেছে—"তোমরা কেমন বেরসিক লোক, শেফেস্ ইন্দিয়ানোস্ (ভারতের নেতা মশাইরা)? আজ নাতাল! নাচো! গান করো!" তারপরে আমরা গান করি কি না করি, তাহা শোনার জন্য অনর্থক অপেক্ষা না করিয়া থাকিয়া, হাত-ধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতেছে। আমরা নিজের নিজের সেলে বন্ধ হইয়া আছি ঠিকই। কিন্তু ফুর্তির হুল্লোড়ে সে বন্ধন আর বন্ধন বলিয়া ঠেকিতেছে না। ফের্নান্দ বা ফের্নান্দের সহকারী গোয়ানিজ কনস্টেবলটি, আমাদের পাহারাওলা মিলিটারী সান্ত্রীরা—সকলে ভুলিয়া গিয়াছে আমরা সালাজার সরকারের শত্রু, রাজদ্রোহী বন্দী। আজ 'নাতাল', আজ সকলের সঙ্গে একসাথে মিলিয়া মিশিয়া বন্ধুত্ব করার এবং ফুর্তি করার দিন—সেই বোধটাই সেদিন তাহাদের মনে বেশী করিয়া জাগিয়া ছিল। এইভাবে রাত্রি এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত হৈ-চৈ করিয়া সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে ক্রমে সে রাতের গান-বাজনা স্তিমিত হইয়া আসিল। একে একে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে পর রাত্রি আবার যখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে কানে আসিল হেনরী ডি'সুজা আর পিন্তু'র মিলিত কণ্ঠে চিরকালের খৃষ্ট জন্ম-প্রহরের অবিস্মরণীয় গানের সুর—

> A silent night! A holy night!
>
> A heavenly child is born!........

সেই গান শুনিতে শুনিতে কখন যে নিজে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, তাহার খেয়াল হয় নাই। পরের দিন কেরুসের ডিউটি; সে দিন হৈ-হুল্লোড় কিছুটা কম হইলেও সে দিন রাত্রেও গান-বাজনা কম হয় নাই। 'আল্তিন্যো'-তে এই আমাদের শেষ সপ্তাহ।

'নাতাল' এবং তাহার কদিন বাদেই 'নোভা আনো'র (নববর্ষের) হৈ-চৈ-এর ভিতর বুঝি নাই কখন ১৯৫৫ সাল কাটিয়া '৫৬তে পা বাড়াইলাম। তাহার পর আরো কয়দিন যাইতে না যাইতেই এক সন্ধ্যেবেলা কেরুস্ আসিয়া হুকুম শোনাইয়া গেল—"সিনোরস্ শাউদ্যুরি, যোশী, পাতিল! আজ রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তোমাদের জিনিসপত্র গোছাইয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া তৈরি হইয়া থাকিবে। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় তোমাদের এখান হইতে অন্যত্র যাইতে হইবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায়? আগুয়াদা?" সে সরাসরি জবাব দিল না। একটু হাসিয়া খালি বলিল—"Provabel" (সম্ভব)। কেরুসের কথা বলার ধরন এইরকম ছিল। আমরা বুঝিলাম, আমরা কোথায় চালান হইতেছি।

॥ ৩৯ ॥

আগুয়াদা দুর্গে

পাঠকদের হয়ত মনে আছে, উপরে এই কাহিনীর এক জায়গায়, 'আল্তিন্যো' জেলের কাছাকাছি গোয়ার রোমান ক্যাথলিক প্যাট্রিয়ার্কের আবাস-স্থল হিসাবে যে প্রাচীন প্রাসাদটি আছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক ডাঃ হোমার জ্যাকে্র একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি—"History dozes from the residence."—প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদের গা বহিয়া যেন পুরানো ইতিহাস চোঁয়াইয়া পড়িতেছে। ডাঃ জ্যাকে্র এই মন্তব্য প্যাট্রিয়ার্কের ঐতিহাসিক আবাস-স্থল সম্পর্কে যতটুকু সত্য বা যতখানি প্রযোজ্য তাহার চেয়ে অনেক বেশীগুণে এবং অনেক বেশী পরিমাণে প্রযোজ্য গোয়ার জেল-জীবনে আমাদের নূতন আবাস-স্থল আগুয়াদা দুর্গ সম্পর্কে।

আগুয়াদা দুর্গকে যদিও গোয়াতে পর্তুগীজ স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায় না (কারণ, পুরাতন গোয়া শহরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজও সেইন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের ক্যাথিড্রাল ও সমাধি, বম্ যেসুর গীর্জা প্রভৃতি বহু প্রাচীন ইমারত এখনও খাড়া আছে, যেগুলি আগুয়াদা দুর্গ হইতে প্রায় এক শ' দেড় শ' বছরের বেশী পুরাতন), ইহাকে ভারতের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিকালে ইউরোপীয়দের তৈরী উল্লেখযোগ্য পুরাতন ঐতিহাসিক ইমারতগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া নিশ্চয়ই গণ্য করা যায়। আগুয়াদা দুর্গের ইতিহাসের সঙ্গে পূর্ব ভারতে আমরা তত পরিচিত নই বটে; কিন্তু পশ্চিম ভারত ও সমগ্র ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগ সন্ধিক্ষণের সাক্ষ্য হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

আগুয়াদা দুর্গ নির্মিত হয় ১৬৯২ সালে। দিল্লীর মুঘল তখ্ত তাউসে তখনও বর্ষীয়ান সম্রাট ঔরঙজীব সমাসীন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের তখনও অবসান হয় নাই; আধুনিক যুগ তখনও অনেক—অনেক দূরে। কিন্তু গোয়াতে তখন পর্তুগীজ শাসনের দ্বিতীয় শতাব্দী প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে।* দূর প্রাচ্য এবং ভারত মহাসাগরে

---

* আগুয়াদা দুর্গের ইতিহাস প্রসঙ্গে পর্তুগীজ ভারতের ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষ তারিখের কথা এখানে মনে রাখা দরকার। পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি এবং ইউরোপ হইতে সমুদ্রপথে

গোয়াকে কেন্দ্র করিয়া যে সমৃদ্ধিশালী সওদাগরী সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার স্বর্ণ যুগ তখন স্তিমিতপ্রায়। গোয়াতে পর্তুগীজরা তখন সমুদ্রপথে প্রধানত ওলন্দাজদের এবং কিছুটা ইংরেজদের ভয়ে এবং স্থলপথে উত্তর ও পূর্বদিক হইতে মারাঠাদের আক্রমণের ভয়ে সশঙ্কিত। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য তখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই সত্য। কিন্তু সমগ্র পশ্চিম ভারত তখন মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতের জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবে শিখশক্তির অভ্যুদয় হইতেছে। রাজস্থানে রাজপুতরা বিদ্রোহী। সম্রাট ঔরঙজীবের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতি কোনোমতে জোর করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতনকে ঠেকাইয়া রাখিতেছিল বটে। কিন্তু প্রায় বোঝাই যাইতেছিল তাহার আর বেশী দেরী তখন নাই।

এই একই সময়ে ভারত মহাসাগরে ভাবীকলের য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রাগ্-ভূমিকা রচিত হইতেছিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, বৃটিশ ও ফরাসীদের নৌ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়া। আগুয়াদা দুর্গ সেই অতীত যুগের অতন্দ্র প্রহরী। মাণ্ডভী নদীর মোহনার ধারে আরব উপসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সেই প্রাচীন আগুয়াদা দুর্গ শুধু পর্তুগীজ ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিকেই নিজের সতর্ক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রাখে নাই। সেখানে স্থির অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া দূর প্রাচ্য ও পশ্চিমের ইতিহাসের কত না ওঠা-নামা দেখিয়াছে! কত রাজ্য-সাম্রাজ্যের আর সভ্যতার ভাঙ্গা-গড়া দেখিয়াছে! আগুয়াদা খালি নিজে এখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই। আজও রোজ সকাল-সন্ধ্যায় আগুয়াদা দুর্গ শিখরে সেদিনকার মত লাল-সবুজ রংয়ের পর্তুগীজ পতাকাই ওড়ে!

আজ হইতে আড়াই শ' তিন শ' বছরের কথা! মাণ্ডভী ও জুয়ারী নদী বাহিয়া এই আড়াই শ' বছরে বহু জল সহ্যাদ্রি হইতে আরব সাগরে আসিয়া মিশিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু যুগ-পরিবর্তন, পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের সমসাময়িক এই যুগকে আমরা বলি ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবসানের যুগ, সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী ও শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যুগ। ইতিহাসের বিচিত্র পরিহাস! এ যুগের ভাঙ্গা-গড়ার ডামাডোলে কত

ভারত আবিষ্কারক ভাস্কো দা গামা কালিকটে আসিয়া পৌঁছান ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে। আলফোন্সো দা আল বুকের্ক বিজাপুরের আদিলশাহী নবাবদের হাত হইতে গোয়া বন্দর কাড়িয়া নিয়া ভারতের বুকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন ১৫১০ সালে। ভারতে তখনও মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৫১০ সাল হইতে শুরু করিয়া সতেরো শ' শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারত সাগর এবং দূর প্রাচ্যের বাণিজ্যে পর্তুগীজ নৌ-শক্তির প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল বলা চলে। কিন্তু ইহার পর হইতে পর্তুগীজরা ক্রমশ প্রথম ওলন্দাজদের (ডাচ বা হলাণ্ডবাসীদের) কাছে এবং পরে ইংরেজদের কাছে হটিয়া যাইতে থাকে। সতেরো শ' শতকে গোয়া ছাড়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে দিউ, দমন, সালসেট, বাসীন, চাওল ও বোম্বাই বন্দর এবং পূর্ব উপকূলে মান্দ্রাজের নিকটে সান থোমে এবং বাংলাদেশে হুগলি উপনিবেশ পর্তুগীজদের দখলে ছিল। মালয় উপদ্বীপে মলাক্কায় এবং সিংহলের বেশীর ভাগ অঞ্চলের উপরে তাহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল।

সতেরো শ' শতকে আসিয়া গোয়া, দমন ও দিউ ভিন্ন অন্য সমস্ত কেন্দ্র একের পর এক পর্তুগীজদের হাত ছাড়া হইয়া যায়। ওলন্দাজরা প্রথমে ১৬০৩ সালে এবং তাহার পর দ্বিতীয় বার ১৬৩৯ সালে সমুদ্রপথে গোয়া অবরোধ করে। এই সময় হইতে গোয়ার প্রাধান্য হ্রাস পায়

প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্য-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারই মধ্যে ক্ষুদ্র পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আজও মাথা তুলিয়া খাড়া আছে! এ যুগের ইতিহাস নিজের গতিতে সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাওয়ার পথে পর্তুগালের কথা যেন ভুলিয়া গিয়াছিল! তাই আজও আগুয়াদার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ আছে; ১৯৫৫-৫৬-তে আসিয়াও তাই দেখিতেছি ইতিহাসের নেপথ্যে অবস্থিত সেদিনকার সেই পুরাতন আগুয়াদা দুর্গ আবার নূতন করিয়া পর্তুগীজদের ভারত-সাম্রাজ্য—'ইস্তাদু দা ইন্দিয়া'—রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হইতেছে।

১৯৫৬ সালের ৩রা জানুয়ারীর ভোর। সবে মাত্র পূবের আকাশে সহ্যাদ্রির উঁচু প্রাচীরের ওপার হইতে সূর্য দেখা দেওয়ার উপক্রম করিয়াছে। ভোর আকাশের সোনালী-লাল আলো ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া মাণ্ডভী নদীর বুকে আর পাঞ্জিম শহরের সরকারী ইমারতগুলি ও গীর্জার চূড়ায় প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই ভিতর সশস্ত্র পর্তুগীজ পুলিস ও মিলিটারী পাহারায় পর্তুগীজ-বিরোধী রাজনৈতিক বন্দী-বোঝাই দুইখানি বড় স্টীম লঞ্চ সেই প্রাচীন আগুয়াদা দুর্গের সামনে আসিয়া নদীর মাঝখানে থামিয়া গেল। পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া আমরা 'আল্তিন্যো' জেলের ছোট কুঠুরীতে দিবারাত্র বন্দী ছিলাম। বাহিরের জগৎ, খোলা আলো-বাতাস, উন্মুক্ত আকাশ-নদী-পৃথিবী আবার কোনোদিন চোখে দেখিব ভাবি নাই। রাত সাড়ে তিনটার সময় অন্ধকারে 'আল্তিন্যো' জেল হইতে আমরা আমাদের বন্দী-জীবনের গাঁঠরী-বোঁচকা বিছানা, ফাদার কারিনোর দেওয়া বই-কাগজপত্রের বোঝা, সব কিছু ঘাড়ে করিয়া প্রথম আসিয়া আমাদের জন্য আমদানী করা চারটি স্পেশাল মোটর বাসে আসিয়া উঠিয়াছি। প্রত্যেকজন বন্দীর সম্মুখে ও পিছনে স্টেন-গানধারী পর্তুগীজ পুলিস ও মিলিটারী পাহারা। সেই সব বাস রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া আসিয়া পাঞ্জিমের জাহাজঘাটে আনিয়া আমাদের মোটর লঞ্চে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। দিনের বেলায় এত বেশীসংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীকে পাঞ্জিমের খোলা রাজপথ দিয়া চালান দেওয়া সমীচীন হইবে না মনে করিয়া পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষ আমাদের রাতারাতি পাঞ্জিম হইতে লঞ্চে করিয়া আগুয়াদায় চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে। আকাশে সূর্যের আলো দেখা দিয়াছে। আমরা লঞ্চে আসিয়া এবার

এবং তাহার সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য-দীপ্তি দ্রুত ম্লান হইয়া আসিতে আরম্ভ করে। সতেরো শ' শতকের শেষ দিকে গোয়াতে পর্তুগীজদের নূতন বিপদ দেখা দেয়; ১৬৮৩ সালে ছত্রপতি শিবাজী-র পুত্র শম্ভাজী স্থলপথে সাবন্তবাড়ীর দিক হইতে গোয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ঘটনাচক্রে শম্ভাজী শেষ পর্যন্ত আর গোয়া আক্রমণ করেন নাই বটে, কিন্তু এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৫৯ সালে পেশোয়াদের সঙ্গে পর্তুগীজদের সন্ধি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত গোয়ার উপর মারাঠা আক্রমণের বিপদ একেবারে কাটে নাই। এই সঙ্কটের মুখে গোয়া বন্দর ও পোতাশ্রয়ের প্রবেশ পথে একটি শক্ত সামরিক ঘাঁটি তৈরী করিয়া পর্তুগীজরা একই সঙ্গে সমুদ্রপথে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের আক্রমণ এবং স্থলপথে মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। বলাই বাহুল্য ১৬৯২ সালে আগুয়াদা দুর্গের পত্তন হয় গোয়ায় পর্তুগীজ রাজত্বের এই সঙ্কট মুহূর্তে পর্তুগীজদের সামরিক আত্মরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ হইতে। কিন্তু মনে রাখা দরকার ১৬৯২ সালে পৌঁছিতে পৌঁছিতে গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনের ১৮২ বছর পার হইয়া গিয়াছে!

মাঝ দরিয়ায় আটক পড়িলাম। আর বড় লঞ্চ অগ্রসর হইবে না। আগুয়াদার দিকে নদীর জলের গভীরতা কম এবং জলের নীচে বড় বড় পাথর আছে বলিয়া ছোট আকারের একটি পেট-বুক চাপা মোটর-বোট আনা হইয়াছে। বড় লঞ্চ হইতে আমাদের কয়েক খেপে আগুয়াদা দুর্গের পাথরের জেটিতে নামাইয়া দেওয়ার জন্য।

ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা সকলে যখন লঞ্চ হইতে নামিয়া সত্য সত্যই সেই পাথরের জেটির উপর আসিয়া জমা হইলাম, সেখানে নীচে নদীর বুক হইতে পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া লাল-কালো ল্যাটেরাইট পাথরে গাঁথা যে বিশাল দুর্গ প্রাকার খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইয়া সকলেই যেন কিছুটা অভিভূত হইয়া গেলাম। এই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগুয়াদা দুর্গ! এতক্ষণ দূরে স্টীম-লঞ্চে বসিয়া দুর্গের আকারের বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নদী এবং সমুদ্রের বুক হইতে আগুয়াদা পাহাড় খাড়া হইয়া সোজা উপরের দিকে দেওয়ালের মত উঠিয়া গিয়াছে; আর সেই পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া জলের ভিতর হইতে সমান করিয়া কাটা ল্যাটেরাইট পাথরের বিরাট এক একটি জগদ্দল ব্লক, একটির পরে একটি করিয়া বসাইয়া প্রায় ৬০।৭০ ফুট উঁচু পাথরের দেওয়াল গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। দেওয়ালের নীচের দিকে জলের ভিতর বিরাট সব পাথরের চাঙড় দেওয়ালের ভিতকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। নদীর পলি, সমুদ্রের মোটা বালি, শামুক-ঝিনুক, ছোট বড় পাথরের নুড়ি সব কিছু সেই সমস্ত চাঙড়ের ফাঁকে ফাঁকে এই আড়াই শ' বছর ধরিয়া জমা হইয়াছে। তাহার উপর ঘন সবুজ শেওলা আর সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জ লতাপাতা গজাইয়া গাঢ় কাল্‌চে-সবুজ বর্ণ-সমারোহের সৃষ্টি হইয়াছে। নদী-সমুদ্রের জলের ঢেউ এই সব পাথরের চাঙড়ের উপর, আর না হয় দুর্গের দেওয়ালের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়ে। জলের সাদা ফেনায় কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু ঢাকিয়া যায়। আবার নূতন ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া মুহূর্তের মধ্যে সেই ফেনাকে সরাইয়া নূতন করিয়া দুর্গের ভিতে আঘাত করিতে চায়। সেদিকে তাকাইয়া মনে হয় না দুর্গের এই দেওয়াল মানুষের হাতে গড়া। মনে হয়, জলের ভিতর হইতে নিজের কোনো অন্তর্নিহিত দানবীয় শক্তির জোরে আপনা-আপনি মাথা তুলিয়া একদিন এই দেওয়াল পাহাড়ের গায়ে খাড়া হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। আগুয়াদা পাহাড়ের সঙ্গে, পাহাড়ের নীচেকার লাল ল্যাটেরাইট পাথরের সঙ্গে দুর্গের এই দেওয়ালকেও যেন একসাথে জমাইয়া গাঁথা হইয়াছিল। মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের হাতে তৈরী জিনিস বলিয়া মনে পড়ে যখন উপরের দিকে তাকাইয়া দুর্গ-প্রাকারের ফাঁকে ফাঁকে সাজাইয়া রাখা পুরানো দিনের সব লোহার কামানের মুখ দেখা যায়। প্রাচীরের কোণায় কোণায় দুর্গের বুরুজ কিম্বা প্রহরীদের ঘুম্‌টি-ঘর দেখা যায়। কিন্তু সে সব অনেক উপরে। নীচে নদীর বুকে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখান হইতে মাথা উঁচু করিয়া সে সব দেখিতে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘাড় ব্যথা হইয়া যায়। উপরে খুব ছোট ছোট আকারের মানুষ-জন যেন চলাফেরা করিতেছে। কিছুটা ঠাহর হয়; কিছুটা হয় না। কিন্তু নীচে হইতে দাঁড়াইয়া উপরে দুর্গের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া দেখিলে দুর্গের বিশাল আকারটা যেন মনের উপর ক্রমে চাপিয়া বসিতে চায়; মনে হয়, প্রাচীন যুগের মহা শক্তিশালী অতিকায় কোনো দৈত্য যেন থাবা পাতিয়া সমুদ্রের পারে পাহারা দিতেছে।

বেশীক্ষণ এই ভাবটা থাকে না। দুর্গের আকার সম্পর্কে প্রথমে মনের মধ্যে যে একটা আতিশয্যময় ধারণা জাগিয়া ওঠে—বিশেষ করিয়া নীচে মাণ্ডভী নদী বা সমুদ্রের বুক

হইতে দুর্গের কাছাকাছি আসিয়া যদি দুর্গের উপরের দিকে তাকানো যায়—তাহার একটি প্রধান কারণ এই, দুর্গটিকে মাণ্ডভী নদী ও সমুদ্রের ভিতর হইতে খাড়া-হইয়া-ওঠা একটি পাহাড়ের গায়ে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নদীর বুক হইতে আগুয়াদা পাহাড়ের গায়ে গায়ে ভর করিয়া গাঁথা ল্যাটেরাইট পাথরের এই শক্ত দেওয়ালটি ছাড়া আগুয়াদা দুর্গের ভিতরের স্থাপত্য-কৌশলের বিশেষ কোনো নিদর্শন নাই। দুর্গের ভিতরের দিকে পাহাড়ের কোলে কিছু কিছু মাটি কাটিয়া নিয়া কাটা পাথরের ব্লক বসাইয়া চওড়া বারান্দা বা উঠানের মত সমতল জায়গা তৈরী করা হইয়াছে। পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে মাণ্ডভী নদীর দিকে কিম্বা পশ্চিমে সমুদ্রের গায়ে সেই বারান্দার ফালি আগুয়াদা পাহাড়কে ঘিরিয়া আছে। নীচে নদীর বা সমুদ্রের বুক হইতে দুর্গের দেওয়াল যত উঁচু বলিয়া মনে হোক না কেন, ভিতরের দিক হইতে দেওয়ালের উচ্চতা ৭।৮ হাতের বেশী হইবে না, পাহাড়ের টিলার উপর দু' একটি ব্যারাক আছে। নীচে পাহাড়ের কোলের কাটা বারান্দার এক ধার ঘেঁষিয়া দুর্গের বেশীর ভাগ ব্যারাকগুলি। তাহার কোনোটি আমাদের প্রহরী সৈন্যদের জন্য, কোনোটি সাজা পাওয়া কয়েদী সৈনিকদের জন্য; আর কয়েকটি রিজার্ভ আছে আমাদের মত রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা দুর্গের ভিতরে সেই সব ব্যারাকের জঠর-জাত হইয়া যাইব। কিন্তু মাণ্ডভী নদীতে আগুয়াদা দুর্গের পাথরের জেটিঘাটে দাঁড়াইয়া সে কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া আমি এতক্ষণ আগুয়াদার ইতিহাসের সঙ্গে পর্তুগীজ-ভারত সাম্রাজ্যের ইতিহাসের কথা মনে করার চেষ্টা করিতেছিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙিল আমার সঙ্গে যে পর্তুগীজ সান্ত্রী খাড়া ছিল তাহার ডাকে। সে ইশারায় জানাইল—'বোঝা ঘাড়ে নাও! এবার উপরে যাইতে হইবে'; সম্মুখে তাকাইয়া দেখি আমার সহবন্দীরা নিজের নিজের বিছানাপত্র-কাঁধে জেটি হইতে পাথরের সিঁড়ি ভাঙিয়া দুর্গের দেওয়ালের গায়ে ছোট একটি দরজা দিয়া দুর্গে ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একজন পর্তুগীজ কর্পোরাল সেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বন্দীদের গনতি মিলাইতেছেন—'উম্! দোইস্! ত্রেইজ! কাত্র্! সিঁক্'—'এক, দো, তিন, চার, পাঁচ!'—আমিও তাহাদের পিছন পিছন সেই দিকে পা বাড়াইলাম। বই এবং বিছানার গাঁঠরির ভারে আমি বেঁকিয়া গিয়াছি। মনে মনে প্রমাদ গণিতেছি—'এই বোঝা ঘাড়ে করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া অত উপরে কি উঠিতে পারিব?' কর্পোরাল গনতি করিয়া যাইতেছেন—'সিনকোয়েন্তা উম্ ! সিনকোয়েন্তা দোইস্!'—'একান্নো বাহান্নো'— দরজা দিয়া আমিও আগুয়াদা দুর্গের ভিতরে আসিয়া পড়িলাম। ইহার পর তেরো মাস কাল ধরিয়া, গোয়া হইতে মুক্তি পাওয়ার দিন পর্যন্ত আগুয়াদা দুর্গের বন্দীশালায় দুই নম্বর সেল আমার, নানা সাহেব গোরে, শিরু লিমায়ে এবং ঈশ্বরভাই দেশাইয়ের ঘর-বাড়ি হইয়া থাকিবে।

॥ ৪০ ॥

প্রমোশন!

শুধু মাত্র জেল জীবনের ইতিহাস হিসাবে আগুয়াদা দুর্গে আমাদের এই তেরো মাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করিবার মত খুব বেশী কিছু থাকিত না, যদি না সে অভিজ্ঞতা গোয়ায় আমাদের পূর্বের ক' মাসের বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের না হইত। পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে বা 'আল্‌তিন্যো'-তে আমরা সরাসরি পুলিসের হেফাজতে ছিলাম। 'আল্‌তিন্যো'-তে মিলিটারী সৈন্যেরা আমাদের পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকিলেও আমরা আসলে ছিলাম পুলিসের হাতেই। সেখানে আমাদের তম্বির তদারকের ভার সব কিছু পুলিসের উপর ন্যস্ত ছিল। কেরুস্‌ এবং ফের্নান্দ পুলিস কর্মচারী হিসাবে—হোক না তাহারা পর্তুগীজ পুলিসের কনস্টেবল মাত্র—সেই দায়িত্বে পুলিস হেড কোয়ার্টারের তরফ হইতে নিযুক্ত ছিল। মিলিটারী লোকেদের এক আমাদের ব্যারাকের চারিদিকে পাহারা দেওয়া ছাড়া আমাদের ব্যাপারে কোনো কথা বলার এক্তিয়ার ছিল না। 'আল্‌তিন্যো' ব্যারাকের জেল সে হিসাবে পাঞ্জিমের পুলিস কুয়ার্তেলের হাজত বা লক্‌ আপের একটা 'এক্সটেনশন' বা 'ব্রাঞ্চ' হাজত গোছের একটা ব্যাপার ছিল।

আগুয়াদা দুর্গে এখন হইতে আমাদের বসবাসের যে নূতন ব্যবস্থা হইল, সে সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তাহা বিধিমত জেলের ব্যবস্থা। আগুয়াদার জেল অবশ্য মিলিটারী জেল। কিন্তু তাহা হইলেও জেল। অর্থাৎ যাহাকে কিছু পরিমাণে অন্যান্য সভ্য দেশের কারা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী পরিচালিত বন্দীশালা বলা চলে এমন জায়গা। গোয়াতে অসামরিক জেলও কয়েকটি আছে আগেই বলিয়াছি, যেমন রেইস মাগুস দুর্গের জেল বা মাড়গাঁও জেল। এগুলি সিভিল জেল বা পর্তুগীজ ভাষায় (Cadeia Civil)। এই সব জেলও রাজনৈতিক বন্দীতে ভর্তি ছিল। আগুয়াদা দুর্গের জেল সরকারী মতে Cadeia militar;—মিলিটারী জেল বলিয়া এখানে আইন-কানুনের কড়াক্কড়ি কিছু বেশী। আর এও ঠিক, যে আইন-কানুন যাই হোক, মোটের উপর এখানেও রাজনৈতিক বন্দীদের এমন কিছু সুখে রাখা হয় নাই। আগুয়াদায় এক একটি ঘরে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের কিভাবে রাখা হয়, সে সম্পর্কে বৃটিশ মহিলা সাংবাদিক মিসেস তায়া জিন্‌কিনের বর্ণনা সম্পর্কে উপরে একবার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও একথা এখানে বলিতে বাধা নাই যে, এতদিন আমরা পুলিসের হাতে পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে এবং 'আল্‌তিন্যো'-র পাগলা গারদে যে 'অ-মানবিক' অবস্থায় ছিলাম তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমরা এবার হয়ত কিছুটা মানুষের মত বাঁচিতে পারিব, আগুয়াদায় আসিয়া এমনি একটা ভরসা পাইয়াছিলাম। আর তাছাড়া, 'আল্‌তিন্যো'-তে থাকার সময় কয়েক মাস ধরিয়া পর্তুগীজ সাধারণ সৈনিকদের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতেও মনে মনে একটি ভরসা ছিল পুলিসের চেয়ে মিলিটারীর লোকেরা হাজারো গুণে ভালো হইবে। আমাদের কপালক্রমে ইজিপ্ট সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মঁশিয় আহমেদ খলিল যদি এই সময়ে আমাদের খোঁজখবর করার জন্য সরেজমিনে গোয়ায়

না আসিতেন, আর ঠিক এই একই সময়ে 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের যে দুটি ব্যারাকে আটক রাখা হইয়াছিল পর্তুগীজ সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য যদি তাহার দরকার না পড়িত তাহা হইলে, আমাদের আরও কতকাল যে 'আল্‌তিন্যো'-র পাগ্‌লা-গারদে সেই খুপ্‌রি ঘরগুলিতে গাদাগাদি করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত—তাহা কে জানে?

আগুয়াদার জেটিঘাট হইতে দুর্গের ভিতরে গিয়া ঢোকার পর আমাদের সকলকে প্রথমে যে অন্ধকার গুদামঘরে নিয়া গিয়া জমা করা হইয়াছিল, সেখানে বসিয়া আমরা কেহই এ কথা ভাবিতে পারি নাই যে, এখানে আমাদের ভাগ্য 'আল্‌তিন্যো'-র চেয়ে অন্য কোনো রকমের কিছু হইবে। বিগত ছয় মাসের বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা সালাজারী জেলখানার আইন-কানুন সম্পর্কে যে খুব আশা-ভরসা জাগায় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। 'দেখা যাক এর পর কপালে কি আছে'—এই ধরনের একটা মনোভাব নিয়া আমি আমার বই-কাপড়ের বোঁচকার উপর বসিয়া পড়িয়া চারিদিকের রকম-সকম আঁচ করার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল—আমাদের পাহারাওলা পর্তুগীজ পুলিসের একজন 'কাব্‌'-এর ইংরাজী চীৎকার কানে গেল। বন্দীরা সকলে সেই গুদামঘরে আসিয়া জমা হইলে পর সে সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া জানাইয়া দিতেছে এটি আমাদের একটি ওয়েটিং-রুম মাত্র। ফোর্টের কমান্ডাণ্ট সাহেব এখনই আমাদের চার্জ বুঝিয়া নিতে আসিবেন এবং আমরা কে কোন ঘরে থাকিব তাহা ঠিক করিয়া দিবেন। আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বিছানা ও খাট পাইব ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাইব। কমান্ডাণ্ট সাহেব না আসা পর্যন্ত আমরা যেন চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকি, বেশী হৈ-চৈ বা গণ্ডগোল না করি।

'বিছানা' ও 'খাটে'র কথা শুনিয়া আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলাম। 'আল্‌তিন্যো' হইতে আমরা প্রায় দেড় শ' জনের মত রাজবন্দী সেদিন আগুয়াদায় চালান আসিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ভারতীয়দের ভিতর এক নানা সাহেব গোরে এবং শিরুভাই লিমায়ে, আর গোয়ার রাজবন্দীদের ভিতর ডাঃ দুভাষী ভিন্ন আর কাহারও ভাগ্যে গ্রেপ্তারের পরের দিন হইতে খাট-বিছানা দূরে থাকুক, একটি করিয়া ছেঁড়া কম্বল পর্যন্ত জোটে নাই। 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের আগে যে সব রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, তাঁহাদের ফেলিয়া যাওয়া কয়েকটি ছেঁড়া জাপানী মাদুর আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোনও সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী, পুলিস বা কারা-কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে আমরা কিছুই পাই নাই। রাজারাম পাতিল গ্রেপ্তার হইয়া পঞ্জিম কুয়ার্তেলে আসার পর, পুলিসের অ্যাড্‌জুটাণ্ট কমান্ডাণ্টের নিকট হাজতের মেঝেয় পাতার জন্য একটি কম্বল বা শতরঞ্জি জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা, খোঁজ করিতে গিয়া ব্যঙ্গের সুরে উত্তর পাইয়াছিলেন—"Nao Senor! This hotel dose not provide any bedding" ('না মশাই! এই হোটেলে অতিথি-অভ্যাগতদের বিছানা দেওয়ার রেওয়াজ নাই')। সে রেওয়াজ যে নাই, সেটাই আমরা এতকাল অবধারিত বলিয়া ধরিয়া নিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে খাট-বিছানার কথা শুনিয়া নিজেদের কানকেই যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করার ইচ্ছা হইতেছিল না। সে সময় মঃ খলিল কবে আসিতেছেন, আমরা সে কথা জানিতাম না। ভারত গভর্নমেণ্ট যে আন্তর্জাতিক রেড্‌ ক্রসের মারফৎ আমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে খবরও আমাদের কাছে পেঁছায় নাই। কাজে কাজেই খাওয়া-থাকার ব্যবস্থার দিক দিয়া আগুয়াদাতে আমাদের ভাগ্যের যে কোনো পরিবর্তন হইতে

চলিয়াছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। এতদিন আমাদের বিছানা বলিতে ছিল 'আল্‌তিন্যো'-তে কুড়াইয়া পাওয়া কয়েকটি ছেঁড়া মাদুর। গোয়াবাসী বন্দীদের মধ্যে যাহাদের বাড়ি হইতে অল্প কিছু কিছু বিছানাপত্র দিয়া গিয়াছে, তাহারই কিছু কিছু অংশ, বন্দীরা নিজেদের ভিতর ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নিয়াছেন। আগুয়াদায় তাহা হইলে এবার সরকারী খরচে বিছানাপত্র জুটিবে? হঠাৎ এত দয়া কেন?

অন্য সময় হইলে হয়ত ইহার কারণ সম্পর্কে মনে মনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিতাম, কিন্তু সেদিন হঠাৎ বহুদিন বাদে আমরা সকলে কিছুটা বিনা বাধায় একত্র মেলামেশার এবং কথা বলার সুযোগ পাইয়া গিয়াছিলাম। প্রথমে স্টীম লঞ্চে এবং লঞ্চ হইতে আগুয়াদা দুর্গের জেটিতে নামিয়া আমরা 'আল্‌তিন্যো'-র দুই ব্যারাকের সমস্ত বন্দী একসঙ্গে মিশিয়া যাই। দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়া যখন সকলে পূর্বোক্ত গুদামঘরে আসিয়া সমবেত হইলাম, তখনও আমরা দুই ব্যারাকের সকল সেলের বন্দী একসাথে একত্র মিশিয়াই দাঁড়াইয়া ছিলাম। সাধারণ নিয়মমত আমাদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা বারণ ছিল, কিন্তু সেদিন রাতারাতি একসঙ্গে আমাদের অত লোককে 'আল্‌তিন্যো' হইতে মোটর-বাসে এবং লঞ্চে করিয়া আগুয়াদাতে আনার হৈ-হুল্লোড় এবং হাঙ্গামার দরুনই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, আমাদের সঙ্গের পুলিস কর্মচারীরা আমাদের নিজেদের ভিতর কথাবার্তা বলায় বিশেষ কোনো কিছু বাধা দেয় নাই। আর পুলিসের লোকেরা বাধা দিতেছেন না দেখিয়া মিলিটারী পাহারাদারেরাও কিছু বলে নাই; বা বলার দরকার মনে করে নাই। কারণ তাহারা জানে, এই সব রাজনৈতিক বন্দী বা 'সতিয়াগ্রহী'দের বিষয়ে পুলিসের লোকই হইল আসল মালিক; সে মালিক তাহারা নয়। ফলে সারাটা পথ এবং এখন আমাদের এই ওয়েটিং-রুমে কিছুটা চাপা গলায় হইলেও, আমরা প্রায় বিনা বাধায় পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার এবং যতটা পারা যায় পরস্পরের খোঁজ-খবর ও কুশল জানার একটা সুযোগ সেদিন পাইয়া গিয়াছিলাম।

কুয়ার্তেলে বা 'আল্‌তিন্যো'তে থাকার সময় ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষে দুইবার এবং ১৫ই আগস্টের গুলীকাণ্ডের আগে-পরে দুইবার—বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করার সময়, এই মোট চারবার আমার সঙ্গে নানা সাহেব গোরে এবং শিরুভাউয়ের ঘটনাচক্রে দেখা হইয়া যায়। কিন্তু এছাড়া, আমরা ছয়-সাতজন ভারতীয় বন্দী, যাহারা একই সময়ে কুয়ার্তেলে কিম্বা 'আল্‌তিন্যো'তে একই ব্যারাকে ছিলাম, কথা বলা দূরে থাকুক, কোনোদিন পরস্পরের মুখ দেখার সুযোগ পাই নাই। অবশ্য আমাদের পর্তুগীজ সৈনিক বন্ধুদের কল্যাণে 'আল্‌তিন্যো' ব্যারাকের পিছনের জানালা দিয়া চোরাই চিঠির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজন মাফিক যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা আমাদের অব্যাহত ছিল। কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়াইয়া কথা বলার কোনো জো ছিল না। 'আল্‌তিন্যো'-র গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা আরও সঙ্গীন ছিল। তাহাদের কেহ কেহ ইতিমধ্যে এক বছরের উপর 'আল্‌তিন্যো'-তে ঐ সব ছোট ছোট বন্ধ কুঠুরীতে কাটাইয়াছে। অল্পবয়েসী ছেলের দল বেশীর ভাগ। যাহাদের সঙ্গে একসঙ্গে সত্যাগ্রহ করিয়াছে, একসঙ্গে বাড়িঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, 'আল্‌তিন্যো'-তে ঢোকার পর হইতে তাহাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল। আজ আগুয়াদা দুর্গের এই অন্ধকার গুদামঘরে হইলেও আবার সকলে সকলের সঙ্গে মিলিতে পারিয়াছে; পরস্পরের চেহারা দেখিতে পাইতেছে। তাহাদের মানসিক অবস্থা পাঠকেরা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন।

সালাজারের জেলে একবার ঢুকিলে আর যে নিষ্ক্রমণের পথ নাই, ইতিমধ্যে তাহা সকলেই বুঝিয়া নিয়াছে। তবু তাহারই মধ্যে, এতদিন কে কোথায় কিভাবে ছিল, কাহাকে মস্কেইরোর হাতে কিরকম মার খাইতে হইয়াছে, ট্রাইব্যুনালে কাহার কতদিন সাজা হইল—এসব জানার কৌতূহল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সকলে আজ একসঙ্গে এক জায়গায় আসিয়া জমা হইতে পারায় সারা ঘর সেই সব প্রশ্নোত্তরে, হাসিতে, গল্প-গুজবে, চাপা গুঞ্জনের আওয়াজে সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। মারাঠী কোঙ্কানীতে মিশাইয়া একটি প্রশ্ন প্রায়ই কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে—'কিতী বরস্ ঝালি রে?' 'ঝালি' অর্থাৎ 'শিক্ষা' সাজা—কয় বছরের সাজা হইল তোর? (মারাঠী ভাষায় 'সাজা' কথার প্রতিশব্দ 'শিক্ষা' বা উচ্চারণ 'শিক্‌ষা')। হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উনিশ-কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছেলেরা উত্তর দিতেছে, আমি শুনিয়া যাইতেছি—"দহা, অকরা, বারা, পন্দ্রা" দশ, এগারো, পনরো—যেন খুব মজার ব্যাপার হইয়াছে। কেউ বা জজ কুয়াদ্রস্ কিম্বা ট্রাইব্যুনালের বুড়া প্রেসিডেন্ট কিম্বা পুলিসের পেটমোটা অ্যাড্‌জুট্যান্ট কমান্ডান্টের অঙ্গভঙ্গির ক্যারিকেচার করিতেছে। আমি, নানা সাহেব প্রভৃতিরা কাছাকাছি এক জায়গায় আছি। অনেক ছোট ছেলে সংকোচভরে আমাদের কাছে আসিয়া আলাপ পরিচয় করিতে শিষ্টাচার করিতেছে; তাহাদের কেউ কেউ আমাদেরকে পরস্পরের কাছে চিনাইয়া দিতেছে—"মামা সাহেব, শিবুভাউ, মধুভাউ, চৌধুরী।"

গোয়ার ছেলেরা অনেকে আমাকে চেনে, কারণ ট্রাইব্যুনালের সাজা হওয়ার আগে 'পিদে'র হুকুমে হাজতে থাকার সময় আমাকে পিকিনা জেলে গোয়াবাসী বন্দীদের সঙ্গে একত্র আটক রাখা হইয়াছিল। বেশ কয়েক মাস বাদে আজ আবার তাদের সঙ্গে দেখা হইল। সাজা হইলে পর আমাদের তাহাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল। পাহারাওলা সান্ত্রী পুলিসের তরফ হইতে বেশী বাধা না থাকায় ঘরের ভিতরে সকলের কথাবার্তায় একটা চাপা হৈ-চৈ-এর মত চলিয়াছে, এমন সময়—বেলা তখন প্রায় বারোটা একটা বাজিয়া গিয়াছে—আমাদের ঘরের দরজার সামনে পুলিস ও মিলিটারী সান্ত্রী যাহারা ছিল, হঠাৎ সকলে খট্ খট্ করিয়া বুটের গোড়ালি ঠুকিয়া "অ্যাটেন্‌শন" ভঙ্গিতে দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখি, মিলিটারী শার্ট-প্যান্ট পরা, মাথায় বারান্দাওয়ালা মিলিটারী টুপি, অফিসার গোছের কেউ একজন দু-তিনজন অনুচর কর্মচারীসহ ঘরের দরজার মুখে আসিয়া হাজির হইলেন। ঘরের মেঝে দরজার বেশ কিছুটা নীচে; দরজা দিয়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া ঘরের ভিতর আসিতে হয়। ভদ্রলোকের হাতে একটি ছড়ির মত, মিলিটারী অফিসারদের ভঙ্গিতে বগলতলায় ছড়িটি চাপা। খুব গম্ভীরভাবে ঘরের সিঁড়ির কাছে আসিয়া তিনি সকলকে চুপ করিতে ইশারা করিলেন। আমাদের ছেলেদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। নিজেদের মধ্যে কথা বলার হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতাকে তাহারা চুটিয়া সদ্ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। খালি হাত তুলিয়া ইশারায় কথা বন্ধ করার নির্দেশ মানার মত মেজাজ তখন তাহাদের নাই। নিজেদের সেই হৈ-চৈ-এর ভিতর কখন যে একজন মিলিটারী অফিসার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও তাহাদের খেয়াল নাই। ভদ্রলোক উপায়ান্তর না দেখিয়া গলার স্বর উপরে তুলিয়া তাঁহার নিজস্ব ইংরাজীতে হুকুম করিলেন—"Quiet! silence! this is quertel militar! Here when Commandant speak, everybody discipline!" বুঝিলাম, এই ভদ্রলোকই কমান্ডান্ট; ছেলেরা তাঁহার ইশারায় কথা বলাবলি বন্ধ করে

নাই তাহাতে একটু মনঃক্ষুন্ন হইয়াছেন। আগুয়াদা জেল মিলিটারী জায়গা, এখানে কমান্ডান্ট কথা বলিতে চাহিলে সকলের শৃংখলাবন্ধ হইয়া চুপচাপ থাকা উচিত—এই কথা বুঝাইতে চাহিতেছেন। ঘরের গন্ডগোল একটু থামিলে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, এই ভদ্রলোকই ক'দিন আগে 'আল্‌তিন্যো'-তে আমাদের ঘরে আমাদের দেখিতে গিয়াছিলেন। গোরে বলিলেন—হাঁ, এই ব্যক্তি তাঁহাদের ঘরেও গিয়াছিলেন। ইনিই লেফটেনান্ট* আফোঁসো দা কস্তা দা বেইরা। ভদ্রলোকের কথার ভাবে ইহাও বুঝিলাম, নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে খুব সচেতন হইলেও পুলিসের রীতি হইতে ইঁহার রীতি কিছুটা ভিন্ন। কুয়ার্তেলে বা 'আল্‌তিন্যো'-তে হইলে এক ধমকে কথা বন্ধ না হইলে এতক্ষণ আমাদের উপর দমাদ্দম রবার ট্রাঞ্চিয়ন কিল-গুঁতা-লাথি চলিত। দরকার হইলে পেটমোটা অ্যাড্‌জুট্যান্ট কমান্ডান্ট নিজে আসিয়া লাঠি বা রবারের ডান্ডা ধরিতেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সালাজারী আমলে পর্তুগালের মিলিটারীর লোকেরা অন্তত পুলিসের চেয়ে কিছুটা ভদ্র। তেনেন্ত কস্তার কথাবার্তার ধরনে সেই আশ্বাসটুকু পাইয়া আমাদের আগুয়াদার জীবন শুরু হইল।

॥ ৪১ ॥

তেনেন্ত আফোঁসো দা কস্তা দা বেইরা'র রাজত্বে

তেনেন্ত আফোঁসো দা কস্তা-র আমাদের সামনে সেদিন এভাবে উদিত হওয়ার উদ্দেশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের জানাইয়া দেওয়া যে, আগুয়াদা দুর্গে তিনিই মালিক এবং এখন হইতে আমাদের তাঁহার হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে। আমরা যে একটি 'মিলিটারী' কুয়ার্তেলে আসিয়াছি এবং এখানকার নিয়ম-কানুন যে পর্তুগালের 'মিলিটারী' কর্তৃপক্ষ খাস পর্তুগাল হইতে ধার্য করিয়া দিয়াছেন, এমন কি খোদ আফোঁসো কস্তারও সাধ্য নাই যে, তাহার কোনোরকম রদ-বদল করেন—এই কথাটাই সবিস্তারে ইংরাজীতে ও পর্তুগীজ ভাষায় আমাদের জানাইয়া দিয়া তিনি তখনকার মত বিদায় লইলেন। 'তখনকার মত' বলিতেছি এইজন্য যে, সেদিন রাত্রিতে 'লাইট্‌স অফ্‌' হওয়ার পর আমরা নিজের নিজের সেলে বিছানা পাতিয়া না ঘুমানো পর্যন্ত, ভদ্রলোক প্রায় বার কুড়ি ফোর্টের অফিসে, নিজের বাসায় এবং আমাদের সেলে সেলে যাতায়াত করিয়াছেন এবং তাঁহার অধীনে আমাদের কি ধরনের ডিসিপ্লিন মানিয়া জেল-জীবনের দৈনন্দিন রুটিন অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য উপরে আমাদের ওয়েটিং রুম হিসাবে যে অন্ধকার গুদাম ঘরের কথা বলিয়াছি, যেখানে প্রথমে আমাদের নিয়া গিয়া জমা করা হইয়াছিল, আফোঁসো কস্তা দর্শন দেওয়ার পর সেখানে আমাদের বেশীক্ষণ থাকিতে হয় নাই। অল্প কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের সাতজনের (অর্থাৎ ভারতীয় সত্যাগ্রহী যাহারা ছিলাম) ডাক পড়িল, আমাদের জিনিসপত্র নিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিতে হইবে। বাহিরের লম্বা ব্যারাকের বারান্দায় আনিয়া আমাদের সাতজনের দলকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা হইল—বারান্দার বাঁ দিককার

* পর্তুগীজ ভাষায় 'তেনেন্ত'।

কোণে আমরা চারজন অর্থাৎ আমি, নানা সাহেব, শিরুভাউ ও ঈশ্বরভাই দেশাই এবং ডান দিককার কোণে মধু লিমায়ে, জগন্নাথ রাও ও রাজারাম পাতিল। সম্মুখের ব্যারাকে মোট পাঁচটি ঘর; দুই কোণায় দুইটি ছোট ঘর; তাহার পর দু'পাশে দুটি বড় হল, মধ্যে একটি মাঝারিগোছের হল। তাহাকে হলঘর বলাও চলে, আবার গার্ড রুম বা প্যাসেজও বলা চলে। কারণ, বন্দী-ব্যারাকের সান্ত্রী পাহারারা তাহাদের প্রতিদিনকার ডিউটিতে আসিয়া সেই ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা সময় থাকে; আবার সেই ঘরের ভিতর দিয়াই পিছনের ব্যারাক দুইটিতে কিংবা সিঁড়ি দিয়া টিলার উপরের ব্যারাকে যাইতে হয়। যে অন্ধকার ঘরটিতে সেদিন আমাদের প্রথম নিয়া গিয়া জমা করা হয়, সেটিও আগুয়াদা দুর্গের বন্দীশালার একটি ব্যারাক। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সেখানে থাকিতে হয় নাই। কিন্তু প্রায় জনচল্লিশের মত বন্দীকে এই ঘরে এবং তাহার পার্শ্ববর্তী ঐরকম আর একটি ঘরে আরও চল্লিশজনকে রাখা হইয়াছিল। এখনও এই দুটি ঘরে প্রায় ঐসংখ্যক বন্দীই আছে। পিছনকার এই দুইটি ঘর একেবারে আগুয়াদা পাহাড়ের টিলার গায়ে লাগা। এই দুই ঘরের মাঝামাঝি জায়গা দিয়া টিলার উপরে সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। টিলার উপরেও একটি ব্যারাক বা হল আছে। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যারাকটি আগুয়াদা বন্দীশালার সবচেয়ে ভালো ঘর হইতে পারিত, কারণ টিলার উপরে বলিয়া তাহার চারিদিকে ফাঁকা—ঘরের চারিপাশে কোনোও দেওয়ালের ঘের দেওয়া নাই। ছাদের কাছে দেওয়ালের উপরের দিকে স্কাইলাইটের মত কয়েকটি কাটা বা গরাদ দেওয়া ফাঁক বা ফুকর আছে। তাহা না হইলে সেই ঘরে ঢোকার একটি লোহার দরজা ছাড়া আলো-হাওয়া আসা-যাওয়ার অন্য কোনো পথ নাই।

আগুয়াদা দুর্গ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম, কিংবা এলাহাবাদের যমুনা দুর্গ বা দিল্লীর লাল কেল্লার সঙ্গে তুলনীয় নয়। আগুয়াদা দুর্গ পাহাড়ের গায়ে তৈরী নৌ-যুদ্ধের দুর্গ। স্থল-পথ হইতে গোয়ার বিরুদ্ধে কোনো সম্ভাবনীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আগুয়াদা দুর্গ নির্মিত হয় নাই। ১৬১২ সালে আগুয়াদা দুর্গ যখন তৈয়ারী হয়, তখন গোয়ায় এবং ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ একাধিপত্যের সুবর্ণ যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়াছে নূতন ওলন্দাজ এবং ইংরেজ নৌ-শক্তি। স্থল-পথে মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কা থাকিলেও দুর্গম সহ্যাদ্রি পর্বতমালা পার হইয়া গোয়া আক্রমণ করা মারাঠাদের পক্ষেও সহজ ছিল না। কাজে কাজেই আগুয়াদাতে সংরক্ষণ-ব্যবস্থার যা-কিছু তোড়জোড় সেটা ছিল সমুদ্রের দিকে। ডাঙ্গার দিকে আগুয়াদা পাহাড়ের টিলার উপরে উপরে দুর্গের উত্তর দিক দিয়া একটি প্রাচীর বা প্রাকার-জাতীয় দেওয়াল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার উচ্চতা খুবই কম। আসলে দুর্গের উত্তর দিককার পাহাড়টাই স্থলপথের দিকে দুর্গপ্রাকারের কাজ করিত। পিছন দিককার দেওয়ালটি তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আগুয়াদার কাছাকাছি সহ্যাদ্রির একটি শাখা একটু বাঁকিয়া একেবারে পশ্চিমে সমুদ্রের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারই পশ্চিম কোণায় আগুয়াদার লাইট্ হাউস্। সেই লাইট্ হাউসের সার্চ লাইট্ আজও জুয়ারী এবং মাণ্ডভী নদীর মোহানায় গোয়া-মুর্মুগাঁও বন্দরের প্রবেশপথে আলো দেখায়। মাণ্ডভী নদী দক্ষিণ-পূর্বে পশ্চিমের দিক হইতে আসিয়া এই পাহাড়ের দক্ষিণ গা ঘেঁষিয়া পশ্চিমে সমুদ্রে পড়িয়াছে।

মাণ্ডভী নদীর মোহানায় নদী এবং সমুদ্রের ধারে মোহানার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আগুয়াদা পাহাড়ের কোল কাটিয়া দুর্গটি তৈয়ারী হইয়াছে। পাহাড়ের গা কাটিয়া বারান্দার মত যতটুকু জায়গা পাওয়া গিয়াছে দুর্গের ভিতরের দিকে তাহার চেয়ে বেশী

কোনো খোলা জায়গা নাই। দুর্গের ভিতরে যত ব্যারাক—বন্দীশালার ব্যারাক, সার্জেণ্ট এবং সৈন্যদের ব্যারাক, ফোর্টের দপ্তর, অস্ত্রাগার, সৈন্যদের মেস এবং রান্নাঘর, কমান্ডান্টের বাসা বা কোয়ার্টার সব কিছু একের পর এক পাশাপাশি সেই বারান্দা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। এসবের পিছনে বা উত্তরে পাহাড়ের বা টিলার উপরের অংশ। প্রকৃতির তৈরী বিশাল প্রাচীরের মত এই পাহাড়টি আগুয়াদা দুর্গকে স্থলপথের সকল সম্ভাব্য আক্রমণের হাত হইতে আগলাইয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ের উপর দিয়া নামমাত্র পাথরের যে দেওয়ালটি আছে, বা তাহার গায়ে মধ্যে মধ্যে দু' একটি যে বুরুজ আছে, সেগুলিকে নিতান্ত নিয়ম-রক্ষার মত তৈরী করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আগুয়াদা পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণার টিলার যে লাইট্ হাউস্‌টি আছে সেটি এবং দুর্গের পশ্চিম দিকের ইমারতগুলি সবচেয়ে পুরাতন। আমাদের বন্দীশালা দুর্গের এই পশ্চিম অংশে অবস্থিত। অর্থাৎ, একেবারে পশ্চিমদিকে বা সমুদ্রের ধারে দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণায় আগুয়াদা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু টিলার উপর লাইট্ হাউস্, আর সেই লাইট্ হাউসের নীচে আমাদের ব্যারাকগুলি। দেখিলেই বোঝা যায়, তাহার মধ্যে সবচেয়ে সম্মুখের দিকে সমুদ্রের ধারের যে লম্বা ব্যারাকটি, যাহার দুই কোণার ঘরে আমরা আশ্রয় পাইয়াছি, এবং তাহার পাশের চার্চ ঘরটি নূতন তৈয়ারী হইয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় যেসব জার্মান বন্দী গোয়াতে অন্তরীণ ছিল, তাহারা পুরাতন ব্যারাকের অন্ধকার ঘরগুলিতে থাকিতে অস্বীকার করায় এই নূতন ব্যারাকটি তৈরী করা হয়। পিছনের ব্যারাকগুলি দুর্গের পুরাতন অংশের ভগ্নাবশেষ মাত্র; বন্দীশালার কাজ চালানোর জন্য সেগুলিকেই কিছুটা মেরামত করিয়া দরজা জানালা বসাইয়া নেওয়া হইয়াছে। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, আদিল শাহী সুলতানদের আগে গোমন্তকে যে হিন্দু কদম্ব রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, আগুয়াদা পর্বতে এই জায়গায় তাঁহাদেরও একটি দুর্গ ছিল। বর্তমান আগুয়াদা দুর্গ তাহারই ভগ্নাবশেষের উপরে নির্মিত হয়। কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা জানি না।

নূতন ব্যারাকে আমাদের ঘরের পাশেই দুর্গের গীর্জা ঘর। সেখানে প্রতি রবিবারে পাদ্রী সাহেব আসিয়া দুর্গের সৈনিক, কয়েদী-সৈনিক এবং ক্রিশ্চিয়ান রাজনৈতিক বন্দী সকলকে একত্রে উপাসনা করাইয়া যাইতেন। গীর্জার পাশেই যে ঘর, সেটি সামরিক আদালতে দণ্ডিত কয়েদী-সৈনিকদের ব্যারাক। সে ঘরে বছর-ভোর পনরো কুড়িজন বন্দী পর্তুগীজ সৈনিককে থাকিতে দেখিয়াছি। এই ঘরটিও বেশ পুরানো ঘর। তাহার পাশে খুব পুরাতন একটা দোতলা বাড়ির মত আছে। অবশ্য ইহার বয়স দেখিয়া শুনিয়া দেড় শ' বছরের বেশী বলিয়া মনে হয় না। দফায় দফায় মেরামতের, বহু ভাঙ্গাচোরা অদল-বদলের চিহ্ন, বহু পলেস্তারার প্রলেপ ইহার গায়ে প্রকট। এখানে দোতলার উপর গোয়ার দেশী সামরিক বাহিনীর কয়েদীদের আটক রাখা হয়। তাহার পর একটা দোতলা দেউড়ীর মত জায়গা আছে। দেখিয়া মনে হয়, আগুয়াদা দুর্গের প্রধান তোরণদ্বার এককালে এইখানে ছিল। এই দেউড়ীর উপরের তলায় এখন লাইট্ হাউসের জন্য ইলেক্‌ট্রিসিটী জেনারেটিং-এর যন্ত্রপাতি এবং দুর্গের বেতার ও রেডিয়ো ট্রান্সমিশন স্টেশন অবস্থিত।

এই দেউড়ী পর্যন্ত দুর্গের বন্দীশালার সীমানা। দেউড়ীর ভিতর দিয়া আর একটু নীচে নামিয়া আসিলে আগুয়াদায় অবস্থিত পর্তুগীজ সৈন্যদলের সার্জেণ্টদের ব্যারাক ও মেস; তাহার পরে দুর্গের দপ্তর। তাহার পর আর একটি দেউড়ী। ইহার উপর তলায় কমান্ডান্টের আবাসস্থল। এই দ্বিতীয় দেউড়ীর বাহিরে দুর্গের পানীয় জলের প্রস্রবণ ও

স্নানের জায়গা। ফল-ফুলের বাগান, সৈন্যদের ব্যারাক ও মেস, অস্ত্রাগার, ডিস্পেন্সারী প্রভৃতিও ইহারই কাছাকাছি। এসব যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে আগুয়াদা দুর্গের আজকালকার সরকারী দেউড়ী। এখান হইতে লাইট্ হাউস্ পর্যন্ত দূরত্ব পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় এক মাইলের মত হইবে। কিন্তু দুর্গের ভিতরে সমতল জায়গা কোথাও এক শ' গজের বেশী চওড়া হইবে না। পাহাড়ের গায়ে লাগা ব্যারাকগুলির সম্মুখ দিয়া দুর্গের ভিতরকার পাথরের বাঁধানো রাস্তা বড়জোর দশ গজ চওড়া। আর তার পরেই দুর্গের দেওয়াল একেবারে নদী কিংবা সমুদ্রের বুকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট নীচে জলের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। সেই দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে এখনও ষোল শ' সাল সতের শ' সালের পুরানো বড় বড় সব কামান সমুদ্র এবং নদীর মোহানার দিকে মুখ করিয়া সাজানো আছে। এক একটি কামানের পাশে স্তূপের মত করিয়া গাদা কামানে তোপদাগার লোহার পুরাতন সব গোলা সযত্নে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বছরে দু'বার করিয়া এইসব গোলা ও কামানগুলিকে ঝাড়-পোঁছ করিয়া, তেল ও আল্কাত্‌রার বার্নিশ মাখাইয়া, ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখা হয়। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ঐতিহ্যে ঘোরতর বিশ্বাসী হইলেও আগুয়াদা দুর্গের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ আর এসব কামান-গোলা-গুলির উপর কোনো আস্থা রাখেন না। এ-যুগে আগুয়াদা দুর্গেরও যে আর সেরূপ কোনো সামরিক মূল্য নাই, তাহাও বলা বাহুল্য। এইসব পুরাতন কামান, দুর্গের পুরাতন প্রাকার, দেউড়ী, বুরুজ এসবকে মেরামত করিয়া ঝাড়িয়া পুঁছিয়া তাহার চারিপাশে ফুলের বাগান তৈরী করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবেই এখন আগুয়াদা দুর্গের যা-কিছু মূল্য। দুর্গের সর্বত্রই প্রায় পাতা-বাহার কিংবা ফুলের গাছের কেয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছে। খালি আমাদের বন্দীশালার ব্যারাকের দিকটাতেই বাগান করার মত কোনো জায়গা নাই। আমাদের ব্যারাকের সামনে হাত কুড়ি পাথর-বাঁধানো একটি উঠান। তাহার লাগাও দুর্গের দেওয়াল; তাহার পরই মাণ্ডভী নদীর মোহানা এবং সমুদ্র। দুর্গের পশ্চিম দিকটা এখন প্রধানত মিলিটারী কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য সামান্য সংখ্যক কিছু মিলিটারী পাহারা এখানে রাখা হইলেও সরকারীভাবে আগুয়াদা দুর্গের নাম 'Praca de Aguada' (প্রাসা দে আগুয়াদা), আগুয়াদা প্লেস বা আগুয়াদা পার্ক। গোয়ার প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে সারা পর্তুগীজ সাম্রাজ্য হইতে লোকে ইহা দেখিতে আসে।

আমরা আমাদের নিজের ঘরে আসিয়া সুস্থ হইয়া বসিতে না বসিতেই আবার তেনেন্ত আফোঁসো কস্তা দুই সার্জেণ্ট নিয়া আমাদের ঘরে হাজির। তিনি আসিয়া আমাদের ঘরের দুটি দোতলা খাট, একটি করিয়া সুজনী, খড়ের বালিশ, গামছা, তোয়ালে, এনামেলের সান্‌কি, চামচ, জলের মগ এসব বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। আর যাওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে বই কাগজপত্র যা-কিছু ছিল তাহা পাঞ্জিমে মিলিটারী 'কুয়ার্তেল জেরাল'-এ সেন্সরের জন্য পাঠাইতে হইবে বলিয়া কাড়িয়া নিয়া চলিয়া গেলেন। অবশ্য এ ভরসাও দিয়া গেলেন যে, দু' তিনদিনের মধ্যেই বই কাগজপত্র সব ফেরৎ আসিবে। সে সময় তাঁহার দেওয়া সে ভরসায় খুব আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। তবু মোটের উপর বিগত কয় মাসে পর্তুগীজ পুলিসের হাতে যে ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছি, তাহার সঙ্গে তুলনায় একটি জিনিস লক্ষ করিলাম, কাজে-কর্মে কিছুটা বাস্তবাগীশ হইলেও এবং একটু বেশী কথা বলার অভ্যাস থাকিলেও ভদ্রলোক আমাদের সম্পর্কে তাঁহার প্রতি কাজেরই একটা যুক্তিসহ কৈফিয়ৎ আমাদের কাছে দিয়া যাইতেছিলেন। আর কিছু না হোক, আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক;

আমাদের কাছে তাঁহার অন্তত ভদ্রতার দায়টা আছে—সে বিষয়ে তাঁহাকে সচেতন বলিয়াই মনে হইল। আমরা যেন পর্তুগীজ মিলিটারী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অহেতুক কোনো বিরূপ ধারণা পোষণ না করি, ভদ্রলোকের কথায় বার্তায় সেই ধরনের একটা অতি-ব্যগ্রতাপ্রসূত সৌজন্যের আভাস পাইতেছিলাম। পরে অবশ্য নানা সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে সিনর আফোঁসো কস্তার নিজস্ব সৌজন্যবোধ ও শালীনতার কিছুটা ভাগ থাকিলেও, স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল বের্নার্দ গেদীস সাহেবও, আমাদের আগুয়াদায় পাঠানোর কয়েকদিন আগে সিনর কস্তাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, ভারত হইতে আগত সত্যাগ্রহী দলের নেতা হিসাবে আমাদের সাতজনের সম্পর্কে যেন কিছুটা সতর্কতা ও বিবেচনার সঙ্গে জেলে ব্যবহার করা হয়, সেকথা বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন। জেনরেল বের্নার্দ গেদীস এতদিন অবশ্য এ-সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এখন তাহা হওয়ার কারণ বোধ হয় কাহাকেও খুলিয়া বলিতে হইবে না। ইজিপ্ট সরকারের প্রতিনিধি মঃ আহমেদ খলিল কয়েক সপ্তাহের ভিতর গোয়াতে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছিলেন। অবশ্য তখনও সে খবর আমরা পাকাপাকি জানিতাম না। তাই সিনর কস্তার ব্যবহার সেদিন একটু অতিরিক্ত রকমের ভালো বলিয়া আমাদের কাছে মনে হইয়াছিল। 'আল্তিন্যো'-তে ফের্নান্দ এবং কেরুস-এর তুই-তোকারি শুনিয়া শুনিয়া প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক।

॥ ৪২ ॥

আগুয়াদার সমুদ্র

সমস্ত বাধাবিঘ্ন পার হইয়া সেদিন শেষপর্যন্ত যখন আমরা চারজন আমাদের দুই নম্বর সেলে স্থিতু হইয়া বসিতে পারিলাম, তখন আমাদের আগুয়াদার সব কিছুকেই 'আল্তিন্যো' এবং পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের জীবনের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রায় 'হঠাৎ স্বর্গে প্রমোশন পাওয়ার' মত মনে হইতেছিল বলা চলে। এ বিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নাই যে, ঘর হিসাবে আগুয়াদা দুর্গের বন্দীশালার ভিতরে আমাদের এই দুই নম্বর সেল সবচেয়ে লোভনীয় এবং ভালো ঘর ছিল। ঘরটি লম্বায় উত্তরে-দক্ষিণে প্রায় উনিশ-কুড়ি ফুট, চওড়ায় পূবে-পশ্চিমে চৌদ্দ ফুটের মতো। ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালের পাশে একটা সরু গলির মতো ছিল, তার পরেই হাত দুয়েক দূরে পাহাড়ের টিলার গায়ে গাঁথা পাথরের দেওয়াল। কিন্তু সেই গলির ধারে ঘরের উত্তর দিকে লোহার গরাদ দেওয়া বেশ চওড়া একটি জানালা ছিল; বর্ষার দিনে সেই জানালা দিয়া যাহাতে বৃষ্টির ঝাপ্টা না আসে তাহার জন্য জানালার সঙ্গে কাঁচের সার্শি দেওয়া ছিল।। দক্ষিণ দিকে ওই রকমই মোটা লোহার গরাদ দেওয়া দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড দরজা। সেই দরজা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকিলেও তাহার ভিতর দিয়া আলো-হাওয়া আসার কোনো বাধা ছিল না। উত্তর দিককার জানালা দিয়া বেশী আলো আসা সম্ভব ছিল না। কারণ, পিছনেই পাহাড়ের গায়ে লাল পাথরের বড় বড় কাটা চাঙগড় দিয়া গাঁথা শক্ত দেওয়াল উঠিয়া গিয়াছে। তবু সেই দেওয়াল এবং জানালার মধ্যবর্তী সরু বন্ধ গলি দিয়া যেভাবেই হোক কিছুটা হাওয়া আসিত। জানালা দিয়া মাথা উঁচু করিয়া

উপরের দিকে তাকাইলে টিলার উপরকার কিছু সবুজ ঘাস এবং ঝোপঝাড় অল্প অল্প দেখা যাইত। ঘরের সম্মুখের দিকে কিন্তু এক দরজার গরাদ ছাড়া আমাদের দৃষ্টিপথে অন্য কোনো বাধা ছিল না। সামনের দিকে গভর্নর-জেনারেলের প্রাসাদ, ভাস্কো-দা-গামা বন্দর ও মুর্মুগাঁও বন্দর, এবং তার পরে যতদূর দৃষ্টি যায় সীমাহীন সমুদ্র যেন একটু বাঁকিয়া নীচু হইয়া ক্রমে দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

আমাদের ঘরের সামনে হাত চার পাঁচেকের মত প্রশস্ত একটু বারান্দা ছিল। ব্যারাকের ঘরগুলির সামনে দিয়া এই বারান্দা প্রায় ষাট হাতের মত একটানা চলিয়া গিয়াছে। বারান্দার পরেই উঠান। আমাদের ঘরের সামনে উঠানটি কিছুটা সরু বা অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে, সেখানটায় উঠান বোধহয় হাত দশেকের বেশী চওড়া হইবে না। তার পরেই দুর্গের হাত চারেক চওড়া বাইরেকার দেওয়াল, নদী এবং সমুদ্রের বুক হইতে খাড়া উঠিয়া আসিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দরজার ঠিক সম্মুখে দেওয়ালটি কাটা ছিল বলিয়া আমরা আমাদের ঘর হইতে বসিয়া মাণ্ডভীর ওপারে ভাস্কো বা মর্মুগাঁও-এর দিকে কিম্বা সমুদ্রের দিকে সবকিছু দেখিতে পাইতাম। পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, আগুয়াদা দুর্গ নির্মিত হয় কতকটা নৌ-যুদ্ধের প্রতিরক্ষা দুর্গ হিসাবে। গোয়া বন্দরের উত্তর মোহড়া পাহারা দেওয়ার জন্য দুর্গ-প্রাকারের এইসব কাটা জায়গায় দূরপাল্লার ভারী ভারী কামান বসানো থাকিত, যাহাতে সমুদ্রের দিক হইতে জাহাজে করিয়া কোনো শত্রুপক্ষ মাণ্ডভীর মোহানা দিয়া গোয়া আক্রমণ না করিতে পারে। দুর্গের যে দিকটায় অফিস-দপ্তর, কমাণ্ডাণ্টের বাসা বা সৈন্যদের ব্যারাক, সেদিকে এখনো দেওয়ালের এইসব কাটা জায়গায় ভারী ভারী পুরানো দিনের কামান সাজানো আছে তাহা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের ব্যারাকের সামনের দেওয়ালে এইরকম সব কামান রাখার জায়গা কাটা আছে; কিন্তু কামান একটিও নাই। এক-একটি কাটা জায়গা প্রায় হাত তিনেকের মতো চওড়া হইবে। বন্দীরা যখন কোনো সময় ব্যারাকের ঘরগুলি হইতে বাইরে আসে, তখন দেওয়ালের উপর উঠিয়া কিম্বা এইসব কাটা জায়গায় দাঁড়াইয়া বাহিরের শোভা দেখিতে পায়। কিন্তু আমাদের ঘরের ঠিক নাক-বরাবর দুর্গের দেওয়ালের এইরকম একটি কাটা ফাঁক থাকায় আমাদের খুবই সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। তাহা না হইলেও একেবারে অসুবিধা হইত না। কারণ, আমাদের ব্যারাকের ভিত্‌টা কিছুটা উঁচু ছিল। দুর্গের ভিতরের দিক হইতে সম্মুখের দিকের দেওয়ালের উচ্চতা বোধহয় হাত ছয়-সাতেকের বেশী হইবে না। ঘরের ভিতর হইতে নদীর ওপারে বা সমুদ্রের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি এই দেওয়ালে খুব বেশী আটকাইত না। আগুয়াদা দুর্গে আমাদের এক বছরের বন্দীজীবনের সবচেয়ে বড় আরাম ও সান্ত্বনা ছিল সম্মুখে মাণ্ডভী নদীর ওপারে পাঞ্জিম শহর এবং মুর্মুগোয়া ও ভাস্কো বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত অবাধ দৃশ্যপট এবং অন্যদিকে সোজা দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পরিব্যাপ্ত সীমাহীন সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় খোলা সমুদ্রের ফিকা সবুজ রং বহু দূর সীমান্তে গিয়া ক্রমে ঘন নীল হইয়া উঠিয়াছে। উপরে আকাশের হাল্কা নীল আসিয়া মিশিয়াছে সমুদ্র-দিগন্তের ঘন নীলের সঙ্গে। সমুদ্রের সেই অবাধ জলীয়-প্রান্তর দিগন্তের কাছে আসিয়া যেন একটু ঢালু হইয়া বাঁকিয়া আকাশের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে। আগুয়াদার এক বছর আমাদের কাটিয়াছে দিনের পর দিন সেই দিগন্তের দিকে চাহিয়া চাহিয়া।

আগুয়াদা দুর্গকে এক হিসাবে পাঞ্জিম শহরের প্রায় এপার-ওপার বলিলেই চলে, মধ্যে মাণ্ডভী নদী। পশ্চিম হইতে সোজা লাইনে আগুয়াদার দূরত্ব বোধহয় মাইল তিনেকের

বেশী নয়। মানিকোম পাগলা গারদ হইতে আমাদের প্রথমে বাসে করিয়া পাঞ্জিমের জাহাজ-ঘাটে এবং সেখানে হইতে মোটরলঞ্চে করিয়া আগ্‌য়াদার ঘাটে আনিয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণত কেহ লঞ্চে করিয়া নদীপথ দিয়া আগ্‌য়াদায় আসে না; নিয়মিত সেরূপ কোনো ব্যবস্থাও নাই। পশ্চিম আগ্‌য়াদায় আসিতে হইলে পাঞ্জিম নদীর পূব দিকে বেতি'র ফেরীঘাটে লঞ্চে নদী পার হইয়া জঙ্গল ও পাহাড়ের ভিতর দিয়া আগ্‌য়াদার দিকে উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা ধরিতে হয়। বেতি' হইতে প্রায় মাইল বারো চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া তবে আগ্‌য়াদায় পৌঁছাইতে পারা যায়। এ-পথে যানবাহন বলিতে এক ট্যাক্সি ভিন্ন আর কিছু মেলে না। কিন্তু তাহার জন্য আগে হইতে বেতি'তে আসিয়া যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা চরিত্র করিতে হয়। কারণ, পাঞ্জিম হইতে পেড়্‌নে', মাপ্‌সা, বিচোলী', সাঁকলি', ওয়ালপই প্রভৃতি শহর বা বাজারে আসিতে হইলেও বেতি'র পথেই আসিতে হয়। বেতি' প্রভৃতি জায়গায় মোটর-বাস আসে যায়। কিন্তু যেসব যাত্রীরা বাসের টাইম-টেবিলের ঘড়ি-বাঁধা সময়ের বাহিরে নিজেদের ইচ্ছামত আসা-যাওয়া করিতে চান, ট্যাক্সিগুলি সাধারণত তাঁহাদের নিয়া ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আগ্‌য়াদার পথে লোকালয়, ঘন-বসতি বা বাজার-জাতীয় কিছু সেরকম নাই। তাই এ পথে নিয়মিতভাবে মোটর-বাস বা ট্যাক্সি চলাচল করে না। তবে আগ্‌য়াদায় একটি মিলিটারী ছাউনি এবং লাইট্ হাউস্ ছিল বলিয়া মিলিটারী ট্রাক, লরি, অফিসারদের জীপ-গাড়ী প্রভৃতি এ-পথে রোজই কিছু কিছু আসা-যাওয়া করিত। আগ্‌য়াদা দুর্গ গোয়া'র রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বন্দীশালা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হওয়ার পর হইতে পুলিশের গাড়ী, বন্দী-বোঝাই প্রিজ্‌ন ভ্যান, বন্দীদের সঙ্গে ইন্টারভিউপ্রার্থী আত্মীয়-স্বজনদের ভাড়া-করা ট্যাক্সি, জেলের রসদ সরবরাহকারী কন্‌ট্রাকটরদের গাড়ী, এ-সবের আসা-যাওয়াও ক্রমে বাড়িয়া যায়। আগ্‌য়াদায় থাকিতে থাকিতেই আমরা নিজেরাও আগ্‌য়াদা হইতে পুলিশ পাহারায় প্রিজ্‌ন ভ্যানে করিয়া এই পথে শহরের চোখের ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাইতে বা হাসপাতালে এমনি চিকিৎসার জন্য আসা-যাওয়া করিয়াছি।

রেইস্ মাগুস্ দুর্গের বন্দীশালাও বেতি হইতে আগ্‌য়াদার পথে পড়ে। আগ্‌য়াদা ও রেইস্ মাগুস্-এ আটক বন্দীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য তাহাদের আত্মীয়-স্বজন-দের এই পথেই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আসিতে হইত। একই গ্রাম বা শহরের একই পাড়ার আটক রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনেরা ইন্টারভিউর জন্য নির্দিষ্ট দিনে আগ্‌য়াদায় বা রেইস্'-মা'য় (রেইস্ মাগুসের চলতি সংক্ষিপ্ত রূপ) আসা-যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের ভিতর চাঁদা করিয়া ট্যাক্সি ভাড়া করিতেন। সকলে মিলিয়া যতটা পারা যায় এক ট্যাক্সিতে গাদাগাদি বোঝাই না হইয়া আসিলে খরচা পোষাইত না; ট্যাক্সি চাহিলেও সব সময় ভাড়া পাওয়া যাইত না। রাস্তা নামে 'পাকা' বা 'metalled' হওয়া সত্ত্বেও ইহার বেশীর ভাগটাই পীচ্-বাঁধানো রাস্তা ছিল না। পাহাড়ী চড়াই উৎরাইয়ে ওঠা-নামার ঝাঁকুনির সঙ্গে এই পাথুরে খোয়া-বাঁধানো, ধুলা-ওড়ানো লাল-মাটীর রাস্তায় মোটর গাড়ীতে চলাও যে খুব সুখের ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য।

বেতি' হইতে আগ্‌য়াদার রাস্তায় এক তৃতীয়াংশ বা প্রায় অর্ধেকের মত আসিলে রেইস্ মাগুস্ গ্রাম ও দুর্গের পথ পড়ে। বড় রাস্তা হইতে একটু ভিতরে গিয়া রেইস্ মাগুস্ গ্রাম ও দুর্গ রেইস্ মা'ও আগ্‌য়াদার মতই মাণ্ডভীর সমুদ্র মোহানার কাছাকাছি অবস্থিত। রেইস্-মা' দুর্গ অবশ্য আয়তনে আগ্‌য়াদা হইতে অনেক ছোট।

এই দুর্গ মিলিটারীর চার্জে নয়। বহু আগেই এটিকে একটি অসামরিক সিভিল

জেল, বা পর্তুগীজ ভাষার 'কাদেইয়া সিভিল'-এ (Cadeia Civil) পরিণত করা হইয়াছে। এই সময় এখানেও ৮০।৯০ জন রাজনৈতিক বন্দীকে রাখা হইয়াছিল; ইহার চেয়ে বেশী লোক এখানে ধরে না। ১৯৫৪ সালের সত্যাগ্রহের নেতা টোনী ডি' সুজাকে এখানেই আটক রাখা হয়। আমরা মুক্তি পাইয়া চলিয়া আসার পর তাঁহাকে আগুয়াদায় বদলি করা হয়। রাজনৈতিক বন্দী ভিন্ন সাধারণ কয়েদীদেরও রেইস্ মা'য় রাখা হইত। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। রেইস্ মাগুসে্ একটি ছোট লাইট্ হাউস্ বা বাতিঘর ও একটি পুরাতন কাথিড্রাল (গীর্জা) আছে। পর্তুগীজ ভারতের ও গোয়ার ইতিহাসে রেইস্ মাগুসে্র প্রসিদ্ধি আগুয়াদার চেয়ে অনেক বেশী। তার কারণ এ্যাডমিরাল আল ব্যুকের্ক যখন গোয়ায় প্রথম অবতরণ করেন তখন প্রথমে যেখানে তিনি জাহাজ নোঙর করেন, রেইস্ মাগুস্ সেই জায়গা। সেখানে একটি ছোট স্মারক স্তম্ভ আছে। কিন্তু আগুয়াদা জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা রেইস্ মা' জেলের বন্দীদের কিছুটা ঈর্ষা করিত অন্য কারণে। অসামরিক জেল হওয়ার দরুন এবং জেলের বুড়ো ডাইরেক্টর সাহেব মানুষটি ভালো হওয়ার জন্য সেখানে জেলের ভিতরে চলাফেরার কড়াক্কড়ি অনেক কম ছিল। আবার দু' একটি ব্যাপারে অসুবিধাও ছিল। যেমন বন্দীদের শোয়ার জন্য রেইস্ মাগুসে্ কোন খাটের ব্যবস্থা ছিল না; সকলকেই স্যাঁৎসেঁতে মেজেতে ঢালা বিছানা পাতিয়া শুইতে হইত। রেইস্ মাগুস্ জেল আমি দেখি নাই; তাই সে সম্পর্কে বেশী আলোচনা করিয়া লাভ নাই। আগুয়াদার কথায় ফিরিয়া আসা যাক।

পঞ্জিম পর্যন্ত পঞ্জিম শহরের পূব দিক দিয়া উত্তর মুখে বহিয়া আসিয়া যেখানে মাণ্ডভী সমুদ্রে মেশার জন্য পশ্চিমে বাঁক ঘুরিয়াছে, আগুয়াদা দুর্গ প্রায় সেই বাঁকের উপর নদীর উত্তর পারে মাণ্ডভীর মোহানার মুখে অতন্দ্র প্রহরীর মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঁকের জায়গাটা হইতে দুর্গ সীমানার আরম্ভ। এই বাঁক হইতে নদীর উত্তর-পার বরাবর প্রায় এক মাইল পর্যন্ত দুর্গ-প্রাকার নদীর বুক হইতে পাহাড়ের গায়ে খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। দুর্গের ভিতরে আমাদের সেলগুলি যে জায়গায়, সেখান হইতে সেলের বাহিরে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলে পঞ্জিম শহরের উত্তর পূর্ব দিকে বাড়ীগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। মানিকোম জেলের টিলার উপরে পঞ্জিমের জলকলের নতুন উঁচু গম্বুজ বা জলাধারটিও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। আগুয়াদা হইতে ইহার দূরত্ব মাইল পাঁচেকের মত হইবে। নদীর দক্ষিণ পারে পঞ্জিম শহর যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর আমাদের এপার হইতে নদীর ধারে ধারে উঁচু পাড়ের উপর ঘন গাছপালা বা বন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

মাইল খানেক এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার পর যে জায়গায় পঞ্জিমের পশ্চিম দিক দিয়া জুয়ারী নদী আসিয়া সমুদ্র মোহানার কাছাকাছি মাণ্ডভীতে পড়িয়াছে, দুই নদীর মধ্যবর্তী সেই উঁচু অন্তরীপের উপর আগুয়াদা দুর্গের সোজা দক্ষিণে অপর পারে গোয়ার লাট-ভবন বা গভর্ণর জেনারেলের প্রাসাদ। গভর্ণর জেনারেলের প্রাসাদের প্রাচীরও ল্যাটেরাইট পাথরের বড় বড় টুকরা দিয়া আগুয়াদা দুর্গ-প্রাকারের মতই নদীর বুক হইতে উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। তবে সে প্রাচীর আগুয়াদার প্রাচীন দুর্গ-প্রাকারের মত অত বিরাট বা উঁচু নয়। নদীতীরের এই প্রাচীরের পিছনে প্রাসাদের হাতার এলাকা বা কম্পাউন্ড দূর-বিস্তৃত। তাহার ভিতরকার সাজানো গাছপালার সারি এবং বাগান নদীর এপারে আমাদের দুর্গের ভিতর হইতেও কিছু কিছু দেখা যায়।

প্রাসাদটি দুইতলা, কতকটা মিশ্র গথিক ও রোমক কায়দায় তৈরী। স্থাপত্য সাদাসিধা অথচ বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ। পূব-পশ্চিমের সারিবাঁধা থামওয়ালা বারান্দা যেখানে আসিয়া মিশিয়াছে, গীর্জার চূড়ার মত প্রাসাদের একটি উঁচু চূড়া উঠিয়া গিয়াছে। প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে জুয়ারী নদীর অপর পারে মুর্মুগাঁও ও ভাস্কো-দা-গামা বন্দর। ভাস্কো-দা-গামা বন্দরের সংক্ষিপ্ত নাম 'ভাস্কো'। আগুয়াদা হইতে মুর্মুগাঁও ও ভাস্কোর দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল হইবে। উভয় বন্দরের জেটি, ডক, কিছু কিছু ঘরবাড়ী, ইমারত আগুয়াদায় আমাদের সেল হইতেও আব্‌ছা আব্‌ছা দেখিতে পাওয়া যাইত। উভয় নদীর মোহানার বাঁ পাশে গভর্ণর জেনারেলের প্রাসাদের মাইল খানেক পশ্চিমে নদী ও সমুদ্রের বুকে দুটি ছোট ছোট দ্বীপ বা দ্বীপের মত পাহাড়। তাহার পরেই দিগ্বলয় রেখাহীন অসীম সমুদ্র। যতদূর দৃষ্টি যায় দক্ষিণে ও পশ্চিমে শুধু জল আর আকাশ ছাড়া কিছু নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া বৈচিত্র্য যে কিছুই ছিল না তা' নয়। মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের বড় বড় জাহাজ মাণ্ডভীর মোহানার মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। গোয়াতে কিছু ম্যাঙ্গানীজ ও লোহার খনি আছে। কিছু কিছু জাপানী ও ইতালিয়ান জাহাজ গোয়া বন্দরে আসিয়া সেই ম্যাঙ্গানীজ ও লোহা বোঝাই করিয়া নিয়া চলিয়া যাইত। ভারতের দিক হইতে স্থলপথে বা জাহাজেও গোয়াতে কোনো মাল আমদানী-রপ্তানী হইত না। গোয়াতে পর্তুগীজদের তাই চাউল ও খাদ্যশস্য হইতে সকল রকম জিনিসের জন্য প্রধানত নির্ভর করিতে হইত বাহিরের আমদানীর উপর। ভারত উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে গোয়ার স্থল-সীমান্ত তিন দিক হইতে বন্ধ করিলেও পশ্চিমে গোয়ার সমুদ্র-সীমান্ত কানো দিন বন্ধ হয় নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, এমন কি ভারত হইতেও গোয়াতে প্রয়োজনীয় মালপত্রের আমদানী একেবারে বন্ধ হয় নাই। হিন্দুস্থান লিভারসের 'দল্‌দা' বনস্পতি হইতে বাটার জুতা, ভারতে তৈরী কাপড়-চোপড়, হ্যারিকেন-লণ্ঠন সব কিছুই আমরা জেলে বসিয়াই কিনিয়াছি। গোয়ার বাজারে কোনো জিনিসেরই অপ্রতুল ছিল না। তাহার কারণ ভারতে তৈরী যে কোনো জিনিসই সরাসরি ভারত হইতে গোয়াতে না আসিয়া বোম্বাই হইতে এডেন বন্দর ঘুরিয়া সহজেই গোয়াতে আসিত। কিছু কিছু জিনিসপত্র পাকিস্তানের করাচী হইতে এবং কিছু সিংহল ও কলম্বো হইতে আসিত। তা ছাড়া যে সব জাহাজ গোয়ার ম্যাঙ্গানীজ, লোহা ও ওর্‌-এর (আকরের) চালান নিতে আসিত, সেই সমস্ত জাহাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে গোয়ার প্রয়োজনীয় সকল রকম জিনিস বোঝাই হইয়া আসিত। গোয়াতে মোট লোকের সংখ্যা ছয় লাখের মত। তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। সমুদ্রপথ খোলা থাকাতে এ বিষয়ে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। এক কথায় গোয়া সম্পর্কে আমাদের তথাকথিত অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তাহার জন্যই গোয়া-মুর্মুগাঁও বন্দর জাহাজের আনাগোনা কোনো দিনই বন্ধ হয় নাই। খুব বেশী না হইলেও সপ্তাহে একটি কিম্বা দুইটি সমুদ্রগামী বড় জাহাজ মুর্মুগাঁও বন্দরের সামনে মাণ্ডভীর মোহানার মুখে আসিয়া নোঙ্গর করিত। নদীতে জলের গভীরতা কম বলিয়া এসব বড় জাহাজ একেবার নদীর ভিতরে বন্দরে গিয়া ডকের পাশাপাশি গিয়া লাগিতে পারিত না। সে রকম বড় বার্থওয়ালা ডক গোয়ার কোথাও নাই। ভাস্কো, মুর্মুগাঁও ও পঞ্জিম হইতে ছোট বড় লঞ্চে করিয়া এই জাহাজ হইতে মাল ওঠানো নামানোর কাজ চলিত। আমরা আমাদের সেলের ভিতর বসিয়া বসিয়াই সে দৃশ্য দেখিতে পাইতাম।

বাহিরের কোনো বড় জাহাজ যখন বন্দরে থাকিত না, তখন মাণ্ডভী জুয়ারীর মোহানায় জেলেদের মাছ ধরা দেখা আমাদের পক্ষে একটা কম উপভোগ্য দৃশ্য ছিল না। গোয়াতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় অধিকাংশই খুব গরীব ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান। গ্রামের পাদ্রী-পুরোহিতেরা পাঁজী-পুঁথি দেখিয়া শুভদিন নির্দেশ করিয়া দিলে তাহারা দল বাঁধিয়া নৌকা নিয়া, জাল নিয়া মাছ ধরিতে যায়। কোঙ্কন উপকূলের অন্যান্য অঞ্চলের জেলেদের মত নাবিক হিসাবেও গোয়ার জেলেদের বেশ নাম আছে। মাছধরার দিনে আগুয়াদা দুর্গের সম্মুখে মাণ্ডভী ও জুয়ারী নদীর প্রশস্ত মোহানার মুখে প্রায় ১৬-১৭ স্কোয়ার মাইল বিস্তৃত জলাভূমিতে দলে দলে ছোট ছোট (দু' তিন জনের বেশী লোক ধরে না এমন সাইজের) জেলে-ডিঙ্গি ভোর হইতে মাছ ধরিতে নামিত। পূর্ববঙ্গে পদ্মা-মেঘনার বুকে ভিন্ন মাছ ধরার ডিঙ্গি ও জালের এত বেশী একত্র সমাবেশ আমি কখনো দেখি নাই। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ১টা—২টা পর্যন্ত মাছ ধরিয়া আবার সমস্ত ডিঙ্গি হঠাৎ উধাও হইয়া যাইত।

মাণ্ডভী-জুয়ারীর মোহানায় আর এক দেখার জিনিস ছিল শুশুক। নদীর মোহানার ভিতর দিকে এখানে ওখানে অনবরত একটু লম্বাটে আকারের শুশুক পাক খাইয়া জলের ভিতর হইতে উঠিতেছে ডুবিতেছে, মাছ খাইয়া বেড়াইতেছে। অন্য কাজ না থাকিলে সেলে বসিয়া বসিয়া তাহা লক্ষ্য করাও কম উপভোগ্য ছিল না।

জীবনে আমি এতদিন ধরিয়া সমুদ্রের এত কাছাকাছি থাকি নাই। সেলে বন্ধ থাকিলে মনে হইত কোনো জাহাজের ক্যাবিনে যেন আছি। সেলের ভিতর হইতে ইয়ার্ডে বাহির হইলে মনে হইত যেন 'আউটার ডেকে' আসিয়াছি, সমুদ্র এত কাছে। আমাদের সেল হইতে মোটে দশ পনরো হাত দূরেই মাণ্ডভীর মোহানা আর খোলা সমুদ্র। মাণ্ডভী নদী সেইখানে ঠিক কোন জায়গায় সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। সমুদ্র হইতে ডাঙ্গার দিকে ভিতরমুখো একটি খাড়ি এবং নদীর মোহানা। নদী ও সমুদ্র এই জায়গায় একত্রে একে অন্যের সঙ্গে আসিয়া মেশায় ঠিক কোন জায়গায় নদী শেষ হইল আর সমুদ্রের খাড়ি আরম্ভ হইল এক বর্ষার দিন ছাড়া সেটা বোঝা যায় না। পাহাড়ী নদীর বর্ষার সময়কার ঘন গৈরিক রংয়ের লাল জল প্রবল তোড়ে আসিয়া আরব সাগরের ফিকা সবুজের সঙ্গে মিশিতে চাহিলেও একটা জায়গায় লাল এবং সবুজের মধ্যে কেউ যেন দোরঙ্গা মানচিত্রের মত একটা সীমানা টানিয়া দিয়াছে এরকম মনে হইত। কিন্তু বর্ষা কাটিয়া গেলে আবার যে-কে সেই। সমুদ্রের সঙ্গে এই কয় মাসে আমাদের যেন এক পরম আত্মীয়তা পাতানো হইয়া গিয়াছিল।

গোয়া বন্দর ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য বলাই বাহুল্য পর্তুগীজদের হাতে থাকায় এই বন্দরের যে ধরনের উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। গোয়া বন্দরে পোতাশ্রয়ের যেসব নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা আছে, বোম্বাই বা করাচী ভিন্ন অন্যত্র তাহা বড় একটা নাই। গোয়ার কাছাকাছি সমুদ্রের গভীরতা বেশী এবং তাহার ফলে বাহির সমুদ্র হইতে বড় বড় জাহাজ মাণ্ডভীর মোহানার মুখে বন্দরের খাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সহজেই আশ্রয় নিতে পারে ও যতদিন ইচ্ছা নিরাপদে নোঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে। সমুদ্রের উপকূল এখানে কোথাও উপর হইতে ক্রমে ঢালু হইয়া জলের ভিতরে নামিয়া আসে নাই। পুরী বা বাংলা দেশে দিঘার কাছে, কিম্বা মাদ্রাজের দিকে, বঙ্গোপসাগরের পারে যে

ধরনের ঢালু 'বীচ' বা বেলাভূমি আছে গোয়াতে সেরকম নাই বলিলেও চলে। সহ্যাদ্রি পর্বত-মালা মনে হয় এখানে একেবারে সমুদ্রের ভিতর হইতে খাড়া হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া আসিয়াছে। ডাঙ্গার কাছাকাছিও সমুদ্রের জলের গভীরতা তাই বেশী এবং সেই কারণেই গোয়াতে সমুদ্রের ধারে পুরী, দিঘা বা মাদ্রাজের মত উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের সমারোহ দেখা যায় না। নীল সমুদ্রের ভিতর হইতে একের পর এক বিরাট আকারের এক একটি উত্তুঙ্গ ঢেউ সাদা ফেনার মুকুট মাথায় দিয়া বিপুল বেগে ডাঙ্গার দিকে দৌড়াইয়া আসিয়া উপকূলে বালির উপর আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; আর সেই ভাঙ্গা ঢেউয়ের ফেনিল জলরাশি ঢালু জমির দুর্বার পিছু টানে সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে নামিয়া গিয়া আবার নূতন ঢেউয়ের আকারে মাথা উঁচু করিয়া ডাঙ্গার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এ দৃশ্য গোয়াতে বা আগুয়াদা হইতে দেখা যায় না। জলের গভীরতা বেশী বলিয়া সমুদ্র এখানে অনেক শান্ত। সমুদ্র হইতে পাহাড়ের গায়ে বা দুর্গ প্রাকারের গায়ে জলের ঢেউ যে আছাড় খাইয়া পড়ে না তা নয়; কিন্তু কি উচ্চতার দিক দিয়া আর কি অস্থিরতার দিক দিয়া সে সব ঢেউকে পুরীর দিককার বড় বড় 'ব্রেকার' জাতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। সমুদ্রের তর্জন-গর্জন বা হুঙ্কার তাই এদিকে তত বেশী নয়। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রিতে ভিন্ন সমুদ্রের অবিরাম গর্জন সেভাবে কানে আসে না।

আমরা যখন প্রথম আগুয়াদায় আসি তখন শীতকাল। গোয়ার সমুদ্র তখন একেবারে শান্ত ধীর-স্থির হইয়া যেন ঝিমাইতেছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের জলের 'বে অব্ বেঙ্গলে'-র জলের মত অতটা ঘন নীল নয় বরং যেন কিছুটা ফিকা সবুজ বা 'বট্‌ল গ্রীন্' ধরনের। নীলের আমেজ তাহাতে খুবই ক্ষীণ। কিন্তু মান্ডভীর মোহানা হইতে খাড়ির বাহিরে খোলা সমুদ্রে যতদূর চোখ যায়, সেই ফিকা সবুজ জলের নিস্তরঙ্গ চাদরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে যেন সমুদ্র বলিয়া মনে হয় না। যেন খুব বড় একটা দীঘি বা হ্রদ চুপ-চাপ হইয়া পড়িয়া আছে। কোনো সময় জোর হাওয়া উঠিলে সমুদ্র উত্তাল বা উদ্বেল হইয়া সামান্য কিছু চাঞ্চল্য দেখায়। জলের উপরের দিকে ছোট ছোট ঢেউ নাচিতে থাকে। ইংরাজীতে সমুদ্রের সে অবস্থাটিকে 'চপি' বলে, কিন্তু 'রাফ্' বলে না (Choppy : Rough) তার চেয়ে বেশী কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

বর্ষায় আরব সাগর হইতে যখন প্রবল মৌসুমী হাওয়া আসিতে থাকে, সহ্যাদ্রিতে ধাক্‌কা খাইয়া মৌসুমী মেঘ যখন ধারাসার বর্ষণে কোঙ্কন উপকূলের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, মান্ডভী এবং জুয়ারী বাহিয়া বিপুল তোড়ে পাহাড়ী বর্ষার জল যখন সমুদ্রে আসিয়া মিশিতে চায় সে সময় নদী ও সমুদ্রের জলের কিছুটা উন্দামতা দেখা দেয়। একেবারে 'ব্রেকার' না বলা গেলেও, কিছু বড় বড় ঢেউ যেন মাঝ-দরিয়ায় দেখা দেয় আবার সেখানেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মিলাইয়া যায়। বর্ষার নদীর গেরুয়া জল আর সমুদ্রের জলকে একসঙ্গে মিশাইয়া জোরে ঝাঁকাইয়া একাকার করিয়া দিতে চায়; কিন্তু তবু দুইয়ে যেন মিশ খাইতে চায় না। কিন্তু গোয়ার সমুদ্রের এই চেহারা বর্ষার তিন মাস ছাড়া থাকে না।

কিন্তু মৌসুমী হাওয়াতে কিম্বা বর্ষার ঝড়-বৃষ্টিতেও আরব সাগরে জাহাজ চলাচলের কোনো বাধা হয় না। ইতিহাসের ছাত্রদের নিশ্চয়ই জানা আছে, দক্ষিণ আফ্রিকার নীচে দিয়া 'কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্' (পর্তুগীজ ভাষায় ইহার নাম 'কাবো দা বুয়েনা এস্পেরাঁস; ইংরেজরা পর্তুগীজদের কাছ হইতেই এই নামের সঙ্গে—'উত্তমাশা অন্তরীপ'—পরিচিত হয়) ঘুরিয়া মাদাগাস্কার পর্যন্ত পেঁাছানোর পর সেখান হইতে বর্ষার এই মৌসুমী হাওয়াতেই

পাল তুলিয়া দিয়া আরব সাগর পার হয় এবং সেই হাওয়ার টানে টানে সোজা উত্তর-পূর্বে কালিকট বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়। বলাই বাহুল্য ভাস্কো দা গামার সময় হইতে আজ পর্যন্ত মৌসুমী হাওয়ার গতি-প্রকৃতির যেমন কোনো বদল হয় নাই, মালাবার ও কোংকন উপকূলের সমুদ্রেরও তেমনি স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

আমাদের নতুন ঘরে ঢুকিয়া জিনিসপত্র একটু গোছগাছ করিয়া দিয়া বসার উদ্যোগ করিতে করিতে দেখি ঈশ্বরভাই চুপ করিয়া একদৃষ্টে সেই ধীর-স্থির সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আবৃত্তি করিতেছেন—

"আপূর্যমানমচল-প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ........."

ভগবদ্‌গীতার এই শ্লোকার্ধে সমুদ্রের যে বর্ণনা আছে, পুরী এবং বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রের চেহারাটাই আমার মনে একটু বেশী করিয়া ছাপ ফেলিয়া রাখাতে, আমি কোনো সময়েই এই বর্ণনার সঙ্গে নিজেকে মনে মনে খুব খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারি নাই। বরাবরই আমার মনে হইয়াছে গীতাকার কবি সমুদ্রের জলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। ঈশ্বর-ভাইয়ের আবৃত্তির স্বর কানে যাইতেই আমিও আর একবার সমুদ্রের সেই প্রশান্ত মূর্তির দিকে নূতন করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। মনে পড়িল—

"তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে,
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী"॥

কে জানে আগুয়াদা দুর্গে পর্তুগীজ বন্দীশালায় বসিয়া আরব সাগরের সেই প্রশান্তি ক্রমে আমাদের মনেও বর্তাইবে কিনা?

বলা বাহুল্য, খালি সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এবং গভীর শ্লোক আওড়াইয়া গেলে শান্তি পাওয়া যায় না—বিশেষ করিয়া পর্তুগীজদের জেলে। তাছাড়া সে দিন ভোর রাত্রি থেকে পাঞ্জিম হইতে আগুয়াদা পর্যন্ত টানা-হেঁচড়ায় আমাদের কিছু খাওয়া হয় নাই। বেলা তখন প্রায় দেড়টা-দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। সেলে সেলে লোহার দোতলা খাটিয়া পাতিয়া বন্দীদের বসবাসের ব্যবস্থা হইতেছে, সুজনী চাদর খড়ের বালিস এনামেলের বাসন-পত্র জনে জনে হিসাব করিয়া ঘরে ঘরে বিলি করা হইতেছে। কমান্ডাণ্ট কস্তা সাহেব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ পিছন পিছন নিয়া এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করিয়া সমস্ত ব্যবস্থার তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন। খাওয়া দাওয়া আজ অদৃষ্টে আছে কিনা কে জানে? আমরা চারজনেই তখন বেশ কিছুটা শ্রান্ত ও পিপাসার্ত বোধ করিতেছি। ক্ষুধাও পাইয়াছে প্রচুর; কিন্তু খাওয়া হোক বা না হোক্ খানিকটা ঠান্ডা জল পাইলেও আপাতত হয়। কি করা যায়, প্রহরী সৈন্যদের কাহাকেও ডাকিয়া একটু খাবার জল চাহিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি সানুচর কমান্ডাণ্ট সাহেব, জন দুয়েক বন্দুকধারী প্রহরী এবং তাহাদের পিছনে জনকয়েক গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীর হাতে জলের একটি কলসী, চায়ের কেট্‌লী, জগ এবং কয়েকটি এলুমিনিয়মের ছোট ছোট মগ হাতে করিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছেন দেখিলাম। শেষোক্ত বন্দীদের কাহাকেও তখন আমরা চিনিতাম না। আন্দাজ করিলাম তাঁহারা আমাদের পূর্বাগত। সে দিন আমাদের জন্য জল, চা এসব হাতে করিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গোয়ার এডভোকেট ও জাতীয় আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত গোপালরাও কামাথ, এডভোকেট মুলগাঁওকর, শ্রীযুক্ত শিবানন্দ গাইটোণ্ডে এবং আলভায়ো পেরেইরা ছিলেন। ইঁহাদের ভিতর চারজনেই

গোয়াতে জাতীয় আন্দোলন সংগঠনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। শিবানন্দ গোয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ডাঃ পুণ্ডলিক গাইটোণ্ডের ছোট ভাই, মেটালর্জির গ্রাজুয়েট। ডাঃ গাইটোণ্ডের গ্রেপ্তারের পর পর্তুগীজবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার দশ বছরের সাজা হইয়াছে।* কমাণ্ডাণ্ট-সহ সকলে আমাদের সেলের দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে কাব্ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া গেল।

তেনেন্ত আফোঁসো দা কস্তা দুর্গের কমাণ্ডাণ্ট হিসাবে নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে খুবই সচেতন। আগুয়াদায় যে তিনিই সবার উপরে কর্তা-ব্যক্তি সে-কথা সকলকে জানাইয়া দিতে তিনি মুহূর্ত দেরী করেন না। শিক্ষিত ভদ্র যুবক, পর্তুগীজ জাতির ঐতিহ্য, পর্তুগীজ ভদ্রতার চোস্ত আদব-কায়দা এ সব সম্পর্কে খুব সজাগ ও সচেতন। তাহার উপর স্বয়ং গভর্নর জেনারেল বলিয়া দিয়াছেন আমাদের কজনকে নিয়া কোনো হাঙ্গামা যেন না হয়, কারণ ইজিপ্ট সরকারের লোক আমাদের তদ্বিরের জন্য আসিতেছেন। কাজে কাজেই ঘরে ঢুকিয়া তিনি আবার খুব ভদ্রতা দেখাইয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ চৌধুরী! মিঃ গোরে! আমি খুবই দুঃখিত যে আমি এখনও আপনাদের 'লাঞ্চে'র কোনো বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। তবে আমি ম্যানেজারের কাছে আপনাদের খাবার প্রস্তুত করার অর্ডার দিয়া আসিয়াছি। আজ অবশ্য আপনাদের একটু কষ্ট হইবে। কিন্তু কাল-পরশু হইতে সব রুটিন মাফিক চলিবে। এখন আপনার শ্রান্ত, তাই আপনাদের জন্য খাবার ও হাতমুখ ধোওয়ার জল এবং চায়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।" পিপাসায় না চাহিতেই চা জল! আগুয়াদায় কি আমরা তাহা হইলে সত্য সত্যই একেবারে কল্পতরুর রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম? আফোঁসো ইশারায় যাঁহারা চা, জল আনিয়াছিলেন তাঁহাদের সে সব আমাদের জন্য পরিবেশন করিতে আদেশ দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাবধান করিয়া দিলেন—অর্থাৎ যে সব বন্দীরা আমাদের অন্যঘর হইতে চা, জল এসব দিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলা বারণ। শুধু তাই নয়, পর্তুগীজ সৈন্যদের সঙ্গেও আমাদের কথাবার্তা বলার কোনো হুকুম নাই। আমরা যদি কোনো বিষয় কিছু জানাইতে চাই তাহা হইলে কারুকে ডাকিয়া আমরা অফিসে স্লিপ্ বা চিঠি পাঠাইতে পারি। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ডাকিয়া এমনি কোনোরকম কথাবার্তা বলিতে বা গল্পগুজব করিতে পারিব না। সেরূপ করিতে দেখা গেলে আমাদের এবং তাহাদের (অর্থাৎ যে সব সৈন্যকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাইবে তাহাদের) শাস্তি হইবে। এইসব কথা জানাইয়া দিয়া তিনি আবার ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সদলবলে বাহির হইয়া গেলেন। অবেলায় হইলেও আমরা হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া কিছুটা সুস্থ হইয়া নিজেদের ঘরদুয়ার গোছাইতে বসিলাম।

---

*ইঁহাদের মধ্যে এডভোকেট মুলগাঁওকর ও শিবানন্দ গাইটোণ্ডেকে গত বছর মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

॥ ৪৩ ॥

আগ্বয়াদার জীবনযাত্রা

আগ্বয়াদায় সেদিন আমাদের সাব্যস্ত হইয়া বসিতে বসিতে এবং খাওয়া দাওয়া সারিতে সারিতে বিকাল হইয়া গেলেও আফোঁসো কস্তার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হয় নাই। দু'-এক দিনের ভিতরেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রুটিন তিনি একেবারে ঘণ্টা মিনিট বাঁধিয়া ছক কাটিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। পর্তুগীজ জেল আইনে আমরা এদেশে যাহোক 'সশ্রম কারাদণ্ড' বা 'রিগরস ইম্প্রিজনমেণ্ট' বলি, সে ধরনের ব্যবস্থা নাই। পর্তুগীজ আইনে কারাদণ্ড মানে শুধু আটক রাখা, আমরা যাকে 'সিম্পল ইম্প্রিজনমেণ্ট' বা 'বিনাশ্রম কারাদণ্ড' বলি তাহাই। তা ছাড়া আগ্বয়াদা দুর্গের বন্দীশালা ঠিক নিয়মিত ধরনের সাধারণ জেল নয় বলিয়া, সেখানে বন্দীদের খাটাইয়া শাস্তি দেওয়া বা সরকারী কাজকর্ম করানোর মত কোনো বিশেষ ব্যবস্থা—যেমন ঘানি টানানো, বা জাঁতায় গম পেষানো, এসবের কোনো বন্দোবস্তও ছিল না। আমাদের সঙ্গে আগ্বয়াদা দুর্গের বন্দীশালায় যেসব পর্তুগীজ মিলিটারী কয়েদী থাকিত (আমরা কোনো সময়েই কুড়ি-পঁচিশ জনের বেশী মিলিটারী-কয়েদী আগ্বয়াদায় থাকিতে দেখি নাই) তাহাদের দিয়া অবশ্য মধ্যে মধ্যেই নানা রকমের কাজ করানো হইত। একমাত্র আমাদের ইয়ার্ড ভিন্ন দুর্গের অন্যান্য ঘর-দুয়ার ঝাড়া-পোঁছার কাজ, দুর্গের বাগান-পত্র ঠিক রাখা, মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন ব্যারাকে চুনকামের কাজ বা রাজমিস্ত্রী ছুতার মিস্ত্রীর কাজ বা এই জাতীয় শারীরিক পরিশ্রমের কাজের দরকার পড়িলেই সেসব তাহাদের দিয়া করনো হইত। অবশ্য তাহার বিনিময়ে তাহাদের কিছু কিছু পারিশ্রমিক মিলিত। মধ্যে কিছু দিনের জন্য আমাদের চুল কাটার জন্য একজন পর্তুগীজ মিলিটারী কয়েদী নাপিত আসিয়াছিল। তাহাকে দিয়া চুল কাটাইতে হইলে আমাদের আট 'তাংগা' বা আট আনার মত 'ফি' দিতে হইত। আগ্বয়াদার সৈন্যেরাও অনেকে, সে যতদিন ছিল, তাহার কাছেই ঐ রেটে চুল কাটিত। ঐ তাহার জেলের কাজ ছিল। অবশ্য কোনো দিন চুল কাটানোর বেশী খরিদ্দার না থাকিলে বেচারী অন্যদের সঙ্গে মিশিয়া তাহার হাত খরচ রোজগার করার জন্য বাগানের মালীর কাজ বা মিস্ত্রীর কাজ করিতে পিছপাও হইত না। কিন্তু আমাদের দিয়া অর্থাৎ আগ্বয়াদাতে আমরা যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ছিলাম, জোর করিয়া কোনো কাজ করানো হইত না। আমাদের যেসব কাজ করিতে হইত, তাহা সবই আমাদের নিজেদের কাজ অর্থাৎ আমাদের নিজের নিজের ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, পায়খানা সাফ করা, ভারে করিয়া জল বহিয়া আনা, কাঠ আনা, বাজার হইতে রেশন আসিলে জেল গুদাম হইতে মাথায় করিয়া সে সব বহিয়া আনা এবং নিজেদের রান্নাবান্না করা ইত্যাদি ধরনের সমস্ত কাজ আমাদের নিজেদেরই করিতে হইত। অবশ্য ঘটনাচক্রে আমরা আট জন ভারতীয় সত্যাগ্রহী 'নেতা', আমাদের সেলে আমরা চারজন এবং ব্যারাকের অপর পাশে মধু লিমায়ে, জগন্নাথ রাও-দের সেলে চারজন—দৈনিক রান্নার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলাম। তাহার কারণ আমাদের ঘরে রান্নাবান্না করার মত কোনো আলাদা জায়গা ছিল না। খালি সকাল বেলাকার চা-জলখাবার তৈরির জন্য আমরা নিজেদের খরচে একটি কেরোসিন স্টোভ কিনিয়া লইয়াছিলাম। তাছাড়া আমাদের দুপুরের ও রাতের খাবার গোয়াবাসী বন্দীদের

অন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর হইতে রান্না হইয়া আসিত। মিলিটারী পাহারায় সেই ঘর হইতে আমাদের গোয়াবাসী বন্ধুরা দুবেলা আমাদের জন্য রান্না করা ভাত তরকারি এসব দিয়া যাইতেন। এক রোজকার রান্নাবাড়ার কাজ ছাড়া অন্য সব কিছু কাজই আমাদের নিজ হাতে করিতে হইত।

কেতা ও রুটিন-দুরস্ত কমাণ্ডাণ্ট কর্তা রোজ আমাদের কখন কোন্ কাজ করিতে হইবে, তাহার জন্য চার্ট বানাইয়া দিয়াছিলেন। কিছু কিছু কাজের জন্য বন্দীদের সেলের বাহিরে আসার বা আনার প্রয়োজন করিত; কিন্তু সকল সেলের বন্দীদের এক সঙ্গে বাহিরে আনা হইবে না। কারণ তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাইবে। সেইজন্য এইসব কাজের জন্য পালা করিয়া কখন কোন্ সেলের লোককে বাহিরে আনা হইবে তাহার হিসাব ঠিক করা ছিল। সেই হিসাবে দিনের মধ্যে সবার প্রথমে ছিল আমাদের 'limpar' ও 'lavar' (cleaning and washing) এর কাজ; অর্থাৎ ঘর ঝাড়ু দেওয়া, পায়খানা ধোওয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সারা ইত্যাদির জন্য আধ ঘণ্টার জন্য রোজ ভোরে ৪৷৷টা—৫টার সময় আমাদের সেল খুলিয়া দেওয়া হইত। আমাদের পায়খানার ঘরটি আমাদের সেলের বাহিরে সমুদ্রের ধারে দুর্গের বাহির দেওয়ালের একটি ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত ছিল। সেখানে একটি ফ্লাস কমোড জাতীয় জিনিস ছিল, খালি তাহার ফ্লাসটি ছিল না। আমরা ছাড়া আর কেহ এই পায়খানা ব্যবহার করিত না। আমরা চারজন পালা করিয়া রোজ ভোরে কূয়া হইতে জল আনিয়া (কিম্বা জোয়ারের দিনে সমুদ্রের জল উঁচু হইয়া উপরে উঠিলে দুর্গের দেওয়ালের কোনো কাটা জায়গায় দাঁড়াইয়া সমুদ্র হইতে দড়ি বালতির সাহায্যে জল তুলিয়া নিয়া) সেটিকে নিজেদের স্বার্থেই সাধ্যমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতাম। আমাদের প্রাতঃকৃত্য ছাড়া সকলের হাতমুখ ধোওয়া এসব কাজ সারার সময়ও ছিল এইটি। কাগজে কলমে আধ ঘণ্টা ধার্য থাকিলেও প্রায় ঘণ্টাখানেক এসব কাজে কাটিয়া যাইত। ইহার পর ৬টা—৬৷৷টা হইতে ৯টা—৯৷৷টা পর্যন্ত ঘণ্টা তিনেক আমরা সেলের ভিতর আটক থাকিতাম। সে সময়টা কাটিত নিজেদের চা-জলখাবার তৈরি করিয়া নেওয়ার কাজে এবং সকালের চা-জলখাবারের পালা শেষ হইলে পর চিঠিপত্র লিখিয়া ডাকে পাঠানোর জন্য তৈরি হইতে কাটিয়া যাইত।

এখানে বলা দরকার, আগুয়াদায় আসিয়াই আমরা প্রথম ভারতে আমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিয়মিত চিঠিপত্র লেখার অনুমতি পাই। গোরে এবং শিরুভাউ লিমায়ে ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের চেষ্টায় ভারতে চিঠিপত্র লেখার অনুমতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু অন্য কাহারো সে অনুমতি ছিল না। আমরা চিঠি লিখিয়া কুয়ার্তেলে পাঠাইলে আমার বিশ্বাস সুব শেফ পাগাদু (এই ব্যক্তি আমাদের চিঠিপত্র বা 'আল্‌তিন্যো' জেলে আমরা থাকাকালীন আমাদের অন্যান্য খবরদারী করার কাজে কুয়ার্তেলে নিযুক্ত ছিল) তাহা ছিঁড়িয়া 'ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে' ফেলিয়া দিত। কোনো সময় জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিত—'কি করিব? আজকাল জানো তো ডাকের বড় গোলমাল'!* আমাদের বন্ধু ফাদার

*১৯৫৫ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ভারতের সঙ্গে রেলপথে গোয়ার যোগাযোগ বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় মাস খানেকের মত গোয়া ও ভারতের ভিতর ডাক চলাচল বন্ধ ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ডাক-সংস্থার মাধ্যমে এবং সেপ্টেম্বরে ভারতীয় কন্সাল জেনারেল গোয়া হইতে চলিয়া আসার আগে তাঁহার চেষ্টাতেও মোটামুটিভাবে ডাক চলাচলের—অন্ততপক্ষে চিঠিপত্র আসা-

কারিনো পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে বহু দরবার করিয়াও এবিষয়ে আমাদের জন্য বিশেষ কোনো সুরাহা করিয়া দিতে পারেন নাই।

আগুয়াদায় আসার পরই আমাদের ক্রমে ক্রমে চিঠিপত্র লেখার এবং গোয়ার বাহির হইতে আনা খবরের কাগজ ও বই পাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম আমাদের খালি গোয়ায় প্রকাশিত পর্তুগীজ ভাষার খবরের কাগজই দেওয়া হইত। এইসব কাগজে খবর বলিতে বিশেষ কিছু থাকে না। শুধুমাত্র একটি কলমে বি-বি-সি, অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো, পাকিস্থান রেডিয়ো ইত্যাদি হইতে প্রচারিত সংবাদের সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া থাকে। কিন্তু তখন আমরা ছয় মসের উপর পৃথিবীর কোনো খবর জানি না। তাই সেই এক কলম পরিমাণ দৈনিক সংবাদ জানার দুরন্ত আগ্রহে আমরা তাড়াতাড়ি চেষ্টা করিয়া পর্তুগীজ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। ইহার কিছু দিন পর কিছুটা ফাদার কারিনোর এবং কিছুটা ইজিপসিয়ান সরকারের প্রতিনিধি মঃ আহমেদ খলিলের চেষ্টায়, আমরা ক্রমে ক্রমে নামকরা সমস্ত বৃটিশ ও আমেরিকান সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা এবং আরও পরে পাকিস্তানের 'ডন' ও 'টাইমস অফ করাচী' (পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহা মিঃ সুরাবদীর কাগজ ছিল) এই দুইটি কাগজ নিজেদের খরচে আনানোর অনুমতিও পাইয়া যাই। গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা য়ুরোপ হইতে যেসব কাগজপত্র বা চিঠি আসিত তাহা গোয়ায় পেঁাছিত করাচী হইয়া। করাচী হইতে গোয়াতে সপ্তাহে দু'বার হাওয়াই জাহাজ আসে যায়। এই সময় ভারত সরকার ও পর্তুগীজ সরকারের মধ্যে ভারতের উপর দিয়া গোয়াতে হাওয়াই জাহাজ চলাচল নিয়া তীব্র বাদানুবাদ ও মনোমালিন্য চলিতেছিল। ভারত সরকার অভিযোগ করিতে থাকেন যে করাচী হইতে গোয়া-দমন-দিউর পথে এবং গোয়া হইতে দমন-দিউ-করাচীর পথে আসা যাওয়ার সময়, পর্তুগীজ হাওয়াই জাহাজ প্রায়ই ভারতের আকাশ সীমান্ত বে-আইনীভাবে লঙ্ঘন করিতেছে। বারবার এরূপ হইতে থাকিলে তাঁহারা তাহা বরদাস্ত করিবেন না। কিন্তু মুস্কিল এই যে ভারতের আকাশ সীমান্ত একেবারে একটুও লঙ্ঘন না করিয়া করাচী হইতে এরোপ্লেনে গোয়া-দমন-দিউ-তে আসা যাওয়া করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভারত সরকার মধ্যে মধ্যে গোয়া হইতে এইরূপ বে-আইনী বিমান আসা যাওয়া

যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়। ভারত হইতে আমাদের মোটর মেইল ভ্যান্ কারওয়ার বন্দর হইয়া মাজাড়ী পর্যন্ত ডাক নিয়া যায়। মাজাড়ী একেবারে গোয়ার দক্ষিণ সীমান্ত লাগা। আমাদের ডাক হরকরারা মাজাড়ীর সম্মুখে ভারত-গোয়া সীমান্তের মধ্যবর্তী যে শ' দুই গজের মত 'নো-ম্যানস-ল্যাণ্ড' আছে সেখানে মেইল ব্যাগগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় এবং তখন গোয়ার ডাক হরকরারা তাহা কুড়াইয়া নেয়। তাহারাও আবার তাহাদের মেইল ব্যাগ সেইভাবে ঐ একই জায়গায় ফেলিয়া দিয়া যায়; আমাদের ডাক হরকরারা তাহা কুড়াইয়া নেয়। তখন হইতে এই ব্যবস্থা গত তিন-চার বছর যাবৎ নিয়মিত নির্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু গোয়াতে জেলে বসিয়া ভারত হইতে আমাদের চিঠিপত্র আসিলে তাহা পাইতে পাইতে প্রায় সপ্তাহ তিনেকের মত দেরী হইয়া যাইত। তাহার কারণ আমাদের সেই সব চিঠি তিন দফা সেন্সরের বেড়া পার হইয়া তবে আমাদের হাতে পেঁাছাইত। গোয়াতে ঢোকার মুখে একবার সেই চিঠি ভারত সীমান্তে ভারতীয় কাস্টমস্ ও গোয়েন্দা বিভাগের সেন্সরশিপের ভিতর দিয়া আসিবে। তার পর গোয়া সীমান্তে গোয়ার পর্তুগীজ গোয়েন্দা বিভাগের সেন্সরশিপ। তাহার পরে তাহা ডাক বিভাগের হাতে যাইবে এবং কান্দোলী ডাকঘর হইয়া আগুয়াদা দুর্গে বিলি হইবে। সেখানেই সে চিঠির নিষ্কৃতি নাই;

বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া 'হুমকী' দিতেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ভারত সরকার এবিষয়ে পর্তুগীজ সরকারের বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে 'তীব্র প্রতিবাদ' জানানো এবং 'যথোপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা' অবলম্বনের 'হুমকী' দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেন নাই। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, এই ব্যাপারে ভারত সরকারের হুমকি-ধামকিকে আমরা গোয়াতে জেলে বসিয়া যে খুব সুনজরে দেখিতেছিলাম, তা নয়। আমাদের দুশ্চিন্তা ছিল এই হুমকি-ধমকির ফলে যদি করাচী হইতে গোয়ায় বিমান চলাচল বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের বহির্জগৎ হইতে সকল প্রকার সম্পর্কচ্যুত হইয়া পড়িতে হইবে। বাহিরের দুনিয়ার খবরা-খবর পাইবার একটি মাত্র জানালাই আমাদের খোলা ছিল—করাচীর পথে। সে জানালাটি বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আমরা খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারি নাই। দীর্ঘকাল যাঁহারা জেলে বা বন্দীশালায় কাটাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন বাহির হইতে চিঠিপত্র বা সংবাদ-পত্রের মারফৎ বাহিরের খবর যতটুকু পাওয়া যায় তাহার জন্য বন্দীরা কি পরিমাণে উদগ্রীব হইয়া থাকেন। গোয়ায় ঢোকার পর হইতে ছয় মাস কাল ভারতে বা সারা পৃথিবীতে কি ঘটিতেছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। খবরের কাগজ বলিয়া কোনো জিনিস চোখে দেখি নাই। আগুয়াদায় আসিয়া যদিবা সে সুযোগ কিছু মঞ্জুর হইল, এখন গোয়া-করাচী বিমান-ডাক বন্ধ হওয়ার ফলে যদি আমরা সে সুযোগ হারাই, তাহা হইলে দিন চলা আমাদের পক্ষে যে একান্ত দুর্বহ হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে আমাদের কোনো সংশয় ছিল না।

তাই সকাল-বিকালে ভিতর হইতে আমাদের ডাক পাঠানো আর বাহির হইতে আমাদের বাড়ীর ডাক পাওয়া এটা সারাদিনের মধ্যে আমাদের পক্ষে একটা বিশেষ আগ্রহের ব্যাপার ছিল। আন্দাজ নয়টার সময় গার্ড-ডিউটিতে যে সান্ত্রীদল সেদিন থাকিবে, তাহাদের কাব্ বা কর্পোরাল সেলের দরজার সম্মুখে আসিয়া হাঁক দিবে—'কুর্‌রেইয়ু! কার্তাস!' (corrieo! cartars! = ডাক! চিঠি!) সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানা লেখা ও খামে টিকিট-আঁটা সমস্ত চিঠি যাহা আমরা বাহিরে পাঠাইতে চাই, তাহার হাতে দিয়া দিতে হইবে। ক্যাম্প কমান্ডাণ্টের কাছে কোনো দরবার থাকিলে বা জেল গেটে জমা নিজস্ব টাকা হইতে কোনো জিনিসের অর্ডার দিতে হইলে তাহাও এই সঙ্গে দিতে হইবে। বাহির হইতে আমাদের জন্য যেসব ডাকের চিঠি বা কাগজপত্র তাহা পাওয়ার সময় দুইটি; হয় আমরা স্নান করিয়া সারাদিনের ব্যবহার্য জল বহিয়া নিজেদের সেলে ফিরিয়া আসার পর বেলা গোটা

আগুয়াদা হইতে সেই চিঠি পাঞ্জিমে মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে যাইবে মিলিটারি ইনটেলিজেন্স বিভাগের সেন্সরশিপের জন্য। সেখানে সেন্সরের মর্জি-মাফিক তাহা দু' দিন হইতে সাত দিন পর্যন্ত 'কুয়ার্তেল জেরাল মিলিতার'-এর দপ্তরে থাকিয়া তাহার পর ফের আগুয়াদা দুর্গে আসিয়া আমাদের সেলে সেলে বিলি হইবে। তবে আমাদের কোনো চিঠি বা কাগজপত্র ভারত হইতে না আসিয়া যদি বিদেশ হইতে করাচীর পথে আসিত, তাহা হইলে খুব বেশী দেরী হইত না। লণ্ডন বা নিউ ইয়র্কের চিঠি বা য়ুরোপ পশ্চিম য়ুরোপের চিঠি আমাদের হাতে পেঁছাইতে আমি কখনও পাঁচ হইতে সাত দিনের বেশী সময় লাগিতে দেখি নাই। তাহার একটা কারণ বিদেশ হইতে করাচীর পথে আসা চিঠিপত্র সম্পর্কে কোনো সীমান্তবর্তী বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল না; সমুদ্রপার হইতে সমস্ত চিঠিই সেই পথে আসিত। তাছাড়া পাকিস্তান ও করাচী কর্তৃপক্ষ সালাজার সরকারের বিশেষ বন্ধুস্থানীয়ের মধ্যে গণ্য বলিয়া করাচীর ডাকঘরের ছাপ থাকিলে গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন।

১০—১০॥টা হইতে ১২টার মধ্যে, আর না হয় বিকাল ৩টা হইতে ৫টা মধ্যে। বাহিরের ডাক আমাদের হাতে দিবার ভার আইনত সেদিনকার ডিউটী-সার্জেণ্টের উপর। কিন্তু কাব্ বা যে কোনো সান্ত্রীর হাতে এমন কি দুর্গ দপ্তরের বে-সামরিক পিওন বা চাকরের হাত দিয়াও কখন কখন তাহা আমাদের হাতে পেঁছিত। তখনও আবার সেইরকম হাঁক শোনা যাইত—'কুরবেইয়ু—কার্তাস!' ডাকের সঙ্গে বই বা খবরের কাগজপত্র থাকিলে—'কার্তাস! জর্নাল! লিভ্রুস!' (livro = বই)। বলাই বাহুল্য, ডাকের চিঠি বা কাগজপত্র-বইয়ের জন্য এই হাঁক্ ডাক্ আমাদের কানে ভালই লাগিত; এমন কিছু খারাপ ঠেকিত না।

যাই হোক, সকালে চিঠিপত্র বাহিরের ডাকে পাঠানোর কাজটা চুকিয়া গেলেই আমাদের তৈরী হইয়া নিতে হইত 'আগুয়-বানু'র কাজ (Agua=জল; banho=স্নান) অর্থাৎ জল আনা ও স্নান করার জন্য। আগুয়াদা দুর্গে খাওয়ার বা স্নানের জল সরবরাহের জন্য কোনো ভালো ব্যবস্থা ছিল না বা আধুনিক ধরনের কলের জলের বন্দোবস্ত ছিল না (পাঞ্জিম পুলিস কুয়ার্তেলে এবং আল্তিন্যো'-তে তাহা ছিল)। খাওয়ার ও স্নানের জলের জন্য আগুয়াদা-য় যেমন আমাদের তেমনি আমাদের পাহারাওয়ালা সৈন্যদেরও নির্ভর করিতে হইত আমাদের ব্যারাকের পিছনে যে একটি কুয়ার মত ছিল হয় তাহার উপর; আর না হয় আমাদের ইয়ার্ড-এর তিন বা চার ফার্লং দূরে দুর্গের কমাণ্ডাণ্টের কোয়ার্টার এবং সৈন্যদের থাকিবার ব্যারাকের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত একটি পাহাড়ী ঝর্নার পরিস্রুত জল জমাইয়া রাখার বাঁধানো কুণ্ডের উপর। দুর্গের অধিবাসী সৈন্যদল ও কয়েদী মিলিয়া আমাদের ৫০০—৬০০ লোকের ব্যবহার্য জলের উৎস ছিল্ মাত্র এই দুইটি। প্রথম কুয়াটিও আসলে কুয়া নয়, সেটিও একটি কুণ্ড। পাহাড়ের গা কাটিয়া খানিকটা গর্ত মতন করা ছিল; পাথর ও মাটির ভিতর দিয়া চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া তাহাতে ঝির ঝির করিয়া অল্প অল্প জল আসিয়া পড়িত। গর্তের মুখের কাছটায় কুয়ার দেওয়ালের মত কাটা পাথর ও সিমেণ্ট দিয়া একটি দেওয়ালের মত গাঁথা আছে। সেইজন্য বাহির হইতে তাহা দেখিলে সেটাকে সাধারণ একটি কুয়ার মত দেখায় এবং তাহার জল যে পাহাড়ের ভিতর দিয়া চোঁয়াইয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহা জানা না থাকিলে সমতল ভূমির অন্য যে কোন কুয়ার সঙ্গে তাহার তফাৎ বোঝা শক্ত। পঞ্চাশ-ষাট বাল্তি জল তুলিলেই ইহার জল সেদিনের মত শেষ হইয়া যাইত। আবার সারাদিনে একটু একটু করিয়া চোঁয়ানো জল আসিয়া না জমিলে সেখান হইতে কোনো জল পাওয়া যাইত না। দুর্গের লোকেদের আসলে তাই নির্ভর করিতে হইত জলের দ্বিতীয় উৎসটির উপর। এখানে জল আসিত একটি বারোমাস চালু পরিস্রুত জলের ঝর্না হইতে। আগুয়াদায় ১৬৯২ সালে পর্তুগীজরা যখন দুর্গ তৈয়ারী করা স্থির করিয়াছিল তখন তাহারা বিশেষ করিয়া এই জায়গাটি পছন্দ করে এই পরিস্রুত জলের ঝর্ণাটি দেখিয়া। বলাই বাহুল্য, সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে কোনো দুর্গ তৈরী করিতে হইলে সবার প্রথমে খাবার জল সরবরাহের যোগান কোথা হইতে পাওয়া যাইবে সেই কথা বেশী করিয়া চিন্তা করিতে হয়। সামরিক দিক দিয়া মাণ্ডভীর মুখে গোয়া বন্দরের উত্তর মোহড়ায় আগুয়াদা পাহাড়ের বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান সত্ত্বেও এখানে দুর্গ তৈরী সম্ভব হইত না, যদি এখানে পরিস্রুত জলের এই সুন্দর প্রস্রবণটি না থাকিত। প্রস্রবণটির উৎস দুর্গের গায়ে লাগা উত্তর পাহাড়ে। উৎসমুখ হইতে এক পাশে একটি নালা বা বাঁধানো বড় নলের মত করিয়া তাহাকে একেবারে দুর্গের ভিতরে সৈন্যদের ব্যারাকের কাছে সমতল জায়গায় আনিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি পাথরের নালী মুখ দিয়া সেই জলের ধারা একটি চতুষ্কোণ বাঁধানো কুণ্ডের মধ্যে আসিয়া

পড়ে। লোকে কুন্ডের সেই নল হইতে প্রয়োজনীয় জল ভরিয়া নেয়। কিন্তু বাকী জল কুন্ডের মধ্যে জমা থাকে না। তাহা জমা রাখা সম্ভব নয়; তাহার কারণ এই প্রস্রবণ হইতে বাঁধানো নালা দিয়া কুন্ডে চব্বিশ ঘণ্টাই বেশ পুষ্ট ধারায় জল পড়িতে থাকে। সেইজন্য কুন্ডের তলার দিকে আবার একটি ছোট নলের ভিতর দিয়া কুন্ডের জল একটা বড় ঢালু ও গভীর নর্দমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। সমুদ্র সেখান হইতে মাত্র ১০-১৫ গজ দূরে। কখনো কখনো কুন্ডে বেশী জল জমিলে কুন্ডের নীচু দেওয়াল ছাপাইয়া, জল সেই নীচের নর্দমায় আসিয়া পড়ে। এইভাবে দুর্গের অধিবাসীদের পানীয় জলের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া প্রস্রবণের বাড়্‌তি জল নর্দনার ভিতর দিয়া সমুদ্রে চলিয়া যায়।

কিন্তু এ ব্যবস্থা ছাড়াও এই প্রস্রবণের জল একটু বেশী পরিমাণে জমাইয়া রাখার জন্য কুন্ড হইতে কিছু দূরে একটি বিরাটাকারের কুয়া বা ইঁদারা তৈরী করিয়া রাখা হইয়াছে। এই কুয়া বা ইঁদারাটিও প্রথমোক্ত কুয়ার মতই পাহাড়ের গায়ে খোঁড়া গভীর একটি বড়-রকমের গর্ত ছাড়া আর কিছু নয়। খালি ইহার আকার ও আয়তন পূর্বের কুয়াটির চেয়ে পাঁচ ছয় গুণ বড়। সেই গর্তের চারিদিকে ভিতর হইতে লাল ল্যাটেরাইট পাথরে গাঁথা দেওয়াল তুলিয়া ক্রমে ইঁদারার প্রাচীরকে সমতল ভূমি হইতে প্রায় হাত আট-নয় উপরে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। উপরে ইঁদারার মুখের কাছে ব্যাস চওড়ায় প্রায় দশ হাতের মত হইবে। নীচে হইতে দেওয়ালের গায়ে দশ বারো ধাপ পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া তবে ইঁদারার মুখের কাছে উঠিতে হয়। ইঁদারার মুখের কাছটায় প্রাচীরের এক ধার হইতে আরেক ধার পর্যন্ত বিরাট মোটা মোটা কাঠের বীম্‌ বা তরী পাতা আছে। তাহার উপর পা রাখিয়া দড়ি বাল্‌তি দিয়া জল তুলিতে হয়। ইঁদারার উপর হইতে নীচের দিকের অন্ধকারে ঘন কালো জলের দিকে তাকাইলে ভয় হয়। জলের উপরে ইঁদারার ভিতরের দেওয়ালে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁকড়া ফার্ন এবং শেওলা জমিয়া তাহার গাম্ভীর্য এবং প্রাচীন চেহারাকে আরও গম্ভীর এবং প্রাচীন করিয়া তুলিয়াছে। এই ইঁদারার জলও আসে পূর্বোক্ত প্রস্রবণ বা ঝর্না হইতেই। কিন্তু ঝরনার বেশীর ভাগ জল বাহিরের নালীপথ দিয়া পূর্ব-বর্ণিত ছোট কুন্ডটির ভিতর দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে। বাকী জলকে পাহড়ের পাথরের ভিতর দিয়া চোঁয়াইয়া এই বড় ইঁদারায় আনিয়া জমা করা হয়। তাহাতে সম্বৎসরের মত জলের একটা নিশ্চিত রিজার্ভোয়ার দুর্গবাসীদের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়; আর নালীপথে রোজকার টাট্‌কা জলও পাওয়া যায়। বঝনার জলের এই নালীপথ ও তাহার চারিকোণা কুন্ডটি বাহিরে খোলা জায়গায় অবস্থিত। তার চারি পাশে বাগান; সম্মুখে দুর্গের পুরাতন অস্ত্রাগার বা 'আর্মারী'। কিন্তু ইঁদারাটির চারিদিকে উঁচু দেওয়াল ঘেরা; উপরে পুরাতন টালীর উঁচু ছাদ দেওয়া। সেই দেওয়াল ঘেরা ইঁদারা-বাড়ির ভিতরে, দরজা দিয়া ঢুকিয়াই যে জিনিসটি সবার আগে চোখে পড়ে, তাহা হইল ইঁদারার প্রাচীরের সঙ্গে বিরাট মোটা দুটি থামের সঙ্গে ধুরী লাগানো বিরাট, চওড়া আকারের ভারী এবং উঁচু একটি কাঠের চাকা। এই চাকার ব্যাস ইঁদারার মুখের কাছে ব্যাসের চেয়ে বড়। এখন অবশ্য ইহা আর কোনো কাজে লাগে না। শুনিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইহা নির্মিত হয়। তখন এই চাকা ঘুরাইয়া ইহার সাহয্যে ইঁদারা হইতে দুর্গবাসীদের ব্যবহারের জন্য জল তোলা হইত।

পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ আগুয়াদা দুর্গের অন্যান্য দর্শনীয় জিনিসের সঙ্গে—অর্থাৎ প্রাচীন অস্ত্রাগার, পুরাতন দুর্গপ্রাকার বা সেই প্রকারে সাজানো পুরাতন ভারী কামানের সারির সঙ্গে সঙ্গে জল তোলার এই চাকাটিকেও দুর্গের প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে

যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া আল্‌কাত্‌রার পোঁচ খাইয়া খাইয়া এই ভীষণ-দর্শন কাঠের চাকাটি আজও টিকিয়া আছে। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ এই চাকার ইতিহাস আজকাল কাহাকেও বলিতে বা জানাইতে চান না। এই চাকার ইতিহাসের সহিত গোয়ার হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় নির্যাতন বা 'ইন্‌কুইজিশ্যনে'-র ইতিহাস-জড়িত। এই অতিকায় ভারী চাকাটি ঘুরাইয়া জল তোলার কাজে নিযুক্ত করা হইত ধর্মান্ধ জেসুইট পাদ্রীদের নির্দেশে দণ্ডিত অবিশ্বাসী অখৃষ্টান 'infiel' বা 'infidel'দের। তাহাদের জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়া এই কাজে নিযুক্ত করা হইত; ধর্ম পরিবর্তনে স্বীকৃত হইলে অব্যাহতি দেওয়া হইত। অবশ্য এ ইতিহাস বহুদিনগত খৃষ্টীয় মধ্যযুগের ইতিহাস। এ যুগে পর্তুগীজ জাতিকে বা তাহাদের রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় ধর্মকে খালি এই ইতিহাস দিয়া বিচার করিলে বা বুঝিতে চাহিলে ভুল করা হইবে। কিন্তু আগুয়াদা দুর্গের অন্যান্য প্রাচীন দর্শনীয় জিনিসের সঙ্গে তখনকার ধর্মীয় নির্যাতনের এই মধ্যযুগীয় যান্ত্রিক প্রতীকটিকে আজও যেভাবে যত্ন করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা হইতে সালাজারী স্বেচ্ছা-শাসনের মানসিকতা কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

বন্দীদের সকলকে বেশীর ভাগ সময় স্নানের ও খাওয়ার জলের জন্য এইখানে আসিতে হইত। আমাদের এবং জগন্নাথ রাওদের দুটি ঘর ভিন্ন বন্দী-ব্যারাকের অন্য সমস্ত ঘরের একপাশে একটি আলাদা স্নানের জায়গা ছিল। তাহাদের তাই বাহিরের ইঁদারা বা কুণ্ড হইতে রোজ মাথায় করিয়া দুই তিন টিন জল নিয়া আসিয়া সেই স্নানের জায়গায় পালা করিয়া স্নান করিতে হইত। কিন্তু আমাদের ঘরে কোনো আলাদা স্নানের জায়গা না থাকাতে আমরা রোজই, হয় আমাদের বারাকের পিছনের ছোট কুয়ায়, আর না হয় বাহিরের ইঁদারা ও ঝর্না জলের কুণ্ডের কাছে গিয়া স্নান করিতাম। আমাদের খাওয়ার জলও টিনের ক্যানেস্তারায় করিয়া সেখান হইতে আনিতে হইত। আমাদের নিজেদের সেলে স্নানের কোনো আলাদা জায়গা না থাকায় এক হিসাবে আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। অন্যান্য সেলে স্নানের জায়গা বলিতে যে একটি খুপ্‌রী ঘর থাকিত তাহার ভিতরেই পায়খানা। ইংরেজ মহিলা সাংবাদিক আগুয়াদার বন্দীদের সেলে গেলে এই জায়গার বর্ণনা করিতে গিয়া যে 'হোল্‌' বা 'গর্ত' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, ("a hole that served both for bath and toilet") পাঠকদের অনেকের তাহা মনে থাকিতে পারে। আমাদের ঘরে 'টয়লেট'(!) বা 'বাথরুম' দুয়েরই কোনো বালাই ছিল না। আমাদের পায়খানা ঘর ছিল সেলের বাহিরে; আর স্নানের জায়গা উপরে বর্ণিত ঝর্নাতলা। আফোঁসো কস্তা অবশ্য আমাদের স্নানের জন্য প্রথমে আধ ঘণ্টা সময় ধার্য করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সময় বাড়িতে বাড়িতে ১ ঘণ্টা—১॥ ঘণ্টা—২ ঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়ায়। এই সময়-বৃদ্ধি অবশ্য আমাদের সৈন্য ও প্রহরীদলের সঙ্গে ভাব জমাইয়া বে-সরকারী ভাবে 'ম্যানেজ' করিয়া নিতে হইত। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে আমরা যেমন দুর্গের পুরাতন কয়েদী বলিয়া সৈন্যদের পরিচিত হইয়া উঠিলাম, আমরা আমাদের প্রয়োজন ও দরকার মত যতক্ষণ ঝর্না-তলা বা ইঁদারা ঘরে থাকিতে চাহিতাম থাকিতে পাইতাম। আমাদের সঙ্গে রাইফেলধারী একজন সান্ত্রী থাকিত বটে। কিন্তু আমরা ধীরে-সুস্থে আরাম করিয়া স্নান ও কাপড় কাচা শেষ করিয়া টিনে সমস্ত দিনের খাবার জল ভর্তি করিয়া তাহাকে ডাক না দেওয়া পর্যন্ত, সাধারণত সে আমাদের ঘরে ফেরার জন্য তাগিদ দিত না।

সারাদিনের মধ্যে এই স্নানের ও জল আনার সময়টি আমাদের পক্ষে সত্যই খুবই উপভোগ্য ও আনন্দের জিনিস ছিল। তাহার প্রথম কারণ স্নানের জায়গাটি খোলা জায়গায় বাগানের ভিতর। নল দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝর্নার জল আসিয়া পড়িতেছে। আর আমরা ইচ্ছা মতন জগে করিয়া কিংবা টিনের ক্যানেস্তারায় করিয়া যতবার খুশী সেই জল মাথায় ঢালিতেছি, সাবান মাখিতেছি, গা মাজিতেছি, যে কোনো বন্দিশালাতেই জেল-জীবনে এটা দুর্লভ সুযোগ। দ্বিতীয়ত, আমাদের সেল হইতে স্নানের জায়গা প্রায় আধ মাইলের মত দূর হইলেও, আমাদেরকে সমুদ্রের ধারে ধারে দুর্গের ব্যারাকগুলির সামনেকার দুর্গের খোলা রাস্তা দিয়া সেখানে যাইতে হইত। দিনের মধ্যে একবার এভাবে সমুদ্রের ধারে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিতে পারা বা হাত পা ছড়াইয়া আসা যাওয়া করিতে পারাটাও কম কথা নয়। স্নান উপলক্ষে আমরা যতক্ষণ বাহিরে থাকিতে পারিব ততক্ষণই সেলের বাহিরে উন্মুক্ত অকাশের তলায় থাকা যাইবে। যতটা পারা যায় চোখ ভরিয়া বাহিরটা দেখিয়া নেওয়া যাইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিছুটা অসুবিধায় মধ্যে ছিল, দু' হাতে দুটি কেরোসিনের টিনের ক্যানেস্তারায় জল ভর্তি করিয়া ঘরে নিয়া আসিতে হইবে—সারাদিনের পানীয় জল রান্নার জল বা জলের অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজন তাহা এই স্টক হইতেই মিটাইতে হয়। অন্ততপক্ষে পুরা চার টিন জল না হইলে আমাদের কুলাইত না। এই জল আনার কাজটা কিছুটা পরিশ্রমসাধ্য এবং দুরূহ ছিল। ঈশ্বরভাই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন এবং পর্তুগীজ পুলিস শিরুভাউয়ের পা ভাঙিগয়া দিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে টিনে করিয়া জলের ভার বহিয়া আনা খুবই কষ্টকর হইত। পারতপক্ষে আমরা তাঁহাদের জল বহিতে দিতাম না—এ কাজ করিতাম নানা সাহেব এবং আমি দুজনে মিলিয়া। কিন্তু আমাদের পক্ষেও ইহা খুব সহজ ছিল না।

স্নানের পালা শেষ করিয়া ঘরে আসিতে আসিতেই বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে আমাদের ভাত তরকারী আসিয়া যাইত। কোনো কোনো দিন আমরা নিজেরাও শখ করিয়া স্টোভে নিজেদের জন্য রান্না করিয়া নিতাম। কিন্তু মোটের উপর দৈনন্দিন এক-আধ ঘণ্টা ভিন্ন ইহাতে আমাদের বেশী সময় যাইত না। খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তারপর ঘণ্টা দুই তিন আমরা পড়াশোনা বা লেখার কাজে কাটাইতে পারিতাম। বিকালে সপ্তাহে পাঁচদিন প্রত্যেক সেলের লোক আমরা আধ ঘণ্টা করিয়া মিলিটারী পাহারায় আমাদের ব্যারাকের সম্মুখের উঠানে বেড়াইতে পারিতাম। সপ্তাহে দুদিন—বৃহস্পতিবার ও রবিবার—গোয়াবাসী বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের বা 'ইণ্টারভিউ'-র দিন। সেই দুইদিন আমাদের গার্ড ডিউটির সৈন্যেরা বন্দীদের পালা করিয়া একের পর এক আমাদের ইয়ার্ডের ভিতর দেউড়ীতে 'ইণ্টারভিউ'-র জন্য সেল হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া ও ফিরাইয়া আসার কাজে ব্যস্ত থাকিত বলিয়া, আমরা বাহিরে বেড়ানর জন্য আসিতে পারিতাম না। তাছাড়া, সকল সেলের লোককে এক সঙ্গে উঠানে নামিতে দেওয়া হইত না। এক এক সেলের লোক আলাদা আলাদাভাবে ইয়ার্ডে বেড়ানোর জন্য আসিবে। বেড়ানোর সময় কেহ কাহারো সঙ্গে কথা বলিতে পাইবে না—খালি ঘুরিয়া বেড়াইবে বা পায়চারি করিতে পাইবে।

বলা বাহুল্য, এসব বিধি-নিষেধের কড়াক্কড়ি বেশীদিন বহাল ছিল না। অবশ্য তাহার একটা বড় কারণ আমাদের পাহারাওয়ালা পর্তুগীজ সৈন্যদের নিরীহ-নির্বিবাদী স্বভাব। 'আল্‌তিন্যো' জেলের কাহিনী যাঁদের স্মরণ আছে তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন ইহার

অর্থ কি। আমি আমার উনিশ মাসের পর্তুগীজ সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা হইতে একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, আমাদের রাজনৈতিক শত্রু বা দেশের শত্রু হিসাবে বিষনজরে দেখিত এমন সৈনিক দু' একজন ভিন্ন বেশী দেখি নাই। তাছাড়া পর্তুগীজরা জাতি হিসাবে খুব ঢিলাঢালা ইন্‌ফর্মাল স্বভাবের লোক। কোনো বিষয়ে নিয়ম-কানুনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি করা তাহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কাজে কাজেই কাগজপত্রে বেড়ান'র সময় বন্দীদের একে অন্যের সঙ্গে কথা না বলা, এক সেলের বন্দীদের অপর সেলের বন্দীদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলার কোনো সুযোগ না দেওয়া এসব সম্পর্কে আফোঁসো কস্তা পর্তুগীজ মিলিটারী প্রিজন্‌ কোড্‌ দেখিয়া নিয়ম-কানুন অনেক করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু কাজে সব সময় ততটা কড়াকড়ি প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়া উঠিত না। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিতে ফিরিতে প্রায় ৭টা বা ৭॥টার মধ্যে আমাদের রাতের খাবার আসিয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় আর একবার অল্পক্ষণের জন্য ঘরের জমা আবর্জনা, ময়লা জল এসব সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য কিংবা দরকার হইলে পায়খানা যাওয়ার জন্য আমাদের সেল খুলিয়া দেওয়া হইত। তার পর সারা রাতের মত সেল বন্ধ হইয়া যাইবে। রাত্রি নয়টায় 'লাইট্‌স্‌ অফ্‌'-এর বিউগ্‌ল বাজিলে, আমাদের আলো নিভাইয়া ঘুমইয়া পড়ার কথা। কিন্তু আফোঁসো কস্তা ও তাহার সহকারী কাব্র'লের আমলের দু' মাস ভিন্ন এ নিয়মেরও ব্যতিক্রমটাই সাধারণ নিয়ম ছিল।

মোটের উপর এই ছিল আগুয়াদার জেল-জীবনে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার রুটিন। কিন্তু খালি এই রুটিন দিয়া আগুয়াদা দুর্গের সাধারণ রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনযাত্রাকে বিচার করিলে ভুল হইবে। আগুয়াদা দুর্গে আসার পর আমাদের কয়জনকে সামান্য যা কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অন্য কোনো রাজনৈতিক বন্দীর বেলায় প্রযোজ্য ছিল না। আমরা যখন আগুয়াদায় যাই তাহার মাস দুয়েক পূর্ব হইতে আরো প্রায় ২০।২২ জন ভারতীয় সত্যাগ্রহী বন্দী সেখানে ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশীয় বহু শিক্ষিত গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীও সেখানে ছিলেন—অ্যাডভোকেট মুলগাঁওকর, অ্যাডভোকেট গোপালরাও কামাথ, ডাঃ জোসে মার্তিন্‌স্‌, মোটালার্জিস্ট এঞ্জিনিয়ার শিবানন্দ গাইটোণ্ডে, আলভায়ো, পেরেইরা, আন্তোনিও আলবের্তে এবং আরও অনেকে। আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে তেনেন্ত আফোঁসো কস্তা খুব ভদ্র হইলেও এইসব ভারতীয় ও গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের উপর তিনিও কম নির্যাতন বা অত্যাচার চালান নাই। তবু পাঞ্জিমের পুলিস কুয়ার্তেল এবং 'আল্‌তিন্যো' জেলের নরক যন্ত্রণার তুলনায় আগুয়াদা দুর্গ অনেক বিষয়েই বন্দীদের পক্ষে ভাল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পর্তুগালের সাধারণ মানুষ : আগুয়াদার অভিজ্ঞতা

আগুয়াদায় আসিয়া ঘটনাচক্রে আমাদের ভাগ্যে একটি অপ্রত্যাশিত রকমের সুবিধা ঘটিয়া গিয়াছিল। আগুয়াদা দুর্গের বন্দীশালার পরিচালনার ভার যে গোয়ার পর্তুগীজ মিলিটারী কর্তৃপক্ষের উপরেই ছিল তাহা বলিয়াছি। আগুয়াদা দুর্গের গ্যারিসন কম্যান্ডান্ট দুর্গের বন্দীশালারও কমান্ডান্ট। দুর্গের বা বন্দীশালার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার উপর পুলিশের সরাসরি কোন কর্তৃত্ব ছিল না; সেরূপ কর্তৃত্ব করিতে চাহিলে সামরিক কর্তৃপক্ষ সেটা বরদাস্ত করিতেন না। ইহার ফলে এখানে আসিয়া আমরা সালাজারের 'পিদে' বা মন্তেইরো 'মিন্তী' (দো-আঁসলা ফিরিঙ্গী গোয়ানীজ) গোয়েন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, কিছুটা খোলাখুলিভাবে সাধারণ পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে মেলামেশার ও গল্প-গুজব করার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং সেই সূত্রে পর্তুগালের সাধারণ মানুষদের চিন্তাধারা ও মানসিকতা বোঝারও যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছিলাম। পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে আমরা প্রথম সংস্পর্শে আসি 'আল্তিন্যো' জেলে। 'আল্তিন্যো'তে রাজনৈতিক বন্দীদের পাহারা দেওয়ার কাজে সৈনিকদের নিযুক্ত করা হইলেও সেখানকার ষোলো আনা কর্তৃত্ব ছিল পুলিশের হাতে। সেখানে আমাদের কি ভাবে পুলিশের নজর এড়াইয়া খিড়কীর জানালা দিয়া লুকাইয়া-চুরাইয়া সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে হইত সে কথা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। আগুয়াদাতে আর যাহাই হোক পুলিশের ভয় ছিল না। শুনিতে কিছুটা আশ্চর্য মনে হইলেও, প্রধানত এই কারণেই আমরা আগুয়াদা জেলের ভিতরে চলাফেরার এবং পর্তুগীজ মিলিটারী অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশার খানিকটা স্বাধীনতা পাইয়াছিলাম। এই সমস্ত পর্তুগীজ সৈনিকরা এবং নীচের দিকে হাবিলদার-জমাদার গ্রেডের কাবু, কর্পোরাল বা সার্জেণ্ট হইতে উপরের দিকে কমিশন্ড গ্রেডের তেনেন্ত (লেফ্টেনান্ট), কাপ্তেন, মেজর প্রভৃতি বিভিন্ন ছোট বড় র‍্যাঙ্কের অফিসারেরাই আমাদের সামনে পর্তুগালের বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের প্রতিভূ হিসাবে উপস্থিত ছিল।

পর্তুগালে যে বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের আইন বা ন্যাশনাল সার্ভিস কন্স্কৃপ্-শনের নিয়ম প্রচলিত আছে সে কথা উপরে একবার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। গোয়াতে যে সব পর্তুগীজ সৈনিকদের আনা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই সেই আইনের বলে জোর করিয়া ধরিয়া-বাঁধিয়া আনা সৈন্য। পর্তুগালে ২০ বৎসর হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ নাগরিককে সামরিক শিক্ষা নিতে হয় ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে তাহাদের প্রত্যেককে কমপক্ষে দুই বৎসর করিয়া সৈনিকের কাজ করিতে হয়। বলা বাহুল্য পর্তুগালের মত ছোট দেশে দেশের সমস্ত অধিবাসীকে এইভাবে সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া যুদ্ধের কাজে লাগানোর মত সামরিক প্রয়োজন সচরাচর দেখা দেয় না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে কাজে সকলকেই ডাকা যাইতে পারে, আইনত পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সে ক্ষমতা সকল সময়েই আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মালিক হইলেও পর্তুগাল যে সারা ইউরোপের ভিতর ক্ষুদ্রতম ও দুর্বলতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, তাহা সকলেই জানে।

শিক্ষাদীক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়াও পর্তুগাল নিতান্ত অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশ। কোনোমতে লিখিতে পড়িতে পারে বা নাম সই করিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা সর্বশেষ সেন্সাস অনুযায়ী শতকরা ৫৯-৬০ জনের বেশী নয়। কৃষি, অলিভ বা জলপাইয়ের চাষ, কর্ক বাগিচার চাষ এবং মাছ ধরা—এইসব হইল দেশের বেশীর ভাগ লোকের জীবিকার উপায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে পর্তুগীজ জলদস্যুতার কাহিনীর সূত্র ধরিয়া পর্তুগীজ নৃশংসতা বা বর্বরতা সম্বন্ধে আমাদের দেশে লোকের মনে অন্য রকমের ধারণা প্রচলিত থাকিলেও জাতি হিসাবে পর্তুগীজরা নিতান্ত শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ জাতি। ১৬৪৪ সালে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধের পর বিগত দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া তাহারা কোনো বড় রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ করে নাই বলিলেও চলে। আধুনিক যুগে পর্তুগাল ১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল বটে। কিন্তু জার্মাণীর হাতে একবার ঠেঙগানি খাওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত পর্তুগাল অন্য কোনো যুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় নামার মত হঠকারিতা করে নাই।*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমদিকে ডাঃ সালাজারের নেতৃত্বে পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি প্রথমদিকে যে নাৎসী জার্মাণী ও ফ্যাসিষ্ট ইতালীর দিকেই ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কিন্তু তাহা হইলেও সালাজার প্রত্যক্ষভাবে পর্তুগালকে জার্মাণী, ইতালী ও জাপানের সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইতে দেন নাই। বৃটেন ও আমেরিকার কথা ভাবিয়া তিনি মোটামুটিভাবে 'নিরপেক্ষ' থাকাই স্থির করেন। ১৯৪১ সালের পর আমেরিকার জাপান ও জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার পর মিত্রপক্ষের জয়লাভ যখন ক্রমে ক্রমে সুনিশ্চিত হইয়া দেখা দিল, তখন তিনি পর্তুগালের 'নিরপেক্ষতা' একেবারে সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ না করিয়াও বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে কিছু কিছু চুক্তি সম্পন্ন করেন এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরে আজোর্স দ্বীপপুঞ্জে এবং পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত অন্য কয়েকটি জায়গায় মিত্রপক্ষের উড়ো-জাহাজ ও নৌ-যুদ্ধের ঘাঁটি তৈয়ারি করার সুবিধা দেন। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর্তুগালের কোনোরকম প্রত্যক্ষ সামরিক ভূমিকা ছিল না।

---

* প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত পর্তুগাল সরাসরি ভাবে মিত্রপক্ষ বা জার্মানী কোনো পক্ষে যোগ দেয় নাই। জার্মানীই বরং 'ভুল' করিয়া (জার্মান গভর্নমেণ্ট সেই রকমের কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন) পশ্চিম আফ্রিকার আংগোলা অঞ্চলে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের উপর চড়াও হয়। পর্তুগাল তখন তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কিছু করে নাই। তবে মোটামুটি ভাবে পর্তুগালের রাষ্ট্রনায়কদের সহানুভূতি সে সময়ে মিত্রপক্ষের অনুকূলেই ছিল, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই যে পর্তুগাল শেষ পর্যন্ত মিত্র-পক্ষে যোগদান করে তা নয়। তাহার চেয়ে বড় কারণ ছিল মিত্রপক্ষে যুদ্ধে নামিলে গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকার নিকট হইতে মোটা রকম অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে এই প্রত্যাশা। পর্তুগালে তখন সবে মাত্র পাঁচ ছয় বছর হইল কিছুটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। দেশের ভিতর আর্থিক ও রাজনৈতিক সকল দিক দিয়াই তখন চরম বিশৃংখলার অবস্থা চলিতেছিল। সেই অবস্থার ভিতরেই পর্তুগাল যুদ্ধে যোগ দিয়া ফ্রান্সে লীজ্ নদীর সীমান্তে প্রচণ্ড উৎসাহের চোটে প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য আনিয়া ফেলে। জার্মানী যুদ্ধের পশ্চিম সীমান্তে সে সময় কিছু কাল ধরিয়া চুপচাপ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় সুনিশ্চিত জানিয়াও ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানী যখন আবার পশ্চিম সীমান্তে সম্মুখ অভিযান আরম্ভ করে, পর্তুগীজ বাহিনীর দুর্ভাগ্যবশত জার্মানদের সো

অর্থাৎ গোয়া লইয়া ভারতের সঙ্গে গন্ডগোল বাধিয়া ওঠার আগে পর্যন্ত পর্তুগালে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির আইন কাজে লাগাইয়া দেশের সাধারণ নাগরিকদের যুদ্ধের কাজে লাগানোর সেরকম কোনো জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। ১৯৫৪ সালে যখন ভারত প্রবাসী গোয়াবাসীদের সত্যাগ্রহ অভিযান শুরু হয়, বিশেষ করিয়া দাদ্রা ও নগর হাভেলীতে গণ-অভ্যুত্থানের পর এই দুইটি পর্তুগীজ ছিটমহল হইতে যখন পর্তুগীজ শাসন উচ্ছেদ হয়, তখন ডাঃ সালাজার 'পর্তুগীজ সাম্রাজ্য বিপন্ন' এই জিগীর তোলেন এবং 'সাম্রাজ্য রক্ষার পবিত্র সংগ্রামে' যোগ দেওয়ার জন্য নাটকীয়ভাবে দেশের যুবশক্তিকে আহ্বান জানান। ভারতের দিক হইতে জোর করিয়া পর্তুগালের হাত হইতে গোয়া, দমন ও দিউ কাড়িয়া নেওয়ার ষড়যন্ত্র হইতেছে এবং যে কোনো মুহূর্তে ভারত হয়ত গোয়া দখল করার উদ্দেশ্যে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিবে এই যুক্তি দেখাইয়া পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্ট পর্তুগালে বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের আইন প্রবর্তন করেন। ১৯৫৪ সালের শেষদিক হইতে গোয়া, দমন ও দিউতে দলে দলে যত পর্তুগীজ সৈন্য আনিয়া জমা করা হয়, তাহাদের বেশীর ভাগই এই বাধ্যতামূলক কনস্কৃপ্শনের আইনের বলে রিক্রুট করিয়া আনা সৈনিক। ইহারা বেশীর ভাগই নিরক্ষর বা অর্ধ-নিরক্ষর চাষী, অলিভ বাগিচা বা কর্ক বাগিচার মজুর, কিম্বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোক—সাধারণ গ্রাম্য গরীব লোক, পেশাদার সৈনিক নয়। দেশের আইন অনুযায়ী দুই বছরের জন্য নিজেদের কাজকর্ম বাড়ীঘর ফেলিয়া অল্প বেতনে গোয়া রক্ষার সংগ্রামে সৈনিকের কাজ করিতে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দু'একজন মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবক যে একেবারে থাকিত না তা নয়। কেহ বা দোকানদার, কেহ বা ছুতার-মিস্ত্রী কিম্বা মদের ভাটি বা চোলাইখানার শ্রমিক (পর্তুগালের আঙ্গুরের চাষ ও মদের ব্যবসাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে), কল-কারখানার মিস্ত্রী মেকানিক ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ছিল চাষী।

অভিযানের অন্যতম আক্রমণ-মুখ ছিল লীজ্ সীমান্তেই। পর্তুগালের ইতিহাসকার মার্কিন অধ্যাপক নোওয়েল পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে লীজ্ নদীর পারে এই মারাত্মক জার্মান অভিযানের ফলাফল নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:

"Portuguese troops began to arrive in France at the beginning of 1917, and by July, 40,000....had been sent....These men seem to have had no adequate training and above all no psychological preparation for what they would face. The majority felt no personal interest in the war in which they had been sent to fight.. ..Therefore when the Germans suddenly struck their part of the allied line at the Lys river on April 9, 1918, the result was a complete rout."

—History of Portugal; Charles E. Nowell; (P. 228)

এক কথায় জার্মানদের সেই মারমুখী অভিযানের সামনে কয়েক ঘণ্টার ভিতরে লীজ্ সীমান্তে পর্তুগীজ বাহিনী তথা মিত্রপক্ষের যুদ্ধব্যূহ একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, এবং শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষের অন্যান্য ফ্রণ্টের সেনাবাহিনীর প্রাণপণ চেষ্টায় লীজ্ নদীর পারে জার্মান অগ্রগতি সেবারকার মত কোনোমতে ঠেকানো সম্ভব হয়। নোওয়েল লিখিতেছেন: "পর্তুগীজরা ইহার

গোয়া সম্পর্কে এইসব শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেরই কোনো মাথাব্যথা ছিল না, গোয়াতে থাকিতে তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না। কিন্তু সরকারী মিলিটারী সার্ভিসে নাম লেখানোর হুকুম জারী হইয়াছে। এখন মিলিটারীতে কাজ করার দায় এড়াইতে চাহিলে বিচারে সাজা হইয়া জেল হইবে, সেই ভয়ে তাহারা বাধ্য হইয়া গোয়ায় আসিয়াছে। অবশ্য দু' একজন যে ইহার ব্যতিক্রম ছিল না বা ইহাদের মধ্যে সাধারণভাবে পর্তুগীজ জাতীয়তা-বাদের কোনো প্রভাব কাজ করিত না তাহা নয়। পর্তুগালের শক্তি ভারতের চেয়ে অনেক বেশী, নেহরু বেশী বাড়াবাড়ি বা ট্যাঁ-ফোঁ করিলে সালাজার তাঁহাকে মারিয়া ঢিট্ করিয়া দিবেন এসব কথাও কেহ কেহ বলিত। কিন্তু মোটের উপর, ইহাদের বেশীর ভাগই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত সাধারণ মানুষ। মানিকোমের 'আল্তিন্যো' জেলে থাকার সময় এই সব পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে গোপনে আলাপ-সালাপ করার যতটুকু সুযোগ-সুবিধা আমরা পাইয়াছিলাম এবং সেখানকার ভয়াবহ পরিবেশের ভিতরে পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাদের নিকট হইতে যেরূপ অপ্রত্যাশিত ভালো ব্যবহার ও নানারকমের সাহায্য পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে আমার মনে সুস্পষ্ট ধারণা যে, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পর্তুগীজ পুলিসের নৃশংসতা বা 'পিদে'র অত্যাচার দিয়া গোটা পর্তুগীজ জাতিকে বিচার করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। 'পিদে'র অলিভেইরা কিম্বা ভাগ্যান্বেষী গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মন্তেইরো পর্তুগীজ জাতীয় মানসিকতার প্রতিভু নয়। সকল দিক দিয়া তাহার সত্যকার প্রতিভূ পর্তুগালের গ্রাম জনপদের এইসব সাধারণ মানুষ, ডাঃ সালাজারের গভর্নমেণ্ট যাঁহাদের কনস্কৃপশন আইনের সুযোগে সস্তায় ধরিয়া-বাঁধিয়া সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য গোয়ায় লড়িতে পাঠাইয়াছে। 'আল্তিন্যো'-তে থাকিতেই মনে একটা আগ্রহ জাগিয়াছিল যদি কোনো সময় সুযোগ পাই তো পর্তুগাল ও পর্তুগীজ জাতির সাধারণ লোকেদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে হইবে। আগুয়াদায় আংশিকভাবে সে সুযোগ ঘটিয়াছিল।

পর এই যুদ্ধে সকলের চোখে পড়ার মত কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই।" মিত্রপক্ষও পর্তুগীজদের সামরিক কেরামতি দেখিয়া তাহাদের উপর অন্য কোন ফ্রন্ট রক্ষার দায়িত্ব দিতে আর ভরসা পান নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করার ফলে পর্তুগাল এই সময় বৃটেনের কাছ হইতে ঋণ হিসাবে ও অন্যান্য ভাবে যে পরিমাণ নগদ অর্থ সাহায্য পায় তাহা দিয়া পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের পক্ষে তখনকার মত নিজেদের আর্থিক সংকটের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

এখানে এ ইতিহাস উল্লেখ করার প্রয়োজন এই জন্য করিতেছি যে এই সব কথা ভালো করিয়া জানা না থাকিলে পর্তুগীজদের সম্পর্কে আমাদের মনে খুবই ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে। যুদ্ধ-প্রবণতা কোনদিনই পর্তুগীজ জাতীয় চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। বরং তাহার বিপরীতটাই সত্য। প্রকৃতপক্ষে এ যুগের পর্তুগীজরা আমাদের মতই নিতান্ত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় জাতি। যে যুগে পর্তুগীজরা 'জলদস্যু' হিসাবে ভারত মহাসাগরের উপকূলে দেখা দেয় তখন য়ুরোপের কোন জাতিই বা 'জলদস্যু'তা করে নাই? স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, বৃটিশ সকলেই পালা করিয়া 'জলদস্যু'তা করে। ভুলিলে চলিবে না, এই য়ুরোপীয় 'জলদস্যুরা'ই অসীম সাহসে অজানা মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া পশ্চিমে আটলাণ্টিক, পূবে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আধুনিক মানুষের জন্য সারা পৃথিবী জোড়া বিশ্বজগৎ আবিষ্কার করে।

আগুয়াদা আসিয়াই দু' চার দিনের ভিতরেই বুঝিতে পারি পুলিস এবং গোয়েন্দা 'পিদে' বাহিনীকে পর্তুগীজ সামরিক বিভাগের বড় ছোট সকলেই খুব ঈর্ষা ও ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া 'পিদে'-কে। সাধারণ সৈন্যদের তো কথাই নাই, মিলিটারী অফিসারেরাও 'পিদে'র লোকদের সহ্য করিতে পারে না এবং সুযোগ পাইলেই জানাইয়া দিতে ছাড়ে না যে, তাহারা 'পিদে'র নীচে নয়। অথচ 'পিদে'কে মনে মনে ভয় করে না এমন মিলিটারী অফিসারও বড় একটি দেখি নাই। আগুয়াদা জেলে আমরা আসার পর ফাদার কারিনো যখন আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখা করিতে আসেন, তখন পুলিস হেড কোয়ার্টার হইতে তাঁহার সঙ্গে আমাদের ইণ্টারভিউ-র সময় উপস্থিত থাকার জন্য একজন গোয়ানীজ ক্রিশ্চয়ান গোয়েন্দাকে পাঠানো হয়। ইহার আগে ফাদার কারিনো যখন 'আল্‌তিন্যো' জেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, তখন কোনো গোয়েন্দা বা পুলিস অফিসার সম্মুখে হাজির থাকিত না। আফোঁসো কস্তা ইহাতে 'অপমানিত' বোধ করেন— মিলিটারী দুর্গের বন্দীদের সঙ্গে বাহিরের লোকের সাক্ষাৎকারের সময় 'অসামরিক' পুলিসী-গোয়েন্দা, কেন থাকিবে?' ইহার অল্পদিন বাদেই নানা সাহেব গোরের পত্নী শ্রীমতী গোরে ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ কালীচরণ চৌধুরী আমাদের সঙ্গে গোয়াতে আগুয়াদায় আসিয়া দেখা করার অনুমতি পান। তখনও এই গোয়েন্দাটিই 'ইণ্টারভিউ ওয়াচার' হিসাবে কাজ করিয়াছে এবং দুইবারেই তাহার সঙ্গে আমাদের ছোটখাট ধরণের গণ্ডগোল হয়। আফোঁসো কস্তা'র কাছে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইলে, তিনি বলেন—'আপনাদের মত আমিও পুলিসের গোয়েন্দাদের পছন্দ করি না! জানেন, আমরা মিলিটারী লোকেরা এইসব গোয়েন্দাদের আমাদের কোনো কাজে ভিড়িতে দিতে চাই না। উহাদের ছায়া মাড়াইলে পাপ হয়!' তিনি ইতিপূর্বেই এই লোকটিকে সরাইয়া দিবার জন্য গোয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষকে লেখেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এই লোকটির বদলে গোয়া'র পর্তুগীজ মিলিটারী হেড কোয়ার্টারের (কুয়ার্তেল জেরাল মিলিতার) একজন সার্জেণ্ট আমাদের ইণ্টারভিউ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়। এই লোকটি মোটামুটিরকম শিক্ষিত ও খুবই মার্জিত ভদ্ররুচিসম্পন্ন নির্বিবাদী গোছের লোক ছিল। ফলে গোয়া হইতে মুক্তি পাওয়ার সময় পর্যন্ত আমাদের আর জেলে পুলিসী গোয়েন্দাদের দ্বারা উত্যক্ত হইতে হয় নাই। আফোঁসো কস্তার সঙ্গে আর একটু বেশী পরিচয় হওয়ার পর একদিন কথায় কথায় 'পিদে'-র কথা উঠিয়া পড়ে। 'পিদে'র কথা উঠিতেই তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন; তারপরে স্পষ্টাস্পষ্টি বলিলেন—"দেখুন, একথা ঠিক যে আমাদের অভ্যন্তরীণ কোনো ব্যাপারে সাধারণ পুলিসের বা 'পিদে'র কোনো হস্তক্ষেপ আমরা সাধারণত সহ্য করি না। কিন্তু তাহা হইলেও 'পিদে'র ক্ষমতা অনেক বেশী। আপনাদের সঙ্গে আমি ভাল ব্যবহার করিতেছি 'পিদে'র তরফ হইতে যদি এই মর্মে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট যায়, তাহা হইলে আমি মুস্কিলে পড়িব। 'পিদে'র ভয় না থাকিলে আমি আমাদের 'কুয়ার্তেল জেরালে'র অনুমতি নিয়া আপনাদের এখানকার চলাফেরার উপর বিধি-নিষেধ আরও আল্গা করিয়া দিতে পারিতাম।"

অবশ্য কস্তার একথার অর্থ এ নয় যে, আফোঁসো কস্তা আমাদের উপর জেল-জীবনের বিধি-নিষেধ এমন কিছু ঢিলা করিয়া দিয়াছিলেন। তা নয়, বিধি-নিষেধ যথেষ্টই ছিল। এখানেও আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের আলাদা-আলাদা সেলে হুড়কা বন্ধ করিয়া রাখার হুকুম ছিল এবং বাহিরে আসা'র রুটিন-সম্মত প্রয়োজন না হইলে বাহিরে আসিতে দেওয়া

হইত না। কিন্তু দিন যাইতে যাইতে সমস্ত বাধা-নিষেধই ক্রমে শিথিল হইয়া আসে। তাহার আসল কারণ, মিলিটারীর উপর 'পিদে'র সতর্ক দৃষ্টির অভাব বা পর্তুগীজ মিলিটারী বিভাগের সামরিক তৎপরতার অভাব নয়। ইহার প্রকৃত কারণ পর্তুগীজ জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে বোঝা যাইবে না। বলা বাহুল্য, আগুয়াদায় জেলের ভিতরে হইলেও সে পরিচয়ের সুযোগ আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাইয়াছিলাম।

উপরেই বলিয়াছি, পর্তুগীজ জাতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাহারা এমনিতে খুবই ঢিলাঢালা ইন্‌ফর্মাল ধরণের জাত, গা ছাড়িয়া দিয়া চলিতে ভালবাসে। তাহাদের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অন্যান্য ল্যাটিন জাতের অভিজাতদের মত পোষাকী আদব-কায়দা ও ভদ্রতার ফর্মালিটি বা আইনকানুনের কড়াক্কড়ি যথেষ্টই আছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় বা সাধারণ চলাফেরায় কোনো নিয়মের অনুশাসন মানিয়া চলা পর্তুগীজ জাতির স্বভাবের বাহিরে। কাজে কাজেই আগুয়াদায় ঢুকিতে না ঢুকিতেই তেনেন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিন কিভাবে চলিবে, সে সম্পর্কে সময় বাঁধিয়া ছক কাটিয়া ঘরে ঘরে নিজ হাতে নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত সে নোটিশ অনুযায়ী যে কাজ চলে নাই পাঠক নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তাহা আন্দাজ করিতে পারিয়াছেন। যেমন তেনেন্ত কর্তার হুকুম ছিল কোনো সৈনিক আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে না বা গল্প করিবে না। আমরাও বিনা প্রয়োজনে সৈনিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করিব না। যদি দুর্গের কর্তৃপক্ষকে বন্দীদের কোনো কিছু জানানোর দরকার হয়, তাহা হইলে সেদিনকার গার্ড ডিউটিতে নিযুক্ত 'কাব্ দা গুয়ার্দ'কে—অর্থাৎ কর্পোরাল বা হাবিলদারকে ডাকিয়া ইয়ার্ড সার্জেণ্টের মারফৎ কমান্ডাণ্টকে লিখিত চিঠি দিতে হইবে; আমরা বা আমাদের পাহারাদার পর্তুগীজ সৈনিকদের ভিতর কেহ যাহাতে এ আইন না ভাঙ্গে, তাহার কড়া নজর রাখার জন্য কর্তা সার্জেণ্টদের উপর কড়া হুকুম দিয়া গেলেন বটে। কিন্তু কোনো পর্তুগীজকে অপরিচিত কাহারও কাছাকাছি দু' চার ঘণ্টা থাকিতে হইলেও তাহার সঙ্গে সে কোনো না কোনোও ছুতায় ভাব করিতে চেষ্টা করিবে না—সে অন্য যে কোনো জাতেরই লোক হোক না কেন—ইহা হইতেই পারে না। কাজে কাজেই দু' চার দিনের মধ্যেই দেখা গেল সার্জেণ্ট সকাল বেলায় একবার আমাদের সেলের সামনে রাউন্ড দিয়া চলিয়া গেলেই স্বয়ং কাব্ দা গুয়ার্দরা নিজেরা, পরে তাহার দেখাদেখি অন্য শান্ত্রীরা এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়া নিয়া আমাদের সেলের দরজার কাছে এক আধটি কথা বলিয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা সকলেই জানে, সালাজারের রাজত্বে 'পিদে' বা গোয়েন্দা পুলিস ছাড়া কাহাকেও ভয় করিতে নাই। সার্জেণ্টদের ভয় করার তো কথাই ওঠে না। এবিষয়ে কাব্ এবং সাধারণ সৈনিকদের আইন ভাঙ্গাটা সাধারণ নিয়মে দাঁড়াইয়া যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে সার্জেণ্টরাও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিল। যেদিন যাহার ডিউটি থাকে, কিম্বা ডিউটি না থাকিলেও অকাজে একটা ছুতানাতা করিয়া আমাদের ঘরের ভিতর আসিয়া গল্পসল্প করিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। সিগারেট আদান-প্রদান, চা খাওয়া, ফল, রুটি-মাখন খাওয়া এসব চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম আমাদের অসুবিধা হইত পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলা আমাদের মোটেই আয়ত্ত ছিল না। দুই একটি কাজ-চলা গোছের কথা ছাড়া পর্তুগীজ ভাষা আমরা জানিতাম না বলিলেই হয়। দু' একজন সার্জেণ্ট ছাড়া অপর পক্ষের ইংরাজি জ্ঞানও তথৈবচ। কিন্তু তাহার জন্য কথা বা ভাবের আদান-প্রদান আটকাইত না। কিছুটা আকারে ইঙ্গিতে, কিছুটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মিশ্র ইঙ্গ-পর্তুগীজ-

কোঙ্কণী কথা ব্যবহার করিয়া কোনোমতে কাজ চালাইয়া নেওয়া যাইত। কিছুদিন বাদে পরস্পরকে একটু ঘনিষ্ঠ চেনা-জানা আর এক সেল হইতে অন্য সেলে বন্দীদের পরস্পরের ভিতর চিঠিপত্র, বই, খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকা গোপনে আদান-প্রদান করার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইল এইসব সাধারণ সৈনিকরা এবং সার্জেণ্টরা। 'আল্তিন্যো'তে যে কাজ অত্যন্ত সঙ্গোপনে ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, আগুয়াদায় প্রায় তাহাই দাঁড়াইয়া গেল নিত্যনৈমিত্তিক জল-ভাতের মতন।

আমাদের প্রিজন্ ইয়ার্ড দুর্গের ভিতর একেবারে শেষ প্রান্তে হওয়ার দরুণ এবং কমাণ্ডাণ্টের অফিস হইতে অনেকটা দূরে বলিয়া সেখানে খালি আমরা এবং আমাদের প্রতিদিনকার সান্ত্রী ডিউটির প্রহরীরা ছাড়া আর কেহ থাকিত না বা আসিত না। প্রতিদিন আট দশজন প্রহরী থাকিত একজন সার্জেণ্ট ও একজন কাব্ দা গুয়ার্দের চার্জে। কিন্তু সার্জেণ্টরা সারাদিনের মধ্যে দু' একবার ইয়ার্ডে ঘুরিয়া যাওয়া ছাড়া বা সময় সময় আমাদের সঙ্গে আসিয়া গল্পসল্প করিয়া যাওয়া ছাড়া ইয়ার্ডে বড় বেশী আসিত না। সবকিছু কাজের ভার 'কাবে'র হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। আমাদের সেলগুলির দরজার তালার চাবি সেই 'কাবে্'র কাছে থাকিত। সে-ই দরকার মত আমাদের ঘর খুলিয়া বাহিরে নেওয়া, আমাদের সঙ্গে বন্দুকধারী সৈন্য পাহারা দিয়া আমাদের জল আনিতে বা স্নান করিতে পাঠানো, বিকালে আমাদেরকে ইয়ার্ডের উঠানে বেড়ানোর জন্য বাহির করা, medico বা ডাক্তার আসিলে আমাদের ডাক্তারের কাছে নিয়া যাওয়া, অন্য সেল হইতে আমাদের দুপুরের বা রাতের রান্না করা খাবার আসিলে তাহার জন্য আমাদের ঘর খুলিয়া দেওয়া—এক কথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যা কিছু রুটিন সবই চলিত এই 'কাবে্'র তত্ত্বাবধানে। এইসব 'কাব্'রাও সাধারণ সৈনিক শ্রেণীরই লোক ছাড়া কিছু নয়। 'কাব্'ও দরকার মত তাহার এসব কাজের ভার দলের কোনো সৈনিককে দিয়া করাইয়া নিত। 'কাব্' হয়ত গার্ড রুমে বসিয়া রেডিয়ো শুনিতেছে কিম্বা তাস খেলার আড্ডায় বসিয়াছে সে সময় নিজে না আসিয়া অন্য কাহাকেও পাঠাইল এইরকম প্রায়ই হইত। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে বন্দীশালার আবহাওয়া বেশ ঢিলাঢালা ঘরোয়া রকমের দাঁড়াইয়া যাইতে বেশী দিন সময় লাগে নাই। আগুয়াদ' দুর্গের প্রহরীরা কিছুদিন অন্তর অন্তর দুর্গ হইতে পাঞ্জিম হেড কোয়ার্টারে বদলী হইয়া যাইত এবং তাহাদের জায়গায় সেখান হইতে নূতন প্রহরীদল আসিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পর্তুগীজ সাধারণ মানুষদের সহজাত মানবিক বন্ধুত্ববোধের দরুণ এইসব সৈনিকরা এক আধজন বাদে প্রায় সকলেই তাহাদের আগুয়াদা আসার অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই আমাদের বন্ধু হইয়া উঠিত। আমরা পর্তুগীজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বলিয়া আমাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা বা ইংরাজিতে যাকে 'Vindictiveness' বলে, তাহা মোটেই আমরা ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই নাই। এমনকি এইসব সৈনিকদের ভিতর যাহারা কিছুটা রাজনীতি সচেতন ছিল এবং আমাদেরকে তাহাদের দেশের শত্রু বলিয়া মনে করিত, তাহারাও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। কোনো সৈনিক বা সার্জেণ্ট বা ঐরকমের কেউ হয়ত বাহির হইতে কোনো কাজে আগুয়াদায় আসিয়াছে; কৌতূহল ভরে সত্যাগ্রহী কিম্বা সত্যাগ্রহীদের ভারতীয় নেতারা কি ধরণের জীব দেখিতে আসিল। তাহারাও আমাদের সেলের সামনে আসিয়া সাধারণত অত্যন্ত ভদ্র ও হৃদ্যতাপূর্ণভাবে কথা বলিত। অভদ্র, পাজী, গোমড়ামুখো দু' একজনকে কখনও কখনও দেখা যাইত না তা নয়। কিন্তু সাধারণ পর্তুগীজরা মোটের উপর ফূর্তিবাজ,

'hail-fellow-well-met !'—গোছের দিলখোলা জাতের লোক। 'পিদে' বা পুলিসের লোকেদের মত মতলব করিয়া পদে পদে রাজনৈতিক বন্দীদের জব্দ ও অপমান করার কোনো প্রবণতা আমরা সাধারণত ইহাদের মধ্যে দেখি নাই। মিলিটারী অফিসারদের সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে। পুলিস অফিসারদের তুলনায় বেশীর ভাগ মিলিটারী অফিসার অনেক বেশী শিক্ষিত ও ভদ্রশ্রেণীর লোক বলিয়া তাঁহাদের ব্যবহারও অনেক বেশী ভদ্র ও মার্জিত হইত। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণ পর্তুগীজ সৈনিকদের নিকট হইতে আমরা যে ধরণের হৃদ্যতা ও সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের নিকট হইতে ততটা কখনও পাই নাই। এটা বোধ হয় ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষার ও সামাজিকতার ব্যবধান! আরও একটা কারণ আছে এইসব সৈনিকদের বেশীর ভাগ লোক সালাজার বা পর্তুগীজ অভিজাত শ্রেণীর লোকের মত পর্তুগালের অতীত সাম্রাজ্য গৌরবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া গোয়া সম্পর্কে কোনো আকর্ষণ অনুভব করিত না বা গোয়া রক্ষার জন্য লড়িয়া প্রাণ দিতে হইবে এমন কোনো উদগ্র সাম্রাজ্যিক-জাতীয়তাবাদের প্রেরণা বা উদ্দীপনা তাহারা মনে মনে অনুভব করিত না। গভর্ণমেণ্ট জোর করিয়া গোয়া রক্ষার জন্য তাহাদের এখানে পাঠাইয়াছে। কোনোমতে দুই বছর মিলিটারী সার্ভিসের দায় শেষ করিয়া আবার দেশে নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিলে ভাল। বহু সৈনিক তাহাদের বাড়ীঘরের সমস্যা, বৌ-ছেলের সমস্যা, এমনকি প্রণয়-প্রণয়িনী সমস্যার ঝামেলার কথা আমাদের কাছে আসিয়া মন উজাড় করিয়া বলিত।

এইসব পর্তুগীজ সৈনিকরা আমাদের নানাভাবে যে সাহায্য করিত, তাহার জন্য আমরা তাহাদের কখনো কোনো ঘুষ বা টাকা পয়সা দিই নাই, তাহা দিবার মত অবস্থাতেও আমরা আগুয়াদায় ছিলাম না। আসলে ইহা তাহাদের ঘুষের প্রলোভন দেখাইয়া বিবেক-বিরুদ্ধ বা আইনবিরুদ্ধ কাজ করাইয়া নেওয়ার প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা বন্ধুত্বের। পর্তুগীজরা খুবই বন্ধুত্বপরায়ণ জাত এবং ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাহারা কিছুটা সেণ্টিমেণ্টাল। বন্ধু পারিলে বন্ধুকে যতটা পারে সাহায্য করিবে, না করাটাই অন্যায়, তাহা করিতে গিয়া যদি আইন-কানুন অল্পস্বল্প ভাঙিতে হয়, তাহাতে বেশী দোষ নাই এই মনোভাব পর্তুগীজদের সহজাত। এমনকি পর্তুগীজ সৈনিকদের মধ্যে যাহারা রাজনীতি সচেতন ও উগ্র পর্তুগীজ জাতীয়তাবাদী ছিল, ভারত কিছুতেই গোয়ার লড়াইয়ে পর্তুগালকে হারাইতে পারিবে না এই বলিয়া আমাদের সঙ্গে ছেলেমানুষি ধরণের তর্ক-বিতর্ক করিতে আসিত, তাহাদেরকেও দেখিয়াছি কয়েকবারের আলাপ-পরিচয় এবং তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জমিয়া ওঠা বন্ধুত্বসূত্রে অনুরোধ করিলে আইন ডিঙগাইয়া আমাদের সাহায্য করিতে, সেল হইতে সেলে অন্য বন্দীদের কাছে আমাদের চিঠিপত্র, বই এসব দিয়া আসিতে খুব দ্বিধা করিত না।

এসবের ফলে আফোঁসো কস্তার রুটিন ধরিয়া আমাদের জেল জীবন যে চলে নাই, তাহা না বলিয়া দিলেও চলিবে। পর্তুগীজ সৈনিকদের মনে এছাড়া মোটামুটিভাবে 'শেফেস্ ইন্দিয়ানুস্' অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান লীডার, ভারতীয় 'নেতা' হিসাবে আমাদের কয়েক জনের সম্পর্কে কিছুটা সম্ভ্রমবোধও ছিল। তাহার একটি কারণ আগেই বলিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশই ছিল প্রায় নিরক্ষর বা অর্ধ-শিক্ষিত চাষী। ইহাদের অনেকের ভিতরেই পর্তুগীজ ভাষার সঙ্গে ইংরাজি ভাষা শেখার একটা ঝোঁক বা আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাদের অনেককেই আমরা ইংরাজি শেখার জন্য দোভাষী পর্তুগীজ ও ইংরাজি প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, জাতীয় বই বা 'ওয়ার্ড বুক' প্রভৃতি কিনিয়া দিয়াছি। ইংরাজদের সঙ্গে পর্তুগীজ সম্পর্ক খুব বুনিয়াদী সম্পর্ক। কিন্তু আজকাল এইসব পর্তুগীজ সৈনিক-

দের ইংরাজি শেখার আগ্রহের সেইটাই একমাত্র কারণ নয়। একটা বড় কারণ, তাহাদের অনেকের মনে এরকম একটা গোপন আশা আছে যে, ইংরাজি জানিলে কোনো না কোনো সময়ে আমেরিকায় গিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করা যাইবে, যে সুযোগ পর্তুগালে বসিয়া থাকিলে পাওয়ার আশা কম। আমরা ইংরাজি জানি, এটা আমাদের সম্পর্কে ইহাদের মনে সম্ভ্রমবোধ থাকার একটি কারণ। আর একটি কারণ, সাধারণ পর্তুগীজরা বেশী লেখাপড়া না জানিলেও লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের তাহারা খুবই সম্মান ও মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত। তাহাদের দেশের গ্র্যাজুয়েট বা এম. এ. ডিগ্রীসম্পন্ন লোকেদের বা উকীল-ব্যারিষ্টার ও এ্যাডভোকেটদের সম্বোধন করিতে হইলে সাধারণ লোকেরা 'দুতোর' (Dotour) অর্থাৎ ডক্টর বলিয়া ডাকিবে। কোনো লোককে 'সিনর' বা 'মিষ্টার' বলিয়া ডাকা তাহাদের মতে সাধারণ ভদ্রতা। লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিতে হইলে 'দুতোর' না বলিলে চলিবে কেন? আমরা তাই অনেক সময়েই আগুয়াদার সৈন্যদের দ্বারা 'দুতোর' সম্বোধনে সম্বোধিত হইতাম। খালি আমাদেরকেই নয়, গোয়া-বাসী রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ও লেখাপড়া জানা বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও যেমন—শ্রীযুত গোপালরাও কামাথ, মলগাঁওকর প্রভৃতি (দুজনেই এ্যাডভোকেট) সৈন্যদের দ্বারা 'দুতোর' সম্বোধনে অভিহিত হইতেন।

কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের কাছে যতটা না হোক সার্জেণ্টদের কাছে আমাদের খাতির আর একটু বেশী ছিল। তাহার কারণ সার্জেণ্টরা সকলেই প্রায় হাই স্কুল বা লাইসিয়ামে (কলেজে) কিছুদূর পড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ঘরের ছেলে। পর্তুগাল অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইউরোপের মধ্যে খুবই অনগ্রসর দেশ হওয়ায় ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ভিতর দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার তীব্রতা খুবই বেশী। সেজন্য পুলিসের কনস্টেবলের চাকরি, কিম্বা সৈন্যদলে সার্জেণ্ট হিসাবে একটা পাকা চাকুরির আকর্ষণ তাহাদের পক্ষে একেবারে কম নয়। অথচ তাহারা জানে, তাহারা 'অফিসার' নয়, অর্থাৎ তাহারা 'কমিশনড' নয়; তাহাদের পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা সে হিসাবে কম। ইহাদের অনেকের মনেই সে জন্য একটা নিম্ন-মধ্যবিত্তসুলভ আহত-আত্মমর্যাদাবোধ ছিল। তাহারা যে সাধারণ সৈনিকদের মত অশিক্ষিত ছোটলোক নয়, তারা আমাদের মতই শিক্ষিত ভদ্রলোক, আমাদের কাছে সেটা প্রমাণ করার একটা ইচ্ছা ইহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই দেখিয়াছি। কাজে কাজেই দু একজন নিতান্ত পাজি ধরণের সার্জেণ্ট ভিন্ন ইহারা সকলেই মোটামুটি আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করিত। আগুয়াদায় আসার কয়েক মাস পরে আমাদের যখন বৃটিশ ও আমেরিকান সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল, এইসব পত্রিকা আমাদের নামে কিছু কিছু আসিতে আরম্ভ করিলে পর সার্জেণ্টদের মধ্যে যাহারা ইংরাজি পড়িতে পারিত, আমাদের কাছ হইতে তাহারা সেগুলি পড়ার জন্য ধার করিয়া নিয়া যাইত। গোয়ার পর্তুগীজ ভাষার খবরের কাগজ আমরা পড়িয়া কোনো জায়গায় ভালো করিয়া বুঝিতে না পারিলে তাহাদের সাহায্যে বুঝিয়া নিতাম। তবে এমনি গল্প-সল্প বা আলাপ-আলোচনা করার সময় তাহারা রাজনীতির, বিশেষ করিয়া নিজেদের দেশের রাজনীতির, কথা যতটা সম্ভব এড়াইয়া যাইতেই চাহিত। তাহারা যে গোয়ার মুক্তি-আন্দোলন বা ভারতভুক্তি আন্দোলন সমর্থন করিত, সেরূপ মনে করার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। যাহাদেরকে সালাজার গভর্ণমেণ্টের উপর তত প্রসন্ন নয় বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহারাও গোয়া আর পর্তুগালের

থাকিবে না ইহা খুব সহজভাবে নিতে পারিত না। পর্তুগীজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্র-শ্রেণীর কাছে—অভিজাতশ্রেণীর তো কথাই নাই—গোয়া পর্তুগালের অতীত সমৃদ্ধি এবং লুপ্ত গৌরবের প্রতীক চিহ্ন। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত-সুলভ জাতীয়তাবাদী মনের কাছে এ প্রতীক চিহ্নের মূল্য যথেষ্টই আছে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনায় ইহার আবেদন কম জোরালো নয়। কিন্তু সার্জেন্টদের মধ্যে বেশ ক'একজনকে এবং সাধারণ সৈনিকদের ভিতর শিক্ষিত ছেলে যারা তাদের প্রায় অধিকাংশকে গণতন্ত্রবাদী ও সালাজার বিরোধী বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে জানার একটা কৌতূহল প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছি।

মিলিটারী অফিসারদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতেন ও ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলিতেন। তেনেন্ত আফোঁসো কস্তাকে আমরা আমাদের প্রথম কমাণ্ডাণ্ট হিসাবে পাই। উনত্রিশ-ত্রিশ বছরের মাঝারি লম্বা, দোহারা চেহারার যুবক, যদিও শরীরের মধ্যভাগে ইতিমধ্যেই বেশ একটু পরিধি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাই নাদুস-নুদুস বা ইংরাজিতে roly-poly বলিলে দোষ হয় না। ইতিপূর্বেই তাঁহার কথা যা বলা হইয়াছে তাহা হইতে সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন ভদ্রলোক একটু ব্যস্তবাগীশ এবং নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। মধ্যে মধ্যে একটু একটু বাধিয়া গেলেও ইংরাজিতে মোটামুটি রকম কথাবার্তা চালাইয়া যাইতে পারেন। কিছুটা ফরাসী ভাষাও জানেন। ইজিপ্সিয়ান গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মঃ খলিল আসিলে তাঁহার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় দু' চারটি কথা বলিলেন, তবে মঃ খলিল ফরাসী ভাষায় তাঁহার চেয়ে অনেক বেশী পোক্ত বুঝিয়া সে পথে বেশীদূর অগ্রসর হইলেন না। ভদ্রলোকের বয়স কম বলিয়াই বোধ হয় সকল ব্যাপারে নিজের কেরামতি, ক্ষমতা ও ভদ্র আদব-কায়দা লোক-দেখানো ভাবে একটু 'শো-অফ্' করার প্রবণতা আছে। কিন্তু মোটের উপর একথা বলিতেই হইবে আমাদের আগুয়াদায় আসার প্রথম দিন হইতেই তিনি আমাদের সঙ্গে সম্ভব মতন ভদ্র ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে নিজের ক্ষমতা খাটানোর জন্য আমাদের অসুবিধা ঘটাইতে একেবারে ছাড়েন নাই বটে, কিন্তু অযাচিতভাবে বহু সাহায্যও করিয়াছেন। গোয়াতে ইহার আগে আমরা পুলিস কুয়ার্তেলের হাজতে কিম্বা 'আলতিন্যো' জেলে যে ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় কস্তার আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে এইসব ছোটখাট ত্রুটি খুব ধর্তব্যের মধ্যে মনে হয় নাই।

বয়সে তরুণ ও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা কম বলিয়া হোক কিম্বা আমরা তাঁহার চেয়ে বয়সে প্রবীণতর এবং রাজনীতির লোক বা 'পোলিতিকো' বলিয়া হয়ত তাঁহাকে যথোচিত পদমর্যাদা দিব না সেই আশঙ্কায় হোক আগুয়াদায় আমাদের আসার প্রথম দিনেই সন্ধ্যে বেলায় কি একটা কাজে আমাদের ঘরে আসিয়া তিনি কথায় কথায় আমাদের জানাইয়া দিলেন যে, তিনি যদিও এখনো 'তেনেন্ত' (অর্থাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট') পদেই আছেন, কিন্তু তিনি একজন ডিউক-সন্তান; তাঁহার পুরা নাম আসলে আফোঁসো কস্তা দা বেইরা; তাঁহার বাবা খুব বড় একজন পর্তুগীজ মিলিটারী অফিসার জেনারেল ছিলেন এবং তিনি পর্তুগালে "বেইরা' প্রদেশের একজন 'ডিউক'। এখন যিনি গোয়ার মিলিটারী কমাণ্ডাণ্ট, তিনি আর্মিতে তাঁহার বাবার জুনিয়ার অফিসার ছিলেন এবং তাঁহার ও গভর্ণর-জেনারেল জেনারেল বের্নাদ গেদীসের বিশেষ অনুরোধেই তিনি আগুয়াদা দুর্গে আমাদের সকলের দায়িত্বভার নিতে রাজী হইয়াছেন। এসব কথা আমাদের জানানোর বিশেষ দরকার ছিল না,

তবু ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে সবটা বলিয়া গেলেন। পরে খোঁজ নিয়া জানিয়াছিলাম তাঁহার ডিউক-সন্তান হওয়ার গল্পটা নিয়া আমরাই শুধু নয়, পর্তুগীজ সৈনিক ও সার্জেণ্টদের মধ্যেও অনেকে এ-নিয়া হাসাহাসি করিত। কিন্তু একটি অসতর্ক মুহূর্তের দুর্বলতা ছাড়া আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে অন্যান্য সকল ব্যাপারেই তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়াছেন ইহা না বলিলে তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইবে।

তেনেন্ত কস্তাই আমাদের প্রথম দিন সন্ধ্যায় গোয়ার পর্তুগীজ ভাষার দৈনিক 'ও এরাল্‌দো' ('O Heraldo'; The Herald) পড়িতে দিয়া যান। আমরা পর্তুগীজ ভাষা ভালো বুঝি না ও পড়িতে পারিব না জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাগজের সেদিনকার খবরের অংশটুকু নিজে পড়িয়া অনুবাদ করিয়া শোনাইয়া দিয়া যান। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া রেডিয়োতে শোনা আন্তর্জাতিক রাজনীতির খবর আমাদের বলিয়া যাইতেন। 'ও এরাল্‌দো' কাগজ যখন তিনি আমাদের দেন, তখন আমরা পুলিশের কাছ হইতে পর্তুগীজ ভাষার খবরের কাগজ রাখার অনুমতি পাই নাই। তাঁহার নিজের কাগজখানি রোজ সন্ধ্যাবেলায় তিনি নিজ হাতে করিয়া আমাদের ঘরে দিয়া যাইতেন আবার নিজে সেখানি ফেরৎ নিয়া যাইতেন। কস্তার খালি একটি দাবী আমাদের কাছে ছিল—তিনি যে সব হুকুম বা বিধি-নিষেধ আমাদের উপর জারী করিবেন সেগুলি একেবারে খাস পর্তুগালের মিলিটারী আইন মোতাবেক; অতএব সেগুলির প্রতি আমরা যেন যথোচিত মর্যাদা বা সম্মান দেখাইতে ত্রুটি না করি এবং আমাদের সাধ্যমতন সেগুলি মানিয়া চলি। তাহা হইলেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া থাকিবে না এবং তাঁহার পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিবিধান করার কারণ ঘটিবে না। তিনি 'পলিতিকো' (রাজনৈতিক নেতা, রাজনীতির লোক) নন, 'মিলিতার' (সামরিক লোক, মিলিটারী লোক)। তাঁহার কোন রাজনীতি নাই। আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বা আমাদের দেশের সঙ্গে তাঁহার কোনো ঝগড়া নাই। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, ইন্দো-আরিয়ান সংস্কৃতি তাঁহার খুবই প্রিয় জিনিস, ভগবান বুদ্ধের দেশ দেখার একটা কৌতূহল তাঁহার ছিল কিন্তু এখন আর তাহা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও পর্তুগালের সঙ্গে গোয়ার উপর অধিকার নিয়া আজ যখন ভারতের সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে তখন তিনি পর্তুগীজ হিসাবে পর্তুগালের দিকে না দাঁড়াইয়া পারেন না। কাজেকাজেই আমরা যেন তাঁহাকে ভুল না বুঝি। মোটামুটি ভাবে গোয়াতে এই সব মিলিটারী অফিসার বা তাঁহার সম-মর্যাদাসম্পন্ন অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সাধারণ মনোভাব এই ধরনেরই ছিল। কিন্তু গোয়ার ব্যাপারে ঠিক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী না হইলেও পর্তুগালে সালাজার-শাসনের বিরুদ্ধবাদী মিলিটারী অফিসার দু'এক জনের সঙ্গে আমাদের কখনো-সখনো দেখাসাক্ষাৎ যে হয় নাই তা নয়। তবে আগুয়াদাতে নয়। আগুয়াদাতে আমরা পর পর দুইজন কমাণ্ডাণ্টকে এবং তাঁহাদের কয়েকজন সহকারীকে পাই। গোয়ার পর্তুগীজ সেনাপতি একজন ব্রিগেডিয়ার এবং ইঁহাদের জানাশোনা বন্ধু-বান্ধব যাঁরা আগুয়াদা দেখিতে বা বেড়াইতে আসিতেন তাঁহাদের কারো কারো সঙ্গেও আমাদের অল্প-বিস্তর কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়। পর্তুগীজ জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যগৌরব সম্পর্কে একটা অতিরিক্ত অহঙ্কারবোধ ইহাদের সকলের মধ্যেই দেখিয়াছি, কিন্তু সালাজারের 'ইস্তাদু নোভো' বা নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে সকলে যেন নিজেদের পুরাপুরি এক করিয়া দেখিতে চান না: সামরিক বিভাগের আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা সম্পর্কে ইঁহাদের সকলকেই খুব সচেতন বলিয়া আমার মনে হইয়াছে।

পর্তুগালের রাজনীতি নিয়া একদিন কস্তার সঙ্গে আমাদের আলোচনা উঠিয়া পড়ে। তিনি আমাদের কাছে স্পষ্টাস্পষ্টি বলেন পর্তুগীজ সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে তাঁহার কোনো সহানুভূতি নাই বা ছিল না। তিনি ডেমোক্রাসী-তে বিশ্বাস করেন না, তিনি একজন 'রয়ালিষ্ট' বা রাজতন্ত্রবাদী। আমরা হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—'আপনাদের রাজবংশ কোথায়, রাজা কোথায়?' ১৯১১ সালে পর্তুগীজ রাজবংশ উত্তরাধিকারী-হীন হইয়া পড়ে। তিনি উত্তর দিলেন—'প্রয়োজন হইলে আমরা রাজা খুঁজিয়া বাহির করিব।' ইহাতে অবশ্য খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। কারণ স্বয়ং ডাঃ সালাজারকেও রাজতন্ত্রের সমর্থক বলিয়া অনেকে মনে করেন। পর্তুগীজ সামরিকবাহিনীর পুরাতন অফিসারেরা বেশীর ভাগই খোলাখুলি ভাবে রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং সে হিসাবে তাঁহারা প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলতার ভক্ত এবং সালাজারের গভর্নমেণ্টকে পছন্দ করেন। ডাঃ সালাজারও এই সব অফিসারদের প্রকাশ্য ভাবে রাজতন্ত্র সমর্থন করার ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন না। কিন্তু ইদানীং কিছুকাল ধরিয়া পর্তুগীজ সামরিক বিভাগের অফিসারদের মধ্যেও যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে এবং অনেকে সালাজার গনর্ভমেণ্টের বিরোধিতা করার জন্য সম্মুখে আগাইয়া আসিতেছেন। অবশ্য তেনেন্ত কস্তা যে সে দলের লোক নন বা ছিলেন না তাহা সহজেই বোঝা যায়।

কস্তা আমাদের আর একটি সুবিধা দিয়াছিলেন। আগুয়াদা দুর্গের প্রহরী সৈনিকদের জন্য মাসে দু' একবার পর্তুগীজ সিনেমা দেখানো হইত। কস্তা সৈনিকদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদেরও এই সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যেদিন সন্ধ্যাবেলায় সিনেমা হইবে আমাদের আগেই খবর দিয়া রাখা হইত। আবহাওয়া ভালো থাকিলে দুর্গের গেটের কাছাকাছি একটি বাগান-ওয়ালা লনে খোলা ময়দানে, সমুদ্রের ধারে ওপন্ এয়ার সিনেমা হিসাবে ছায়াচিত্রের অনুষ্ঠান হইত। সিনেমা দেখানর ব্যাপারটার মধ্যে খানিকটা সামাজিকতা ছিল। বসার বন্দোবস্ত হইত গ্যারিসনের সৈনিকেরা সবার শেষে, তার পরে আগুয়াদা জেলের কয়েদী সৈনিকরা, তারপর গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীরা, তারপর ভারতীয় বন্দীরা, তারপর ভারতীয় সত্যাগ্রহী 'নেতা' আমরা আটজন এবং আমাদের সম্মুখে সার্জেণ্টরা, কমাণ্ডাণ্ট, ডেপুটী কমাণ্ডাণ্ট, কমাণ্ডাণ্টের পত্নী ও ছেলেমেয়েরা, দুর্গের গীর্জার পাদ্রী সাহেব, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি। সেখানে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা বা সামাজিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার উপর কোনো নিষেধ থাকিত না। সিনেমা দেখিতে আমরা যে সন্ধ্যায় প্রথম আমন্ত্রণ পাই, কস্তা নিজ হইতেই ডাকিয়া লনে আমাদের সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও আগুয়াদায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন এই রকম দু'এক জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ করাইয়া দেন। আমাদের সম্পর্কে 'শেফেস ইন্দিয়ানুস্ দস্ সত্যাগ্রহীস্'—ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের নেতা হিসাবে—এই সব ভদ্রলোকে ও ভদ্রমহিলাদের মনে হয়ত কিছুটা কৌতূহলও থাকিয়া থাকিবে। যাই হোক, সামাজিক ভদ্রতা ও অভিবাদন বিনিময় করিয়া আমরা যে যার আসনে গিয়া বসিলাম। কিন্তু সেদিন হইতে শেষ পর্যন্ত এই সব সিনেমা-সন্ধ্যাগুলিতে জেলখানার পরিবেশ উপভোগ্য রকমে শিথিল হইয়া যাইত। অসুবিধার মধ্যে এক ছিল আমাদের বসার টুলগুলি ঘাড়ে করিয়া মাঠে যাইতে হইত আবার সিনেমা শেষ হইয়া গেলে সেগুলি সেইভাবে ফিরাইয়া আনিতে হইত। কিন্তু এ বিষয়ে সৈনিক, সার্জেণ্ট সকলেরই এক অবস্থা। মাঠে বা সিনেমার ঘরে কোনো বসার ব্যবস্থা না থাকায় টুল ঘাড়ে করিয়া না নিয়া গেলে মাটীতে বসিতে হইবে তাছাড়া কোনো উপায় নাই।

কস্তা আগ্‌য়াদাতে আমরা যাওয়ার পর খুব বেশী দিন থাকেন নাই, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে তিনি চলিয়া যান। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন তাঁহার চাকুরীতে যে বেতন ছিল তাহাতে তাঁহার পোষায় না। তিনি ভালো পাইলটের কাজ জানেন। তিনি সামরিক বিভাগ হইতে পদত্যাগের অনুমতি চাহিয়াছেন। পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা হইতে লোরেনজে মার্কুয়েস হইতে করাচী এবং গোয়া পর্যন্ত একটি নূতন পর্তুগীজ এয়ার লাইন খোলা হইতেছে, তিনি সেখানে পাইলটের চাকুরী নিবেন। তাদের মাহিয়ানার রেট নাকি অনেক বেশী এবং ভালো। কস্তার সময়ে কস্তার সহকারী হিসাবে ছিলেন কাব্রাল নামে একজন দীর্ঘাকৃতি যুবক। কস্তা আমাদের বলিয়াছিলেন প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি ও দেশ-আবিষ্কারক কাব্রালের বংশের সংগে এই ভদ্রলোকের যোগাযোগ আছে। কথাটা কতখানি সত্য জানি না। কিন্তু ভদ্রলোকের দেহের অভিজাতসুলভ লম্বা গড়ন, মুখ-চোখের গঠন-বৈশিষ্ট্য এই সব দেখিয়া আমাদের মনে হইত, হয়ত হইতে পারেও বা। কাব্রাল কাহারও সংগেই বেশী কথা বলিতেন না। দু'একবার হয়ত ইয়ার্ডে রাউণ্ডে আসিতেন। অত্যন্ত ভদ্র, মিতভাষী গম্ভীর এবং একটু 'মেলাংকলি' চেহারার এই লোকটি কোনো সময়ে আমাদের বেশী কাছাকাছি আসেন নাই। তবে কস্তার জন্য আমাদের দৈনন্দিন রুটীন, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে লাইটস্-অফ্ ঠিক মতন হইয়াছে কিনা এসব দেখার সময়ে একটু কড়াক্কড়ি করিতেন।

কস্তা যাওয়ার পর যিনি কমাণ্ডাণ্ট হইয়া আসেন তিনি আমাদের পূর্বপরিচিত। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালে আমাদের বিচারের সময় ইনি আমাদের সরকার হইতে নিযুক্ত কোর্ট ডিফেণ্ডার বা অভিযুক্ত পক্ষের মিলিটারী উকীল। কাপ্তেন মিরান্দা। এ্যাডভোকেট বিনায়ক রাও কৈসরে। আমাদের পক্ষে বয়ান করায় তাঁহাকে আমাদের ক'জনের জন্য বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ভদ্রলোককে আমার বেশ ভালো বলিয়া মনে হইয়াছিল। আগুয়াদায় আমাদের কমাণ্ডাণ্ট হইয়া আসার পর হইতে আমাদের মুক্তির দিন পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে আমাদের সে ধারণা পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন হয় নাই। কস্তার মত এ ভদ্রলোক কারণে অকারণে আমাদের ঘরে আসিতেন না বা গল্পগুজব করিতেন না বটে। বরং কতকটা দূরত্ব রাখিয়াই চলিতেন। অবশ্য তাহার আর একটি কারণ ছিল তিনি ইংরাজী মোটেই জানিতেন না। ইংরাজী-জানা এক-আধজন সার্জেণ্ট কিম্বা আমাদের জেল ডিসপেন্সারীর গোয়ানীজ কম্পাউণ্ডার যাহাকে হোক দোভাষী হিসাবে সংগে নিয়া তিনি আমাদের ঘরে আসিতেন। আমরা যে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা পর্তুগীজ ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া খুব জুত পাইব না সেটা তিনি বুঝিতেন। কিন্তু দোভাষী নিয়া গল্পগুজব করা চলে না। তবে তিনি একটু লাজুক স্বভাবের লোকও ছিলেন। অন্য কাহারও সংগে—পর্তুগীজ যাহারা জানিত, এমন গোয়াবাসী রাজবন্দী বা নিজের সহকর্মীদের সংগেও—তাঁহাকে বেশী গল্প-গুজব করিতে দেখি নাই। তবে তাঁহার সবচেয়ে বড় গুণ যাহা ছিল, তিনি কস্তার মত বাস্তবাগীশ ও উপর-পড়া 'অফিসিয়াস্' ধরণের লোক ছিলেন না। ফলে আমাদের অযথা ঘাঁটাইতে তিনি মোটেই চাহিতেন না। বেশী রাউণ্ড দিতে বা কড়াক্কড় করিতে আসিতেন না। কস্তার সময়কার রুটিন তাঁহার সময় নিতান্ত নিয়মে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। স্নানের বা অন্যান্য কাজের নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও আমরা কতকটা ইচ্ছামতন ঘরের বাহিরে থাকিতে পারিতাম। এক বিকাল বেলায় আধ ঘণ্টার জন্য বেড়ানর ব্যাপারে কম্‌তি-বাড়তি সেরকম কিছু হয় নাই। তাহার কারণ বন্দীশালার মোট আটটি সেলের বেড়ানর জায়গা আমাদের ইয়ার্ডের ঐ ছোট

উঠানটি। পালা করিয়া সে উঠান ব্যবহার করিলেও দু'ঘণ্টার কমে সব সেলের বা ব্যারাকের বন্দীদের বেড়ান শেষ করা যাইত না। কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে মিরান্দার নীতি ছিল খুব বেশী কিছু নিয়মের এদিক-ওদিক না হইলে আমাদের সেলের ভিতর থাকা বা বাহিরে আসা-যাওয়া ও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে তিনি কতকটা চুপ করিয়া থাকিতেন। সার্জেণ্ট বা কাব্ এদের সঙ্গে আপোষে বন্দোবস্ত করিয়া আমরা যদি ছোটখাট ব্যাপারে একটু বেশী সুবিধা নিই তাহাতে তিনি আপত্তির কিছু দেখিতেন না। মোটের উপর মিরান্দার আমলে দশ এগারো মাস আমাদের মোটামুটি স্বচ্ছন্দভাবে কাটিয়াছে—আগুয়াদার মত একটা মিলিটারী জেলখানায় যতটা সম্ভব।

আগুয়াদা হইতে বহুদিন হইল চলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু সেখানে পর্তুগালের সাধারণ লোকেদের সঙ্গে কাছাকাছি আসার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম তাহাতে সালাজারের পর্তুগালকে কিছুটা সহানুভূতি নিয়া বোঝার পক্ষে পরে সুবিধা হইয়াছে। পর্তুগাল ও ভারত-গোয়া সম্পর্কের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আমাদের পর্তুগালকে ও পর্তুগালের জনসাধারণকে কিছুটা জানা ও বোঝা দরকার। ডাঃ সালাজার এবং তাঁহার 'নূতন রাষ্ট্রে'র অভিজাত স্বেচ্ছাতন্ত্রই পর্তুগালে শেষ কথা নয়। সেখানে দরিদ্র চাষী-মজুর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাহাদের অভাব-অভিযোগ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া বাস করে। যদি তাহারা কোনোদিন সালাজারের স্বেচ্ছাতন্ত্রের নিগড় হইতে মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজিয়া পায়, গোয়া-সমস্যার সমাধান হইতে দেরী হইবে না। আগুয়াদায় আসিয়া সাধারণ সৈনিক, কাব্, সার্জেণ্ট বা ভদ্র শিক্ষিত অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে আসিয়া এটুকু বুঝিয়াছিলাম পর্তুগালের সাধারণ মানুষ সহজাত ভাবে হিংস্র, নৃশংস বা নিষ্ঠুর স্বভাবের মোটেই নয়। বরং তাহার বিপরীতটাই সত্য। তাহারা দরিদ্র ও অনগ্রসর হইতে পারে; কিন্তু আমাদেরই মত মানবিকবোধসম্পন্ন সহজ মানুষ। তাহাদের সহজাত মানবিকতা-বোধ গণতান্ত্রিক প্রগতির পথে একদিন মুক্তির পথ খুঁজিবেই। পর্তুগাল-গোয়া-ভারত সম্পর্কের ইতিহাস সেদিন বহু শতাব্দী কাল পরে আবার নূতন ভাবে লেখা হইবে।

॥ ৪৫ ॥

গোয়া মুক্তি-সংগ্রাম : সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদের পর্যায়

১৯৫৬ সালে আমরা আগুয়াদা জেলে বদলি হইয়া আসার পর বাহির হইতে যেসব খবর আসিতে থাকে, তাহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, গোয়ার মুক্তিসংগ্রাম ক্রমশ মরীয়া অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসবাদের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে গোয়ার ভিতরে যেভাবে পুলিসী-শাসন ও অবাধ নিষ্পেষণের নীতি চলিতে থাকে তাহাতে গোয়ার ভিতরে কোনো প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন যে চলা সম্ভব ছিল না সে কথা আগেই বলিয়া আসিয়াছি। আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়েরা তখন সকলেই জেলের ভিতর। কর্মীরাও অধিকাংশ দলে দলে গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসিয়াছেন। অনেকে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে পলাইয়া আসিয়াছেন। গোয়ার ভিতরে আত্মগোপন করিয়া যাঁহারা আছেন তাঁহাদের পক্ষে বাহিরে আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে কোনো প্রকাশ্য

সংগঠন গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল না। তাহা গড়িয়া তোলার মত অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ, গোয়াতে এ সময়ে কেন, কোনো সময়েই ছিল না।

এই অবস্থার ভিতরে জেলের বাহিরের কর্মীদের অনেকের মনে আর কোনো পথ না পাইয়া সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে কিছু করা যায় কিনা সে-চিন্তা জাগিতে থাকে। এরকম অবস্থায় সকল দেশেই সাধারণত যা হয় গোয়াতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই—রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রাম আন্দোলন অনিবার্যভাবে গুপ্ত সংগঠন ও সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াইতে থাকে। গোয়ার ভিতরে এ সময় সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলাও যে সহজসাধ্য ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ সমগ্র গোয়াকে তখন সামরিক যুদ্ধ-শিবিরে পরিণত করিয়াছেন। গোয়ার মত ছোট জায়গায় তখন দশ-বারো হাজারের মত পর্তুগীজ ও নিগ্রো সৈন্য আনিয়া ফেলা হইয়াছে। অস্ত্রসজ্জার দিক দিয়া পর্তুগালের মত রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহার কোনো কিছুই বাকী রাখা হয় নাই বা বাকী ছিল না। এই অবস্থার ভিতরে ব্যাপক আকারে সার্থক ও কার্যকরীভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলা তবেই সম্ভব হয়, একমাত্র যদি সীমানার বাহিরে কোথাও হইতে, আর কিছু না হোক, অন্ততপক্ষে অস্ত্রশস্ত্রের নিয়মিত যোগান পাওয়া যায়। তাহা পাওয়া গেলে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনকে ক্রমে গেরিলা যুদ্ধের রূপ দেওয়াও সম্ভবপর হয়। গোয়ার ক্ষেত্রে সীমান্তের বাহির হইতে এই ধরণের সাহায্য একমাত্র ভারত হইতে পাওয়ার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। গোয়াতে জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপ যখন প্রথম দেখা দেয় তখন হইতেই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বরাবর অভিযোগ করিয়া আসিয়াছেন যে, এ সমস্ত ঘটনা ভারত গভর্নমেণ্টের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসবাদী এজেণ্টদের কাজ। ইহার পিছনে গোয়াতে জনমতের কোনো সমর্থন নাই বা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের কোনো ব্যাপক সংগঠনও নাই। যা কিছু ঘটিতেছে সবই সীমান্তের অপর পার হইতে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রের ফলে।

পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগ সম্পর্কে যে বিশেষ কোনো গুরুত্ব আরোপ করার দরকার করে না, তাহা এখানে না বলিলেও চলিবে। কারণ, খালি গোয়ার জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ প্রচেষ্টা সম্পর্কেই নয়, গোয়ার ভিতরকার পর্তুগীজ-বিরোধী যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কেই—তাহা নিতান্ত অহিংস ও নিরামিষ ধরনের আন্দোলন হইলেও—পর্তুগীজ সরকার তাহাকে কখনও 'ভারত-প্ররোচিত' ভাড়াটিয়া আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো আখ্যা দেন নাই। গোয়াবাসীদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁহারা প্রথম হইতে বরাবর এই একই ধরনের অভিযোগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমার দিক হইতে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়া এ কথা আমি জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি যে, গোয়ার ভিতরে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে তাহার সঙ্গে ভারত সরকারের, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রকার সমর্থন বা যোগাযোগ কখনও ছিল না বা নাই। গোয়ার ভিতরে থাকার সময়, এবং তাহার পর গোয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিভিন্ন সূত্রে এ সম্পর্কে বিভিন্ন খোঁজ-খবর করিয়া, আমার এ বিষয়ে যতটুকু জানার সুযোগ হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমার এ কথা বলিতে কোনোই দ্বিধা নাই যে, ভারতের বিরুদ্ধে পর্তুগীজ সরকারের এই অভিযোগের পিছনে কোনোই বাস্তব সত্যতা নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাও বোঝা যাইবে যে, এই ধরনের অভিযোগ মোটেই যুক্তিসহ নয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়ার ভৌগোলিক অবস্থান যেরূপ, তাহাতে

ইচ্ছা করিলে ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে গোপনে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়া গোয়ার ভিতরে বড়রকমের কোনো সশস্ত্র হাঙ্গামা বাধাইয়া তোলা ভারত সরকারের পক্ষে মোটেই কঠিন হইত না, বা অসম্ভব ছিল না। এই কাহিনীর প্রথম দিকে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করার অভিজ্ঞতার বর্ণনা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন, উত্তর, পূর্ব বা দক্ষিণ যে কোনো দিক দিয়া গোপনে গোয়ার ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো কোনো সময়ে কঠিন বা অসম্ভব ছিল না। বরং সহ্যাদ্রির পথে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া গোয়াতে অস্ত্রশস্ত্র বা লোকজন পাঠানো খুবই সম্ভব। পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই দুই-তিন শ' মাইলব্যাপী দুর্গম ও ঘন বনাকীর্ণ পার্বত্য সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করিয়া সীমান্ত পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করাই বরং সম্পূর্ণ অসম্ভব। আজ পর্যন্ত পর্তুগীজ সরকার সে চেষ্টা কখনও করেন নাই। গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের এবং সাইপ্রাসের মুক্তি-যুদ্ধের সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্কের কথা তুলনা করা যাইতে পারে। গ্রীস হইতে সাইপ্রাস দ্বীপ সমুদ্রপথে প্রায় ছয় শ' মাইল দূরে। তাছাড়া সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ সামরিক ও নৌ-বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গ্রীস হইতে সাইপ্রাসের বিদ্রোহীদের সাহায্য করা গ্রীসের 'এনোসিস্'-পন্থীদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব হয় নাই। আলজিরিয়াতেও ঠিক তেমনি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের এত তোড়জোড় সত্ত্বেও বিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কিংবা উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রতট দিয়া ইজিপ্ট বা টিউনিসের পক্ষে সেখানকার মুক্তিফৌজের সাহায্যের জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো অসম্ভব হইতেছে না। সেক্ষেত্রে ভারত গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ঘরের সঙ্গে লাগাও এবং ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা ও সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাবিহীন অরক্ষিত—প্রায় উন্মুক্ত গোয়া-সীমান্ত পার করিয়া গোয়ার ভিতরে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়া কোনো বড়রকমের একটা হাঙ্গামা বাধাইতে পারিতেন না, এ রকম মনে করারও কোনো সঙ্গত কারণ নাই। আর একটু বড় দরের ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করিয়া এও বলা চলে, আমেরিকার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াও নূতন চীনের সাধারণতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার সাহায্যের জন্য সশস্ত্র 'স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী' পাঠানো যদি অসম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের সাহায্য করিতে চাহিলে বা সেরূপ কোনো কিছু করার ইচ্ছা থাকিলে, ভারত গভর্নমেণ্টের তাহার জন্য কোনো মুক্তিসম্পাত অজুহাতের কিংবা সামর্থ্যের অভাব হইত না। কাশ্মীরের অবস্থার সঙ্গে গোয়ার অবস্থার তুলনা ঠিক ঠিক করা যায় না। কিন্তু ইহাও আমরা দেখিয়াছি, প্রয়োজন বোধ করিলে ভারত গভর্নমেণ্ট দুর্গম কাশ্মীরেও ব্যাপক ও কার্যকরীভাবে সামরিক সাহায্য পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই। সেইরূপ প্রয়োজন বোধ করিলে গোয়াতেও তাঁহারা গোপনে বা প্রকাশ্যে নানাভাবেই অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইতে বা কোনো সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা প্রত্যেকে ভালো করিয়া জানেন, এই বৈদেশিক নীতির বা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন না হইলে পর সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গোয়া-সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করাও ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ তাহা ভারত গভর্নমেণ্টের আন্তর্জাতিক নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাছাড়া উহা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস-নীতিরও বিরোধী।

গোয়াতে প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র কার্যকলাপ দেখা দেয় এই আন্দোলনের সর্বশেষ পর্যায়ে, কতকটা পর্তুগীজদের পুলিসী সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুত্তর

হিসাবে। সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা গোয়ার জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মনে জাগিতে থাকে তাঁহাদের আন্দোলনের একটা মরীয়া অবস্থায় পেঁছিয়া। ভারত গভর্নমেণ্টের কোনো উস্কানি, গোপন প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্র তাহার জন্য দরকার করে নাই। বরং এ সম্পর্কে এ কথাই বলা সংগত যে, ভারত গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে গোয়া সমস্যার সমাধানের জন্য কিংবা গোয়া হইতে পর্তুগীজ শাসন উচ্ছেদের জন্য কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের আশু সম্ভাবনা বা আশা নাই ইহা সুনিশ্চিতভাবে জানার পর, আন্দোলনের যে সমস্ত কর্মীরা তখনও বাহিরে ছিলেন তাঁহাদের মনে ক্রমশ সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা জাগিতে থাকে। সালাজারের জ্যাক্‌বুটের তলায় নিজেদের প্রতিকার-হীন অসহায় অবস্থার মধ্যে আন্দোলনকে সম্মুখে আগাইয়া নিবার আর কোনো পথ খোলা না পাইয়া সশস্ত্র উপায়ে কিছু করা যায় কিনা তাঁহারা সে কথা চিন্তা করিতে থাকেন। ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহাদের তরফ হইতে অভিযোগ বা অনুযোগ এই যে, এ সম্পর্কে যে ধরনের ব্যবহারিক সাহায্য ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহাদের কিছুটা প্রত্যাশিত ছিল তাহাও কোনো সময় তাঁহারা পান নাই।

১৯৫৫ সালের গোড়ার দিক হইতে গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের যে নূতন পর্যায় আরম্ভ হয়, তাহাকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম, ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিক হইতে ১৯৫৫ সালের ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত। এই পর্যায়ে গোয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতের অনুকরণে অহিংস সত্যাগ্রহ ও প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের নিতান্ত প্রাথমিক স্তরেও জনসাধারণের পক্ষে স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করার কিংবা নিজেদের সংগঠন গড়িয়া তোলার ব্যাপারে কমপক্ষেও যতটুকু স্বাধীনতা ছিল সালাজারের আমলে গোয়াতে তাহা কোনো সময়েই ছিল না; ১৯৫৪-৫৫ সালে তো নয়ই। এই সময়ে গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামে সাধারণভাবে নিজেদের সহানুভূতি জানানো এবং পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের কাছে গোয়ার ভারতভুক্তির প্রস্তাব আনা ভিন্ন ভারত গভর্নমেণ্ট গোয়ার ভিতরে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগঠন গড়িয়া তোলার ব্যাপারে কোনো প্রত্যক্ষ বা ব্যাপক সাহায্য করেন নাই। ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন বোম্বে হইতে গোয়ার ভিতর সত্যাগ্রহী দল নিয়া যাওয়ার প্রস্তাব আনেন, সে সময় ভারত সরকার খালি গোয়াবাসী সত্যাগ্রহীদের ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গোয়ায় প্রবেশ করার অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু নয়। বোম্বাই বা পশ্চিম ভারতে প্রবাসী গোয়াবাসীদের ভিতর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার চালানোর জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট যে অল্পবিস্তর সাহায্য কিছুই করেন নাই তাহা নয়। কিন্তু সে সাহায্য কোনো সময়েই গোয়ার ভিতরে খুব কার্যকরীভাবে প্রসারিত হয় নাই। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস আসিতে আসিতেই এই সময়কার প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের সমস্ত শক্তি ও সংগঠন নিঃশেষিত হইয়া যায়। গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের নিজেদের চেষ্টায় সংগঠিত শেষ প্রকাশ্য গণ-সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠান হয় ঐ বছরের ৬ই এপ্রিল। মাপ্‌সা-তে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়া ঐ দিনই শ্রীমতী সুধাবাঈ যোশী গ্রেপ্তার হন। তাহার পর হইতে এ পর্যন্ত গোয়ার ভিতরে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে কোনো সভা-সমিতির অধিবেশন বা প্রকাশ্য গণ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় নাই।

মুক্তি-সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯৫৫ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ

হইতে যখন নানা সাহেব গোরে প্রথম ভারতীয় সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসৈনিক দলের নেতৃত্ব করিয়া পুণা-বেলগাঁও-বান্দার পথে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করেন। এই অধ্যায়কে গোয়া-মুক্তি সংগ্রামে ভারত হইতে আগত স্বেচ্ছাসৈনিকদের সত্যাগ্রহ অভিযানের অধ্যায় বলা চলে। এই সময় হইতে ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত গোয়ার ভিতরে মুক্তি-আন্দোলনের কর্মীদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকে, ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের বেআইনীভাবে গোয়া-সীমান্ত লঙ্ঘন করার ব্যাপারে সাহায্য করার মধ্যে। ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতনের ফলে তখন এ ছাড়া তাঁহাদের আর বেশী কিছু করা সম্ভবও ছিল না। গোয়ার ভিতরে মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান প্রধান নেতারা প্রায় সকলেই তখন জেলে কিংবা নির্বাসনে। গোয়ার ভিতরে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের ও বিশেষ করিয়া গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্মী যাঁহারা জেলের বাহিরে ছিলেন তাঁহাদের কোনোমতে আত্ম-গোপন করিয়া পুলিসের হাত হইতে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইতেছিল। ভারতীয় সত্যাগ্রহী দল আসিতে আরম্ভ করার ফলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতময় গোয়ার ব্যাপার নিয়া তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার দরুন গোয়ার জনসাধারণের মনে এ প্রত্যাশা ছিল যে, এবার হয়ত ভারত গভর্নমেণ্ট গোয়া সমস্যার সমাধানের জন্য, কূটনৈতিক পথেই হোক আর হায়দরাবাদের মত সামরিক বা আধা-সামরিক "পুলিসীব্যবস্থা" প্রয়োগ করিয়া হোক, একটা কিছু সত্যকার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহ এবং ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজ সৈন্যদের নৃশংস গুলী চালনার পরও ভারত সরকারকে যখন খালি পর্তুগালের সঙ্গে কূটনৈতিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা, এবং কিছুটা জোরালো ভাষায় "তীব্র প্রতিবাদ" জানানো ভিন্ন আর কিছুই করিতে দেখা গেল না, তখন হইতে ভারত সরকার আর যে এ বিষয়ে খুব বেশী কিছু করিবেন, সে ভরসা গোয়ার জাতীয়তাবাদীদের মনে ক্রমশ স্তিমিত হইয়া আসে। অথচ ভারত গভর্নমেণ্ট এইভাবে চুপ-চাপ করিয়া বসিয়া থাকার ফলে গোয়ার ভিতরে জাতীয়তাবাদী কর্মী বা রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোকেদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নায়ক মন্তেইরো এবং 'পিদে'-বাহিনীর নির্দেশে পরিচালিত নির্যাতনের অভিযান, ধর-পাকড়, খানা-তল্লাসী, পুলিস হাজতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিসের অমানুষিক অত্যাচার —এসব কিছুই বন্ধ হয় নাই বা তাহার প্রকোপ লেশমাত্র কমে নাই। বরং এই সময়ে নির্যাতনের মাত্রা দিনের পর দিন আরও যেন বাড়িয়া যাইতে থাকে। গোয়াতে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের মনে ,এবং বিশেষ করিয়া সালাজার গভর্নমেণ্টের উপনিবেশ-মন্ত্রীর মনে, বোধ হয় এইরকম একটা ধারণা জন্মায় যে, নেহরু গভর্নমেণ্ট গোয়ার ব্যাপারে চুপচাপ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বেশী কোনো হৈ-চৈ করিতে সাহস পাইতেছেন না। তখন সেই সুযোগে গোয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সংগঠনের ছিটফোঁটা যেটুকু যা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাকে সম্পূর্ণ পিষিয়া মারাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। ঋণের শেষ ও শত্রুর শেষ যে রাখিতে নাই—বিশেষত সেই শত্রু যদি ঘরের-জমিদারীর বিদ্রোহী প্রজা হয়— সালাজার সরকার সে নীতিতে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। ইহার ফলে এই সময়, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের পর হইতে ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গোয়াতে পুলিসের নির্যাতন, মারধোর ইত্যাদি পূর্বের তুলনায় আরও মারাত্মক এবং নৃশংস আকারে দেখা দিতে আরম্ভ করে। গোয়ার ভিতরকার জাতীয়তাবাদী মুক্তি-আন্দোলন ইহার ফলে অপরিহার্যরূপে ক্রমশ সশস্ত্র প্রতিরোধ ও পাল্টা সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য হয়।

বলা বাহুল্য, এই ধরণের মরীয়া হতাশার মনোভাব হইতে যে সন্ত্রাসবাদ দেখা দেয়, তাহা কোথাও জনসাধারণের মুক্তি-আন্দোলনকে সাফল্যের পথে আগাইয়া নিয়া যাইতে সাহায্য করে না। কিন্তু যে পরিবেশের ভিতর গোয়ার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম আর কোনো পথ খুঁজিয়া না পাইয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরার মত ব্যর্থ-সন্ত্রাসবাদের রাস্তা বাছিয়া নেয়, আমার নিজের দিক দিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিতে কোনো বেগ পাইতে হয় নাই। অতীতে আমি, যেটুকুই হোক, বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং অহিংস সত্যাগ্রহের নীতি আমার স্বধর্ম নয়, মনে মনে এই ধারণা থাকার দরুন গোয়ার সশস্ত্র মুক্তি-যোদ্ধাদের সম্পর্কে আমার মনে সহানুভূতি না জাগিয়া পারে নাই।

আমরা আগুয়াদা দুর্গে বদ্‌লি হইয়া আসার অল্প কিছুদিন পরেই খবর পাই, গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা-সর্দার এবং গোয়ায় স্বনাম-খ্যাত কাসিমির মন্তেইরোর দলের সাথে, (পাহাড়ের দুর্গম রাস্তায় মন্তেইরো জীপ চালাইয়া যাইবার সময়) গুপ্ত জাতীয়তাবাদী দলের একটি বড় রকমের সশস্ত্র সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে বুকে গুলী লাগিয়া মন্তেইরো হাসপাতালে আসিয়া মারা গিয়াছে। দু' একদিন বাদেই অবশ্য আমরা এ খবরও পাইয়া যাই যে, আগের সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য নয়। জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে তাহার সশস্ত্র সংঘর্ষ ও গুলী-বিনিময় হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু অতি অল্পের জন্য সে বাঁচিয়া গিয়াছে। জাতীয়তাবাদীরা পাহাড়ের নির্জন পথে জঙ্গলের ভিতর হইতে লুকাইয়া তাহার জীপের টায়ার লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায় এবং টায়ার ফাটিয়া জীপটি থামিয়া গেলে আরও কাছে আসিয়া জীপের আরোহীদের উপর সমানে কিছুক্ষণ ধরিয়া গুলী চালাইতে থাকে। মন্তেইরোর জীপে সে নিজে ছাড়া তাহার সঙ্গে কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী পুলিসও ছিল। যেদিক হইতে জীপের উপর গুলী আসিতেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া তাহারা পাল্টা স্টেন্‌গান চালাইতে আরম্ভ করে। মন্তেইরোর সঙ্গীদের ভিতর একজন সঙ্গী এই গুলী-বিনিময়ের ভিতর মারা যায়। মন্তেইরো নিজে পাঁজরায় গুলী লাগিয়া পড়িয়া যায়। আর কয়েক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হইলেই তাহার ফুস্‌ফুস্‌ কিংবা হৃদ্‌পিণ্ড গুলীতে বিদ্ধ হইত। তাহার একটি হাতেও কয়েকটি গুলী লাগে; কিন্তু তাহার কোনো আঘাতই মারাত্মক হয় নাই। কিছুদিন হাসপাতালে থাকিয়া সে সারিয়া ওঠে এবং যথানিয়মে সালাজার সরকার তাহাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন। বলাই বাহুল্য, মন্তেইরোর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তখন হইতে আরও অপ্রতিহত হইয়া ওঠে।*

---

*গোয়া হইতে আসার পর নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাই দোর্দণ্ডপ্রতাপ কাসিমির মন্তেইরো হঠাৎ গভর্নর জেনারেলের হুকুমে পদচ্যুত হইয়াছে। গোয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বে-পরোয়া দমননীতি চালাইয়া যে ব্যক্তি বারবার সালাজার সরকার দ্বারা সম্মানিত হইয়াছে তাহার হঠাৎ পদচ্যুত হওয়ার কারণ কি তাহা পুরাপুরি জানা না গেলেও খবর পাওয়া গিয়াছে, জনৈক মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে ব্যক্তিগত কারণে বিবাদের সময় তাহাকে চড় মারার অভিযোগেই নাকি গভর্নর জেনারেল সরাসরি মন্তেইরোকে ডিস্‌মিস করিয়াছেন। বোম্বাই পুলিসের ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট, লণ্ডনের কসাই, পেশোয়ারে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ট্রাক ড্রাইভার, গোয়াতে ম্যাঙ্গানীজ খনির ইজারাদার—ভাগ্যান্বেষী মন্তেইরো গোয়াতে ডাঃ সালাজারের পার্টি 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'-কে আশ্রয় করিয়া পুলিস কমাণ্ডাণ্ট রুম্বার অনুগ্রহে কিভাবে ক্রমে ক্রমে গোয়া পুলিসের রাজনৈতিক

আগেই বলিয়াছি, আগুয়াদায় আসার পর হইতে আমরা গোয়া হইতে প্রকাশিত পর্তুগীজ খবরের কাগজ জেলের ভিতরে কেনার অনুমতি পাই। এর প্রত্যেকটি কাগজ সরকার অনুমোদিত কাগজ (কারণ সরকারী অনুমোদন ও সেন্সরশিপ ভিন্ন কোনো খবরের কাগজ কেন, ছাপার অক্ষরে একটি লাইনও গোয়াতে প্রকাশিত হইতে পারে না)। কাজে কাজেই সরকারী ইস্তাহার ভিন্ন বা গ্রেপ্তারের খবর ভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগে সম্পর্কিত কোনো রাজনৈতিক সংবাদ এইসব কাগজে প্রকাশিত হইত না। কিন্তু তবুও এইসব কাগজের মধ্যে যেসব সরকারী বুলেটিন ছাপা হইত, তাহার মারফত গুপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের কিছু কিছু খবর আমরা পাইতাম। এ ছাড়া, আগুয়াদাতেও 'আল্‌তিন্যো' জেলের মতই আমাদের বাহিরের (অবশ্য গোয়ার ভিতরকার) রাজনৈতিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত খবরাখবর পাওয়ার একটি বড় রাস্তা ছিল আমাদের পর্তুগীজ সৈনিক প্রহরীরা। আগুয়াদা জেলের সৈনিকরা জেলের মোটামুটি বিধি-নিষেধ বাঁচাইয়া আমাদের সংগে গল্পগুজব করিতে কিংবা বাহির হইতে আমাদের জন্য খবরাখবর নিয়া আসিতে মোটেই কার্পণ্য করিত না। কাজে কাজেই গোয়াতে জেলের বাহিরে কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিলে বা গুপ্ত সন্ত্রাসবাদীরা কোথাও কোনো গুলীগোলা চালাইলে আমাদের এই সৈনিক বন্ধুদের মারফত প্রায় সংগে সংগে সে সম্পর্কে কিছু না কিছু জানিতে পারিতাম। তাছাড়া, জেলের বাহিরের (অবশ্য সে বাহিরটা গোয়ার ভিতরেই সীমাবদ্ধ, সেটি গোয়ার বাহির নয়) সংগে খবরাখবর লেন-দেন করার কিছু গোপন

গোয়েন্দা বিভাগের কর্তৃত্ব পদে উন্নীত হয় তাহা আগেই বর্ণনা করিয়াছি। রুম্বার সংগে গভর্নর জেনারেল বের্নার্দ গেদীসের খুব বনিবনা ছিল না এবং সেই জন্যই রুম্বাকে শেষ পর্যন্ত গোয়া হইতে বিদায় নিতে হয়; এমন হইতে পারে, মন্তেইরো রুম্বার অনুগ্রহভাজন বলিয়া জেনারেল গেদীস তাহাকে প্রথম হইতেই ভালো নজরে দেখিতেন না। সালাজারী ব্যবস্থায় পুলিস ও মিলিটারীর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সালাজার পুলিস এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী 'পিদে'-কে দিয়া মিলিটারীকে নজরে রাখেন আবার মিলিটারীর লোকেদের দিয়া দরকার হইলে পুলিসকে সায়েস্তা রাখেন। তাঁহার সিকিউরিটী পুলিস বা 'Policia Segurancha' দুয়ের উপরেই নজর রাখে। 'পিদে' আবার দরকার মত সিকিউরিটী পুলিসের উপর নজর রাখে। বের্নার্দ গেদীস নিজে মিলিটারীর লেফটেনান্ট জেনারেল; তার উপরে রাজনৈতিক দিক দিয়া তিনি সালাজারের একান্ত বিশ্বাসভাজন লোক। বের্নার্দ গেদীসের পূর্ববর্তী কোনো গভর্নর জেনারেল গোয়াতে পুলিসকে বাগ মানাইতে পারিয়াছেন এরূপ বড় দেখা যায় নাই। আমার ধারণা জেনারেল বের্নার্দ গেদীস প্রথমটায় না হইলেও, ১৯৫৬ সালে ডাঃ সালাজার তাঁহার কার্যকাল আরও চার বছরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়ার পর, তিনি ক্রমে ক্রমে পুলিসের ক্ষমতা খর্ব করিয়া আনিয়া গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ও শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিতে থাকেন। শোনা যায় তাঁহার চেষ্টাতেই গোয়ার সরকারী দল 'ইউনিয়ন নাসিওনালের' সংগঠনের নাকি কিছুটা রদ-বদল হইয়াছে এবং তাহার ভিতরেও গোয়েন্দা পুলিসের যে প্রভাব ছিল তাহা কিছুটা কমিয়াছে। ১৯৫৬ সালে নূতন পুলিস কমান্ডান্ট হিসাবে যিনি নিযুক্ত হইয়া আসেন তিনিও মিলিটারীর লোক এবং বের্নার্দ গেদীসের অনুমোদিত লোক। তাছাড়া ১৯৫৬-৫৭ সালের পর জাতীয়তাবাদী প্রকাশ্য বা গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তীব্রতাও ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। ফলে হঠাৎ ফাঁপিয়া ওঠা নামগোত্রহীন ভাগ্যান্বেষী মন্তেইরোর গোয়েন্দাগিরির

লক্ষ্য বন্দীদের নিজেদেরও ছিল।‡ এইভাবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া টুক্‌রা টুক্‌রা খবর মিলাইয়া নিয়া, আমরা জেলের মধ্যে থাকিলেও, গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম কিভাবে ক্রমশ সশস্ত্র প্রতিরোধ ও গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথের দিকে মোড় নিতেছিল, তাহা বুঝিতে আমার খুব বেশী অসুবিধা হয় নাই। অত্যাচারী পুলিস কর্মচারীদের উপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ ভিন্ন মিলিটারী ও পুলিস চৌকির উপর অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা, কখনও বোমার বা ডিনামাইটের সাহায্যে কোনো ব্রিজ উড়াইয়া দেওয়া কিংবা সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে 'স্যাবোটাজ' (ধ্বংসমূলক কাজ) করার চেষ্টা—এইসব ধরনের ঘটনার সংখ্যা এই সময় খুব বাড়িয়া যায়। আমাদের মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের জজ-আর্ভিটর কুয়াড্রসের উপর বোমা পড়ে এই সময়েই।

এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটিলেই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের রেডিয়ো মারফত কিংবা সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিতেন, এসব ঘটনা হয় ভারত সীমান্তের কাছাকাছি জায়গায় ভারতীয় স্পাই বা গুপ্ত এজেন্টদের দ্বারা কিংবা গোয়ার ভিতরের দিকে হইলে ভারত গভর্নমেন্টের বেতনভোগী গোয়ানীজ 'বান্দিদো'-'ব্যান্ডেলেইরো'-গুন্ডা, বদমায়েসদের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পর্তুগীজ পুলিস এইসব ঘটনার সংগে ভারত গভর্নমেন্টের বা ভারতীয় কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রমাণ করিতে পারে নাই।

গুপ্ত স্বাধীনতাবাদীদের তরফ হইতে এই ধরনের এক একটি ঘটনা ঘটার সংগে সংগে জনসাধারণের উপর এবং পুলিসের সন্দেহক্রমে এইসব ঘটনা উপলক্ষে যাহারা গ্রেপ্তার হইত, তাহাদের উপর পুলিসের অত্যাচার এবং পীড়নের মাত্রাও সকল সীমা ছাড়াইয়া যাইত। সাওয়াই নামে একটি গ্রামে একজন গোয়েন্দা পুলিসের চর বা ইন্‌ফর্মার নিহত হয়। তাহার ফলে গোটা সাওয়াই গ্রামের সমস্ত পুরুষ এবং কয়েকজন মহিলাকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া জেলে নিয়া আসা হয়। আট বছর বয়সের বৃদ্ধ পর্যন্ত বাদ পড়েন নাই। ইঁহাদের কয়েকজন সাত-আট মাস, আমরা আগুয়াডা জেলে থাকার সময় সেখানে থাকিয়া গিয়াছেন। এইরকম গ্রামও গ্রেপ্তার এক আধটি বা এক আধবার নয়, বারে বারেই ঘটিয়াছে। এইরকম সময়েই পাঞ্জিম কুয়ার্টেলের হাজতে পুলিসের হাতে মার খাইয়া পর পর কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু হয়। তাহাতে বাহিরে জনসাধারণের ভিতরেও কিছুটা চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিস অবশ্য যথারীতি কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করে যে, এসব বন্দীরা কেহ হয়ত হাজত হইতে পালাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া উঁচু দেওয়ালের উপর হইতে পড়িয়া মারা গিয়াছে। কয়েকজন সম্পর্কে বলা হয়, তাহাদের অপরাধ সম্পর্কে

উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি আর বেশী বোধ করেন নাই। এ সব কিছুর ভিতর সমষ্টিগত সত্যাগ্রহের আন্দোলন আর প্রায় সহজেই স্তিমিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। দু বছর পূর্বে হইলে এর মধ্যে সত্যাগ্রহীদেরকে ছাড়ানো সম্ভব হইত না। অবশ্য সত্যাগ্রহীরা আজ নাই বলিয়াই গোয়ায় সরকারী শাসনের রূপ বদলাইয়াছে তাহা মনে করারও কোনো কারণ দেখিতেছি না।

‡গোয়া হইতে জেলের ভিতর এখন নিয়মিত রকমে সূত্র থাকিলেও এই গেরিলা বাহিনী সম্পর্কে সঠিক খবর এখানে পৌঁছাইবার মত সহজ আজও আসে নাই। আগুয়াডা বা রেইস মাগুস্ দুর্গের বন্দীশালায় যে সব বন্দীরা আছেন ইহাতে তাঁহাদের অযথা অসুবিধা ঘটিতে পারে।

জেরোনিমোর নাম শুনিয়া। বিভিন্ন থানায় এবং কুয়ার্তেলের হাজতে সত্যাগ্রহীদের ও আটক রাজনৈতিক বন্দীদের উপর বেপরোয়াভাবে মারধোর করা, নানান্ কায়দায় তাহাদের উপর অত্যাচার করা বা তাহাদের যতভাবে সম্ভব নাকাল ও অপদস্থ করার কৌশল বাহির করিতে তাহার জুড়ি পর্তুগীজ পুলিস বাহিনীর ভিতরেও খুব বেশী ছিল না। এ প্রসঙ্গে তাহার সম্পর্কে যেসব কাহিনী সহবন্দীদের নিকট শুনিয়াছি, তাহাতে আমার সব সময় মনে হইয়াছে যে, এক 'পিদে'-বাহিনীর আলেশান্দর-এর কথা বাদ দিলে জেরোনিমোর মত নৃশংস ও 'সাডিস্ট' (Sadist) অত্যাচারী বোধ হয় গোয়াতে সে সময় দুর্লভ ছিল। কোনো বন্দী অপরাধ স্বীকার করিতে চাহিতেছে না, পিটাইয়া মুখে রক্ত তুলিয়া তাহার কাছ হইতে সই করা এক্‌রারনামা আদায় করিতে হইবে—এরূপ ক্ষেত্রে ডাক পড়িবে জেরোনিমোর। কোথাও সত্যাগ্রহী দল হাজতে আসিয়াও ঢিট্ হয় নাই—তাহাদের ঠাণ্ডা করার জন্য এবং পুলিস হাজত কি, তাহা সমঝাইয়া দেওয়ার জন্য তাহারই ডাক পড়িবে। তাছাড়া সে তাহার এই কেরামতির জন্য তখনকার দিনে গোয়া পুলিস বিভাগের প্রায় সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মন্তেইরো ও ইন্সপেক্টর অলিভেইরার বিশেষ প্রিয়পাত্র। কাজে কাজেই নিজেকে সে খুবই বাহাদুর জবরদস্ত লোক বলিয়া মনে করিত।

জেরোনিমোর বাড়ী ছিল গোয়াতে পর্তাগাল বলিয়া একটি গ্রামের কাছে। এই পর্তাগালে হিন্দুদের একটি বহুদিনের পুরাতন মঠ আছে; মঠের দেবতা মহাদেব শংকর। বলাই বাহুল্য, পুলিস বাহিনীর একজন কেউ-কেটা লোক বলিয়া সে-অঞ্চলে পরিচিত থাকাতে মধ্যে মধ্যে ছুটিতে বাড়ি আসিলে জেরোনিমো নিজের গ্রামে ও গ্রামের আশেপাশে খুব প্রতিপত্তি খাটাইয়া বেড়াইত। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে একদিন সে এইভাবে পর্তাগালে আসিয়া প্রচুর মদ খাইয়া এবং নিজের আরও জনকয়েক ফিরিঙ্গী মাতাল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়া এদিক ওদিক হল্লা করিয়া বেড়াইবার পর হঠাৎ তাহার মাথায় খেয়াল চাপে—আজ মঠে গিয়া হিন্দুদের দেবতার কাছে নিজের দাপট জাহির করিয়া আসিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে মঠে আসিয়া পুরোহিতের কাছে বলে—"মন্দিরের দরজা খুলিয়া দাও। তোমাদের দেবতা কেমন দেখিব!" পুরোহিত দরজা খুলিতে অস্বীকৃত হইলে তাহারা জোর করিয়া মন্দিরের দরজা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং সকলকে দেখাইয়া দেববিগ্রহকে অপবিত্র করে (যেভাবে অপবিত্র করে তাহা এখানে ছাপার অক্ষরে না লিখিলেও চলিবে)। মঠাধিকারী আচার্য—তাঁহার নাম স্বামী পরশুরামাচার্য—তখন মঠে উপস্থিত ছিলেন না। ফিরিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া তিনি থানায় খবর দিতে বলেন। থানাতে জেরোনিমোর নাম শুনিয়া সুব শেফ্ দারোগা যিনি ছিলেন, তিনি মঠের নালিশ লিখিয়া নিতে অস্বীকার করেন এবং ধমকাইয়া মঠের পুরোহিত এবং অন্যান্য লোকেদের তাড়াইয়া দেন*। ইহার পরবর্তী সকল ঘটনা খুঁটিনাটি আগুয়াদায় বসিয়া আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই। এই বর্ণনার বেশীর ভাগ ঘটনাই আমি সংগ্রহ করিয়াছি গোয়ার পর্তুগীজ দৈনিক কাগজ 'এরাল্‌দো' এবং 'ও এরাল্‌দো'তে প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে। স্থানীয়

---

*গোয়াতে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় ধর্ম প্রায় রাজধর্মের পর্যায়ে থাকিলেও সাধারণ পক্ষে হিন্দু বা মুসলমান কোনো ধর্ম সম্প্রদায়েরই সাধারণ ধর্মাচরণে এখন কোনো বিধি-নিষেধ আরোপিত নাই।

হিন্দুদের মধ্যে ইহা নিয়া যে কিছুটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাহা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ঘটনার পরিণতি ঘটে পর্তাগালের মঠে জেরোনিমো-র দ্বারা অনুষ্ঠিত হাঙ্গামার তারিখ হইতে সপ্তাহকালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে জেরোনিমো বারেটোর সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়া। একদিন রাত্রিতে নয়টা-দশটার সময় পুলিসের পোশাক পরিহিত কিছু লোক আসিয়া বারেটোর বাসার সম্মুখে দরজায় কড়া নাড়িয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে থাকে। ডাকাডাকির আওয়াজ শুনিয়া সে প্রথমটা জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখার চেষ্টা করে, কে আসিয়াছে। পুলিসের পোশাক পরিহিত লোক দেখিয়া তাহার মনে আর কোনো সন্দেহ জাগে নাই। কিন্তু বাহিরে আসিয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছদ্মবেশী অতিথিদের হাতে স্টেনগান গর্জিয়া ওঠে এবং বারেটোর প্রাণহীন দেহ ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া তাহার ভাই ও পরিবারের অন্যান্য লোকেরা বাহিরে আসিলে তাহাদেরও একে একে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এ কাজ শেষ করিয়া ছদ্মবেশী সন্ত্রাসবাদীর দল পালাইয়া যায়। কেহ ধরা পড়ে নাই।

পরের দিন এই খবর পাঞ্জিমে পুলিস কুয়ার্টেলে পৌঁছানর পর পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষের মানসিক অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পর্তাগাল এবং তাহার চারিদিককার সমস্ত গ্রামের হিন্দু অধিবাসীদের উপর এবং পর্তাগালের মঠের উপর সেদিন হইতে ক্রমান্বয়ে পুলিস ও মিলিটারীর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যে অত্যাচার চলে, তাহার তুলনা গোয়ার ইতিহাসেও কম খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। গ্রামের নিরপরাধ মহিলারা এবং ছোট ছোট ছেলেরাও এই অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পান নাই। আর এ অত্যাচারের একটি বিশেষত্ব এও ছিল যে, ইহার প্রকোপ কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ পুলিসের মনে দৃঢ়ভাবে এ সন্দেহ জাগে যে, হিন্দু মঠাধিকারী ও পুরোহিতরাই গোপনে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া এই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছে। কাজে কাজেই পুলিসের আক্রোশটা বেশী করিয়া গিয়া পড়ে হিন্দুদের উপরেই। কিন্তু হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারের ফলে গোয়ার পর্তুগীজ রাজভক্ত হিন্দু উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও কিছুটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং শুনিয়াছি হিন্দু ধনিক ব্যবসায়ী ও বড় বড় জমিদারদের প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু লোক এই সময়ে ইহার বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেল বের্নার্দ গেদীসের কাছে দরবার করিতেও যান। বের্নার্দ গেদীস সাহেবও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যদি এভাবে অত্যাচার চালানো যায়, তাহা হইলে হয়ত হিন্দুদের মনে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং তাহা দিলে সেটা গোয়াতে পর্তুগীজ রাজত্বের ভবিষ্যতের পক্ষেও খুব মঙ্গলজনক হইবে না। ইহার ফলে এই অত্যাচার ক্রমে ক্রমে বন্ধ করা হয়। সাধারণ হিন্দু গ্রামবাসীদের মধ্যে যেসব লোককে এই ঘটনা উপলক্ষে সন্দেহক্রমে হাজতে আটক করা হয়, তাহাদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পর্তাগাল মঠের পুরোহিত ও মঠাধিকারী শ্রীযুক্ত পরশুরামাচার্যকে পুলিস অব্যাহতি দেয় নাই। পরে বিচারে তাঁহার লম্বা মেয়াদের কারাদণ্ড সাজা হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত ভদ্রলোককে পাঞ্জিম কুয়ার্টেলের হাজতের ভিতরে পুলিস পিটাইয়া হত্যা করে। শ্রীপরশুরামাচার্যকে গত ১৯৫৬ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অন্যান্য আরও অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে হাজতে আটক রাখা হয়। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে (অর্থাৎ আমরা গোয়া হইতে চলিয়া আসার বৎসরাধিক কাল পরে) মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের

বিচারে তাঁহার এবং অন্যান্যদের ১৭ বছর হইতে ২৬ বছর পর্যন্ত সাজা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালে এইরূপ একটি নয়, সন্ত্রাসবাদীদের চেষ্টায় এই ধরনের আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। গোয়ার ভিতরে দুধ-সাগর হইতে মাড়গাঁও পর্যন্ত ২৫ মাইল রেলপথ বারবার ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিবার ও ট্রেন 'ডি-রেল' করার চেষ্টা হয়। এমন কি জুলাই-আগস্ট মাসে (১৯৫৬ সাল) মাড়গাঁও ও ভাস্কো বন্দরে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ডক্ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয় বলিয়া পুলিস সন্দেহ করে এবং সন্দেহক্রমে বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও খ্রিশ্চিয়ান পরিবারের লোকেদের ধরিয়া জেলে নিয়া আসে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আগুয়াদায় আমাদের দেখা হয়। আমাদের মামলার অন্যতম এডভোকেট শ্রীযুক্ত ডাম্বার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি ভাস্কো বন্দরের ডক নির্মাণের অন্যতম কন্ট্রাক্টর ছিলেন, এই মামলায় অভিযুক্ত হইয়া আগুয়াদা জেলে আসেন। এখানে সমস্ত ঘটনার বিবরণ বা খুঁটিনাটি ইতিহাস লেখার দরকার করিবে না। খালি এ সম্পর্কে পর্তুগীজ প্রোপাগাণ্ডার কথা মনে রাখিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একেবারে গোয়ার অভ্যন্তরে—রাজধানী পাঞ্জিম ও অন্যান্য শহরের যেখানে ও যেরকম ব্যাপকভাবে এইসব ঘটনা ঘটিয়েছিল, তাহাতে ইহাদের সম্পর্কে এ উক্তি কিছুতেই করা চলে না—ইহা খালি ভারতীয় গুপ্তচর বা স্পাইদের কাজ। এও বলা চলে না যে, ভারত সীমান্তের অপর দিক হইতে দুই-চারজন গুপ্তচর বা মাহিনা-করা এজেন্ট গোয়ার ভিতরে আসিয়া সীমান্তের কাছাকাছি জায়গায় এই ধরনের কাজ করিয়া আবার লুকাইয়া ভারতে পালাইয়া যাইত বলিয়াই পর্তুগীজ পুলিসের পক্ষে এই ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই।

পর্তসালে জেরোনিমো বারেটোর হত্যা এবং ভাস্কো ও মুর্মুগোয়ার ডক উড়াইয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে উপলক্ষ করিয়া যখন গোয়ার ভিতরে আবহাওয়া খুব উত্তেজনাময় হইয়া ওঠে, সে সময় পর্তুগীজ সরকার জনৈক রাজনৈতিক বন্দীর তথাকথিত স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া এক আজগুবি কাহিনী প্রেস কনফারেন্স করিয়া তাঁহাদের খবরের কাগজ মারফত চারিদিক প্রচার করিতে চেষ্টা করেন যে, 'কর্নেল চৌধুরী' নামে ভারতীয় সেনা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বেলগাঁও-এর নিকটে গোয়া সীমান্তের কাছাকাছি কোনো জায়গায় গোপনে এক 'গোয়া মুক্তিফৌজ'কে ('লিবারেশন আর্মি') 'স্যাবোটাজে'র কাজে হাতে-কলমে তালিম দিতেছেন। কিন্তু এসম্পর্কে এই 'স্বীকারোক্তি' ছাড়া অন্য কোনোও দলিল-প্রমাণ তাঁহারা উপস্থিত করেন নাই। গোয়ার ভিতরকার সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম বা সন্ত্রাসবাদ যে গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনেরই একটি দিক এবং গোয়ার জনসাধারণের ভিতর এই সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট নৈতিক সমর্থন ছিল, সে বিষয়ে আমার মনে কোনোও সন্দেহ নাই। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের লোকেরা সাধারণত কোনোও সশস্ত্র কার্যকলাপে লিপ্ত হইতেন না। পর্তুগীজ পুলিসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এইসব কার্যকলাপ সাধারণত 'আজাদ গোমন্তক দল' বা 'আজাদ গোয়া দল' নামে পরিচিত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত হয়। বোম্বাই-এ উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, গোয়ার ভিতরকার কর্মীদের সঙ্গে উক্ত সংগঠনেরই বোম্বাই-এর 'কেন্দ্রীয়' প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নিতান্ত ক্ষীণ ধরনের ছিল; এবং মোটেই কার্যকরী ছিল না। গোয়ার ভিতরে মুক্তি-আন্দোলন সেদিকে বহুদিন পর্যন্ত নিজের রসদ ও নৈতিক প্রেরণা

নিজে নিজে সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। বাহির হইতে এসম্পর্কে যে যাহাই বলুক বা দাবী করুক। গোয়াতে আমি এই সময় জেলের ভিতরে থাকিলেও এসম্পর্কে আমার জ্ঞান অনেকটা প্রত্যক্ষ। সমস্ত কথা এখনও খুলিয়া বলার সময় আসে নাই; কিন্তু গোয়ার ভিতরে যদি এই সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের কোনোও বাস্তব সামাজিক ভিত্তি না থাকিত এবং জনসাধারণের জাতীয়তাবাদী চেতনা হইতে যত অল্পই হউক কিছু না কিছু নৈতিক সমর্থন পাইয়া এই আন্দোলন প্রথমত সেই সমর্থন হইতে নিজের জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া অগ্রসর হইতে না পারিত, তাহা হইলে এই সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের জের আমরা টানিয়া আনার দুই বছর পর্যন্ত টানিয়া আসিত না। বলা বাহুল্য যে ধরনের ব্যাপক নৈতিক সমর্থন জনসাধারণের মধ্যে না থাকিলে এইরূপ এক একটি ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, পর্তুগীজ পুলিস গোয়ার ভিতরে এত বেশী সংখ্যায় ধরপাকড় করিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জেলে আটক রাখারও দরকার বোধ করিত না।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই যে, ১৯৫৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে গোয়াতে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। আগুয়াডা দুর্গের বন্দীশালার ভিতরে বসিয়াও বাহিরের খবরাখবর যতটুকু আমাদের কানে পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিত, তাহা হইতে একথা আমরা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতেছিলাম, গোয়ার ভিতরে এইবারকার পর্যায়ের যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—১৯৫৪ সালের গোড়ার দিক হইতে যাহার সূত্রপাত—তাহার আয়ু ক্রমশ শেষ হইয়া আসিতেছে। এই আন্দোলনের শেষদিকে যে বাস্তব অবস্থার ভিতরে সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিকল্পনা দেখা দেয় এবং যে অবস্থার চাপে এই পরিকল্পনাও সত্যাগ্রহ ও আন্দোলনের (বিক্ষোভমূলক কার্যকলাপের) উপরে উঠিতে পারে নাই, তাহাতে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের বাস্তব সাফল্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম ছিল। আগেই বলিয়াছি, ভারত সরকারের দিক হইতেও কোনোও প্রত্যক্ষ সমর্থন বা উল্লেখযোগ্য রকমের বাস্তব সাহায্য এই সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। কারণ, তাহা ভারত সরকারের ঘোষিত আন্তর্জাতিক নীতির বিরোধী। এই ধরনের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে রাজনৈতিক দিক দিয়া গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করিতে হইলে আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে বাহিরের দুনিয়ার যে ধরনের যোগাযোগ থাকা অপরিহার্য হয়, গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের নেতাদের তাহা কোনোও সময়েই ছিল না। এই সময় জেলের বাহিরে থাকিয়া গোয়ার যে সকল রাজনৈতিক কর্মী পুলিসের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া এই সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই সৎসাহসী, আত্মত্যাগী সাধারণ তরুণ। কাজে কাজেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয় প্রভাব-প্রতিপত্তির যোগাযোগ তাঁহাদের খুব কমই ছিল।

পাঠকদের মনে থাকিবে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর ভারতের জনসাধারণের রাজনৈতিক দৃষ্টি গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের দিক হইতে সরিয়া ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলনের দিকে ফিরিয়া যায়। ১৯৫৬ সালে গোয়ার কথা বা গোয়া মুক্তি-সংগ্রামের কথা এদেশে তখন সাধারণ লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল বলিলেও চলে। আবার ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের কথাই দেশের লোকের মনে বড় হইয়া উঠিয়াছে। শারদীয়া পূজা ও 'দশেরা' উৎসব শেষ হইয়া যাওয়ার পর আগুয়াডা দুর্গে আমাদের একটি কোনোও ফল ফলিতে পারে কি না, জেলের দশ বৎসরের একটানা বন্দীজীবন কাটানোর

ভাবিতে শুরু করিয়া দিয়াছি। তখন জানিতাম না, ডাঃ সালাজারের জেলে আমার থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

॥ ৪৬ ॥

জেল মুক্তি!

গোয়াতে বন্দীদশা হইতে আমরা এত তাড়াতাড়ি বা এত সহজে রেহাই পাইয়া যাইব তাহা যে আমাদের আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না সে কথা বলা বাহুল্য। দেখিতে দেখিতে আগুয়াদা জেলে কখন যে আমাদের এক বছরের উপর সময় কাটিয়া গিয়াছে, ১৯৫৬ সাল হইতে আমরা ১৯৫৭ সালে পা দিয়াছি, গোয়াতে আসার পর হইতে আমাদের এ পর্যন্ত পর পর দুইটি শারদীয়া, দুইটি বড়দিন চলিয়া গিয়াছে—সে সব কিছুই এতদিন আমরা খেয়াল করি নাই। খেয়াল করার কথা মনে ওঠে নাই; কারণ গোয়াতে হোক আর খাস পর্তুগালে হোক, ডাঃ সালাজারের জেলে পা দিয়া পুরা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কেহ সেখান হইতে ছাড়া পাইয়াছে, এরকমটা বড় শোনা যায় নাই। ১৯৫৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ গোয়ার ১৯৪৬ সালের জাতীয় আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম কাকোড়কর ও ডাঃ রাম হেগড়ে লিস্‌বন হইতে ছাড়া পাইয়া লণ্ডনের পথে ভারতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু সেটা তাঁহাদের দশ বছরের কারাদণ্ড ও নির্বাসনের মেয়াদ পুরাপুরি শেষ করিয়া তবে। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমের ছোট ভাই শ্রীদিবাকর কাকোড়কর পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে 'কাব্ ভের্দে' দ্বীপে তখনও নির্বাসনে আছেন, ছাড়া পান নাই।* ১৯৪৬-এর আন্দোলনের আর একজন নেতা শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় আত্মারাম দেশপাণ্ডে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন এবং এখনও লিস্‌বনের জেলে সেই অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। দেশপাণ্ডে গোয়াবাসী বা পর্তুগীজ প্রজা নন, ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে সাজা দেওয়া বা জেলের ভিতরে তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে গোয়াবাসীদের তুলনায় কোনোরকম তারতম্য করা হয় নাই। একথা সত্য যে ১৯৫৫ সালের আন্দোলনের সময় ভারত হইতে যে সমস্ত ভারতীয় সত্যাগ্রহী বে-আইনীভাবে গোয়ায় প্রবেশ করেন, তাঁহাদের বেশীর ভাগকেই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আটক করেন নাই, কিম্বা মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করিয়া তাঁহাদের লম্বা মেয়াদের সাজা ঠুকিয়া দেন নাই। গ্রেপ্তারের পর দু' একদিন হাজতে রাখিয়া, ভালভাবে মারধোর করিয়া, শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রায় সকলকেই তাঁহারা গোয়া সীমান্ত পার করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই সত্যাগ্রহীদের 'নেতা' হিসাবে, তাহারা আমাদের ৭।৮ জনকে যখন বিশেষভাবে বাছাই করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, আদালতে হাজির করিয়া দশ-বারো বছরের সাজা দিয়াছেন, তখন নিশ্চয় সকল দিক না ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমাদের সম্পর্কে এ ধরনের ব্যবস্থা তাঁহারা নেন নাই এবং নিশ্চয়ই গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের মত

---

* শ্রীযুত দিবাকর কাকোড়কর ১৯৫৮ সালে 'কাব্ ভের্দে' হইতে মুক্তি পাইয়া ভারতে আসিয়াছেন।

পুরা সাজা না খাটাইয়া নিয়া তাঁহারা সহজে আমাদের অব্যাহতি দিবেন না—এইটাই আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরিয়া নিয়াছিলাম। কাকোড়করদের দুই ভাই, ডাঃ হেগ্ড়ে এবং দেশপাণ্ডের কথা মনে করিয়া নিজেদের সম্পর্কে অন্য কোনো রকম আশা পোষণ করার মত ভরসা আমরা পাই নাই।

চলতি দুনিয়ার আন্তর্জাতিক কূটনীতির টানা-পোড়েনে ভারত-পর্তুগীজ সম্পর্ক কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার ভিতর দিয়া গোয়া-সমস্যার কোনো সমাধান হইবে কি না হইবে—জেলে বসিয়া তাহার কোনো আভাস-ইঙ্গিত আমরা পাইতেছিলাম না। ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে ক্রুশ্চোভ এবং বুলগানিন ভারত সফরে আসিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে গোয়ার প্রশ্নে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দাবীকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানান বটে। কিন্তু তাহার ফলে পর্তুগীজ সরকারের গোয়া সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্বতন মনোভাবের পরিবর্তন করেন নাই কিম্বা গোয়া সমস্যার আশু সমাধানের ব্যাপারে কোনো সাহায্য হয় নাই। গোয়ার প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়ন বা নূতন চীন প্রভৃতি কম্যুনিস্ট শক্তিপুঞ্জের সমর্থন যে ভারত গভর্নমেণ্টের দিকে থাকিবে, বা এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, সিংহল বা মিশর প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনসাধারণের সমর্থন আমরা পাইব সে বিষয়ে আমার বা আমার সহবন্দীদের মনে কোনো সন্দেহ কখনো ছিল না। কিন্তু রুশিয়ার সমর্থন বা পৃথিবীর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের সমর্থন, আশু প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া বিচার করিলে, গোয়া সমস্যার সমাধানে সাহায্য না করিয়া কতকটা বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৫৫ সালে গোয়ার ব্যাপারে ক্রুশ্চোভ এবং বুলগানিনের ভারতকে সক্রিয়ভাবে সমর্থনের ঘোষণা অপরিহার্যভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পর্তুগালের দিকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে। ক্রুশ্চোভ এবং বুলগানিনের ভারত সফরের সময় পর্তুগালের পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ পাউলো কুন্যা আমেরিকার তৎকালীন সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ ডালেসের সঙ্গে দেখা ও সলা-পরামর্শ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছিলেন। গোয়া সম্পর্কে ক্রুশ্চোভ এবং বুলগানিনের বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডালেস এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি নিজেদের দিকে পাইতে ডাঃ কুন্যার মোটেই বেগ পাইতে হয় নাই। ক্রুশ্চোভ-বুলগানিনের বিবৃতির ক'দিনের মধ্যেই কুন্যার সঙ্গে ডালেস সাহেব এক পাল্টা যুক্ত-বিবৃতি প্রচার করিয়া ভারতকে হুমকী দেন যে, 'পর্তুগীজ প্রদেশ' গোয়ার ব্যাপারে ভারত যদি সোভিয়েট সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা কখনই বরদাস্ত করিবে না।*

---

*পরবর্তীকালে মিঃ ডালেস অবশ্য ভারত সরকারকে এবং পৃথিবীর জনমতকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই বিবৃতি মারফত গোয়াতে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদ সম্পর্কে তিনি কোনো প্রকার সমর্থন জ্ঞাপন করিতে চান নাই। ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে করাচীতে বাগ্‌দাদ প্যাক্ট সম্মেলনে যোগদানের পর ফেরার পথে তিনি ভারতে আসেন। সে সময় নূতন দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া তিনি একথা বলেন; সরকারীভাবে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকেও এই কথাই বোঝাইতে তিনি চেষ্টা করেন। মিঃ ডালেসের সঙ্গে তাঁহার এই আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু লোক-সভায় বলেন:—

"Mr. Dulles assured me that in subscribing to the joint statement (with Dr. Cunha) U. S. A. was not supporting Portugal

গোয়া নিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই পাকিস্তান ও পর্তুগালের মধ্যে একটা গোপন আঁতাত ও যুক্তফ্রণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা পঞ্জিমে 'আল্‌তিন্যো' জেলে থাকিতে থাকিতেই পাকিস্তানের ভাবী প্রধান মন্ত্রী (বর্তমানে প্রাক্তন) জনাব সুহ্‌রাবর্দী সাহেব 'স্বাস্থ্যান্বেষণে' কয়েক দিনের জন্য গোয়ায় আসেন এবং ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা ও তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলীর নির্দেশক্রমে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের বক্তব্য প্রচার করার জন্য তিনি য়ুরোপে গিয়া অন্যান্য দেশের মধ্যে পর্তুগাল ও লিস্‌বন ঘুরিয়া আসেন। গোয়ার ব্যাপারে তাঁহার নিজের এবং পাক গভর্নমেণ্টের সমর্থন কোন দিকে তাহা ডাঃ সালাজারকে জানাইয়া দিতে সুহ্‌রাবর্দী সাহেব কোনো ত্রুটি করেন নাই বা নিজের বক্তব্য সংশয়াতীতভাবে পরিষ্কার করিয়া পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সামনে তুলিয়া ধরিতে তাঁহার কোনোই দ্বিধা হয় নাই। কারণ উভয় পক্ষের মুরুব্বি ডালেস সাহেব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি কোন দিকে সুহ্‌রাবর্দী সাহেব ডালেস-কুন্যা যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাছাড়া গোয়ার প্রশ্নে পাকিস্তান যদি পর্তুগালকে সমর্থন করে তাহার বিনিময়ে কাশ্মীরের ব্যাপারে পর্তুগাল পাকিস্তানকে সমর্থন করিবে—ইহাও পাক রাষ্ট্র নেতাদের হিসাবের মধ্যে ছিল। ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে পর্তুগাল ইউনাইটেড নেশন্‌স্ বা জাতি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে উভয়ের কাছে উভয়ের সমর্থন পাকিস্তান এবং পর্তুগাল দুইয়েরই কাম্য ছিল। গোয়া সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কূটনীতির মারপ্যাঁচ বর্ণনা করা আমার এখানে উদ্দেশ্য নয়। খালি এইটুকু জানানোর জন্য এ-কথার এখানে অবতারণা করিতে হইল যে, ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে বা ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে গোয়াতে আগুয়াদা জেলে বসিয়া আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিতেছিলাম, তাহাতে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থার সম্ভাব্য কোনো পরিবর্তনের ফলে অল্পদিনের ভিতরেই গোয়া সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এবং গোয়াতে আমরা যাহারা বন্দী হইয়া আছি, ছাড়া পাইয়া আবার সহজে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব এরূপ মনে করার কোনো কারণ দেখি নাই। বরং এইটাই আমাদের মনে হইতেছিল যে, পণ্ডিত নেহরুর চীন ও রুশিয়া পরিভ্রমণ এবং ক্রুশ্চোভ-বুলগানিনের ভারত সফরের পর পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জ বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বিশেষ সন্দেহের ও অপ্রীতির চোখে দেখিতেছে এবং গোয়া সমস্যা ক্রমশ কাশ্মীর সমস্যা নিয়া পাক-ভারত বিরোধ এবং পূর্ব-পশ্চিমের 'কোল্‌ড্ ওয়ার' বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়ায় তাহার সমাধান ক্রমশ একান্ত দুরূহ হইয়া পড়িতেছে।

---

as against India....But the position nevertheless is that the joint communique is being interpreted especially by the Portuguese authorities as if U. S. A. supported their claims."

এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট ডালেস-কুন্যা যুক্ত বিবৃতি ও মিঃ সুহ্‌রাবর্দীর গোয়া ও লিস্‌বন সফরের পর হইতে গোয়া ব্যাপারে আর নিজেদের একা বলিয়া মনে করেন না। সোভিয়েট রুশিয়া বা কম্যুনিস্ট চীন যদি ভারতের সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে আমেরিকা এবং পাকিস্তান গোয়া প্রশ্নে পর্তুগালের দিকে থাকিবে এটা তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহার ফলে গোয়া প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে আপোস-রফা করার মতো কোনো আবহাওয়া পর্তুগীজ শাসকদের মনে সৃষ্টি হয় নাই।

গোয়াতে বা ভারতে গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের তীব্রতা এই সময় ক্রমশ কিভাবে স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল সে কথা আগেই বলিয়া আসিয়াছি। ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে সারা পৃথিবী সুয়েজ সমস্যার আলোড়নে বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; সুয়েজকে উপলক্ষ্য করিয়াই বুঝিবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। সুয়েজ সমস্যার সুরাহা হওয়ার আগেই তাহার উপর আসিয়া পড়িল কম্যুনিস্ট হাঙ্গারীর অন্তর্বিপ্লব। সেখানেও পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ আসন্ন যুদ্ধের আশু সম্ভাবনা রচনা করে। ভারতের ভিতরেও তখন রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমস্যা এবং আসন্ন দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ডামাডোল দেশের রাজনীতি-সচেতন মানুষের দৃষ্টি একচেটিয়াভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ভিতরে গোয়ার কথা কিম্বা গোয়ার ভিতরে জেলে আমাদের মতন কয়জন রাজনৈতিক বন্দীর কথা কে মনে করিয়া রাখিবে? আমাদের মনের তখনকার এই হতাশাসূচক প্রশ্নের মধ্যে দেশবাসীর প্রতি হয়ত একটু অবিচার নিহিত হইয়া থাকিবে। দেশবাসী যে আমাদের কথা ভোলে নাই, তাহা সে সময় পুরাপুরি জানা না থাকিলেও আজ তাহা ভাল করিয়াই জানি এবং তাহার জন্য দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা আমার নাই। কিন্তু মোটের উপর সে সময় আগুয়াদা দুর্গের বন্দীশালায় বসিয়া গোয়া সমস্যার কোনো সমাধানের সম্ভাবনা আমাদের চোখে পড়িতেছিল না এবং তাহার সমাধান ভিন্ন ডাঃ সালাজারের জেল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সত্বর বাহিরে আসার কোনো আশা-ভরসাও আমরা পাইতেছিলাম না।

জেল জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের কয়েকজনের অর্থাৎ আমাদের ঘরে শ্রীযুক্ত নানা সাহেব গোরে, শিরুভাউ লিমায়ে ও ঈশ্বরভাই দেশাই এবং ভারতীয় সত্যাগ্রহী নেতাদের অপর সেলে শ্রীযুক্ত মধু লিমায়ে, জগন্নাথ রাও যোশী ও রাজারাম পাতিল প্রভৃতি কাহারও পক্ষেই নূতন নয়। ভারতে বৃটিশের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সময়ে তো বটেই এবং স্বাধীনতার পরেও কখনও সখনও, অল্পবিস্তর জেল খাটার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই ছিল। গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে অবশ্য অধিকাংশের কারাবাসের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমার নিজেরও ইংরেজ আমলে বেশ লম্বা মেয়াদে, একবার ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৭ সালের শেষ পর্যন্ত, আবার যুদ্ধের সময় ১৯৪০ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, জেলে আটক থাকার সৌভাগ্য হইয়াছে। গোয়াতে গ্রেপ্তার হওয়ার ছয় মাস বাদে আগুয়াদা জেলে আসিয়া উহারই মধ্যে আমরা কিছুটা 'স্থিতু' হইয়া বসার সুযোগ পাই। এ দফায় বছর বারো আমাদের হয়ত এখানেই থাকিতে হইবে। তিন দিকে সমুদ্র বেষ্টিত আগুয়াদা দুর্গের দুই নম্বর সেলই আমাদের ঘর-বাড়ি হইয়া থাকিবে এটা ধরিয়া নিয়া মনে মনে আমরা তাহার জন্য তৈয়ারী হইতে থাকি। আগুয়াদায় আসিয়া আমরা প্রত্যেকেই তাই নিজের নিজের পছন্দসই এক একটি কাজ বাছিয়া নিয়াছিলাম। নানা সাহেব মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার; এবং তাছাড়া তাঁহার ছবি আঁকার শখ আছে। কী সাদাকালো 'লাইন-স্কেচ' আর কী 'ওয়াটার কলার' উভয় প্রকার চিত্রাঙ্কনেই তিনি বিশেষ পারদর্শী। 'আল্‌তিন্যো'তে থাকিতেই তিনি মারাঠী ভাষায় আমেরিকার একটি বৃহদাকার ইতিহাস লেখা আরম্ভ করেন। শ্রীমতী গোরে তিন মাস, ছয় মাস বাদে বাদে যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, তখন প্রত্যেক বার মার্কিন ইতিহাসের বাছাই করা প্রামাণ্য পুস্তক কিছু কিছু সঙ্গে করিয়া আনিতেন। গোরে সময়টা ছবি আঁকা এবং মার্কিন ইতিহাস চর্চার মধ্যে ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন। শিরুভাউ ঠিক সাহিত্য মার্গের বা কলা মার্গের লোক নন। তিনি

প্রধানত কর্মী ও সংগঠক। কিন্তু কাজের অভাবে তিনিও একটি দিনপঞ্জী লেখার কাজ নিয়মিতভাবে হাতে নিয়াছিলেন। 'আল্‌তিন্যো'-তে থাকার সময় তিনি বাহির হইতে একটি চরখা আনাইয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু আগুয়াদায় আসার পরে মিলিটারী কর্তৃপক্ষ সেটা কাড়িয়া নেন। ঈশ্বরভাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও দর্শন চর্চায় সময় কাটাইতেন। আমার খেয়াল হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শুরু করিয়া ভারত সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস একটু বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করার ও সম্ভব হইলে সে সম্পর্কে কিছু লেখার। লেখাপড়ার কাজে গোয়াতে জেল জীবনে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল, প্রয়োজনমত বই-পত্র পাওয়া যাইত না, উপরে বলিয়াছি, এ সম্পর্কে কী অসুবিধা ছিল। তবুও উহারই মধ্যে সম্ভব মতন যত বেশী সংখ্যায় পারা যায় প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করার দিকে আমরা সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে থাকি এবং শেষ দিকে নিজের নিজের মনোমত বিষয়ে বেশ কিছু বইয়ের সংগ্রহ আমরা করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলাম। এক দাবা খেলা ছাড়া অন্য কোনো রকম খেলাধুলার সুযোগ আমাদের বিশেষ ছিল না। মধ্যে মধ্যে একঘেয়ে হইলেও তাই দাবা খেলাতেও কিছুটা সময় আমাদের কাটিয়া যাইত। ইহা ছাড়া ঘর পরিষ্কার করা, জল আনা, বাসন মাজা, চা-জলখাবার তৈরী করিয়া নেওয়া বা রান্না করা, দৈনন্দিন রুটিন মাফিক এ সব কাজও ছিল। লম্বা মেয়াদে জেলে থাকার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা সকলেই জানেন যে, জেলে আটক এই রকম অবস্থায় অতি সহজেই একটা হতাশাময় একঘেয়েমির ভাব মনের উপর চাপিয়া বসিতে চায়। আগুয়াদা দুর্গের জেল মিলিটারী জেল হইলেও, গোয়াতে আমাদের জেল-জীবনের প্রথম দিককার অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক সুসহ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের ইয়ার্ডের অতটুকু অল্প জায়গায় থাকিয়া থাকিয়া সময় সময় প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিত। সমুখে সীমাহীন সমুদ্রের জলরাশি দেখার জন্য না থাকিলে হয়ত পাগল হইয়া যাইতাম। কিন্তু সব সময়ে সেই অচলপ্রতিষ্ঠ স্থির সমুদ্রের দিকে তাকাইয়াই তো আর দিন কাটানো যায় না। ছাড়া পাইব না জানি। কিন্তু সময় সময় মনে হইত, ইহার চেয়ে যদি ইহারা আমাদের সমুদ্র পারে আফ্রিকায় মোজাম্বিক কিম্বা আঙ্গোলায় কিম্বা আটলাণ্টিক সমুদ্রের মাঝখানে আজোরেস দ্বীপে নির্বাসনে পাঠাইত তাহা হইলে মন্দ হইত না। অনেক সময় তাই আমরা মনে মনে কামনা করিতাম যে, কাকোড়কর ভ্রাতাদের মত কিম্বা ডাঃ হেগ্‌ড়ে বা গাইটোণ্ডের মত আমাদের পর্তুগালে চালান করিয়া দিক না কেন! সালাজারের খরচায় তাহা হইলে ইউরোপটাও দেখা হইয়া যাইবে। আরও দশ এগার বছর যদি ইহাদের হাতেই আটক থাকিতে হয়, তাহা হইলে গোয়ায় না থাকিয়া বাহিরে কোনো দূরদেশে যাওয়াও মন্দ নয়; যদি 'বেটারা' নিয়া যায়!

দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ, তখন কখনও সখনও চিঠিপত্রের মারফত আর বিদেশী সংবাদপত্রের মারফত যতটুকু সম্ভব তাহার বেশী আর কিছু ছিল না। আমার নিজের দিক দিয়া কিছুটা কষ্টকর ব্যাপার এই ছিল, বাংলা ভাষায় কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারিতাম না; বাংলা ভাষা জানা সেন্সর না থাকার দরুণ বাংলা বই রাখা বা আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বাংলা ভাষায় লেখা চিঠি পাওয়ার অনুমতি আমার ছিল না। ভোরে দরজা খোলার সময় হইতে রাত্রে বাতি নেভানো পর্যন্ত খালি পর্তুগীজ ভাষা, না হয় মারাঠী-কোঙ্কণী আর ঘরের মধ্যে নিজেদের ভিতর ইংরেজী ও হিন্দী। সৈনিকরা আসিয়া 'বঁ দিয়' (Bon Dia—গুড ডে, গুড মর্নিং) বলিয়া অভিবাদন জানাইয়া দিনের জীবনযাত্রার রুটিন আরম্ভ করিয়া দিয়া যাইত। রাত্রে 'বঁ নোইৎ' (Bon Noite—

গুড নাইট, বিদায়) বলিয়া দরজার তালা বন্ধ করিয়া ঝাঁকুনি দিয়া ঠিকভাবে বন্ধ হইয়াছে কি না দেখিয়া চলিয়া যাইত। খবরের কাগজ পড়ার মত এবং দৈনন্দিন কাজ চালানোর মত কথা বলার জন্য যতটুকু পর্তুগীজ ভাষা আয়ত্ত করা দরকার তাহা এই এক বছরে আমাদের আয়ত্ত হইয়াছিল। চোখের সামনে মোহনার ওপারে ভাস্কো ও মুর্মুগোয়া বন্দর। সপ্তাহে একটি, দুটি, তিনটি বিদেশী জাহাজ আসিয়া নদীর মোহনার মাঝখানে নোঙগর ফেলে। আবার ক'দিন বাদে আমদানী মাল খালাস করিয়া গোয়ার ম্যাঙ্গানিজ্ বা ঐ জাতীয় রপ্তানি মাল ভর্তি করিয়া সেই সব জাহাজ ক্রমে ক্রমে সমুদ্র দিকচক্রবালে অদৃশ্য হইয়া যায়। সময় সময় সেদিকে তাকাইয়া আমার মনে হইত, আমি যেন আর ভারতে নাই। সমুদ্র পারে কোন বিদেশে যেন চলিয়া আসিয়াছি, দেশে আর সহজে ফিরিব না।

এইভাবে আমাদের দিন কাটিতেছে এমন সময় একদিন দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া আমরা নিজের নিজের বিছানায় শুইয়া কিম্বা বসিয়া পুরানো খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছি, কাহারও কাহারও চোখে তন্দ্রা নামিয়া আসিতেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি চুপি চুপি আমাদের সেলের দরজার কাছে আমাদের সেদিনকার 'কাব্ দা গুয়াদ' রিবেইরো আসিয়া দাঁড়াইয়া দরজায় টোকা মারিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করিতেছে। 'রিবেইরো' অবশ্য তাহার আসল নাম নয়; তাহার আসল নাম এখানে বলার দরকার নাই। কিন্তু সে এখানকার মিলিটারী 'কাব্'-দের মধ্যে খুব ফুর্তিবাজ লোক এবং আমাদের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। তাহার চোখে মুখে একটা চাপা উত্তেজনার অথচ আনন্দের ভাব। দরজায় তাহার টোকা মারার শব্দ শুনিয়া নানা সাহেব উঠিয়া তাহার কথা শুনিতে গেলেন; আমরাও কিছুটা কৌতূহলের সঙ্গে সেদিকে তাকাইয়া জানিতে চেষ্টা করিতে থাকিলাম—ব্যাপার কি, রিবেইরো এই দুপুর বেলায় আবার কি খবর দিতে আসিল? নানা সাহেব দরজার কাছে যাইতে যাইতে আমাদের কানে শব্দ গেল—"Bon noticia Senor! Muito bon! (Good news Mister, very good! ভালো খবর সিনর! খুব ভালো খবর!)। কি ভালো খবর? নানা সাহেবের সঙ্গে সে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে, সব কথা কানে আসিয়া পেঁছাইতেছে না টুকরা টুকরা দু' একটি শুনিতে পাইতেছি—"Emissora Lisboa..O ministerio Ultra-mar..amnestia para presos Indianos.." (লিস্‌বন রেডিয়ো......ওভারসিজ মিনিস্ট্রী...ভারতীয় বন্দীদের জেল মুক্তি...)। লোকটা বলে কি? আমরা ভুল শুনিতেছি না তো? সকলে ধড়মড় করিয়া নিজের নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। নানা সাহেব ধীরে ধীরে আপন যায়গায় ফিরিয়া খুব গম্ভীর মুখে বলিলেন—"কি জানি রিবেইরো আমাদের 'লেগ্ পুল্' করিতেছে কি না (অর্থাৎ পরিহাস ছলে আমাদের নিয়া মজা করিতেছে কি না); কিন্তু ও যে কথা বলিল তাহা তো 'সিরিয়স্' (গম্ভীর) ব্যাপার।" আমরা বলিলাম—"কেন? কিরূপ গম্ভীর? কি বলিল রিবেইরো?"

"রিবেইরো বলিল—'সিনর! আমার নাম যেন প্রকাশ না হয়। এইমাত্র গার্ড রুমে আমি লিস্‌বন রেডিয়ো শুনিয়া আসিলাম, লিস্‌বনে পর্তুগীজ ওভারসিজ মন্ত্রী দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে সমস্ত ভারতীয় রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়া দেশে ফেরত পাঠানো হইবে!' রিবেইরোর আনন্দ যে, এবার হয়ত গোয়ার এই সব হাঙ্গামা শেষ হইয়া যাইবে এবং ক্রমশ তাহারাও দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু সে বার বার

করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছে, সে যে আমাদের এ খবর দিল সেটা যেন কিছুতেই প্রকাশ না হয়। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পর্তুগীজরা হঠাৎ আমাদের এভাবে ছাড়িয়া দিবে কেন? ইজিপ্ট গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আহমেদ খলিল দু' দিন আগে আমাদের সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। মশিয়ে খলিল তো আমাদের কোনো আভাস দিলেন না?"

ইজিপ্ট সরকারের প্রতিনিধি মঃ আহমেদ খলিল ইহার ক'দিন আগে—মাত্র দু' তিন দিন হইবে—বৎসরান্তে তাঁহার রুটিন মাফিক গোয়ায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আগুয়াদায় ও গোয়ার অন্যান্য জেলে তখন আমরা প্রায় চল্লিশ জন ভারতীয় বন্দী ছিলাম। জেলখানায় আমরা কেমন আছি, আমাদের অভাব-অভিযোগ কি, কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমাদের চাই কি না, সে সব কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভারতীয় বন্দীদের মধ্যে যদি কেহ আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে যোগ দিতে চায়, তাহা হইলে গোয়া জেলে বসিয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহি করিয়া পাঠানোর সুবিধা পাওয়া যাইবে, পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে তাঁহার সে কথা হইয়াছে। সে কথাও তিনি আমাদের জানাইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি আমাদের এ কথাও বলিয়াছেন যে, তিনি এই বিষয় নিয়া দরবার করিতে যখন জেনারেল পাউলো বের্নাদ গেদীস্-এর সঙ্গে দেখা করিতে যান তখন জেনারেল গেদীস্ তাহাকে স্পষ্টই বলেন—"আমাদের জেলে যাহারা কয়েদী হিসাবে আছে ভারত গভর্নমেণ্ট বা ভারতীয় জনসাধারণ যদি তাহাদের নিজেদের আইন সভায় প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করিতে চায় তাহাতে আমাদের বলার কিছু নাই। সেটা তাহাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেজন্য এই বন্দীরা যদি এখান হইতে কিছু কাগজপত্র সই করিয়া বাহিরে পাঠাইতে চায় তাহাতেও আমরা বাধা দিব না। মিলিটারী কর্তৃপক্ষ নিয়ম মাফিক সেন্সর করিয়া দিলে সে সব কাগজপত্র ডাকে ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আশা করি দয়া করিয়া আপনি তাহাদেরকে ভারতে গিয়া নিজেদের 'ইলেকশন ক্যাম্পেইন্' করার জন্য মুক্তি দিতে বলিবেন না।" দু'জনের মধ্যে ইহা নিয়া কিছু হাসাহাসি হয়। মঃ খলিল গভর্নর জেনারেলকে ইহার উত্তরে বলেন যে আমাদের তরফের সেরূপ কোনো অনুরোধ জানানোর ইচ্ছা আপাতত তাঁহার নাই। মোটামুটি এই সব কথা হইতে আমরা গোয়াতে জেলে আছি এবং জেলেই আমরা থাকিব এইটাই ধরিয়া নিয়াছিলাম। হঠাৎ এমন কি হইল যাহাতে পর্তুগীজ সরকারের আমাদের সম্পর্কে হঠাৎ নীতি বদল করিয়া মুক্তির আদেশ দেওয়ার দরকার পড়িল? অথচ রিবেইরো খালি আমাদের নাচাইয়া মজা দেখার জন্য এই রকম একটা 'উড়ো' খবর মিছামিছি বানাইয়া আমাদের ধাপ্পা দিয়া গেল তাহাও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। বাহির হইতে অন্যান্য রাজনৈতিক খবর পাওয়ার একটি নির্ভরযোগ্য রাস্তা আমাদের ছিল রিবেইরোর মারফত। সে খুব ফূর্তিবাজ লোক হইলেও গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন এবং নানাভাবে আগুয়াদায় সে আমাদের সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং সে সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া আমাদের নিছক ধাপ্পা দিয়া গেল তাহা মনে করাও কঠিন হইতেছিল। অথচ বার বার মনে হইতেছিল, হঠাৎ কেন পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট এভাবে আমাদের মুক্তি দিবে? তাহার জন্য যেটুকু বাস্তব পরিবেশ আগে রচিত হওয়া দরকার সে রকম কিছু হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়াও তো আমরা জানি না।

এই সময় ঈশ্বরভাই দেশাই আমাদের মনে করাইয়া দিলেন যে, নভেম্বর মাসে ফাদার কারিনো আমাদের বলিয়াছিলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের তরফ হইতে কয়েকটি বিষয়ে উভয় দেশের ভিতর বোঝাপড়া করার জন্য একটা চেষ্টা চলিতেছে। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি বিষয় ছিল গোয়া ও ভারতের মধ্যে লোক চলাচল করা সম্পর্কে সমস্ত বাধা অপসারণ করার প্রস্তাব এবং ভারতে যে সমস্ত গোয়াবাসী আছেন বা এখানে থাকিয়া যাঁহারা চাকুরি-বাকুরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে যাহাতে প্রয়োজন মতন টাকা পয়সা পাঠাইতে পারেন তাহার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের অনুমতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ফাদার কারিনো যতটা আমাদের জানাইয়াছিলেন তাহার ভিতরে আমাদের মুক্তি দেওয়ার কোনো প্রস্তাব এই সব কথাবার্তার মধ্যে আসে নাই। তাছাড়া ভারত বা পর্তুগীজ সরকারী কর্তৃপক্ষ কেহই এ ধরনের প্রস্তাবে খুব আগ্রহ দেখান নাই।

১৯৫৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস হইতে ভারত গভর্নমেণ্ট পর্তুগীজ গোয়ার সংগে ভারতের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক লেনদেন, মাল চলাচল এ সব বন্ধ করিয়া দেন। ইহার ফলে সরকারী অনুমতি ভিন্ন ভারত হইতে গোয়াতে মনি-অর্ডার করিয়া কিম্বা অন্যভাবে কোনো টাকা পয়সা পাঠানো যাইত না। ভারতের সংগে গোয়ার সমস্ত রকম বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আমদানী রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে পর্তুগীজদের বা গোয়াবাসীদের যত না অসুবিধা হয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধা হয় ভারত হইতে টাকা পাঠানোর সাধারণ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে। ভারতবর্ষে প্রায় দেড় হইতে দুই লক্ষ গোয়াবাসী বাস করেন; তাহার মধ্যে এক বোম্বাই শহরেই বাস করেন প্রায় ৮০,০০০ হইতে ১০০,০০০ মত। গোয়ার ভিতরে প্রায় পনরো-কুড়ি হাজারটি পরিবারের জীবিকা, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি ভারতবর্ষ হইতে আসা টাকার উপর নির্ভর করে। প্রায় এক বছরের উপর তাহারা ভারতে অবস্থিত উপার্জনক্ষম আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কোনোই অর্থ সাহায্য পায় নাই এবং ইহার ফলে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবার আর্থিক দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছায়। ভারত হইতে গোয়াতে কোনো মাল পাঠানোও নিষেধ ছিল। কিন্তু সমুদ্র পথে মুর্মুগোয়া বন্দর খোলা থাকায় কোনো মাল আসাই বন্ধ হয় নাই। এডেনের পথে ভারতে উৎপন্ন এবং বিদেশী কোনো জিনিসই গোয়ায় আসা বন্ধ হয় নাই। এমন কি এডেনে কোনো বাণিজ্য শুল্ক নাই বলিয়াই গোয়াতে ভারতে তৈরী অনেক জিনিস ভারতের বাজারের চেয়ে সস্তা দরেও পাওয়া যাইত। কিন্তু ভারত হইতে ভারতে অবস্থিত গোয়াবাসীরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে টাকা পয়সা পাঠাইতে না পারার দরুণ এই টাকার উপর নির্ভরশীল তাহাদের পরিবারবর্গের অভাব-অনটনের ও দুরবস্থার সীমা ছিল না।

পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট এই সমস্ত পরিবারকে কোনো আর্থিক সাহায্য করিতেন না। প্রথমত, এতগুলি পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়া গোয়ার পর্তুগীজ সরকার কেন, কোনো গভর্নমেণ্টের পক্ষেই খুব সহজ নয়। তাছাড়া এ ব্যাপারে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের পক্ষে ভারতের উপর দোষারোপ করাটাও সহজ ছিল। এ সম্পর্কে গোয়াতে জনসাধারণের ভিতর কোনো কথা উঠিলেই তাহারা বলিতেন—'এ বিষয়ে আমরা কি করিব? ভারত সরকার ইচ্ছা করিয়া গোয়ার লোকেদের জব্দ করার জন্য এইভাবে তাহাদের কষ্ট দিতেছেন। তোমরা ভারত সরকারকে এ সম্পর্কে বল।' কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পর্তুগীজ সরকারের উপর এ বিষয়ে কিছুটা চাপ ছিলই। কিন্তু ভারতের সংগে তাঁহাদের আন্তর্জাতিক ও কূট-

নৈতিক সম্পর্ক তখন যে জায়গায় ছিল, তাহার ভিতর তাঁহাদের পক্ষে ভারতের কাছে এ বিষয়ে সরাসরি কোনো প্রস্তাব করা সম্ভব ছিল না। অবশেষে রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যস্থতায় এ বিষয়ে উভয় গভর্নমেণ্টের কাছে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ফাদার কারিনোর কাছে ক' মাস আগে আমরা যতটুকু খবর পাই তাহাতে এই প্রস্তাবের সূত্র ধরিয়া আমাদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনার লেশমাত্র আমরা পাই নাই। কাজে কাজেই ঈশ্বরভাই ফাদার কারিনোর দেওয়া সেই পুরানো খবরের কথা আমাদের মনে করাইয়া দিলেও কাব্ রিবেইরোর দেওয়া আমাদের সকলের মুক্তিলাভের এখনকার এই নূতন খবরের সত্যাসত্য সম্পর্কে আমরা তাহা হইতে খুব বেশী কিছু কিনারা করিতে পারিলাম না।

সে দিনটা আমাদের রিবেইরোর দেওয়া খবরের ভালমন্দ সত্যাসত্য সম্পর্কে জল্পনা করিতে করিতেই কাটিয়া গেল। পরের দিন সকাল বেলায় আমরা সকালের চা-জলখাবার খাওয়ার পালা শেষ করিয়া স্নান করার ও জল আনিতে যাওয়ার জন্য তৈরী হইতেছি এমন সময় দেখি মঃ খলিলকে সংগে করিয়া আমাদের জেল কমাণ্ডাণ্ট কাপ্তেন মিরান্দা এবং গোয়ার গভর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী (এই ভদ্রলোকের নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি) আমাদের ইয়ার্ডে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন। কাব্ দা গুয়ার্দ দৌড়াইয়া আসিয়া আমাদের ঘরের দরজা খুলিয়া দিলে তাঁহারা তিনজনে আমাদের ঘরে আসিয়া হাত ঝাঁকুনি ও অভিবাদনাদির পরে সরকারীভাবে আমাদের জানাইলেন, সত্য সত্যই লিস্‌বন গভর্নমেণ্ট, কোনো সশস্ত্র হামলা করা বা হিংস্র কোনো কার্যকলাপের অভিযোগ যে সমস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে নাই, তাঁহাদের সকলকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মঃ খলিল বলিলেন, তিনিও এ সম্পর্কে প্রথমে কিছু জানিতেন না। জানিলে এবার তিনি আমাদের সংগে দেখা করিতে আসিতেন না। পরশুদিন সন্ধ্যার রেডিয়োতে খবর শুনিয়া তাহার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনি গতকাল গভর্নর জেনারেলের সংগে দেখা করিতে যান। গভর্নর জেনারেল তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, আমাদের মুক্তির সংবাদ সত্য এবং সেই 'শুভ' খবর জেলে আমাদের সরকারীভাবে জানানোর জন্যই নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সংগে দিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। গভর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারীও আমাদের পূর্বপরিচিত। আরও দু' এক বার তাঁহার সংগে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। শিরুভাউ-এর সংগে রসিকতা করিয়া তিনি বলিলেন—"আর আমাদের উপর আপনার বিরূপ হইয়া থাকার দরকার করিবে না। এবার আপনার চরখা আপনি ফেরত পাইবেন।" ভদ্রলোক জানিতেন তেনেন্ত কস্তার সময় হইতে শিরুভাউ-এর পর্তুগীজ মিলিটারী কর্তৃপক্ষ ও গভর্নর জেনারেলের সংগে কিছুটা চিঠিতে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছিল। এই ধরনের এক-আধটু রসিকতা ও কৌতুক বিনিময়ের পর তাঁহারা তিনজনে আমাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়া অন্যান্য ভারতীয় বন্দীদের তাঁহাদের আসন্ন মুক্তির খবর দিতে চলিয়া গেলেন। কাব্ রিবেইরো বেচারী যে সত্য সত্যই আমাদের 'লেগ্ পুল্' করে নাই, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বুঝিলাম। একান্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর মত আমাদের মুক্তির খবর শুনিয়া সে নিজের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারে নাই, ছুটিয়া আমাদের খবরটা দিতে চলিয়া আসিয়াছিল। মঃ খলিলের কাছ হইতে এখন পাকাপাকিভাবে খবরটা শুনিয়া মনে মনে তাহার প্রতি সকলেই কৃতজ্ঞতা অনুভব করিলাম। এ দিন সে ডিউটিতে ছিল না। আমাদের মুক্তি পাওয়ার আগে আর একদিন মাত্র তাহার সংগে দেখা

হইয়াছিল। হঠাৎ এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তির খবর পাওয়াতে আর একটি জিনিসও নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম—সব সময় আমাদের জানাশোনা তথ্য ও যুক্তির হিসাব কষিয়া নিজেদের জীবনের ভবিষ্যত রূপ পুরাপুরি কল্পনা করাটা কল্পনাই। এই কাহিনীর উপক্রমণিকার দিকের কথা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা বোধ হয় আমার এই উপলব্ধির তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন। দেড় বছর আগে গোয়াতে সত্যাগ্রহ করিতে যখন রওনা হই, তখন আমি নিজে এবং অন্যান্য সকলেই মনে করিয়াছিলাম আমাকে পর্তুগীজরা বেশী দিন আটক রাখিতে সাহস পাইবে না। অল্প দিনের ভিতরেই ছাড়া পাইয়া আমি ফিরিয়া আসিব! আর এখন আগুয়াদায় এক বছরের উপর বসবাস করিয়া, আগুয়াদার দুই নম্বর সেল সামনের আরো এগারো বছরের জন্য আমাদের স্থায়ী আবাস হইবে নিশ্চিত জানিয়া পাকাপাকিভাবে সেখানে থাকার জন্য যে সময় মনে মনে তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছি, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তির আদেশ আসিল! বহুদিন চেষ্টা করিয়া আমি সবে তখন ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বোঝার আগ্রহে 'স্টুয়ার্ট পিগ'-এর বই শেষ করিয়া অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডের কথা ভাবিতে শুরু করিয়াছি, তাঁহার লেখা ও গ্রন্থাবলীর সাহায্যে ভারত-প্রাগৈতিহাসিকের পূর্ব-ভূমিকায় পরিক্রমায় মধ্য-প্রাচ্যের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধ্যয়নে প্রবেশ করিব। গোয়ার জেলে বই আনানো সহজ নয়, বাহিরের বন্ধুদের চেষ্টায় সবেমাত্র মাস খানেক আগে কিছু ইতিহাসের বই হাতে আসিয়াছে; করাচীর 'ডন' কাগজের মারফত গুজরাটের লোথালে মহেঞ্জ-দড়ো সভ্যতার বহু নূতন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এ খবর দেখিয়া মনে নূতন উত্তেজনাবোধ করিতেছি—এমন সময় জেলে বসিয়া শখের ইতিহাস চর্চার পালা বন্ধ করার হুকুম আসিল। ভাগ্যবিধাতা অদৃষ্টে সালাজারের দেওয়া জেলের অন্ন উনিশ মাসের বেশী মাপেন নাই। আর ক'দিনের মধ্যেই উনিশ মাসের সেই পালা শেষ হইবে।

গোয়াতে যে অবস্থায় আসিয়া বন্দী হইয়াছিলাম, তাহাতে দেড় বছর পরে এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তির আদেশ পাইয়া আমরা কিছুটা উল্লসিত হই নাই, একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। কিন্তু আসন্ন মুক্তির দিন যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল, আমাদের মুক্তির আনন্দের ভিতর একটু ক্ষোভ ও বেদনার অনুভূতিও তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল—আমরা তো ঘটনাচক্রে ছাড়া পাইয়া আর ক'দিনের ভিতরেই ভারতে ফিরিব; কিন্তু গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী যাঁহারা এখানে পড়িয়া থাকিবেন, তাঁহাদের কি হইবে? আমরা যখন মুক্তির আদেশ পাই, তখন আগুয়াদা দুর্গে ২৫০ জনের কিছু বেশী, রেইস মাগুস্ দুর্গে প্রায় ৮০-৯০ জন, মাড়গাঁও জেলে ৯ জন মহিলা বন্দী ছিলেন। আমরা আইনত ভারত রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে আন্তর্জাতিক কূটনীতির দাবা খেলার চালে হঠাৎ মুক্তির আদেশ পাইয়া গেলাম। কিন্তু গোয়ার এই বীর রাজনৈতিক বন্দী ও বন্দিনীদের ভবিষ্যৎ কি বছরের পর বছর সালাজারের অন্ধকূপ জেলে পচিয়া মরা? এতদিন আমাদের মনে সান্ত্বনা ছিল, আমরাও জেলে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার অংশভাগী ছিলাম; আমরা বাহিরের উন্মুক্ত আকাশের তলে স্বাধীন মানুষ হিসাবে আবার চলা-ফেরার অধিকার পাইব, কিন্তু যাঁহাদের সংগে এতদিন ছিলাম, গোমন্তক ও ভারতের সেই বীর সন্তানেরা এখানে পড়িয়া থাকিবেন। মুক্তির আনন্দের ভিতরেও সেই ব্যথা ও সংকোচের অনুভূতি মনের ভিতর ক'দিন ধরিয়া খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। মঃ খলিল ও গভর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী সরকারীভাবে আমাদের আসন্ন মুক্তির খবর জানাইয়া যাওয়ার বারো

দিন পর আমরা মুক্তি পাই। আমাদের আগুয়াদা হইতে তিনটি স্পেশাল বাসে করিয়া গোয়ার দক্ষিণে মাজাড়ী সীমান্তের কাছে আনিয়া ১৯৫৭ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় মুক্তি দেওয়া হয়। এখানে মুক্তির দিনের খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়ার দরকার নাই। খালি এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ এই দিন আমাদের সঙ্গে সকল প্রকারে ভদ্রতা ও সৌজন্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন। ফাদার কারিনো ও তাঁহার একজন ইতালিয়ান ধর্মযাজক বন্ধু আমাদের সঙ্গে সীমান্ত পর্যন্ত নিজেদের জীপে করিয়া আসার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ফাদার কারিনোর কাছে আমরা নানাভাবে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ সে কথা পাঠকেরা জানেন। তাঁহার সঙ্গে গোয়াতে শেষ দিন আর একবার দেখা এবং গোয়া ছাড়ার সময় তাঁহার প্রতি আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাইয়া আসার সুযোগ পাওয়াতে আমরা সকলেই খুবই উল্লসিত হই। কিন্তু এই দিনটির কথা আমার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণে মনে আছে—এই দিন গোয়াতে প্রথম আমি বাংলা কথা শুনি। ফাদার কারিনোর বন্ধু ফাদার জোসে মোইয়া বহুদিন বাংলা দেশে ছিলেন এবং পরিষ্কার বাংলা বলিতে পারেন। তিনি গোয়ার দুর্গম বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সালেশিয়ান মিশনের একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ অসীম। গোয়া জেলে একজন বাঙ্গালী আছে ইহা ফাদার কারিনোর কাছে শুনিয়া তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়ার কথা ভাবিতেছিলেন এমন সময় আমরা ছাড়া পাইয়া যাই। বেচারী আর কি করেন, একটি দিন একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলিতে পাইবেন, এই লোভে বেচারী সেদিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়া ফাদার কারিনোর সঙ্গে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করেন। ঘণ্টা তিনেক তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া কে বুঝিবে তিনি ইতালিয়ান না বাঙ্গালী, যদি তাঁহার পরনে পাজামা এবং ইউরোপীয় ধর্মযাজকের ক্যাসক্ না থাকিত! সেদিন হইতে আজ তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে বাংলা ও বাঙ্গালী অনুরাগী ফাদার মোইয়ার কথা আজও ভুলি নাই।

সন্ধ্যা প্রায় ৭টা—৭৷৷টার সময় আমরা সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হই। আমাদের মুক্তি দিবার সময় একটি নূতন সমস্যা দেখা দিল : এই ভর সন্ধ্যায় জঙ্গলের ভিতর আমরা যাইব কোথায়? আমরা গোয়াতে আটক ভারতীয় রাজবন্দী, জেল হইতে ছাড়া পাইয়া এই সন্ধ্যার অন্ধকারে ভারতে ফিরিয়া আসিতেছি, ভারত গভর্নমেণ্টের সীমান্তরক্ষীরা তাহা জানিবে কি করিয়া? যদি তাহারা অন্য কিছু মনে করিয়া গুলী চালায়? কে তাহাদের খবর দিবে? গোয়া সীমান্তের ভিতরের দিককার পর্তুগীজ ও গোয়ানীজ সীমান্তরক্ষীরা কিছুক্ষণ 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ডে'র দিকে তাকাইয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নাই, কি করা যায়? অবশেষে ফাদার কারিনো বলিলেন, 'আমি ভারতীয় নাগরিক, আমার পাসপোর্ট ও ভিসা দুই-ই আছে, আমি গিয়া খবর দিতেছি।' এই জায়গায় উভয় সীমান্তের মধ্যবর্তী 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড' শ' চারেক গজ চওড়া হইবে। দু-দিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়া সরু একটি পথ। ফাদার কারিনো তাহার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া জঙ্গলের ভিতর প্রায় আধ মাইল দূরে যেখানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের আস্তানা, সেখানে গিয়া আমাদের আসার খবর দিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমরা আজ মুক্তি পাইব ও এই পথ দিয়া আসিব আন্দাজ করিয়া মাজাড়ী কারওয়ার হইতে কয়েক সহস্র লোক অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া থাকিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসায়

হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সীমান্তরক্ষী দল ও তাহাদের অফিসারেরা কাস্টমস পোস্টে আছেন; তাঁহারা আমাদের জন্য এখনও অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা আশ্বস্ত হইয়া পর্তুগীজ সীমান্তের কাঁটাতার দেওয়া কাঠের দরজা পার হইয়া আমাদের জিনিসপত্র ঘাড়ে করিয়া 'নো ম্যানস্ ল্যান্ডে' পা দিলাম। ততক্ষণে মাজাড়ীর কাস্টমস পোস্ট হইতে জন ৪০।৫০ প্রহরী ও অফিসার আসিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের জিনিসপত্র আমাদের হত হইতে নিজেরা বহিয়া নিয়া যাওয়ার জন্য নিয়া নিলেন। অনেকে আসিয়া আনন্দে আমাদের বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহাদের সকলেই সাধারণ প্রহরী বা নিম্নপদস্থ কর্মচারী। গোয়ার পর্তুগীজ জেল হইতে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, আমরা দেশের জন্য গোয়ার মুক্তির জন্য লড়িতে গিয়াছিলাম, বাঁচিয়া ফিরিব, এ আশা কাহারও ছিল না। কিন্তু তবু আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি ইহাতে তাঁহাদের আনন্দের ও উল্লাসের সীমা নাই। মুক্তির পর হইতে বাংলা দেশে ফেরা পর্যন্ত পথে পথে এবং বাংলা দেশে ফিরিয়া কলিকাতা ও নানা স্থানে বহু অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, কিন্তু সেদিনকার সন্ধ্যায় মাজাড়ীর কাস্টমস পোস্টের সাধারণ কর্মচারীদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার উচ্ছ্বাস আমাদের কোনো দিন ভোলার নয়। সেই সন্ধ্যায় দেড় বছর বাদে স্বাধীন ভারতের মাটিতে পা দিয়া অবধি আবার নিজের পিছনে ফেলিয়া যাওয়া জীবন শুরু করিয়াছি। এতদিন যে গোয়াতে ছিলাম, যে গোয়াকে পর্তুগীজ শাসন হইতে আমরা মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলাম, সেই গোয়াকেই পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। দুঃখ এবং অনুশোচনা এতটুকু থাকিয়া গিয়াছে—গোয়া যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে; আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি বটে কিন্তু আজও গোয়া মুক্ত হয় নাই। গোয়াতে আমাদের চার শতাধিক বীর সহকর্মী ও সহকর্মিনী আজও ডাঃ সালাজারের জেলেই থাকিয়া গিয়াছেন।

॥ ৪৭ ॥

উপসংহার

যেখানে আসিয়া এই কাহিনী শেষ হইয়াছে তাহার পর, অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের সন্ধ্যাবেলায় ডাঃ সালাজারের 'আতিথ্য'-বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইয়া আমাদের দেশে ফেরার পর, দেখিতে দেখিতে তিন বছর সময় কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন বছরের ভিতর গোয়ার পরিস্থিতি কি দাঁড়াইয়াছে সে সম্পর্কে পাঠকদের মনে কিছুটা কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সে জন্য উপসংহারে দু' একটি কথা বলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

এই তিন বছরের ভিতর গোয়ার রাজনৈতিক অবস্থার ভিতরে যে কোনো প্রকার মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই তাহা আশা করি সকলেরই জানা আছে। এক কথায় পর্তুগালের সঙ্গে গোয়া, দমন ও দিউ'র রাজনৈতিক সম্পর্ক আগে যা' ছিল তেমনিই থাকিয়া গিয়াছে; তাহার কোনো অদল বদল হয় নাই। ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত গোয়ার মুক্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন চলিয়াছিল তাহা আপাতত ব্যর্থ হইয়াছে। অন্তত

বাস্তব রাজনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার বিশেষ কোন কৃতকার্যতা আপাতত দেখা যায় না। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই বলিতে পারিবে।

তবে একটি ক্ষেত্রে এই মুক্তি-আন্দোলন পর্তুগীজ ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশে পর্তুগীজ শাসনকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার দিক দিয়া সফল হইয়াছে বলা চলে, তাহা পর্তুগীজদের দমন জেলার অন্তর্গত দাদ্‌রা এবং নগর হাভেলীর ক্ষেত্রে। ১৯৫৪ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম ধাক্কাতেই ১৮৮ বর্গ মাইল ব্যাপী এই তালুক দুইটি এবং তাহাদের শাসন-কেন্দ্র সেল্‌ভাসা শহরের উপর হইতে পর্তুগীজ শাসন সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইয়া যায়; পর্তুগীজ এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর ও পুলিশ পাহারা যা' কিছু ছিল সকলে ভয়ে পালাইয়া যায়। বইয়ের ভিতর সে কাহিনী বলিয়াছি। কিন্তু ইহা আমাদের গোয়া যাওয়ার এক বছর আগেকার ঘটনা। তা'ছাড়া দাদ্‌রা এবং নগর হাভেলী গোয়ার অন্তর্গত নয়। দাদ্‌রা ও নগর হাভেলী গোয়া হইতে ৩০০—৪০০ মাইলের মত উত্তরে দমন বন্দরের পিছন দিকে, গুজরাতের সুরত জেলা এবং বোম্বাইয়ের থানা জেলার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। সেল্‌ভাসা ধরিয়া এই দুইটি তালুকের মোট জনসংখ্যা ৪৫,০০০। সেল্‌ভাসা শহরে একটি মিউনিসিপ্যালিটী আছে; তাহার জনসংখ্যা আট-দশ হাজারের মত। পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের পক্ষে এ পর্যন্ত সৈন্য-সামন্ত পাঠাইয়া দাদ্‌রা ও নগর হাভেলী পুনর্দখল করা সম্ভব হয় নাই, তাহার কারণ দমন বন্দর হইতে দাদ্‌রা বা নগর হাভেলীতে পৌঁছাইতে হইলে দমন-গঙ্গা নদী পার হইয়া ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের এলাকার ভিতর দিয়া খানিকটা পথ আসিতে হয়। ভারত সরকারের অনুমতি না পাইলে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সে ভাবে দাদ্‌রা বা নগর হাভেলীতে সৈন্য পাঠানো সম্ভব নয়। তাই সেল্‌ভাসা সহ দাদ্‌রা এবং নগর হাভেলী পর্তুগীজ শাসন-মুক্ত অবস্থায় আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতেছে।

মুক্ত এলাকার শাসনের কাজ চলে জন সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত একটি শাসন পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে, ইহার নাম 'বরিষ্ঠ পঞ্চায়েত'। সেল্‌ভাসাতে একটি নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটী শহরের পৌরজীবন সংক্রান্ত কাজকর্ম চালায়। এই বরিষ্ঠ পঞ্চায়েত আপাতত একজন এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর নির্বাচন করিয়া তাঁহার মারফৎ শাসনের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোয়ার ভূতপূর্ব জজ ডাঃ এ. ফুর্তাদো—যাঁহাকে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট ভারত-বিরোধী বিবৃতিতে স্বাক্ষর না করার জন্য গোয়া ছাড়িতে বাধ্য করেন—দাদ্‌রা ও নগর হাভেলীর বর্তমান এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর। বোম্বাইয়ের রাজ্য-সরকার ও ভারত সরকারের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া তিনি এই কয় বছর ধরিয়া এই তালুক দুইটির শাসনের কাজ চালাইয়া যাইতেছেন।

সংবাদপত্রের পাঠকেরা জানেন পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট দমন হইতে বিনা বাধায় ভারতীয় এলাকার ভিতর দিয়া দাদ্‌রা ও নগর হাভেলীতে সৈন্য পাঠানোর অধিকার দাবী করিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে হলাণ্ডে হাগের আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করিয়াছেন। তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে তাঁহারা এই বলিয়া যুক্তি দিয়াছেন যে বৃটিশ আমলের আগে মারাঠী পেশোয়াদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী তাঁহাদের প্রয়োজন মত এই ভাবে দমন হইতে দাদ্‌রা ও নগর হাভেলীতে সৈন্য পাঠানর অধিকার ছিল। পেশোয়াদের আমলের পর ভারতে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৃটিশ গভর্নমেণ্টও বরাবর পর্তুগীজদের সে অধিকার মানিয়া আসিয়াছেন। পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বক্তব্য যে এখন

ভারতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের গভর্নমেণ্টও পর্তুগীজরা পেশোয়াদের সঙ্গে তাঁহাদের সন্ধিচুক্তি বলে এতকাল ধরিয়া যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য। আজ প্রায় চার বছর ধরিয়া আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে এ মামলা চলিতেছে। উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইয়া গিয়াছে; আদালতের রায় এখনো বাহির হয় নাই। দাদ্রা ও নগর হাভেলীর লোকেরা তাহাদের বরিষ্ঠ পঞ্চায়েতের মারফৎ বহু পূর্বেই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিয়াছে বটে। কিন্তু আদালতের রায় সাপক্ষে ভারত গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন নাই। ফলে দাদ্রা ও নগর হাভেলীর লোকেদের ইচ্ছা ও আগ্রহ সত্ত্বেও এই দুইটি তালুক এখনও পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় যদি ভারত গভর্নমেণ্টের বিপক্ষে যায় তাহা হইলে ভারত গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে কি করিবেন সে সম্পর্কে তাঁহারা এখনো পরিষ্কার ভাবে কোনো কথা বলেন নাই। তবে দাদ্রা ও নগর হাভেলীর লোকেরা তাঁহাদের 'বরিষ্ঠ পঞ্চায়েতে'র মারফৎ সকলকে এ কথা জানাইয়া দিয়াছেন যে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় যাহাই হোক না কেন, পর্তুগীজরা যদি কোনো সময় জোর করিয়া আবার দাদ্রা এবং নগর হাভেলীর উপর দখল নিতে আসে, তাহারা তাহাদের প্রাণপণ শক্তিতে শেষ পর্যন্ত বাধা দিবে এবং প্রয়োজন হইলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকালীন 'পোড়ামাটী'-নীতি অবলম্বন করিয়া সব কিছু আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিয়া ভারতে চলিয়া আসিবে।

এ ভিন্ন সমগ্র পর্তুগীজ ভারত বা গোয়ার আগেকার ঔপনিবেশিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ১৯৫৪-৫৫ সালের গোয়া মুক্তি-আন্দোলন যখন কিছুটা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই সময় ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে—আমাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার মাস চারেকের ভিতর—ডাঃ সালাজার গোয়া সম্পর্কে একটি নূতন "Political Statute" বা "রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক আইন" ঘোষণা করেন। পর্তুগীজ সরকারের তরফ হইতে ইহাকেই গোয়ার স্বায়ত্ত শাসনের আইন বলিয়া চালানোর চেষ্টা হয়। এই আইন অনুযায়ী গোয়াতে বা পর্তুগীজ ভারতে এখন ২৩ জন সদস্য নিয়া একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা আইন পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেল এই আইন পরিষদের সভাপতি। ইহার ২৩ জন সদস্যের ভিতর ১৮ জন নির্বাচিত ও বাকী পাঁচ জন গভর্নর জেনারেলের দ্বারা মনোনীত। নির্বাচিত ১৮ জনের মধ্যে একজন আসিবেন যাঁহারা বছরে ৫০০০ এস্ক্যুদো আয়কর দেন তাঁহাদের ভোটে নির্বাচিত হইয়া; ছয়জন বিভিন্ন জেলার স্থানীয় জেলা বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধি হিসাবে (পর্তুগীজ ভাষায় জেলাকে বলা হয় 'ক'সেল্যিও'; সব 'ক'সেল্যিও'তে বোর্ড বা স্থানীয় কাউন্সিল নাই। এই সব 'ক'সেল্যিও'র এলাকা আমাদের এক একটি থানার এলাকার সমান)। গোয়ার সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এগারো জন সদস্য নির্বাচিত হন। নামে আইন পরিষদ হইলেও এই পরিষদের সত্যকার কোনো ক্ষমতা বা গোয়ার শাসন ব্যবস্থার উপর কোনো কথা বলার অধিকার নাই। লিস্বন হইতে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের ঔপনিবেশিক মন্ত্রদপ্তর গোয়ার জন্য যে বাজেট ঠিক করিয়া দেন গভর্নর জেনারেল তাহাই তাঁহার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সামনে রাখেন, কিন্তু এই বাজেট কোনো মতে বাড়ানো কমানোর ক্ষমতা কাউন্সিলের নাই। পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক মন্ত্রী তাঁহার ইচ্ছা মতন যে কোনো

সময়ে এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে ভাঙিগয়া দিতে পারেন। তাছাড়া নূতন শাসন-তান্ত্রিক আইনের ৯৩ নং ধারায় খুব স্পষ্ট ভাবে একথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে :

"পর্তুগীজ জাতির একতা, অখন্ডতা বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এই পরিষদের কোনো মতামত প্রকাশ করার অধিকার থাকিবে না, যদি কোনো সদস্য সেরূপ কোনো মত প্রকাশ করেন তাঁহার সদস্য পদ খারিজ হইয়া যাইবে এবং তাঁহাকে পরিষদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে।"

ইহার অর্থ পর্তুগাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোয়া বা পর্তুগীজ ভারতের আত্মস্বাতন্ত্র্যের পক্ষে—ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বপক্ষে তো কোনোমতেই নয়—কোনো মতামতই প্রকাশ করার অধিকার এই আইন পরিষদের নাই।

আইন পরিষদের উপরে গভর্নর জেনারেলের একটি শাসন পরিষদ আছে। গোয়া বা পর্তুগীজ ভারতের সকল প্রকার শাসন ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে ন্যস্ত। গভর্নর জেনারেল ছাড়া, পর্তুগীজ ভারতের সেনাপতি, 'শেফ দা গাবিনেত' বা চীফ সেক্রেটারী, এ্যাটর্ণী জেনারেল এবং গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত আইন পরিষদের দুই জন সদস্য এই শাসন পরিষদের সদস্য। শাসন পরিষদের কাজ পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী গোয়া, দমন ও দিউ-র শাসনের কাজ চালানো। আইন পরিষদের কাছে শাসন পরিষদের কোনো প্রকার দায়িত্ব নাই বা জবাবদিহি করিতে হয় না। গভর্নর জেনারেলের মনোনীত দুইজন সদস্য ভিন্ন গভর্নর-জেনারেল-সহ শাসন পরিষদের অন্যান্য সদস্যেরা পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক মন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন। এ ছাড়া পর্তুগীজ ভারত হইতে পর্তুগালের পার্লিয়ামেণ্টে দুই জন সদস্য নির্বাচিত হন। পর্তুগীজ পার্লিয়ামেণ্টের নির্বাচনের আইন অনুযায়ী সালাজারের ইউনিয়ন নাসিওনালের মনোনীত সদস্যরা ভিন্ন—পর্তুগালেও যেমন, গোয়া এবং পর্তুগীজ ভারতেও তেমনি—অন্য কেহ নির্বাচিত হইতে পারেন না। সুতরাং পর্তুগীজ পার্লিয়ামেণ্টে গোয়া বা পর্তুগীজ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা যান তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের অর্থ কি, তাহা বোঝা কাহারো পক্ষেই কঠিন নয়।

আজ পর্যন্ত এই আইনের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। অর্থাৎ গোয়ার অধিবাসীরা রাজনৈতিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকারের দিক দিয়া ১৯৫৫ সালে বা তাহার আগে যেখানে ছিল আজ সেখান হইতে এক পা'ও অগ্রসর হয় নাই। ১৯৫৫ সালে আমরা সত্যাগ্রহী হিসাবে গোয়াবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য গিয়াছিলাম; সত্যাগ্রহ করিয়া গোয়াতে দেড় বছর বা দু' বছর জেল খাটিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের মতোই আরো যাঁহারা গোয়ার মুক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভাগ নিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আর কোনো দিন ফিরিয়া আসিবেন না। তাঁহাদের অনেকে গোয়ার ভিতরে, অনেকে ভারত-গোয়া সীমান্তে পর্তুগীজদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আত্মদানে গোয়া স্বাধীন হয় নাই। গোয়া আজো পর্তুগালের দখলেই আছে; গোয়া, দমন ও দিউ-র উপর হইতে দখলী স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া এদেশ হইতে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাওয়ার কোনো আগ্রহ ডাঃ সালাজার বা পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট ঘুণাক্ষরেও এ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। অর্থাৎ আমাদের সত্যাগ্রহ অভিযান, গোয়াবাসীদের দুঃখ-বরণ, শহীদদের রক্তদান সবই আপাতত ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের দিক হইতে বিচার করিলে, আমাদের 'গোয়া-সমস্যা' বলিতে যাহা বোঝায় আজ পর্যন্ত তাহার কোনো সমাধান

খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; সে সমস্যা ১৯৫৭ সালেও যে অবস্থায় ছিল তেমনি থাকিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া গোয়ার আভ্যন্তরীন রাজনীতির বাস্তব পরিবেশে বা ভারত-গোয়া সম্পর্কের দিক দিয়া এই তিন বছরে যে কোনো পরিবর্তনই হয় নাই, তাহা নয়। পরিবর্তন কিছু কিছু হইয়াছে; তবে সেগুলি কি পরিমাণে গোয়ার মুক্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল বা ভারতের অনুকূল সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ভারত-গোয়া সম্পর্কের দিক দিয়া প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল, ভারত ও পর্তুগাল বা গোয়ার মধ্যে কোনো প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকিলেও (১৯৫৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতের কন্সাল জেনারেলকে গোয়া হইতে সরাইয়া নেওয়া হয় এবং ভারত সরকার পর্তুগালের সঙ্গে সকল প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন) পর্তুগীজ ভারত ও গোয়া এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভিতর পূর্বে আসা-যাওয়া, টাকা-পয়সা আদান-প্রদান করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া যে সমস্ত বাধা-নিষেধ ছিল তাহা এখন ভারত ও পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ উভয় তরফ হইতেই যথেষ্ট শিথিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের তরফ হইতেই গরজ বেশী ছিল। বিশেষ করিয়া ভারত প্রবাসী গোয়াবাসীরা যাহাতে গোয়াতে তাহাদের পরিবারবর্গের বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে এদেশ হইতে বিনা বাধায় টাকা পয়সা পাঠাইতে পারে সে সম্পর্কে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ এবং গোয়ার সাধারণ লোকেরা ভারত সরকারের সঙ্গে একটি বোঝাপড়া বা আপোষ সম্পর্কে খুব বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন। কারণ গোয়ার প্রায় দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ লোক চাকুরী-বাকুরী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করেন। তাহাদের সেই আয়ের উপরে গোয়াতে তাহাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকখানি নির্ভর করে। প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত স্বয়ং পোপ ও ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে ভারত গভর্নমেণ্ট ভারত হইতে ভারত প্রবাসী গোয়াবাসীদের গোয়াতে টাকা-পয়সা পাঠানোর সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবটি যাহাতে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন তাহার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টিতে সহায়তা হইবে ভাবিয়া ভ্যাটিকানের পরামর্শমত পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ আমাদের মুক্তি-দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। আমাদের মুক্তির পর হইতে ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে গোয়ায় আসা-যাওয়া সম্পর্কে যে সব বিধি নিষেধ ছিল তাহার কড়াক্কড়ি খুবই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টাকা-পয়সা পাঠানো সম্পর্কেও এখন আগেকার মত কড়াক্কড়ি করা হয় না। গোয়াবাসীরা গোয়ায় যাইতে চাহিলে এখন ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে কোনো অনুমতি পত্র নিতে হয় না। কিন্তু ভারতীয় নাগরিকদের গোয়ায় যাইতে হইলে পাসপোর্ট ও ভিসা (অর্থাৎ পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের অনুমতি পত্র) নিয়া তবে যাইতে পারা যায়।

গোয়ার আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক পরিবেশের দিক দিয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অপরাধে যাঁহাদের সাজা হইয়াছে এমন লোক ভিন্ন অন্য সমস্ত গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সকলকে গত বছর আগষ্ট মাসে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুধাবাই যোশী এবং অন্যান্য গোয়াবাসী মহিলা রাজনৈতিক বন্দীরাও আরো দু' মাস পূর্বে মুক্তি পাইয়াছেন। শ্রীমতী সুধাবাইয়ের পিত্রালয় যে গোয়াতে আগেই তাহা বলিয়াছি। ভারতীয় নাগরিকের ধর্মপত্নী এবং ভারতের অধিবাসিনী হইলেও পর্তুগীজ আইন অনুযায়ী গোয়ার ভিতরে তিনি

পর্তুগীজ প্রজা বলিয়া গণ্য ছিলেন। সেইজন্যই ১৯৫৫ সালে তাঁহাকে আমাদের সাথে এক সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। তিনি এখন মুক্তিলাভ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীপুত্র ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিয়াছেন। ডাঃ জোসে মার্তিনস্, শ্রীযুক্ত গোপালরাও কামাথ, মুলগাঁওকর, আন্তনী (টোনী) ডি'সুজা, ফাবিয়াঁও দা' কস্তা, শিবানন্দ গাইটোণ্ডে আলভারো পেরেইরা প্রমুখ যে সব বন্ধুদের কথা এই কাহিনীর ভিতর বিভিন্ন জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারাও একে একে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়াছেন। অবশ্য পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের শাস্তি হিসাবে (পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা বা পর্তুগাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা চাওয়ার অর্থ পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাছে আইনত 'পিতৃভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা' বলিয়া গণ্য হয়; পর্তুগীজ ভাষায় "Traison contra soberania da Patri" অর্থাৎ "Treason against the sovereign rights of the Fatherland") তাঁহাদের উপরে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বিলোপ করার যে সাজা দেওয়া হইয়াছিল তাহা এখনো মাফ করা হয় নাই। তবে গোয়াতে সে অধিকার থাকা বা না থাকার মধ্যে কার্যত খুব বেশী তফাৎ নাই। কেননা, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক অধিকার বলিতে আমরা যাহা বুঝি ডাঃ সালাজারের গোয়াতে কেন, সমগ্র পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে কোথাও তাহার অস্তিত্ব নাই।

পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ বা হিংসাত্মক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অপরাধে যে সকল রাজনৈতিক বন্দী এখনো গোয়াতে জেলে আছেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম নয়, প্রায় একশর কাছাকাছি হইবে। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন গোয়া প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকও আছেন। ইঁহাদের মধ্যে গুরুজী রানাড়ের নাম সব চাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত মোহন লক্ষ্মণ রানাড়ে ১৯৫৪ সালে গোয়ার মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব হইতে গোয়াতে স্কুল-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেইজন্য তিনি সাধারণত গুরুজী বা মাষ্টারজী নামে পরিচিত। গোয়াতে জাতীয় আন্দোলন শুরু হইলে পর তিনি প্রথমে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু গোয়ার ভিতরকার রাজনৈতিক অবস্থা ও পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের দমননীতির সর্বাত্মক অভিযানের নৃশংসতা লক্ষ্য করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার কথা ভাবিতে থাকেন। অতি অল্প দিনের ভিতর অদ্ভূত সাহস ও সংগঠন-কুশলতা দেখাইয়া তিনি গুপ্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিতে পারিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহাকে প্রথম হইতেই পুলিসের চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য আত্মগোপন করিতে হয়। পর্তুগীজ পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ খুব চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দুই বছরের বেশী সময় গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে পঞ্জিমের অপর পারে বেতিং-তে পুলিসর সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া এক খণ্ডযুদ্ধে রাইফেলের গুলি বুকের পাঁজরে লাগিয়া তিনি আহত হইয়া পড়িয়া যান। পর্তুগীজ পুলিস ও মিলিটারী সৈনিকরা তখন তাঁহাকে আসিয়া জাপ্টিয়া ধরিয়া ফেলে। গোয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সময়ের আগে পর্তুগীজ পুলিসের বিরুদ্ধে যে সব হিংসাত্মক কার্য-কলাপ হয় তাহার শাস্তি হিসাবে পুলিশ দলে দলে বহু নিরপরাধ গ্রামবাসীকে ধরিয়া নিয়া আসে। তাহাদের কথা জানিতে পারিয়া, তাহাদের সকলকে যে কোনো মতে হোক, পুলিসের হাত হইতে বাঁচানোর জন্য আদালতে যখন তাঁহাকে

হাজির করা হয় তখন ব্যক্তিগত ভাবে এই সব ঘটনার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়া তিনি ট্রাইব্যুনালের জজদের বলেন প্রত্যেকটি ঘটনার জন্য তিনি ছাড়া অন্য কেহ দায়ী নয়; সুতরাং সমস্ত শাস্তি তাঁহার প্রাপ্য। তিনি সে শাস্তি মাথা পাতিয়া মানিয়া নিতে রাজী আছেন কিন্তু তাহার বদলে নিরপরাধ লোকদের বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হোক। আদালতে যতদিন মামলা চলে, আদালতের ভিতর তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা বোধ ও তেজোদৃপ্ত ব্যবহার দেখিয়া মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরাও চমৎকৃত হন এবং তাঁহাদের রায়ের ভিতর 'ভারতীয় দেশপ্রেমিক' বলিয়া (কেননা রানাড়ে ভারতীয় নাগরিক) তাঁহার সাহস ও আত্মত্যাগের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। বিচারে তাঁহার ২৬ বছর সাজা হয়। তাঁহার সহকর্মীদের ২০-২১ বছর হইতে নীচের দিকে ১২-১৩ বছর পর্যন্ত সাজা হয়। কিন্তু তিনি নিজে স্বীকারোক্তি করিয়া বহু ঘটনা সংঘটনের দায়িত্ব নেওয়ায় বহু নিরপরাধ লোক পুলিসের হাত হইতে মুক্তি পায়।

মোটের উপর গোয়ার ভিতরে এখন পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টর দমননীতির প্রকোপ আগের তুলনায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে এ কথা বলা যায়। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে গোয়ার ভিতরে এখন পর্তুগীজ-বিরোধী কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনও সে ভাবে সক্রিয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দমননীতি একেবারে বন্ধ হয় নাই। কিছুদিন আগে (অক্টোবর ১৯৫৯) গোয়ার সীমান্ত অঞ্চলে একটি বোমা-বিস্ফোরণের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সন্দেহক্রমে অধ্যাপক পুরুষোত্তম কাকোড়কর, শ্রীআনাস্তাসিও আল্‌মেইদা, আল্‌ভারো পেরেইরা এবং আরো অনেককে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া বহুদিন জেলে আটক রাখা হয়। তবে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আবার মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মাসখানেক আগে (ডিসেম্বর ১৯৫৯) বন্ধুবর কাকোড়করের নিকট হইতে চিঠি পাইয়াছি তিনিও মুক্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আল্‌মেইদা ও পেরেইরা দুজনেই প্রায় পাঁচ বছর জেলে আটক থাকার পর মাত্র গত বছর আগষ্ট মাসে অন্যান্য সত্যাগ্রহী বন্দীদের সঙ্গে খালাস পান। আল্‌মেইদাকে নাকি এবার গ্রেপ্তারের পর পর্তুগালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ একটি অসমর্থিত সংবাদ পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম কাকোড়কর লিস্‌বন হইতে ভারতে পোঁছানোর পর পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের অনুমতিক্রমে গোয়াতে ফিরিয়া গিয়া গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কোনো প্রকার রাজনীতির সঙ্গে ইদানীং তাঁহার সক্রিয় যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু এই ধরণের দু' চারিটি গ্রেপ্তার বা আটকের খবর ব্যতিক্রম হিসাবে বাদ দিলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহনাই যে আগেকার মত নির্বিচার দমন চালাইয়া সকল প্রকার আন্দোলনকে নিরস্ত করার নীতি পর্তুগীজ সরকার এখন বন্ধ রাখিয়াছেন। বরং তাহার বিপরীতটা কিছুটা সত্য।

মনে হয় পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট অনুমান করেন যে, গোয়ার ভিতরে ভারত অনুরাগী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মী বা নেতারা ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে যে ধরণের কার্যকরী সাহায্য পাওয়ার আশা এক সময় করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাঁহাদের ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতি তাঁহাদের মনে সে অবস্থায় কিছুটা অনাস্থা এবং আশাভঙ্গজনিত বিরক্তি জাগা স্বাভাবিক। ভারত গভর্নমেণ্টও এখন গোয়ার সম্পর্কে চুপচাপ আছেন। এই অবস্থায় গোয়াবাসীদের জন্য নানা ভাবে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের দরদ দেখাইয়া পর্তুগীজ-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের কিছু নিজেদের দিকে টানা যায় কিনা, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে সেই ধরণের একটা চেষ্টা সুপরিকল্পিত

ভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া নানা ভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে; ইংরাজীতে যাহাকে 'policy of pacification' বা রাজনৈতিক তোষণের নীতি বলা যায় তাহার কিছু কিছু আভাষ দেখা যাইতেছে। কিন্তু গোয়াকে সত্যকার স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়া কিম্বা গোয়াবাসীদের রাজনৈতিক অধিকারের পরিধি বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের সমর্থন পাওয়ার কোনো চেষ্টা এখনো পর্যন্ত আরম্ভ হয় নাই। তাহার কারণ সেটা মূলগতভাবে সলাজার-তন্ত্রের নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু গোয়াবাসীদের জন্য অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ে সুযোগ সুবিধা বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের পর্তুগীজ-ভক্ত করিয়া তোলার চেষ্টা ভালো ভাবেই চলিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে গোয়াবাসীদের মধ্যে আর কিছুতেই পর্তুগীজ-বিরোধী মনোভাব না জাগে বা ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য তাহারা নিজেদের মনে বিশেষ কোনো আকর্ষণ না অনুভব করে সেজন্য নানা রকমের লোভ দেখাইয়া একটা নূতন আবহাওয়া তৈরী করার ব্যবস্থা হইতেছে।

কাসিমির মন্তেইরো জাতীয় গোয়েন্দা-সর্দারদের প্রতিপত্তি এখন তাই অনেকটা কম। স্বয়ং কাসিমির মন্তেইরোকেই যে বৎসর দুই আগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, সে কথা আগেই বলিয়াছি। সরকারী পদমর্যাদা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য ও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এখন তাহার কয় বছরের জেল হইয়াছে। যদিও মন্তেইরোর পতনের আসল কারণ গোয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহার উদ্ধত ব্যবহার বরদাস্ত করিতে চাহিতে-ছিলেন না। কিন্তু মন্তেইরোকে শাস্তি দিয়া গোয়ার জনসাধারণকে এটা বোঝান'র চেষ্টা হয় যে মন্তেইরোর বর্বর দমননীতি ও অত্যাচারের পিছনে পর্তুগীজ সরকারের সমর্থন ছিল না। 'পিদে'-র কর্তা গোয়াতে এখন কে জানি না। ইনস্পেক্টর অলিভেইরা গোয়া হইতে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

জেনরেল বের্নার্দ গেদীসের জায়গায় এখন পর্তুগীজ ভারতের গভর্নর জেনারেল হইয়া আসিয়াছেন ব্রিগেডিয়ার ভাসালো ই' সিল্ভা। ভাসালো ই সিল্ভা গোয়াবাসী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে কিছুটা ভালো ব্যবহার করার পক্ষে বলিয়া মনে হয়। উপরে যে 'তোষণ নীতি'র কথা বলিয়াছি, তাহার প্রবর্তনে তাঁহার কিছুটা প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। তিনি আসার কিছু দিন বাদে প্রথমে মহিলা বন্দীদের এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়।

গোয়ার ভিতরে ভাসালো ই সিল্ভার এই নীতির ফল কি হইয়াছে বলা শক্ত। তবে গোয়ার বাহিরে ভারতে যে সমস্ত গোয়াবাসী জাতীয়তাবাদী আছেন তাঁহারা যে ইহার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হন নাই বা তাঁহাদের মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই তাহা সুনিশ্চিত। বিগত অক্টোবর মাসে (১৯৫৯) ভারতে গোয়াবাসীদের সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের লোকেরা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত অন্যান্য বহু সম্মানিত গোয়াবাসী সামাজিক নেতৃবৃন্দ সকলে সমবেত ভাবে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। গোয়াবাসীদের যে চারটি রাজনৈতিক সংগঠন বিগত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই সম্মেলন আহ্বান করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এই সম্মেলনে সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়া একটি সংযুক্ত পরিষদ গঠন করিয়া গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যাওয়ার সংকল্প নূতন করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। গোয়াবাসীদের ভিতর সর্বজনশ্রদ্ধেয় রেভারেণ্ড ডাঃ এইচ. ও. মাস্কারেন্যাস্ এই সংযুক্ত পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

গোয়া মুক্তি আন্দোলনের এই প্রস্তুতির পর্যায়ে একজনের অভাব খুবই বেশী করিয়া অনুভূত হইবে—গোয়া মুক্তি আন্দোলনের অসমসাহসী নেতা, তেজস্বী বীর ডাঃ ত্রিস্তাঁও ব্রাগাঞ্জা কুন্যা আর ইহলোকে নাই। এক বৎসরের বেশী হইল (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮) বোম্বাইয়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের জন্মভূমির মুক্তির জন্য তিনি বিরামহীন ভাবে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ১৯৫৩ সালে লিস্‌বনে বন্দী দশা হইতে মার্সেইয়ের পথে তিনি যে ভাবে পর্তুগীজ পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া ভারতে পালাইয়া আসেন, বহুদিন রোমাঞ্চ উপন্যাসের কাহিনীর মত যে কথা সকলে স্মরণ করিবে। তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইয়া এই উপসংহারে এখানেই ছেদ টানিলাম।

সালাজারের ফ্যাসিষ্ট শাসন পর্তুগাল বা গোয়ার ইতিহাসের শেষ অধ্যায় রচনা করিবে না; তাহার পরেও কিছু আছে সে ভরসা হারাই নাই।

॥ ৪৮ ॥

পরিশিষ্ট

(গোয়ার তিনটি জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত)

[এই তিনটি সঙ্গীতের রচয়িতা গোয়ার পল্লী-কবি ও মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক শ্রীগজানন রায়কত। ১৯৫৪ সালে 'আল্‌তিন্যো' জেল হইতে, গোপনে প্রাচীর টপ্‌কাইয়া তিনি এবং সাঁকলি'র শ্রীশিবাজী দেশাই পাহাড়, বন-জঙ্গল পার হইয়া ভারতে পলাইয়া আসেন।]

১

ত্রিবার! মঙ্গলবার!

ত্রিবার মঙ্গলবার! আজলা ত্রিবার মঙ্গলবার!
স্বাতন্ত্র্যাচী সিংহ-গজর্না আতাঁ ইথে উঠনার!

সহ্যপর্বতা, ভার্গব সিন্ধু! উভারুণী হাত
লাখ মুখানে* লল্‌কারুণিয়া দ্যাঁ তিজলা সাথ!
হে রান্যাণ্ডা! উঠ শিরানোঁ, লাবা লাল তিড়ে!
অন্‌ বায়ুনোঁ ফুল্‌বা অমুচ্যা হৃদয়াতীল ইঙ্গ্‌ড়ে,
কুলদেবীনোঁ য়া বৃক্ষান্তুনি করা স্বরে সঞ্চার!
স্বাতন্ত্র্যাচী সিংহ-গজর্না.......................!

লিহিলেল্যা জ্যা ওড়ী, ত্যাঁচী বাড়লী ন স্বাহী
ডোড়ে ভরুণী তোচী দেখিতো উড়লেলী লাহী

ধন্য ভারত,* ধন্য ভূমিহী, ধন্য তিচে পুত্র
ধন্য তয়াচা ত্যাগ দেখতো জনতেচে নেত্র।
ধন্য করোনি লিহিল্যাচা মীহি সাক্ষাৎকার
স্বাতন্ত্র্যাচী সিংহ-গজর্না......................!

কোল মিড়ালা ফুটলা নারল গুডী উভী ঝালী
অন্ মাউলী রচলা কুন্কম পুনঃ তুঝা ভালী
সরলী ভীতি, চড়্লী নীতি, তুটলা গে লোভ
সামর্থ্যাচা অশা অন্তরী উফাড়লা শোভ।
য়া পুঢ়তী! তব পায়বরতী যা রক্তাচী ধার,
স্বাতন্ত্র্যাচী সিংহ-গজর্না আতাঁ ইথে উঠনার!

[ভাবানুবাদ]

মুক্তি-মাঙ্গলিক

শুভদিন! মঙ্গলময় দিন! আজ শুভদিন! মঙ্গলময় দিন!
স্বাতন্ত্র্যের (স্বাধীনতার) সিংহগর্জন এখন এখানে উঠিবে॥

হে সহ্যপর্বতমালা! হে ভার্গব সিন্ধু! হাত তুলিয়া
লাখো মুখে ললকার ধ্বনি দিয়া তাহার সঙ্গে সাথ দাও
(তাহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাও)!
হে রানে বংশের বীরগণ! শির তোলো, (কপালে) রক্ত তিলক নাও,
বায়ুপ্রবাহ, আমাদের হৃদয়ের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলো,
কুলদেবিগণ, অরণ্যানিতে ত্বরায় সঞ্চারিত হও (আশীর্বাদ করো)!
স্বাতন্ত্র্যের সিংহগর্জন এখন এখানে শোনা যাইবে॥

(কবি গাহিতেছেন :)
এই গানের কলি লেখা হইতে না হইতেই, কাগজে মসীর রেখা না শুকাইতেই,
চোখ ভরিয়া দেখিলাম চারিদিকে লাজ বর্ষণ হইতেছে।
ভারত ধন্য (লোহিয়া ধন্য)! ধন্য এই ভূমি! ধন্য এই দেশের সন্তানেরা!

---

* পাঠান্তরে 'ধন্য লোহিয়া'। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া ১৯৪৬ সালে গোয়ায় গিয়া প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন বলিয়াই কবি বোধহয় গোয়াবাসীদের কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য প্রথমে তাঁহার নাম এই সঙ্গীতের পদের সঙ্গে যুক্ত করিয়া থাকিবেন। বর্তমানে 'ধন্য ভারত' পদই বেশী প্রচলিত।

জনতা নিজেদের চোখে তাহাদের ত্যাগ প্রত্যক্ষ করিতেছে,
আমি (কবি) নিজে ধন্য, নিজ চোখে দেখিয়া এ কথা লিখিতেছি।
স্বাতন্ত্র্যের সিংহগর্জন এখন এখানে ধ্বনিত হইবে ॥

দেবতাদের আশীর্বাদ মিলিয়াছে, নারিকেল দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে,
দেশমাতৃকা আবার তোমাদের কপালে রক্ত-কুঙ্কুম রাগ রচনা করিয়া দিলেন।
ভয় আজ (মন হইতে দূরে) সরিয়া গিয়াছে, নীতি (আদর্শ) সবার উপরে
স্থান পাইয়াছে, লোভের মোহপাশ টুটিয়া গিয়াছে,
অজেয় সংকল্পের শক্তিতে আমাদের অন্তর প্রদীপ্ত হইয়াছে।
হে জননী! তোমার পদপ্রান্তে আমাদের বুকের এই রক্তধারা অঞ্জলি দিলাম
স্বাতন্ত্র্যের সিংহগর্জন এখন গোয়াতে ধ্বনিত হইবে ॥

২

পুঢ়ে চলা!

হুা! পুঢ়ে চলা! পুঢ়ে চলা! পুঢ়ে............!
রৌদ্র চলা পঞ্চীবরী বিজয়ী ঝাণ্ডে!

সহ্যাদ্রিচে উঞ্চ কড়ে
স্বাগতাস সজ্জ খড়ে,
দশ-দিশান্ত বিজয়ান্ত ঝড়তি চৌঘড়ে!
পুঢ়ে চলা! পুঢ়ে............!

মোহপাশ তোড়ুনিয়া
আস্থী বন্‌লো বেড়ে,
ধ্যেয়ানেং ভারুনিয়া
চাললো পুঢ়ে!
পুঢ়ে চলা! পুঢ়ে............!

জাঁউ চলা মনোবলে
অড়বিন্যাস্ ফিরঙ্গাচ্যা পলটনী পুঢ়ে,
ছাতিচী করুণী ঢাল,
হাতীং ক্রান্তিচী মশাল;
বীরানোঁ রক্তাচেং সাণ্ডুনী সড়ে
পুঢ়ে চলা! পুঢ়ে............!

রক্তাচে করুণী দান
চঢ়বু ক্রান্তিচে নিশান!
সিম্পতীল পুষ্পাঞ্চে দেবতা সড়ে
পুঢ়ে চলা! পুঢ়ে............!

[ভাবানুবাদ]

আগে চলো!

আগে চলো! আগে চলো! আগে............!
পশ্চিমের ওপর বিজয় নিশান রোপন করার জন্যে চলো, এগিয়ে চলো!

সহ্যাদ্রির শিখর স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে,
দশদিশান্ত ধ্বনিত করে বিজয় বাদ্য বাজ্‌ছে,
আগে চলো! আগে............!

মোহপাশ ভেঙে
শেষ লক্ষ্যে পেঁছানোর সংকল্পে
মন স্থির করে
আমরা সম্মুখে এগিয়ে চলেছি
আগে চলো! আগে............!

চলো, মনের জোরে এগিয়ে যাই,
সাম্‌নে ফিরিঙ্গীদের পল্‌টনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্যে,
নিজেদের বক্ষপটকে ঢাল করে নিয়ে,
হাতে বিপ্লবের মশাল নিয়ে,
হে বীরেরা নিজেদের রক্ত এবং স্বেদ সম্বল করে
আগে চলো! আগে............!

রক্ত অর্ঘ্য দান করে
বিপ্লবের নিশান চড়াবো আজ!
দেবতারা পুষ্প-বৃষ্টি করবেন আমাদের মাথায়,
আগে চলো! আগে চলো!

৩

গোবা [১] মাঝা

গোবা মাঝা মঙ্গলময়ী! সৌন্দর্যাচী খান
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো, হা মজলা অভিমান।

সতার মঙ্গুড় সহ্যাবাজবী দুধ-সাগরাচী [২]
বহিনী গাতে স্তোত্র মঙ্গল পরশুরামাচী [৩]
গন্ধর্বাচা গানকলেচে আম্হালা বরদান।
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো............।

মাডাণ্ডা কবড়াতুন য়েকা কোঙ্কনী কান্তার [৪]
কাষ্টী তোড়ী শেতা-মধুনি খপতী বস্তীকার
শীত কঢ়ীচী [৫] রুচি আমুচ্যা অমৃতাহি সমান।
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো............।

মন্দিরাঁতুনী ঘুমতী নিত সনইচে সুর
নিত প্রার্থনা খৃস্তী জমতী ইগজী [৬] সমোর
ইথে নান্দতী সংস্কৃতি সারী ভগনীচ্যাহি সমান।
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো............।

১—গোয়ার মারাঠী ভাষার বানান 'গোবা' অথবা 'গোব্যা'; উচ্চারণে বিশেষ তারতম্য নাই।

২—পূর্ব সীমান্তে ভারত হইতে রেলপথে গোয়াতে আসার সময় 'দুধ-সাগর' নামে জলপ্রপাতের পাশ দিয়া আসিতে হয়। একটু দূর হইতে এই জলপ্রপাতের শব্দ গম্ভীর সঙ্গীতের কলরোলের মত শোনায়।

৩—কোঙ্কন অঞ্চলে প্রবাদ আছে ভগবান পরশুরাম পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বা সহ্য-পর্বত পার হইয়া আসিয়া আরব সাগর হইতে কোঙ্কন-ভূমি উদ্ধার করেন। আরব সাগরের অপর নাম এতদঞ্চলে 'ভার্গব সিন্ধু' (পরশুরাম মহর্ষি ভৃগুর পুত্র)। কোঙ্কন উপকূলের হিন্দুদের বিশ্বাস কোঙ্কন-ভূমি ভগবান পরশুরামের সৃষ্টি।

৪—কোঙ্কনী 'কান্তার' অর্থ কোঙ্কনী গান। কান্তার কথাটি কোঙ্কনীতে লাটিন-পর্তুগীজ 'cantar' হইতে আসিয়াছে; 'cantar' মানে 'to sing'—গান করা। কোঙ্কনীরা সঙ্গীত পারদর্শী বলিয়া 'গান্ধর্ব-কলা' বরদানের কথা এই গানে উপরের লাইনে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫—'কঢ়ী' কোঙ্কনী ও মারাঠী সাধারণ লোকেদের ভাত খাওয়ার অপরিহার্য অনুপান; ঘোল এবং ঝাল-টক মশলার ফোড়ন দিয়া তৈরী। অনেক সময় গরীবদের—বিশেষ

কুড়াগরী য়া ঘর কৌলিচে শিল্পীত পোকড়ীচী,
পাটাতুনীয়া রৈকা জুড়জুড় বেদ সংহিতাচী,
তরুবেড়ীচা ঝাড্যা আড়ুন কোকিল গাতী গান।
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো............।

বেষাহি সাবী মনভোলা পরী পাপভীরু নীতিমান
কষ্টাড়ু সাঁবড়া চপড় বহু কষ্টি সদা ব্রতকাম
সরল রাঙগড়া কুড়বাড়ী মম পাহুনী লবতে মান।
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো............।

চরবলী হী আবে বাই, কোকম হিরবে রান,
খাজনাঁত য়া পীক প্রীতিচে মোদে দুলবী মান,
জুব্যা জুব্যাতুনি ফিরতী নাঁবা, বধুনি হরতে ভান॥
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো............।

হী রান্যাঞী মায়ভূমি অন্ অমর কলাবন্তাচী,
পূজ্য মাহাত্মে সন্ত কবীবর বন্দ্য বিভূতিচী,
তিচ্যা মুক্তিস্তব ঝটলে ত্যাঁচে গাইন গৌরব গান॥
ধন্য ধন্য মী ইথে জন্মলো............।

[ভাবানুবাদ]

আমার গোয়া [১]

('স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে!')

মঙ্গলময়ি গোয়া আমার! সৌন্দর্যের আকর (খনি)
ধন্য ধন্য আমি এখানে জন্মেছি, এই আমার অভিমান (গর্ব)॥

সহ্যপর্বত এখানে দুধ-সাগরের [২] বীণা বাজায়,
যেন (দেশ) ভগিনীরা মিলে ভগবান পরশুরামের [৩] স্তোত্রগান করে,
গন্ধর্ব সঙ্গীতকলা আমাদের (কাছে) বরদান হিসেবে এসেছে!
ধন্য ধন্য আমি............॥

করিয়া ভাত খাইতে অভ্যস্ত কোঙ্কনী গ্রামবাসীদের—এছাড়া ভাত খাওয়ার মত তরি-তরকারী বিশেষ কিছু মেলে না।

৬—'ইগর্জী' কথাটি পর্তুগীজ 'igreja' হইতে আসিয়াছে। কোঙ্কনী 'ইগর্জী' বা বাংলা 'গীর্জা' পর্তুগীজ 'igreja'-র অপভ্রংশ।

নারিকেল কুঞ্জে কুঞ্জে শোন কোঙ্কনী গান[৪] (কান্তার) শোনা যায়,
বয়ন-শিল্পীরা, জেলেরা, গ্রামবাসী চাষীরা মাঠে কাজ করতে করতে সেই
গান গেয়ে চলেছে;
আমাদের 'কঢ়ী'[৫] ঠান্ডা হোক, তাই আমাদের অমৃত-সমান রুচি সঞ্চার করে।
ধন্য ধন্য আমি............॥

মন্দিরে মন্দিরে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় সানাইয়ের সুর বাজে,
খৃষ্টভক্তরা গীর্জার[৬] সম্মুখে প্রার্থনার জন্য এসে সমবেত হয়;
সব ধর্ম এবং সংস্কৃতি এখানে আপন বোনেদের মতো পাশাপাশি মিলে
মিশে থাকে।

ধন্য ধন্য আমি............॥

কদলী কুঞ্জে কতনা শোভা! কতনা সম্পদ!
পাটাতনের ওপর দিয়ে ঝরনার জলের ধারা বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনে
মনে হয় কেউ যেন নিরন্তর বেদ-সংহিতা এখানে পড়ে চলেছে;
গাছপাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে কোকিল এখানে গান করে।
ধন্য ধন্য আমি............॥

এদেশে মানুষের বেশ সাদাসিধা, মন সরল; কিন্তু তারা ধর্মপ্রবণ পাপভীরু।
তাদের গায়ের রং কালো (ময়লা) হলেও তাদের অন্তঃকরণ সাদা (সোজা);
নিজেদের কাজে তারা সব সময় লেগে থাকে; তারা সকলে আমার সম্মানার্হ।
ধন্য ধন্য আমি............॥

এখানে আম আর কোকমের বন সবুজে ভরা,
মাঠে সবুজ ধানও মাথা দুলিয়ে যেন তাদের সঙ্গে সায় দিচ্ছে;
ছোট ছোট নদীতে নৌকা ঘুরে বেড়াচ্ছে—এসব দেখে হর্ষে,
গর্বে আমার মন ভরে উঠছে।

ধন্য ধন্য আমি............॥

বীর রানাদের মাতৃভূমি এই দেশ, অমর শিল্পীদের মাতৃভূমি,
পূজ্য মহাত্মাগণের, বন্দনীয় বিভূতিসম্পন্ন সন্ত (সাধু) ও কবিগণের মাতৃভূমি।
তাঁদের এবং যাঁরা এই দেশকে মুক্ত করার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন
সকলের গৌরব-গান গাই।

ধন্য ধন্য আমি............॥
